॥ পূর্ণ পরমাত্মনে নমঃ ॥

মুসলমান

বোঝেনি

জ্ঞান কুরআণ

(অল্লাহ এক, ধরিত্রী এক। ধর্ম কিভাবে হল অনেক?)

**{ সকল মুসলমান ভাই এবং বোনেদের জন্য এই পুস্তক আল্লাহের বরদান সিদ্ধ হবে।
- লেখক }**

জীব আমাদের জাতি, মানব (Mankind) ধর্ম আমাদের।
হিন্দু, মুসলিম, সিখ, ঈসাঈ, পৃথক কোনো ধর্ম নয়॥

লেখক :- সন্ত রামপাল দাস

প্রকাশক :- প্রচার প্রসার সমিতি ও সর্ব ভক্তগণ
সতলোক আশ্রম, হিসার - টোহানা রোড, বরবালা
জেলা - হিসার (রাজ্য - হরিয়ানা) ভারত।

মুদ্রক :- ক্লাসিক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রী
প্লট নং-L-১৪৮&১৪৯ ভারনা ইন্ডাস্ট্রীয়াল ইস্টেট গোয়া - ৪০৩৭২২

সম্পর্ক সূত্র :- 08222880541, 08222880542, 08222880543,
082228808544, 08222880545

বাংলায় কথা বলার জন্য :- 7840000870, 6295917636, 8777828477

e-mail :- jagatgururampalji@yahoo.com
visit us at :- www.jagatgururampalji.org

বিষয় সূচী

ক্রম সং.	বিবরণ	পৃষ্ঠা
I.	ভূমিকা	I - VII

(অধ্যায় নম্বর ১)

1. পবিত্র কুরআনে কী বলছে 1
2. পবিত্র কুরআন থেকে জ্ঞান 1
3. বাইবেল এবং কুরআনের জ্ঞানদাতা একজনই..... 1
4. পবিত্র কুরআনের উত্তম শিক্ষা..... 2
5. নেশা করা ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ 4
6. সুদ নেওয়া পাপ 4
7. জাকাত (দান) করা উচিত 4
8. কুরআনের জ্ঞানদাতা নিজের মহিমা বলেছেন 4
9. কুরআনের জ্ঞানদাতা নিজেকে বাদ দিয়ে, অন্য কাদির আল্লাহর মহিমা বলেছেন 5
10. পুস্তক ফজাইলে আমাল থেকে তথ্য 5
11. ফজাইলে আমাল থেকে উদ্ধৃত নিবন্ধ 5
12. কুরআন মজিদ থেকে প্রমাণ 7
13. ওই জ্ঞান যা কুরআন ও গীতার জ্ঞানপ্রদানকারীও জানেন না 8
14. কুরআনের অমীমাংসিত জ্ঞান (ঔন. সীন. কাফ.-এর রহস্য ভেদ) 8
15. শাস্ত্রে আল্লাহর (পরমাত্মার) উল্লেখ 11
16. মক্কা মহাদেবের মন্দির 14
17. মানুষের ভোজনের জন্য পরমেশ্বরের আদেশ 15
18. হজরত মুহম্মদ মাংস খেতেন না 18
19. সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের বিচার 18
20. কুরআন জ্ঞানদাতার মাংস ভক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশ 19
21. মানবদের ভোজনের জন্য সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও আদেশ 19
22. মনুষ্যের ভোজনের জন্য নির্দেশ 20
23. সূক্ষ্মবেদে (কলাম-এ-কবীরে) কাদির আল্লাহর নির্দেশ 20
24. পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে প্রবেশের পূর্বে কিছু আবশ্যক বিষয়..... 23
25. জন্ম ও মৃত্যু সমন্ধে বিবেচনা..... 25
26. ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের দ্বারা বলা বিধান ভুল 25
27. পুনর্জন্ম সম্বন্ধিত প্রকরণ 27
28. কিয়ামত (প্রলয়) পর্যন্ত কবরে থাকার সিদ্ধান্তের বিষয়ে খণ্ডন 27
29. প্রলয়ের বিষয়ে পরিচয় 30

- প্রথম দিব্য মহাপ্রলয় 34
- দ্বিতীয় দিব্য মহাপ্রলয়..... 34
- তৃতীয় দিব্য মহাপ্রলয় 35

(অধ্যায় নং. 2)

1. আল্লাহ্ পৃথিবীতে আসেন কি, আসেন না? 35
- মুসলমান ধর্মের মৌলানাদের শঙ্কার সমাধান 37
- বাখবর কে? আল্লাহর নাম কি? 37
- নবী মুহম্মদের আকাশ যাত্রা (মেরাজ) নিয়ে মতবিরোধ 42
- নবী মুহম্মদ সাহেবের আকাশ যাত্রা (মেরাজ) 43
- পরমাত্মার জন্য কোনোকিছুই অসম্ভব নয় 44

2. সর্বনাশের জন্য মদ্য পানই যথেষ্ট 44
3. মুসলমান ধর্মে বিবাহের রীতি..... 45
4. ফুরকানের (সত্য-অসত্যের) নির্ণয়..... 49
5. যজ্ঞের দ্বারা লাভ 53
6. নাম জাপ করার লাভ 53
7. আদি সনাতন পন্থ অর্থাৎ যথার্থ কবীর পন্থে পূজা 53
8. দুই ধর্মাবলম্বীদের বোঝানো 63
9. কলিযুগে কাদির খুদার আবির্ভাব..... 73
- কাশী নগরের জঙ্গলে লহরতারা নামক এক সরোবরে পদ্ম ফুলের উপর পরমেশ্বর কবীরের প্রকট হওয়ার বর্ণনা..... 76
- কলিযুগে কবীর পরমেশ্বরের অবতরণ 76
- দ্বাপরযুগে ভক্ত সুদর্শনের মাতা-পিতার আত্মা, কলিযুগে অন্য মানবজন্মের বিবরণ 77
- শিশু কবীর পরমেশ্বরের নামাঙ্কন 80
- শিশু কবীরদেব দ্বারা কুমারী গরুর দুধ পান করা..... 81
- নীরুর ধন প্রাপ্তি 82
- শিশু কবীরকে সুন্নত করার ব্যর্থ প্রয়াস 83
- ঋষি রামানন্দ, সেউ, সম্মন, নেকী ও কামালীর পূর্ব জন্মের জ্ঞান 83

(অধ্যায় নং. 3)

1. হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত 96
- বাবা আদমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 96
- বাবা আদমের উৎপত্তি 96
- পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) মানুষের মতো (নরাকার) 97
- ব্রহ্মা, আদম ও হেবাকে (হব্বা) স্বর্গে রাখেন..... 97
- একের অধিক প্রভুর প্রমাণ 98
- ঈসা মসীহার (যীশু খ্রীষ্টের) দ্বারা কাল ভগবান চমৎকার করাতেন..... 99
- ঈসা মসীহার (যীশু খ্রীষ্টের) মধ্যে ফেরেশতা প্রবেশ করে চমৎকার করতেন 100

2. " মোহম্মদ বোধ " অধ্যায়ের সারাংশ (মুসলমান ধর্মের পরিচয়) 101
- কাদির (সমর্থ্যবান) আল্লাহ্ কবীর 105
- বাদশা সিকন্দর লোধীর অসাধ্য রোগ নিরাময় করা 106
- স্বামী রামানন্দকে জীবিত করা 107

- সমস্ত মানুষ এক প্রভুর সন্তান, যারা দুই মানেন তারা অজ্ঞানী 107
- পবিত্র মুসলমান ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 108
- শেখতকী নামের এক মুসলমান পীরের সহিত কথোপকথন 108
- পবিত্র কুরআন মজিদে প্রভুর বিষয়ে কি বলেছেন? 109
- হজরত মুহম্মদের জীবন চরিত্র 110
- পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থে হজরত মুহম্মদের বিষয়ে উল্লেখ 113
- হজরত মুহম্মদ কিভাবে কুরআনের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন? 118
- পবিত্র ঈসাই ও মুসলমান ধর্মের অনুগামীদের কর্ম আধারে লাভ ও ক্ষতি দেওয়ার মালিক তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) 119
- মামরে তিন দেবতার দর্শনের প্রমাণ 120
- (ঈসাহাকের জন্মের প্রতিশ্রুতি) 120
- বাদশা সিকন্দরের শঙ্কার সমাধান 121

3. মৃত পুত্র কামালকে জীবিত করা 123
4. শেখতকী দ্বারা কবীরজীর অন্যান্য পরীক্ষা..... 124
5. কামালীর পূর্ব জন্মের পরিচয়..... 124
6. শেখতকীর মৃত কন্যা কামালীকে জীবিত করা 126
7. সরষে তেলের গরম কড়াইতে কবীর সাহেবকে ফেলে দেওয়া 127
8. শেখতকী দ্বারা কবীর সাহেবকে গভীর জলের কুয়ায় ফেলে দেওয়া 128
9. শেখতকীর গুন্ডাদের দ্বারা কবীর সাহেবকে মারার নিষ্ফল প্রয়াস..... 129
10. হজরত মুহম্মদের বিষয়ে সন্ত গরীব দাসজীর বিচার 129
11. কুরবানির বাস্তবিক পরিভাষা..... 133
12. সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান কে বলেছেন? 133
13. অল-খীজ্রের (অল কবীরের) বিশেষ পরিচয়..... 133
14. সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞানের বিষয়ে প্রমাণ 135
15. কুরআন শরীফেও (মজিদ) সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই 136
16. (দেখুন ফটোকপি বেদ মন্ত্রের) 137
17. হজরত মুহম্মদের সাথে কবীর আল্লাহর সাক্ষাৎ 144
18. ইসলামের অমীমাংসিত ধাঁধা..... 146
19. পুনর্জন্ম হয়, এটির অনেক প্রমাণ পড়ুন 146

- সম্মন নামের আত্মাই ছিলেন সুলতান ইব্রাহিম 147
- নেকী, সেউ ও সম্মনের বলিদানের আত্মকথা..... 148
- সম্মনের আত্মাই পরে নৌশের খান হয়েছিল 150
- সুলতান অব্রাহিমের (ইব্রাহিম) জন্মের আত্মকথা 151
- সুলতান ইব্রাহিমকে শরণে নেওয়া 154
- অব্রাহিম অধম সুলতানের বিষয়ে সন্ত গরীব দাসের বিচার 159
- অব্রাহিম অধম সুলতানের পরীক্ষা 161
- ভক্তের মন-বিচার সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়া উচিত 162
- দাসের পরিভাষা 162
- সুলতান অব্রাহিম কিভাবে সারনাম মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন?..... 163

- রাজা বড় না ভক্ত রাজ বড়?..... 164
- বিকার যেমন - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাসনা নষ্ট হয় না কিন্তু শান্ত হয়ে যায়..... 164
- ভক্ত তরুবরের (বৃক্ষের) মতো স্বভাবের হয় 165

20. মন্সূর আলীকে কবীর সাহেব উদ্ধার করেন 172
21. মন্সূর আলীর শব্দবাণী..... 174
22. ভক্ত শেখ ফরিদের আত্মকথা 176

(অধ্যায় নং. 4)

1. রহমানের রহমত..... 178

- আমি বুঝেছি আল্লাহর মহিমা 178
- এখন হলাম প্রকৃত মুসলমান 179
- ভূত-প্রেতের বাধা থেকে মুক্তি পেয়েছি 180

(অধ্যায় নং. 5)

1. সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি রচনা..... 181

- আমরা কালের (ব্রহ্ম) লোকে কিভাবে এসেছি?..... 182
- শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? 186

2. সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা..... 189

- (সূক্ষ্ম বেদ থেকে নিষ্কর্ষ রূপে সৃষ্টি রচনার বর্ণন)..... 189
- আত্মারা কালের জালে কিভাবে ফেঁসেছে? 191
- শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি..... 194
- তিনগুণ কি? দেখুন প্রমাণ সহিত 195
- ব্রহ্মের (কাল) অব্যক্ত (অদৃশ্য রূপে গোপন) থাকার প্রতিজ্ঞা 196
- ব্রহ্মা তাঁর নিজের পিতা কালকে (ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস 197
- মাতা দুর্গার দ্বারা ব্রহ্মা অভিশাপ প্রাপ্ত..... 198
- বিষ্ণু তাঁর নিজের পিতা কালকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্তির জন্য প্রস্থান ও মাতা দুর্গার আশীর্বাদ লাভ 199
- পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা 204
- পবিত্র অথর্ববেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 205
- পবিত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 209
- পবিত্র শ্রীমদ্ দেবী মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 213
- পবিত্র শিব মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ..... 214
- শ্রীমদভগবত গীতাতে সৃষ্টি রচনা প্রমাণ..... 214
- পবিত্র বাইবেলে ও পবিত্র কুরআন শরিফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 216
- পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্ দেব) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ..... 217
- আদরণীয় গরীবদাস সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 219
- আদরণীয় নানক সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ 224
- অন্যান্য সাধু-সন্তদের দ্বারা সৃষ্টি রচনার রূপকথা 226

3. পাক কুরআন পুস্তক থেকে প্রমাণিত আয়াতের ফটোকপি গুলি 228

ভূমিকা

বিস্মিল্লাহির্রহমানির্রহীম :- শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

আমি (লেখক সন্ত রামপাল দাস) সমস্ত পবিত্র ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়ন করে জানতে পারলাম যে, এই সংসারে প্রধানত দুটি শক্তি আছে, যে শক্তি সমস্ত জীবকে প্রভাবিত করছে।

(১) রহমান, (২) শয়তান

এই পুস্তকের অন্তিম ভাগে সৃষ্টি রচনা (Creation of World) নামক অধ্যায় পড়বেন। তার মধ্যে আপনি জানতে পারবেন যে, "রহমান" অর্থাৎ দয়ালু কাদির (সমর্থবান) আল্লাহ (পরমেশ্বর), সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা, সকলের পালন-পোষণকারী কে? আর "শয়তানই" বা কে? এই শয়তান প্রত্যেক প্রাণীকে ভ্রমিত করে নিজের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। তিনি মানবকে কিছু ভালো আর অধিকতম ভুল জ্ঞান প্রদান করেন।

কাদির আল্লাহ সম্পূর্ণ যথার্থ জ্ঞান বলেন এবং শয়তান (যাকে মহাপুরুষগণ "কাল" বলেছেন) গুপ্তরূপে থেকে অজ্ঞান ও জ্ঞানের মিশ্রণ মানবকে দেয়, যা অসম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান। সমর্থবান পরমেশ্বর সন্ত ও সদগুরুর (মুর্শিদ) রূপ ধারণ করে প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে যথার্থ সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান স্বয়ং নিজ মুখকমল দ্বারা বর্ণনা করে বলেন। কিন্তু সর্ব মানব একটা কথাই মুখস্থ করে রেখেছে যে, প্রভু (খুদা/God/রব) হলেন নিরাকার। যদিও সমস্ত ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে প্রমাণ রয়েছে যে, খুদা মানবের মতো সাকার।

প্রমাণের জন্য :- পবিত্র বাইবেলের উৎপত্তি অধ্যায় ১ শ্লোক নং ২৬ -তে লেখা আছে যে, পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে বলেছিলেন, "আমি এখন মানবকে আমার নিজের স্বরূপ অনুসারে সৃষ্টি করবো"। পরমাত্মা মানবকে নিজের প্রতিমূর্তিতে উৎপন্ন করেছেন। (পবিত্র বাইবেল থেকে সংগৃহীত সমাপ্ত।)

এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, পরমাত্মা মানবের মতো আকারে আছেন, নিরাকার (বেচুন) নয়। খ্রীষ্টান (ঈসাই) ভাইয়েরা মুখস্থ করে রেখেছেন যে, পরমাত্মা হলেন নিরাকার (God is Formless)।

এই প্রকার হিন্দু ভাইয়েরাও পরমাত্মাকে নিরাকার বলেন। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন। তাঁদেরকেই পরমাত্মা মানেন, যারা সাকার মানব সদৃশ্য ছিলেন।

এই প্রকার মুসলমান ভাইয়েরা বলেন যে, আল্লাহ হলেন নিরাকার (বেচুন)। আবার একথাও বলেন যে, খুদা সপ্তম আকাশে সিংহাসনের (তখত/আরশ) উপর বসে আছেন। যখন আল্লাহ সিংহাসনের উপর বসে আছেন, তখন তো তিনি সাকার মানব স্বরূপেই আছেন। যখন কাদির আল্লাহ পৃথিবীর উপরে আসেন, তখন আল্লাহকে নিরাকার মেনে নেওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে চিনতে ভুল করে ঠকে যায়। তাঁর সঠিক সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞানকে নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে মিথ্যা মনে করে তাঁকে খুদা বলে স্বীকার করেন না অর্থাৎ মানেন না।

এই পবিত্র পুস্তক "মুসলমান বোঝেনি জ্ঞান কুরআন" - এর মধ্যে এই সংশয়গুলি সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করা হয়েছে। কৃপা পূর্বক হৃদয় স্থির রেখে ধৈর্য সহকারে যদি পড়েন, তাহলে দুই দাঁতের মাঝে আঙুল রেখে বসেই যাবেন।

লেখক এই পুস্তকটি ওই কাদির আল্লাহর দ্বারা আকাশ থেকে স্বয়ং পৃথিবীর উপরে এসে বলা সঠিক সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান হতে প্রমাণ সহিত লিখেছেন। আমার উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর সমস্ত মানবকে সঠিক আধ্যাত্ম জ্ঞান প্রদান করা। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে জ্ঞান প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলিতে লেখা রয়েছে, তাও ওই ধর্মের ধর্মাবলম্বীরা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। যার কারণে আমাকে অধিক কঠিনতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

যদি প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তি নিজেদের ধর্ম গ্রন্থগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতেন, তাহলে তাদের বোঝানো আমার

পক্ষে সহজ হতো। যেমন কোনো বিদ্যার্থী যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা সঠিকভাবে করে থাকে, তাহলে তাদেরকে উচ্চ শ্রেণীর পড়াশোনা শেখাতে খুবই সহজ হয়। যারা পূর্বেই দুই আর দুই যোগ ছয় পড়ে রেখেছে আর সেটাই মুখস্থ করে আজও পড়ছে, তাদের যদি সঠিক উত্তর দিয়ে বোঝানো হয় যে, দুই আর দুই ছয় নয়, চার হয়, তাদেরকে এটা বোঝানো বড় কঠিন কার্য হয়ে যায়। তারা সঠিক উত্তর শুনতে চান না, এর পরিবর্তে বিরোধ করে বলেন যে, নতুন শিক্ষক ভুল পড়াচ্ছেন। উপরে উল্লিখিত "পবিত্র বাইবেলে" লেখা আছে যে, পরমাত্মা মানবের মতো সাকারে আছেন। ঈসাইদের (খ্রীষ্টান) যদি বলা হয় যে, আপনারা পবিত্র বাইবেল সঠিকভাবে বোঝেননি, কারণ আপনারা ভুল বলেন যে, God is Formless (পরমেশ্বর হলেন নিরাকার) তখন তারা আমাকেই মূর্খ ভাবেন আর বলেন যে, এক হিন্দু ব্যক্তি কিভাবে বুঝতে পারে পবিত্র বাইবেলের জ্ঞান? আমরা তো প্রতিদিনই বাইবেল পড়ি। বর্তমানে এইরূপ দশা প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি অনুগামীদের।

হিন্দু ধর্মে পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে প্রথম নাম আসে বেদের আর বেদের জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান মানা হয়। ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ -তে প্রমাণ আছে যে, সর্ব সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা পরমেশ্বর সমস্ত লোকের (ধাম) উপরের লোকে বিরাজমান আছেন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭ তে এবং বেদের অনেক স্থানে লেখা আছে যে, "পরমেশ্বর সর্বোচ্চ উপরের ধামে বিরাজমান আছেন" অর্থাৎ নিবাস করেন। সেখানে তিনি সম্রাটের (রাজার) মতো সিংহাসনের উপর বিরাজমান আছেন। তিনি সঠিক ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য সশরীরে দ্রুতগতিতে নীচের পৃথিবী ও অন্যান্য লোকে আসেন এবং যে সকল আত্মারা পরমেশ্বরের সন্ধানে লেগে রয়েছেন, তাদের জট পাকানো জ্ঞানকে সরল করেন, ওই ভালো আত্মাদের সঠিক জ্ঞান বোঝান। তবে হিন্দু ধর্মের ব্যক্তিরাও এই কথা মানতে প্রস্তুত নন যে, বেদের মধ্যে এমন কোনো কথার বর্ণনা রয়েছে। এইজন্য আমাকে তারা সমালোচক এবং ধর্মবিরোধী বলে মনে করেন। আমি প্রতিটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে যে সত্যজ্ঞান রয়েছে, তা সকলের সামনে প্রকাশ করেছি এবং সেই আধারে আমি ওই সকল ধর্মের ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বোঝাতে চেয়েছি। প্রথম প্রথম একবার বিরোধ তো সকলেই জোর-তোর ভাবেই করেন কিন্তু সত্যকে যখন নিজ নিজ গ্রন্থে নিজের চোখে দেখেন, তখন শান্ত হয়ে যান। তবে অনেকেই ওই সত্যকে নিজ চোখে দেখেও স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। কেননা শয়তান তাদের বুদ্ধির উপরে চেপে বসে আর তাদের এই বলে ভয়ভীত করে যে, সমাজের লোকে কি বলবে? তোদের ক্ষতি হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে! ওটা হয়ে যাবে! তবে যারা বুদ্ধিমান এবং সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসেন, তাদের তো খুশির ঠিকানাই থাকে না। তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের মানব জীবনকে ধন্য করে নেন।

উদাহরণের জন্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আল্লাহর (পরমাত্মার) সন্ধানে সত্য এক অন্বেষণকারীর আত্মজীবনী। বোঝার জন্য এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট :-

"এবার বুঝেছি আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞান"

আমি শাহজাদ খান, জেলা - গুরগাঁও, হরিয়ানার নিবাসী এবং আমি এক মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এসেছি। শুরু থেকেই আল্লাহর খোঁজ করেই চলেছি। তবে যেদিন থেকে আমি বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের নিকট থেকে নামদীক্ষা প্রাপ্ত করেছি, সেদিনই আমার আল্লাহ তালার সন্ধান করা সমাপ্ত হয়েছে। নামদীক্ষা নেওয়ার পূর্বে আমি কুরআন শরীফকে অনেকবার পড়েছি কিন্তু তাতে যা লেখা আছে, তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের মুসলিম সমাজে যে সকল মোল্লা-কাজী ও প্রবীণ-বৃদ্ধরা আছেন, তারা শুরুতেই আমাদের একটা কথাই শিখিয়ে রেখেছেন যে, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, বকরী ঈদ মানাবে, ছাগল জবাই করবে, গোশ (মাংস) খাবে, এসব যা কিছুই করবে, তার সাথে আল্লাহর নাম অবশ্যই নেবে। আমি মুসলিম সমাজের হওয়ার কারণে এসব ভক্তি সাধনা করে দেখেছি। মুসলিম সমাজে যা বলা হতো, তাই করতাম। তবে এসব করেও আমার কোনো লাভ হয়নি। আমার নিজেস্ব কোনো কাজ-কর্ম ছিলো না। আমার মা-বাবা আমাকে বলতেন যে আমি কখনো

আমার জীবনে কিছুই করতে পারবো না। যার জন্য আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে তহজ্জুদ এর নামাজ, তার সময় রাত্রি বেলা ইশার নামাজের পরে শুরু হয় আর ফজরের নামাজের সময় শুরু হওয়ার সঙ্গে সমাপ্ত হয়। কিন্তু ফজরের নামাজ শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগের সময়কে অফজল (উত্তম) সময় মনে করা হয়।

এটা সবার প্রথমে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছিলেন। এই নামাজ পড়লে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় আর গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অপরাধ প্রতিরোধ করে। সকল ইচ্ছা পূরণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে যা চাই, তা-ই পাই। প্রতিটি প্রার্থনা পূর্ণ হয়। পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো কেননা তা ধার্মিক লোকেরা আদায় করে। সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এটি পড়েছেন। এটি একজনকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী করে, একজনের গুনাহ মাফ করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে। এটি তার সারমর্ম। তাহাজ্জুদ নামাজের সময়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা আসে যে কেউ কিছু চাইছে, তার ইচ্ছা পূরণ করা উচিত।

সকালে সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমরা ফজরের নামাজ বলি যদি এই নামাজ পড়ে কোনো কাজে রওনা হয়, তাহলে বুঝবেন আপনার কাজ অবশ্যই হয়ে যাবে। একশো শতাংশ হবেই।

আমি প্রায় এই সাধনা বাইশ বছর ধরে করেছি কিন্তু এই ২২ বছরে একদিনও আমার মনে হয়নি যে, আজ আমার কিছু লাভ হয়েছে বা আমার কোনো ক্যারিয়ার তৈরি হয়েছে কিংবা নিখুঁতভাবে কোনো কাজ সফল হয়েছে এই প্রকার কোনো লাভের অনুভব আমার হয়নি। তবে ধন্যবাদ দেব ওই আল্লাহ তালাকে, যাঁকে আমি সদগুরু রামপালজী মহারাজ রূপে পেয়েছি এবং যিনি আমাকে শাস্ত্র বিধি অনুসার সঠিক সত্যভক্তি প্রদান করেছেন।

আজমিরে খাজা শরীফের দরগা আছে, যাকে মইনুদ্দিন চিশতী দরগাও বলা হয়, যে দরগা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। সেখানে আমি চাদর চড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাই মাতাপিতা বললেন, তুমি সেখানে যাও, সেখানে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তাহলে তোমারও ইচ্ছা পূরণ করবেন। আমি সেখানেও গিয়েছিলাম কিন্তু যে স্থানেই যেতাম সেখানে একটা বড় ডেগ (দানপাত্র) রাখা থাকতে দেখতাম আর তার মধ্যে সকলে টাকা-পয়সা ও সোনা-রুপোও ঢালছে দেখতে পেতাম কিন্তু আমার কাছে কোনো পয়সা-কড়ি ছিল না, তাই সেদিন আমি কিছু দিতে পারিনি। সেখানে সকল ব্যক্তিরা মাথায় টুপি পরে মালিকের (আল্লাহর) নাম নেন আর সবুজ রঙের একটা কাপড়ের তলা (নীচ) দিয়ে সকলকে পার করিয়ে বলা হয় যে, আপনি সবাব (পুণ্যফল) পেয়ে গেছেন। এখন থেকে আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গিয়েছে। আবার একথাও বলতেন যে, এটাই জান্নাতের দরজা, যে দরজা কেবল রমজানের দিনেই খোলা হয়। এই প্রকার আমি ২২ বছর পর্যন্ত করে এসেছি, কিন্তু এই সব করে আমার কোনো লাভ হয়নি। অনেক স্থানে গিয়েছি, এমন কি আলিগঢ় দরগা ও মহরৌলি দরগাতেও গিয়েছি, সেখানেও চাদর চড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তবে ওই দরগার বাইরে মাংস কাটা হতো আর ভিতরে একটা পাথর রাখা আছে, তার সামনে সবাই সিজদা করে তার উপর চাদর চড়িয়ে দিয়ে আসতেন। সব স্থানে ওই একই গল্প দেখতাম এবং সকল স্থানে নতুন কিছু না কিছু দেখতেই পেতাম। আমি আমাদের এক মৌলবী সাহেবকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমরা যা করছি কিংবা আমরা যে পথ অনুসরণ করে চলছি, এটা কি সঠিক পথ? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ! এসব করা ভুল নয়, এটি খুবই উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি ৪০ দিনের জামাতে যান। আমি ৪০ দিনের জামাতে তো যায়নি কিন্তু ৩ দিনের জামাতে অবশ্যই গিয়েছিলাম। সেখানেও ঠিক এমনটিই দেখতে পেলাম, সব লোক ভেড়ার পালের মতো সারি দিয়ে চলছে আর সেখানে যদি তারা কখনো কোনো ভোজন তৈরি হতে দেখতে পেতেন, তখন সকলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে আগে ভোজনের দিকে দৌড়ে যেতেন। তারা তখন এটা দেখতেন না যে, তারা সেখানে ভক্তি করতে গিয়েছিলেন। তারা কেবল এটাই দেখতেন যে, কখন তাদের পেট ভরবে আর কখন তারা ঘুমাবেন। নামাজ তাদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণই নয়। নামাজের অর্থ হল, এক নিত্য নিয়ম। তবে নামাজের দ্বারা আমার কোনো লাভ হয়নি।

মহরৌলিতে এক বিশাল বড় দরগা তৈরী করা হয়েছে, সেখানে একটি পাথর রাখা আছে, তার উপরে চাদর চড়ানো রয়েছে আর ওই স্থানের বাইরে মাংস কাটা হয়। সেই মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে রান্না করে সকলকে

খাওয়ানো হয়। খাওয়ানোর পরে বলা হয় যে, এটা অনেক বড় সবাব (পূণ্য কর্ম)। মাংস খাওয়া ও কুরবানি দেওয়া মালিকের (আল্লাহর) আদেশ। তারা হাতের নাগালে গরু, মহিষ, ছাগল এইরকম যা কিছুই পেতেন, সেটাই কেটে লোকেদের খাইয়ে দিতেন। মুসলমান ধর্মে যে প্রকারে মাংস রান্না হয়, মনে হয় যেন তারা শাক-সবজি রান্না করছেন। কেউ তো ছাগল কাটছে, কেউ গরু কাটছে ও কেউ মহিষ কেটে দিচ্ছে অর্থাৎ সব কিছু সেখানে চলতে থাকে। সেখানে একই মটকার (কলসি পাত্র) জল সকলে পান করে, তার মধ্যে কেউ মদখোর, কেউ শিশু, কেউ আবার ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তি। এমনকি যদি কোনো নবাব ব্যক্তিও হয়, তাকেও ওই পাত্রের জলই পান করতে হয়। যদি আপনি এর উপর কোনো প্রশ্ন চিহ্ন ওঠান, তাহলে আপনাকে বলা হয় যে, এসব ভুল নয়, এসব করলে পুণ্য হয়। অতএব একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের এঁঠোও খেতে পারে।

এই সব কথা শুনে আমি এমনই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম যে, আমি আমার মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম। মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা বলা হয় যে, আপনাদেরকে সোজা মুসলমান বানিয়ে পাঠানো হয়। আমি এই ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েই চলছিলাম। একদিন "ভক্তি সওদাগরের সন্দেশ" নামক এক পুস্তক পেয়েছিলাম এবং ধীরে ধীরে সেই পুস্তক আমি পড়তে লাগলাম এবং পুস্তকের বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা! এই পুস্তক কোথা থেকে এসেছে? তিনি বললেন, এই পুস্তকটি আমি বরবালা আশ্রম থেকে ডাকযোগের মাধ্যমে আনিয়েছি। সেই পুস্তকের মধ্যে আমি দেখলাম যে, "কালাম-এ-পাক" -এর এক হেডিং রয়েছে। তাতে লেখা ছিল যে, ওই আল্লাহ তালা যিনি এক বিন্দু জল দিয়ে পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন আর পরে এই পৃথিবীর উপর সাহিব-এ-নসল দ্বারা কাউকে পিতা, কাউকে ঠাকুরদাদা ও কাউকে পুত্র বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে, ওই সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছিলেন আর সপ্তম দিনে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন, সেই আল্লাহ তালার বিষয়ে কোনো বাখবরের (তত্ত্বজ্ঞানীর) নিকট জিজ্ঞাসা করো। তিনি (সদগুরু) বলেছিলেন যে, সূরাঃ ফুরকান ২৫ আয়ত নং ৫২ থেকে ৫৯ -তে এই বিষয়ে লেখা রয়েছে। এরপর আমি ওই গুলোকে নোট করলাম এবং ওই বিষয়ে গভীরভাবে বিচার করলাম। পরে আমি হিন্দি ভাষাতে একটি কুরআন শরীফ নিয়ে এলাম এবং ওই কথাগুলো মিলিয়ে দেখলাম। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম যে, তিনি যা বলেছিলেন, ঠিক তেমনি লেখা ছিল। এই সব দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম যে, এই জ্ঞান তাও আবার এক হিন্দু সমাজের ব্যক্তির নিকট? কলাম-এ-পাকের জ্ঞান এক হিন্দু সমাজের ব্যক্তির নিকট এলো কিভাবে? পরে ধীরে ধীরে সেই পুস্তক দিন-রাত পড়তে লাগলাম। একদিন আমি নির্ণয় করলাম যে, এখন থেকে আমি যখনই ক্লিনিক খুলব, তখনই পূর্ণ পরমাত্মা সদগুরু রামপালজী মহারাজের নাম স্মরণ করেই খুলব। ক্লিনিকটি নতুন নতুন ছিল। তাই যখনই ক্লিনিকটি খুলতাম তখনই সদগুরু রামপালজী মহারাজের নাম নিয়েই খুলতাম। তারপর ধীরে ধীরে সগুরু রামপালজী মহারাজের দয়াতে আমার ক্লিনিকে উন্নতি হতে লাগল। নামদীক্ষা নেওয়ার পর যখন আমি সদগুরু রামপালজী মহারাজের দর্শনে গেলাম, তখন গুরুজীকে বললাম, হে মালিক! আমি অনেক দুঃখ-কষ্ট পার করে এখানে এসেছি। পরমাত্মা তখন আমাকে বললেন, কোটি কোটি ব্যক্তির মধ্যে তোমারই উপর কৃপা হয়েছে। তিনি বললেন, পুত্র! এই ভক্তির উপর অটল বিশ্বাস রেখে ও মর্যাদা রক্ষা করে যদি তুমি ভক্তি করতে পারো, তাহলে জীবনে একদিন তুমি এমন জায়গায় পৌঁছবে যা কখনো কল্পনাও করোনি।

পরমাত্মার (আল্লাহ তালার) বচন আমার জীবনে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ পরমাত্মা ওই সব কিছুই দিয়ে রেখেছেন, যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। সদগুরু রামপালজী মহারাজের নিকট হতে নামদীক্ষা নেওয়ার পরে, আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। যে ব্যক্তিরা বলতেন, আল্লাহ তালার জন্য কুরবানি দাও আর আল্লাহ মাংস খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী সদগুরু রামপালজী মহারাজের শরণে আসার পরে জানতে পারলাম যে, এইরকম কোনো আদেশ আল্লাহ তালার নয়। আল্লাহর জন্য কুরবানি দেওয়ার অর্থ হল, নিজের অন্তকরণের যে সমস্ত বিকারগুলি রয়েছে, তা ত্যাগ (কুরবানি) দেওয়া। অতএব আল্লাহ তালা কখনই মাংস খাওয়ার আদেশ দেননি। আমি আরও অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করেছি কিন্তু কেউ কখনই আমাকে সন্তোস জনক উত্তর দিতে পারেন নি। সদগুরু রামপালজী

মহারাজের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই কেবল সন্তোস জনক উত্তর আমি পেয়েছি। কোনো মুসলমান প্রবক্তাদের নিকট এমন জ্ঞান নেই। আমি স্বয়ং একজন মুসলমান এবং সকল মুসলমান ভাইদেরকে বলতে চাই, আমি অনেকবার নামাজ ও সকল আয়তগুলোও পড়েছি।

ওই আল্লাহ্ তালার বিষয়ে বলা হয়েছে যে :-

"সুভানাকা আল্লা হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবরাকস্মুকা
ওয়া তাআলা। জদুকা ওয়া লা ইলাহা গৈরুক।"

হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি আর তোমার হমদ (প্রশংসা) করি। আর তোমার নাম সমৃদ্ধিকারী। আর তোমার গরিমা দৃঢ়। আর তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই।

"অলহমদু লিল্লাহি রব্বিল আলমীন। অর্রহমানির রহীম।
মালিকি য়োমিদ্দীন ইয়্যা-ক নাবুদু ব ইয়্যা-ক নস্তইন।
ইহদি নস-সিরাতল মুস্তকীম, সিরাতল লজী-ন
অন-অম-ত অলৈহিম গৈরিল মগজুবি অলৈহিম বলজ-জাল্লীন (অমীন)"

আমাদের তো প্রার্থনা করতে হবে ও নামাজের অর্থ বুঝতে হবে। তবে নামাজের অর্থ যা আমাদের পরমাত্মা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহর নিকট নিজেদের আবেদন জানানো, প্রার্থনা করা, নিত্য নিয়ম করা। অন্য বিষয় হল যে, আমরা (মুসলমানরা) যখন আমরা জন্ম গ্রহণ করি, তখন হিন্দু হয়ে জন্ম গ্রহণ করি আর যখন আমাদের মুসলমানি করা হয়, তখন আমরা মুসলমান হয়ে যাই। এমনটি কেন? মালিককে যদি আমাদের মুসলমানই সৃষ্টি করার ছিল, তাহলে তো জন্মের পূর্বেই উপর থেকেই মুসলমানি করে পাঠিয়ে দিতেন। আজ পর্যন্ত এই কথার উত্তর কোনো মোল্লা-কাজীর কাছ নিকট নেই। অন্য প্রসঙ্গ হল, মুহম্মদ সাহেব কখনো মাংস স্পর্শ করেননি এবং তাঁর এক লাখ আশি হাজার যেসব শিষ্য ছিলেন, তাঁরাও কখনো মাংস স্পর্শ করেননি এবং না তিনি তাদেরকে কখনও মাংস খাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

বিশ্বের সকল মুসলমান ভাইগণের কাছে আমার প্রার্থনা হল যে, মাংস খাওয়ার অর্থ হল আমরা আমাদের সন্তানের মাংস খাচ্ছি। এক প্রাণী অন্য প্রাণীর মাংস খাচ্ছে। এর থেকে বড়ো রাক্ষস আর কে হতে পারে? বিশ্বের সকল মুসলমান ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা যদি সত্যই মুসলমান হন, তাহলে মুসলে ইমান হন কিন্তু আমাদের ইমান কোথায়? ইমান তো কিছুই নেই! আজ আমরা মাংস খাচ্ছি, তামাক খাচ্ছি, আবার মিথ্যা কথাও বলছি। তবে পূর্বের মুসলিম সমাজ এমন ছিল না। পূর্বে কোনো মুসলমান ব্যক্তির শরীরে এক ফোটা মদও যদি পড়ত, তাহলে তাঁরা সেই অঙ্গকে কেটে বাদ দিতেন। আজকাল কিছু মুসলমান মদও পান করে এবং মসজিদেও মদ নিয়ে প্রবেশ করে আর তাদের কুরবানি দেওয়ার ইচ্ছা হলেই ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীদের কেটে দেয়। আমি জানি মুসলমান সমাজ এক পবিত্র সমাজ, কেননা মুসলমান সমাজ এক আল্লাহ্ তালা ছাড়া অন্য কাউকে মানেন না। তবে বর্তমানের মুসলিম সমাজ মোল্লা-কাজীদের দ্বারা ভ্রমিত হয়ে রয়েছে। আমার পরিবারের একটি ঘটনা শোনাচ্ছি, একবার আমার বাবার ভীষণ শরীর খারাপ হয়, কেননা তার ফুসফুস গলে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, এখন আপনার খুদা কোথায় গেল? আপনি তো রোজা রাখতেন, নামাজও পড়তেন কিন্তু এই দুঃখের সময় আপনার ইবাদত তো কোনো কাজে লাগল না? তখন তিনি সদগুরু রামপালজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন, তিনি যদি তার এই ভয়ংকর রোগ নিরাময় করে দেন, তাহলে তিনি নামদীক্ষা নেবেন।

কারণ বাবার ওই অবস্থা দেখে আমার পরিবারের সদস্য ও ডাক্তাররাও বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি বেশিদিন জীবিত থাকবেন না। কিন্তু সন্ত রামপালজী মহারাজের কৃপায় আমার বাবা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। পরমাত্মার নামে এত শক্তি আছে যে, নাম উপদেশ (নামদীক্ষা) না নিয়েও যদি সরল মনে হৃদয় দিয়ে পরমাত্মাকে স্মরণ করা হয়, তাহলে পরমাত্মা আপনার সমস্ত দুঃখ দূর করে দেবেন। যদি আজও আপনারা আল্লাহকে (পরমাত্মাকে) না চিনতে পারেন, তাহলে আর কবে চিনতে পারবেন? আমি সন্ত রামপালজী মহারাজের শরণে আসার পরে আন্তরিক

ভাবে তিনবার কলাম-এ-পাক" পড়েছি, তাঁর প্রত্যেক তথ্যের বিষয়ে আমি জেনেছি, সেখানে একটি কথা লেখা আছে যে, "শুরু করছি ওই আল্লাহ তালার নামে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যিনি তাঁর নিজের বান্দাদের সমস্ত পাপ (গুনাহ) ক্ষমা করে দেন।"

সূরাঃ ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ তে কবীর পরমাত্মাকে বড় বলা হয়েছে। আসল জ্ঞান এটা যে, কবীরই হলেন আল্লাহ এবং কবীরই হলেন পরমাত্মা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। হজরত মুহম্মদকে এই কবীর পরমাত্মাই জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে দর্শন দিয়েছিলেন। যে সময় তিনি (নবী মহম্মদ) এক জীবন্ত গরুকে মেরে সেটিকে বাঁচিয়ে দিতে পারবেন বলে ভেবে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর দ্বারা যখন ওই গরুটি জীবিত হয়নি, তখন তিনি গুহার ভিতরে গিয়ে খুব জোরে জোরে কেঁদে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ-হু কবীর! হে আল্লাহ-হু কবীর। তাঁর এই হৃদয়ের আহ্বান শুনে, কবীর পরমাত্মা (আল্লাহ) সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে হজরত মুহম্মদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, যাও হজরত! তোমার গরুকে জীবিত করে দিয়েছি।" সেদিন থেকে মুহম্মদ সাহেবের মহিমা শুরু হতে লাগল আর যেদিন ওই গরু কাটা হয়েছিল, সেই দিনটিকেও মুসলমান ভাইয়েরা স্মরণ করে রেখেছিলেন। অতএব সেইদিন থেকে জীবহত্যা প্রথা চালু হয়েছিল। আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনারা নিজের মোল্লা-কাজীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে, মুহম্মদ সাহেব যদি ওই আল্লাহর এতই প্রিয় ছিলেন, তাহলে তাঁর মৃত্যু এত ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক কেন হয়েছিল? মোল্লা-কাজীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন? তাদের সমস্ত জ্ঞানের ঝোলা ঝেড়ে দেখুন? তারপরও যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে সতলোক আশ্রমে আসুন। এখানে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হবে। অতএব জেনে রাখুন আমাদের জাতি হল "মানব জাতি"। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে আমাদের কোনো লেনা-দেনা নেই। যদি আপনারা এইপ্রকার জাতি প্রথা মেনে চলতে থাকেন, তাহলে কখনই আল্লাহ তালাকে পাবেন না। তবে আজান যে লাগানো হয়, সেই আজানের অর্থ কি?

আল্লাহু অকবর। আল্লাহু অকবর। আল্লাহু অকবর। আল্লাহু অকবর।

অশহদু অল্লা ইলা-হ ইল্লাল্লাহ। অশহদু অল্লা ইলা-হ ইল্লল্লাহ।

অশহদু অন-ন মুহম্মদররসুলুল্লাহ। অশহদু অন-ন মুহম্মদররসুলুল্লাহ।

হয়-য় অলসসলাহ। হয়-য় অলসসলাহ।

হয়-য় অলল ফলাহ। হয়-য় অলল ফলাহ।

আল্লাহু অকবর। আল্লাহু অকবর।

লা ইলা- হ ইল্লাল্লাহ অসিল্লাতু খৈরুম্মিনন্নঔস, অসসলাতু খৈরুম্মিনন্নঔস।

এর অর্থ আমরা আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি। ভেড়া চলনের মতো আমরা সবাই একের পিছনে এক চলছি। এখন কেউ এসে যদি তাদের সঠিক পথের কথা বলেন, তাহলে সেই ব্যক্তির কথা কেউ শুনতে চান না। তারা বলেন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা তো এই নিয়ম পালন করে আসছেন।

তবে জেনে রাখুন, এখন সঠিক সাধনা করার সময় এসেছে। ভেড়ার পালের মতো চললে মুক্তি হবে না। মুক্তি তো সত্ ভক্তির দ্বারাই হবে। আর বর্তমান সময়ে সেই সত্ ভক্তি রয়েছে একমাত্র সন্ত রামপালজী মহারাজের নিকটে। বিশ্বের সমস্ত মুসলিম ভাইদের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, সময় থাকতে এই জ্ঞানকে বুঝুন। পুনরায় বলছি, বর্তমানের এই সময় গত হওয়ার পূর্বেই সন্ত রামপালজী মহারাজের তত্ত্বজ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করুন। পরমাত্মা তাঁর নিজের বাণীতে বলেছেন :-

গরীব দাস য়হ বক্ত জাত হৈ, রোওগে ইস পহরে নুঁ।

এটাই হল সত্য কথা যে, বর্তমানে যত দেরি করে আপনারা এখানে (এই সত্যভক্তির মার্গে) আসবেন, ততই বেশি অনুতাপ হবে আর চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই পাবেন না। অন্য কথা হল, কুরআন শরীফের কোথাও ছাগল কুরবানি দেওয়ার কথা লেখা নেই, সেখানে কেবল কুরবানি লেখা রয়েছে। কুরবানির মানে হল, আল্লাহ তালার মার্গে নিজের সমস্ত খারাপ স্বভাবগুলোকে অর্থাৎ বিকারগুলিকে কুরবান করা বা ত্যাগ করা। না কি ছাগল, মুরগি ও অন্যান্য

গবাদি পশুদের নির্দয়ভাবে কেটে খাওয়া। ঈদের সময় যত কুরবানি আমরা দিয়েছি, ওখানে আমাদের সব পাপ জমা হয়ে রয়েছে। "কলমা" পড়ে ছাগলকে হালাল করা তো অনেক বড় পাপ ও অনেক বড় হারাম। মোল্লা-কাজীরা যদি এই কথা বহু পূর্বে বলে দিতেন, তাহলে এত বড় পাপ কখনও হতো না। তাদের কারণেই মুসলিম সমাজের মুসলমানরা মাংস খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। পরমাত্মা আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন তো কিছু নিয়ম বানিয়েই পাঠিয়েছিলেন। আমরা যদি পরমাত্মার সেই নিয়মগুলি ভঙ্গ করি, তাহলে সরাসরি শয়তানের কাছে পৌঁছে যাব অর্থাৎ নরকে যাব। সৃষ্টিকর্তা কবীরই হলেন আল্লাহ আর সেই কবীর আল্লাহর জ্ঞান বর্তমানে সন্ত রামপালজি মহারাজ সকলকে দিচ্ছেন। তিনি ছাড়া এই জ্ঞান অন্য কারোর নিকটে নেই। যদি মোল্লা-কাজীদের কাছে এতটুকুও জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা বলে দিলেন না কেন? কুরআন শরীফে এই কথা লেখা আছে যে, ওই আল্লাহর খবর কোনো বাখবরের (আল্লাহর প্রতিনিধির) নিকটে জিজ্ঞাসা করো। এই মানব জন্ম খুবই দুর্লভ, অতএব সময় থাকতে এর সদ্ ব্যবহার করুন। পরে অনুতাপ করা ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। আজ আপনারা শিক্ষিত হয়েছেন, নিজেদের পবিত্র গ্রন্থকে পড়ে দেখুন, তার মধ্যে সবকিছুই লেখা আছে। তার মধ্যে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। ওই আল্লাহ তালা বাস্তবে সাকার রূপে আছেন, কণায় কণায় মিশে রয়েছেন। আমাদের কুরআন শরীফে লেখা আছে যে, আল্লাহ তালা ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিরাজমান হয়েছিলেন। ওই আল্লাহ তালার খবর কোনো বাখবরের নিকটে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

বর্তমানে সেই বাখবর (তত্ত্বদর্শী) সন্ত হলেন রামপালজী মহারাজ। আপনি পবিত্র কুরআন শরীফকে খুলে দেখুন। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, আল্লাহ তালা হলেন কবীর, তিনি সপ্তম আকাশে সিংহাসনের উপর বিরাজমান আছেন। আমরা সবাই তারই আত্মা। এই সম্পূর্ণ সংসার তারই আত্মা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সত্যভক্তি করলেই কেবল আমাদের মুক্তি সম্ভব হতে পারে। সত্যভক্তির জন্য আপনাকে বাখবরের (পূর্ণ গুরু/তত্ত্বদর্শী সন্ত) খোঁজ করতে হবে। ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত দ্বারা বলা সত্যভক্তির মাধ্যমেই আত্মার মুক্তি সম্ভব। বর্তমানে সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত হলেন রামপালজী মহারাজ। তিনিই হলেন আল্লাহ তালার পাঠানো প্রতিনিধি অর্থাৎ অবতার। তিনি আল্লাহ তালার ফেরেশতা। তাঁর দ্বারা বলা সত্ ভক্তি যদি আপনি হৃদয় দিয়ে করেন, তাহলে বাস্তবে ওই জান্নাতে (স্বর্গে) চলে যাবেন, যে স্থানে আল্লাহ তালা বিরাজমান আছেন। কালের এই পৃথিবীতে সকলের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে, আর সেই দুঃখময় জীবন কেবলমাত্র সন্ত রামপালজী মহারাজের শরণে আসার পরেই সমাপ্ত হবে।

ভগত শাহজাদ দাস
গুরুগ্রাম (হরিয়ানা)
যোগাযোগের নম্বর :- +91 8950781981

এই পুস্তকের সমস্ত জ্ঞান পবিত্র কুরআন ও মহাপুরুষদের পবিত্র অমৃতবাণী থেকে উদ্ধৃত। এটি পড়ার পরে পাঠকদের কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

আমার উদ্দেশ্য হল বিশ্বের মানবগণকে ভক্তির সঠিক পথ দেখিয়ে, সত্যের মার্গে অগ্রসর করানো। নিঃস্বার্থ প্রয়াস করছি পরমাত্মা ও সদগুরুকে সাক্ষী মেনে ভয় রেখে পরোপকার করছি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল মানবই শিক্ষিত আছেন। আশা করি সকলে নিজের-নিজের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থকে বুঝবেন এবং আমার পরোপকারী সেবামূলক কার্যকে সফল করতে সাহায্য করবেন। নিজে এবং নিজের পরিবার সকলের কল্যাণ করাবেন।

সমস্ত মানবজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী
রামপাল দাস
(সতপুরুষের অন্তিম নবী)

(অধ্যায় নং 1)

"পবিত্র কুরআনে কি বলছে?"

বিস্মিল্লাহির্রমানিররহীম :- শুরু করছি আল্লাহর নামে
যিনি বড় দয়াময়, পরম করুণাময়।
{জীব আমাদের জাতি, মানব ধর্ম আমাদের।
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈসাই (খ্রীষ্টান), পৃথক কোনো ধর্ম নয়।}

(রামপাল দাস)

অর্থাৎ আমরা সকলে জীব, মানব শরীর পেয়েছি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সবাই মানব। এইজন্য আমাদের সকলেরই একই ধর্ম, তা হল মানবধর্ম। কর্ম হল মানবতা। এই কারণে আলাদা কোনো ধর্মই নেই। সমস্ত পৃথিবীর মানবই (নারী ও পুরুষ) এক খুদার (প্রভুর) সন্তান।}

গরীব, নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া।
এক লাখ অস্সী কুং সৌগন্ধ, জীন নহীঁ করদ চলায়া॥ ১॥
গরীব, অর্শ কুর্শ পর অল্লাহ তখত হে, খালিক বিন নহীঁ খালী।
বে পৈয়গম্বর পাক পুরুষ থে, সাহিব কে অবদালী॥ ২॥

অর্থাৎ সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন যে, নবী মুহম্মদকে আমার নমস্কার (সালাম)। তাঁকে আল্লাহর (রাম) রসুল (সংবাদ বাহক) বলা হয়েছে। বাবা আদম থেকে শুরু করে অন্তিম নবী হজরত মুহম্মদ জী পর্যন্ত, এক লাখ আশি হাজার নবী এসেছিলেন এবং ওই সময় যারা তাঁর অনুগামী ছিলেন, আমি অঙ্গীকার করে বলছি যে, তাঁরা কখনো করদ (ছুরি) চালিয়ে জীব হিংসা করেননি। (বাণী ১)

আকাশের (অর্শ) ঊর্ধ্বে অন্তিম প্রান্তে (কুর্শ) আল্লাহর (পরমেশ্বর) তখত (সিংহাসন) আছে। তিনি তার উপর বিরাজমান আছেন কিন্তু ওই জগতের মালিক (খালিক) ব্যতীত কোনো স্থান খালি নেই অর্থাৎ তাঁর অধিকার প্রতিটি জীবে ও প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর শক্তি সর্বব্যাপী রয়েছে। সেই খালিকের (সৃষ্টিকর্তা) কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই। এমন কোনো স্থান শূন্য নেই যা খুদার নাগালের বাইরে। ওই এক লাখ আশি হাজার পয়গম্বর (Messengers) তো পাক পুরুষ (পবিত্র মহাপুরুষ) ছিলেন, যারা আল্লাহর (সাহেব) কৃপাপাত্র (অবদালী) ছিলেন। (বাণী ২)

{**দ্রষ্টব্য :-** এখানে এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করছি যে, কিছু মুসলিম প্রবক্তা (মুখপাত্র) মোট এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীকে মানেন। পরমেশ্বর কবীরজী ও তাঁর শিষ্য গরীবদাসজী ও বিশ্নোই (বিষ্ণুই) ধর্মের প্রবর্তক বাবা জম্বেশ্বরজী মোট এক লাখ আশি হাজার নবীদের কথা বলেছেন। পূর্ণ পরমাত্মা যা বলেছেন তা ভুল হতে পারে না। তবুও জানা উচিৎ যে, পশু হিংসা, মাংস ভক্ষণকে মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে পাপ ওই এক লাখ আশি হাজার বা এক লাখ চব্বিশ হাজার রসুলগণও করেননি। অতএব আমাদেরও করা উচিত নয়।}

"পবিত্র কুরআন থেকে জ্ঞান"

{**দ্রষ্টব্য :-** "পবিত্র কুরআন" -এ যে আয়তগুলি এই পুস্তকে প্রমাণের জন্য লেখা হয়েছে, তা পবিত্র কুরআন থেকে নেওয়া ফটোকপি যা এই পুস্তকে পৃষ্ঠা নম্বর 228 তে লাগানো রয়েছে। অনুগ্রহ করে মিলিয়ে দেখার জন্য সেই পৃষ্ঠাগুলি পড়ুন।}

"বাইবেল ও কুরআনের জ্ঞানদাতা একজনই "

যে আল্লাহ "কুরআন" -এর পবিত্র জ্ঞান হজরত মুহম্মদের উপর নাজিল করেছিলেন। তিনিই আবার পবিত্র "জবুর" -এর জ্ঞান হজরত দাউদের উপর, পবিত্র "তৌরাত"-এর জ্ঞান হজরত মূসার উপর এবং পবিত্র "ইঞ্জিল"-এর জ্ঞান হজরত ঈসার (যীশু খ্রীষ্টের) উপর নাজিল করেছিলেন। এই সকলের আল্লাহ হলেন একজনই।

প্রমাণ :- কুরআন মজিদের সূরাঃ আল মুঅমিনুন ২৩ আয়াত নং. ৪৯-৫০ :-

আয়াত নং ৪৯ :- আর মূসাকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, যাতে লোক তাঁর নিকট হতে মার্গদর্শন প্রাপ্ত করে।

আয়াত নং ৫০ :- এবং মরিয়মের পুত্র ও তাঁর মাতাকে আমি এক নিদর্শন বানিয়েছি এবং তাঁদেরকে এক উঁচু ভূমিতে রেখেছি, যা বিশ্রামের যোগ্য স্থান ছিল আর সেখানে স্রোত প্রবাহিত ছিল।

সূরা আল হদীদ নং ৫৭ আয়াত নং ২৬ - ২৭ :-

আয়াত নং ২৬ :- আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে পাঠিয়েছি এবং তাদের বংশ পরম্পরাতে নবুওয়াত (পয়গম্বরী) ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। তারপর তাঁর বংশধরদের মধ্যে কয়েকজন সত্য পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং অধিকাংশ অবজ্ঞাকারী হয়ে গিয়েছিলন।

আয়াত নং ২৭ :- তাঁদের পরে আমি একের পর এক নিজের রসূলগণকে প্রেরণ করেছি আর তারপরে আমি মরিয়মের পুত্র ঈসাকে (যীশু খ্রীষ্টকে) পাঠিয়েছি এবং তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। তবে যে ব্যক্তিরা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন, তাদের অন্তরে আমি নম্রতা ও দয়াভাব ভরে দিয়েছিলাম আর রহবানিয়তের (সন্ন্যাসের) প্রথা তারা নিজের থেকেই আবিষ্কার করেছেন। আমি তাদের জন্য ওই প্রথা অনিবার্য করিনি। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে, তারা নিজেরাই এই নতুন পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর এটি নিষিদ্ধ করার যে অধিকার ছিল, তা তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তার প্রতিদান দিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই লোক অবজ্ঞাকারী ছিল {সন্ন্যাস অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে পাহাড়ে-জঙ্গলে পরমাত্মার সন্ধান করতে চলে যাওয়া। যেমন- শেখ ফরীদ, বাজিদ ও অন্যান্য সাধু-সন্তদের বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে আপনারা এই পুস্তকের "অল-খিজ্রের (অল-কবীর) পরিচয়" নামক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে পড়বেন।}

⇨ **অন্য প্রমাণ :-** কুরআন মজিদের সূরাঃ আল বাকারা - ২ আয়াত নং ৩৫-৩৮ পর্যন্ত, কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ বলছেন :-

আয়াত নং ৩৫ :- অতঃপর আমি আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে (স্বর্গে) বসবাস করো এবং এখানে যা ইচ্ছা তা স্বাচ্ছন্দ্যে পরিতৃপ্তসহ আহার করো কিন্তু ওই বৃক্ষের নিকট যাবে না, অন্যথায় অন্যায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আয়াত নং ৩৬ :- অবশেষে শয়তান তাদের দুইজনকে সেই গাছের দিকে যেতে প্ররোচিত করে এবং আমার আদেশের অবহেলা করিয়ে দেয়। আমি আদেশ দিলাম যে, এখন তোমরা এখান থেকে নিচে চলে যাও এবং একে অপরের শত্রু হয়ে যাও (সাপ ও মানুষ একে অপরের শত্রু হয়ে গেল) এবং পৃথিবীতে তোমাদের এক নির্দিষ্টকাল অবধি পৃথিবীতে থাকতে হবে আর সেখানে কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করবে।

আয়াত নং ৩৭ :- ওই সময় আদম তার প্রভুর নিকট হতে কিছু শব্দ শিখে তৌবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন, সেই প্রার্থনা তার প্রভু স্বীকার করেছিলেন কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

আয়াত নং ৩৮ :- আমি বললাম, "তোমরা এখান থেকে নিচে চলে যাও।" অতঃপর আমার দ্বারা যে হেদায়েত (মার্গদর্শন) তোমাদের নিকট পৌঁছবে, সেই অনুসারে চলবে। যে আমার হেদায়েত অনুসার চলবে, তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের সুযোগ থাকবে না। (কুরআন মজিদ থেকে নিবন্ধ সমাপ্ত)।

"পবিত্র কুরআনে উত্তম শিক্ষা"

পবিত্র "কুরআন মজিদ" কিতাবে অনেক উত্তম কথা রয়েছে।

এখানে কিছু কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি :-

সূরা: লুকমান - ৩১ আয়াত নং ১২ :- আমি লুকমানকে হিকমত (তত্ত্বদর্শিতা) প্রদান করেছিলাম যে, আল্লাহর (পরমাত্মার) প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাও। যারা কৃতজ্ঞতা দেখাবে, তাদের কৃতজ্ঞতা তার নিজের জন্যই লাভজনক হবে আর যারা অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করবে, তারা অবলম্বন করে তো করুক। আল্লাহ তো বাস্তবে স্বাধীন এবং নিজে স্বয়ংই প্রশংসিত অর্থাৎ পরমাত্মাকে নিজের প্রশংসা করারই প্রয়োজন হয় না, তিনি তো মহান। কেউ তার প্রশংসা করলে পরমাত্মা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে ভাল প্রতিফল দিয়েই দেন, তার সততা দেখে।

সূরা লুকমান- ৩১ আয়াত নং ১৩ :- স্মরণ কর, যখন লুকমান নিজের পুত্রকে সতর্ক করে বলেছিলেন , হে পুত্র! আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না অর্থাৎ পরমেশ্বরের সাথে অন্য দেবকে ইষ্ট (পূজ্য) মানবে না। এটা সত্য যে, আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা অনেক বড় অপরাধ।

সূরা লুকমান ৩১ আয়াত নং ১৪ :- আর এটাই বাস্তবিকতা যে, আমি মানুষকে তার মাতা- পিতার অধিকার স্বীকার করার উপদেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল এবং বুকের দুধ ছাড়াতে দুই বছর সময় লেগে যায়। এইজন্য উপদেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং নিজের মাতা পিতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও, তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমারই নিকট।

সূরা লুকমান- ৩১ নং আয়াত ১৫ :- কিন্তু যদি তারা তোমাকে আমার (আল্লাহর) সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, অর্থাৎ তোমার জ্ঞান অনুসারে সে যদি আমার অংশীদার না হয়, তাহলে

তার কথা একদমই মানবে না, তবে সংসারে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে কিন্তু চলবে ওই সন্ত বা নবীর মার্গ অনুসারে, যারা আমার অভিমুখী হয়েছে। অর্থাৎ যারা পরমাত্মার ভক্তির প্রেরণা করেছিলেন। পরে তোমাদের সকলকে আমার কাছেই আসতে হবে। ওই সময় আমি তোমাদের বলে দেব যে, তোমরা কি প্রকার কর্ম করতে।

সূরা লুকমান- ৩১ আয়াত নং ১৬ :- (লুকমান আরও বললেন যে,) হে পুত্র! কোনো বস্তু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় এবং তা যদি কোনো বড় পাথরের নিচে কিংবা আকাশেও লুকোনো থাকে, তাহলে আল্লাহ তাও খুঁজে বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবগত।

সূরা লুকমান-৩১ আয়াত নং ১৭ :- হে পুত্র! নামাজ (আরতি) নিয়মিত করো। সৎকর্ম করার জন্য সুখবর দাও, অসৎ কর্ম করতে নিষেধ করো আর যদি বিপদ-আপদও আসে, তখন ধৈর্য রাখবে। এই যে কথা, যার ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সবাই এই কথাগুলো সঠিক বলে মানে।

সূরা লুকমান-৩১ আয়াত নং ১৮ :- আর মানুষের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে কথা বলবে না, পৃথিবীর উপর দম্ভভরে চলবে না, আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

সূরা লুকমান-৩১ আয়াত নং ১৯ :- নিজের চলাফেরায় ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং নিজের কণ্ঠস্বর ধীরপূর্ণ রাখবে। সমস্ত আওয়াজ থেকে অপ্রীতিকর আওয়াজ হল গাধার।

সূরা লুকমান ৩১ আয়াত নং ২২ :- যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করেন এবং আচরণে পবিত্র হন, তিনি প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারীকে ধরে নিয়েছেন অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বদা তাঁর সাথে রয়েছেন, কারণ যাবতীয় সমস্ত মামলার অন্তিম নির্ণয় আল্লাহর নিকট।

সূরা অস সজদা ৩২ আয়াত নং ৪ :- তিনি ওই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ছাড়া না তোমার কেউ আপন আছে,না সাহায্যকরী আছে আর না তাঁর সামনে কোনো সুপারিশকারী কেউ আছেন। এর পরেও কি তোমাদের হুঁশ আসবে না?

সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ১৮৮ :- আর তোমরা না তো একে অপরের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রাস করবে এবং অধিকারীদের (অফিসারদের) সামনে কাউকে এই প্রকারে হাজির করো না যে, অন্যের সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে যায়। {অর্থাৎ অধিকারীদের ঘুষ দিয়ে অনুচিত লাভ উঠাবে না।}

সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২৬৮ :- শয়তান (কালের দূত তোমাদের কর্ম নষ্ট করার জন্য) তোমাদের দরিদ্রতা দিয়ে ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নীতি অবলম্বন করার জন্য প্রলোভন করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর উপহার ও উদার কৃপার আশা দেন। আল্লাহ বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ।

সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২৬৯ :- আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তত্ত্বজ্ঞান (হিকমত) প্রদান করেন আর যিনি ওই হিকমত পেয়েছেন, তিনি বাস্তবে প্রচুর বড় সম্পদ পেয়ে গিয়েছেন।

কুরআনের সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২৫৬ :- ধর্মের বিষয়ে কোনো জোর-জবরদস্তি নয়।

সূরাঃ ইউনুস ১০ আয়াত নং ৯৯ :- (হে মুহম্মদ) তুমি কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করবে না। আল্লাহর আদেশ ছাড়া কেউ ইমান আনতে পারে না।

সূরাঃ অর-রহমান ৫৫ আয়াত নং ৭ - ৯ :- ওজনের মাপদন্ড কম করিও না, ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। ওজন সঠিকভাবে করবে।

সূরাঃ অন আম ৬ আয়াত নং ১০৮ :- আর (হে মুসলমানগণ!) যে ব্যক্তিরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তাদেরকে গালি দিও না, কোথাও এমন না হয়ে যায় যে, তাঁরা বহুদেববাদির (শিরক) থেকে উর্দ্ধে উঠে, অজ্ঞানতার কারণে খুদাকে গালি দিতে শুরু না করে দেয়, (তাহলে মহাপাপের ভাগী হয়ে যাবে) এরাও কখনো আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে।

সূরাঃ অন নিসা ৪ আয়াত নং ১০ :- যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের (অসহায়দের) সম্পদ গ্রাস করে, বাস্তবে তারা তো নিজেদের পেট আগুন দিয়েই ভরে আর তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হবে অর্থাৎ তারা নরকে যাবে।

সূরাঃ অন নিসা ৪ আয়াত নং ৯ :- (ওই) মানবদের এই কথা মনে রাখা উচিত যে, যদি তারা স্বয়ং নিজেদের

মৃত্যুর পরে সন্তানদের ছেড়ে যায়, তখন মৃত্যু মুহূর্তে তাদেরকে কত প্রকারের আশঙ্কা ঘিরে ধরে? এইজন্য উচিৎ যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং সঠিক কথা বলা।

সূরাঃ অন নিসা- ৪ আয়াত নং ৩৬ :- আল্লাহর ইবাদত করো। অন্য উপাসনা (পূজা) কোরো না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বেসাহারা, অভাবগ্রস্ত, প্রতিবেশী, পথিক, দাস-দাসী ও যারা তোমার অধিকারে রয়েছে, তাদের সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করো। বিশ্বাস করো! এমন প্রকারের কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা অহংকারী ও নিজের কীর্তির উপর গর্ব করে।

"নেশা করা ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ"

সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২১৯ :- মদ ও জুয়া খুবই খারাপ, মহাপাপ।

"সুদ নেওয়া পাপ"

কুরআন মজিদ সূরাঃ আল বাকারা - ২

আয়াত নং ২৭৬ :- আল্লাহ সুদ গ্রহণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেন অর্থাৎ ধ্বংস করে দেন আর দানকারীদের আয় বাড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, অসৎকর্ম করা ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৭৭ :- হ্যাঁ, তবে যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে, নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে এবং দান (জাকাত) করে, তাদের প্রতিফল তাদের রবের নিকট অবশ্যই রয়েছে। তারজন্য কোনো ভয় (ক্ষোভ) কিংবা দুঃখের (রঞ্জের) সম্ভাবনা নেই।

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৭৮ :- হে মনুষ্য! যারা ইমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো আর তোমাদের কোনো সুদ যদি অন্যদের কাছে বাকী থাকে, তা ছেড়ে দাও। বাস্তবে যদি তোমরা ইমান এনে থাকো।

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৭৯ :- যদি তোমরা এমন না করো, তাহলে সাবধান হয়ে যাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সন্দেশবাহক) পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৮০ :- তোমাদের ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে সময় (ছাড়) দাও আর যদি দান করে দাও তাহলে এটা তোমার জন্য খুবই ভালো, যদি তুমি বোঝো।

"জাকাত (দান) করা উচিৎ"

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৬১ :- যারা আল্লাহর মার্গে নিজেদের ধন-সম্পত্তি ব্যয় করে এবং তাদের সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এমন হয়, যেমন একটি শস্য দানা মাটিতে লাগানো হলে তা থেকে সাতটি শীষ (ছড়া) উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি শীষ থেকে প্রায় একশো শস্য দানা হয়। ঠিক এই প্রকার আল্লাহর যার কর্ম ভালো লাগে, তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। তিনি বিপুল দাতা এবং সর্বজ্ঞও।

সূরাঃ আল বাকারা ২

আয়াত নং ২৬২ :- যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ (মাল) আল্লাহর মার্গে ব্যয় করে আর ব্যয় করে দানের কথা প্রকাশ করে না এবং কাউকে দুঃখও দেয় না। তাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকটে রয়েছে আর তারজন্য কোনো ভয় ও উদ্বেগ নেই (অর্থাৎ তাদের কোনো ভয় কিংবা চিন্তার আবশ্যকতা নেই। পরমাত্মা তাদের রক্ষা করেন এবং ধন বৃদ্ধিও করেন।)

"কুরআনের জ্ঞান দাতা নিজের মহিমা বলেছেন"

সূরাঃ অম্বিয়া ২১ (বড় সাইজের কুরআন মজিদ থেকে সংগৃহীত)

আয়াত নং ৯২ :- এটাই তোমাদের পথ (যা অনুসরণ করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক আর) এটা একমাত্র পথ এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।

সূরাঃ অম্বিয়া ২১ (বড় সাইজের কুরআন মজিদ থেকে সংগৃহীত)

আয়াত নং ৩০ :- ওই কাফিররা এটা জানতে পারেনি যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। তারপর আমি উভয়কে (নিজের শক্তি দ্বারা) পৃথক করে দিয়েছি আর আমি জল থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে বানিয়েছি। তবুও কি (ওই কথাগুলো শুনে) ইমান আনতে পারছো না?

সূরাঃ অম্বিয়া ২১ (বড় সাইজের কুরআন মজিদ থেকে সংগৃহীত)

আয়াত নং ৩১ :- আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড় এইজন্য বানিয়েছি, যাতে পৃথিবী ওই লোকজন নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে

না পড়ে আর আমি এই পৃথিবীতে উন্মুক্ত পথ বানিয়েছি, যাতে লোকেরা (তার মাধ্যমে) তাদের গন্তব্য স্থলে (মকসুদে) পৌঁছে যায়।

সূরাঃ অম্বিয়া ২১ - (বড় সাইজের কুরআন মজিদ থেকে সংগৃহীত)

আয়াত নং ৩২ :- আর আমি আমার নিজের (শক্তি দ্বারা) আকাশকে একটা ছাদের (মতো) বানিয়েছি, যা চিরস্থায়ী (মহফুজ) আর এই মনুষ্য এর (আকাশের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান) নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

"কুরআনের জ্ঞানদাতা স্বয়ং নিজের থেকে অন্য কাদির আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করেছেন"

সূরাঃ অস্ সজদা ৩২ আয়াত নং ৪ :- তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ আপন নেই, না সহায়ক আছে আর না তাঁর সামনে কেউ সুপারিশকারী আছেন। এরপরেও কি তোমাদের হুঁশ আসবে না?

কুরআনের জ্ঞান নাজিল করা আল্লাহ, সূরা বাকারা ২ আয়াত নং ২৫৫ -তে বলেছেন যে, আল্লাহ সেই জীবন্ত শাশ্বত শক্তি যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো খুদা নেই। তিনি না তো ঘুমান আর না তাঁর ঘুম আসে। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আর এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব খবর জানেন। আর আল্লাহকে তিনিই জানতে পারেন, যার উপর তিনি অনুগ্রহ করেন।

তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এবং ওইসব পরিচালনা বা রক্ষণা-বেক্ষণ করা তাঁর কাছে কোনো কঠিন কর্ম নয়। সর্ব ক্ষেত্রেই তিনিই একমাত্র মহান ও সর্বোপরি শক্তি। {অতএব এর দ্বারা স্পষ্ট হল যে, কাদির আল্লাহ যিনি সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং সকলের মালিক, সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা, তিনি কুরআনের জ্ঞানদাতা থেকে অন্য।}

"ফজাইলে আমাল" পুস্তক হতে তথ্য"

কুরআন জ্ঞানদাতা ছাড়া অন্য কোনো সমর্থবান আল্লাহ বিষয়ে অন্য তথ্য :-

ফজাইলে আমাল মুসলমানদের একটি বিশ্বস্ত পবিত্র পুস্তক, যা হাদীস থেকে নির্বাচিত আর হাদীসের প্রমাণ নিয়েই প্রস্তুত করা। পবিত্র কুরআনের পর মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাদীস। ফজাইলে আমালের একটি অধ্যায় হল ফজাইলে জিকির, এর আয়াত নং ১, ২, ৩, ৬ ও ৭ -তেও কবীর আল্লাহর মহিমা রয়েছে।

বিশেষ বিচার :- ফজাইলে আমাল মুসলমানদের একটি বিশ্বস্ত পবিত্র পুস্তক যেখানে ইবাদতের বিধি এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন কি, আপনারা যখন নিম্নোক্ত ফজাইলে আমালের উদ্ধৃত নিবন্ধটির লেখা দেখবেন, তারমধ্যে ফজাইলে জিকির অধ্যায়ের আয়াত নং ১, ২, ৩, ৬ ও ৭ - এ স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, পাক্ কুরআনের জ্ঞান নাজিলকারী আল্লাহ (ব্রহ্ম/(কাল/ ক্ষর পুরুষ) বলছেন যে, তোমরা কবীর আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করো। ওই কবীর আল্লাহ সমস্ত গোপন ও দৃশ্যমান বিষয়কে জানেন এবং তিনি হলেন কবীর, যিনি সমৃদ্ধিশালী পদমর্যাদার অধিকারী। যখন ফেরেশতাদের কাছে কবীর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ আসে, তখন তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যায়। এমন কি, তাদের অন্তর থেকে যখন আতঙ্ক দূর হয়ে যায়, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে বলে, কবীর পরবরদিগারের কি হুকুম আছে? তিনি হলেন কবীর, সমৃদ্ধ পদমর্যাদার অধিকারীওয়ালা। কবীর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সব আদেশ এসেছে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার অধিকারী। হুজুরে অকসদ সাল্লাল্লাহু আলৈহি ওয়াসাল্লাম (হজরত মুহম্মদ) -এর ইরশাদে (কথনে) বলা হয় যে, কোনো বান্দা এমন নেই যে, 'লাইলা-হা-ইল্লাল্লাহ' বলে আর তার জন্য আকাশের দরজা না খুলে যায়, এমনকি এই কলমা (মন্ত্র) সরাসরি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে এই শর্তে যদি কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচাতে থাকেন। (আরো) দুটি কলমার উল্লেখ রয়েছে, একটি তো "লাইলা-হ-ইল্লাল্লাহ" এবং অন্যটি হল 'আল্লাহু আকবর' (কবীর)। {এখানে আল্লাহু আকবরের ভাবার্থ হল পরমাত্মা কবীর (কবীর সাহেব অর্থাৎ কবির্দেব)।}

আবার ফজাইলে দরুদ শরীফেও কবীর নামের মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোপন নেই।

অনুগ্রহ করে পড়ুন ফজাইলে আমালের নিম্নের লেখন :-

ফজাইলে আমাল থেকে উদ্ধৃত নিবন্ধ :-

ফজাইলে জিক্র

١- وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (سورة بقرة، ركوع ٢٣)

বলুতি কবীরূ ব অল্লাহা আলা মাহদাকুম বলাঅল্লাকুম তসকরূন - 1

১. আর যাতে তোমরা কবীর আল্লাহর মহিমা বর্ণন করো, এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে যে, তিনি তোমাদের হেদায়েত দান করেছেন আর যাতে তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো আল্লাহ তালার।

ফজাইলে জিকির

٢ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ - (سورة رعد، ركوع ٥)

আলিমুল গৈবী বসসাহাদতীল কবীরুল মুতআলু - ২

২. ওই কবীর আল্লাহ সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বস্তুর বিষয়ে জ্ঞাত, (সব থেকে) বড় ও সমৃদ্ধিশালী পদমর্যাদার অধিকারী।

ফজাইলে জিকির

٣ - كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ - (سورة الحج ع ٥)

কজালিকা সখারাহলাকুন লীতুকবীরুল্লাহা

আলা মহাদাকুম ব সীরীল মুহসীনীন - ৩

৩. এইপ্রকার আল্লাহ জল্ল শানুহু তোমাদের জন্য মুসখ্খর করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা কবীর আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করো। এই কথার উপলক্ষে যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন এবং আপনি এখলাসওয়ালাদেরকে (আল্লাহর কৃপার) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

ফজাইলে জিকির

٦ - حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ - (سبا ع ٣)

হয়য়াঈজা ফুজীআঅন্ কুলূবীহীম কালু অ,

মাজা কালা রব্বুকুম কালূহুক্কা ব হুবলঅলিয়ুল কবীর - ৬

৬. (যখন ফেরেশতাদের কাছে কবীর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ হয়, তখন তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যায়) এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায়, তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে যে, কবীর পরবরদিগারের নিকট থেকে কি আদেশ হয়েছে? তারা বলে যে, (অমুক) হক বিষয়ের আদেশ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি (কবীর) অতি সমৃদ্ধি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

ফজাইলে জিকির

٧ - فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ (سورة مومن ع ٢)

ফাঅলহুকুম লীল্লাহীল অলীয়ীল কবীর - ৭

৭. অতএব আদেশ কবীর আল্লাহরই, যিনি অতি মহান ও উচ্চ পদের অধিকারীওয়ালা।

ফজাইলে দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ
فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ

অল্লাহুম-ম সল্লি অলারুহি মুহম্মদীন ফিল অর্বাহি অল্লাহুম-ম সল্লি অলা

জ-স-দি মুহম্মদিন ফিল অজসাদি অল্লাহুম ম সল্লি অলা কবির (কবীর) মুহম্মিদ ফিল কুবুরি ০

ফজাইলে জিকির

٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ عَبْدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يُفْضِىَ اِلَى الْعَرْشِ
مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ رواه الترمذى وهكذا فى المشكوة لكن ليس فيه
حسن بن غريب فقط قال القارى و رواه النسائى وابن حبان وعزاه
السيوطى فى الجامع الى الترمذى و رقم له بالحسن وحكاه السيوطى فى
الدر من طريق ابن مردويه عن ابى هريرة وليس فيه ما اجتنبت الكبائر
وفى الجامع الصغير برواية الطبرانى عن معقل ابن يسار لكل شئ مفتاح
ومفتاح السموات قول لا اله الا الله ورقم له بالضعف -

৫. হুজুরে অকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ (উক্তি) আছে যে, কোনো বান্দা এমন নেই যে, ‘লাইলা-হা-ইল্লাল্লাহ’ বলে আর তারজন্য আসমানসমূহের দরজা খুলে না যায়, এমনকি এই কলমা সরাসরি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে এই শর্তে যদি কবীরা গুনাহ (পাপ) থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

ফ.- এটি কত বড় ফজিলত এবং কবুলিয়তের চূড়ান্ত সীমা যে, এই কলমা সরাসরি আরশে-মু’আল্লা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এখন এটিও জানা গেছে যে, কবীরা যদি গুনাহের সাথেও বলা হয়, তাহলে লাভ ছাড়া ওই সময়টা বিফলে যায় না।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, শীঘ্র কবুল হওয়ার জন্য এবং আসমানের (আকাশ) সকল দরজা খুলে যাওয়ার জন্য কবীরা, গুনাহ (পাপ) থেকে বেঁচে থাকাকে শর্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কবীরা গুনাহের সাথেও কবুল করলে সওয়াব ছাড়া খালি যায় না।

কোন কোন আলেমগণ উক্ত হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পর তার রূহের্ সন্মানার্থে আসমানের সকল দরজা খুলে যাবে।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দুইটি কলমা এমন আছে যে, উহাদের মধ্যে একটির জন্য আরশের নিচ পর্যন্ত কোনো বাধা নেই, অপরটি আকাশ ও পৃথিবীকে (নিজ নূর অথবা নিজ সওয়াব দ্বারা) ভরিয়ে দেয়।

একটি হল :- লা-ইলাহা-ইল্লল্লাহ',

অপরটি হল :- 'আল্লাহু আকবর (পরমেশ্বর কবীর),

ফজাইলে জিকির

سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

'সুব্হানল্লাহি অল্হমদু লিল্লাহি অল্লাহু অকবরু' (কবির্)

ফজাইলে দরুদ শরীফ

مَنْ صَلّٰى عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ

মন সল্লা অলা রূহি মুহম্মদিন ফিল্ অর্বাহি ব অলা-জ-স

দিহী ফিল্ অজ্সাদি ব অলা কবির্ (কবীর) হী ফিল কুবুরি0

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

ব ইন্নহালকবীরতুনইল্লা অলল খাশিলীন অ ল্লজীন য়জুন্নুম

অন্নুমা মূলাকূ রগিবহিমব অন্নুমা ইলৈহি রাজিউন

(ফজাইলে আমাল থেকে লেখা সমাপ্ত)

অন্য প্রমাণ :- কুরআনের জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য এক সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তার বিষয়ে বলেছেন, সেটি এই প্রকার :-

কুরআন মজিদ থেকে প্রমাণ

সূরত ফুরকানি (সূরা ফুরকান) ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ :-

কুরআন মজিদ থেকে মূল পাঠ এই প্রকার :-

আয়াত নং ৫২ :- ফলা তুতিঅল কাফিরন ব জাহিদহুম বিহী জিহাদন কবীরা। (৫২)

আয়াত নং ৫২ :- অতএব (হে পয়গম্বর!) তুমি কাফিরদের কথা মানবে না এবং এই (কুরআনের উক্তিগুলি) দ্বারা তাদের সাথে সংঘর্ষ অধিক জোর দিয়ে করবে।

কুরআন শরীফের সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫৩ থেকে ৫৯ পর্যন্ত হিন্দির অনুবাদ নিম্নে রয়েছে :-

আয়াত নং ৫৩ :- আর তিনিই আছেন, যিনি দুই নদীকে মিলিত করে প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছেন। একটির (জল) মিষ্টি, তৃষ্ণা মেটায় আর অপরটির (জল) লবনাক্ত ক্ষার বিশিষ্ট আর উভয়ে মধ্যে এক শক্ত ব্যবধান বানিয়ে রেখেছেন।

আয়াত নং ৫৪ :- আর তিনিই জলের (বিন্দু) দ্বারা মানবকে সৃষ্টি করেছেন। তারপরে তাদেরকে বংশগত অনুসারে (অর্থাৎ কারোর পুত্র, কারোর কন্যা) আর বৈবাহিক সম্বন্ধ অনুসারে শশুর (অর্থাৎ কারোর জামাই, বৌমা) বানিয়েছেন আর তোমাদের প্রতিপালক সমস্ত কিছু করতে সক্ষম অর্থাৎ সর্বশক্তিমান।

আয়াত নং ৫৫ :- আর (কাফিররা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন অন্য যাদেরকে ইবাদত করে, যারা না তাদের উপকার করতে পারে আর না (তাদের) ক্ষতি (করতে পারে) এবং কাফির তো নিজের রবের দিকে পীঠ দিয়ে (মুখ ঘুরিয়ে) রেখেছে।

আয়াত নং ৫৬ :- আর (হে নবী!) আমি তোমাকে সুসংবাদ শোনাতে আর (কেবল শাস্তি দ্বারা) ভয় দেখানোর জন্য পাঠিয়েছি।

আয়াত নং ৫৭ :- (এই লোকদের) বলে দাও যে, আমি তোমাদের কাছে এর (আল্লাহর আদেশের) বদলে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। তবে হ্যাঁ, যে চাইবে, সে তার নিজের প্রতিপালকের নিকট পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ বেছে নিতে পারে।

আয়াত নং ৫৮ :- আর (হে নবী!) ওই জিন্দার (চিরঞ্জীবী) উপর ভরসা রাখো, যাঁর কখনও মৃত্যু হয় না আর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্র মহিমা বর্ণন করতে থাকো আর তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের (ভক্ত) পাপ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানেন।

{আরবি ভাষার সাথে মূল পাঠ "নাগরী লিপিতে" আয়াত নং 58 :-

ব তবক্কল অল্ল্ হয্যিল্লজী লা য়মূতু ব সব্বিহ্ বিহম্দিহ ব কফা বিহী বিজুনূবি ইবাদিহ খবীরা।

সূরত ফুরকানি - ২৫ আয়াত নং ৫৯ (কুরআন শরীফ থেকে হিন্দি) :- যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু

আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপরে সিংহাসনের (তখতের) উপর বিরাজমান হয়েছেন, (সেই আল্লাহ বড়) রহমান অর্থাৎ দয়ালু, সুতরাং তাঁর খবর কোনো বাখবরের (তত্ত্বজ্ঞানীর/ ইলমওয়ালার) নিকটে জিজ্ঞাসা করো।

{আয়াত নং ৫৯ এর আরবি ভাষার মুল পাঠ নাগরী লিপিতে এই রূপ নিম্নে :-

অল্লজি খলকসসমাবাতি বল্‌অর্জ ব মা বৈনহুমা ফী সিত্ততি অয্যামিন্ সম্মস্তবা অল্লঅর্শি জ অররহমানু ফসঅল্ বিহী খবীরন।

ব্যাখ্যা :- (আয়াত নং ৫২ -তে) যে আল্লাহ কুরআন মজিদের (শরীফের) জ্ঞান হজরত মুহম্মদকে বলেছিলেন, তিনি বলছেন যে, হে পয়গম্বর! তুমি কাফিরদের কথা মানবে না, কারণ তারা কবীর আল্লাহকে মানে না। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা (সংঘর্ষ) আমার দেওয়া কোর আনের উক্তির আধারে, প্রবল জোর দিয়ে মানে, দৃঢ়তার সাথে করবে অর্থাৎ তারা যদি না মানে, কবীর আল্লাহ সমর্থবান (কাদির) , তাহলে তুমি ওদের কথা মানবে না।

আয়াত নং ৫৩ থেকে ৫৯ পর্যন্ত, ওই কবীর আল্লাহর পবিত্র মহিমার বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই কবীর হলেন সেই কাদির আল্লাহ, যিনি সমস্ত সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি মানব উৎপন্ন করেছেন, তারপরে তাদের কর্ম সংস্কার বানিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন (সম্পর্ক) তাঁরই অনুগ্রহ দ্বারা তৈরি হয়েছে। লবণাক্ত ও মিষ্টি জলের স্রোতও তিনি আলাদা আলাদাভাবে নিজের কুদরত (শক্তি) দ্বারা প্রবাহিত করিয়ে রেখেছেন। জলের বুঁদ থেকে মানব (মানব = নারী - পুরুষ) উৎপন্ন করেছেন। {সূক্ষ্মবেদে বলা হয়েছে যে, জলের বুঁদের তাৎপর্য, পুরুষ ও মহিলার তরল পদার্থ রূপী বীজকে বোঝায়।

যারা এই আল্লাহ আকবরকে (পরমেশ্বর কবীর) ছেড়ে অন্য সকল দেবী-দেবতাদের ও মূর্তি পূজা করে যা ব্যর্থ,তাঁরা ওই ভক্তদের না তো লাভ দিতে পারে আর না ক্ষতি করতে পারে। তাঁরা তাদের আপন সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর পরে এদের অনুতাপ করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দাও যে, আমার কর্ম হল তোমাদের সঠিক পথ দেখানো। এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট হতে কোনো টাকা-পয়সাও নিচ্ছি না, পরে তোমরা এটা মনে করো না যে, এ (নবী) নিজের স্বার্থবশে ভ্রমিত করছেন। যদি চাও তাহলে নিজের প্রতিপালকের (সৃষ্টিকর্তা বা পালনকর্তার) ভক্তির মার্গ অবলম্বন করতে পারো।

(কুরআনের জ্ঞানদাতা, নবী মুহম্মদকে নিম্নের আয়াতে পুনরায় বললেন যে,)

আয়াত নং. ৫৮ :- আর (হে নবী!) ওই জীবন্তের {জীবন্ত বাবার রূপ ধারণ করে যিনি তোমার সঙ্গে কাবাতে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি আল্লাহ কবীর} উপর বিশ্বাস রাখো, যাঁর কখনোই মৃত্যু হয় না (অবিনাশী পরমেশ্বর আছেন) আর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্র মহিমার গুণগান করতে থাকো, তিনি নিজের বান্দাদের (অনুগামীদের) সকল গুণাহ (পাপ) সম্পর্কে ওই কবীর পরমেশ্বর ভালভাবেই পরিচিত আছেন অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সত্য ইবাদতকারীর (সাধকের) সমস্ত পাপ সমাপ্ত করে দেন।

"ওই তত্ত্বজ্ঞান যা কুরআন ও গীতার জ্ঞান প্রদানকারীও জানেন না"

আয়াত নং ৫৯ :- কবীর আল্লাহ (আল্লাহু আকবর) তিনিই, যিনি সর্ব সৃষ্টির (উপরের এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর) রচনা ছয় দিনে করেছিলেন। তারপর তিনি উপরের নিজস্ব নিজ লোকে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। ওই কবীর আল্লাহ হলেন অসীম রহমান (দয়ালু)। তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানতে হলে, কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী গুরুর) নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

এরদ্বারা এই কথা স্পষ্ট হল যে, কুরআনের জ্ঞান প্রদানকারী, ওই সর্বশক্তিমান কবীর পরমেশ্বরের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন না। তাঁকে প্রাপ্ত করার বিধি এই কুরআনের জ্ঞানদাতার জানা নেই। এইজন্য তো সূরাহ আশ্ শূরা ৪২ আয়াত নং ১ ও ২ - এর মধ্যে কেবল সাংকেতিক শব্দ বলা হয়েছে, যার অর্থ আজ পর্যন্ত এই দাস (রামপাল দাস) ছাড়া কারোর জানা নেই। এমনকি হজরত মুহম্মদেরও কাছেও এই জ্ঞান ছিল না। এই জ্ঞান ছাড়া পরিত্রাণ (মোক্ষ) পাওয়া সম্ভব নয় আর না জান্নাত (কালের স্বর্গ) প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

এখানে এটাও প্রমাণিত হল যে, হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত সকল নবী ও তাদের অনুগামীরাও মোক্ষ হতে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছেন, বেহেশতেও (স্বর্গেও) যেতে পারেননি। সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন যে, সঠিক ভক্তি বিধি অনুসারে সাধনা না করার কারণে হজরত মুহম্মদও বেহেশত (স্বর্গে) যেতে পারেননি। তাঁকে অনুসরণ করে, সেই একই সাধনা করে, সমস্ত মুসলমান সত্য সাধনা ভুলে গিয়েছেন।

{ বাণী :- গরীব, নবী মুহম্মদ নহী বহিশত সিধানা। পীছে ভুলা হে তুর্কানা ॥}

"কুরআনের অমীমাংসিত জ্ঞান" (ঔন, সীন, কাফ- এর রহস্যভেদ)"

কুরআনের অনুবাদকর্তা সূরা অশ্ শুরা ৪২ আয়াত নং ১ এর শব্দগুলি "হা. মীম" এবং আয়াত নং 2 এর শব্দগুলি "ঔন. সীন. কাফ" - এর অনুবাদ করেননি। কেবল মন্তব্য করেছেন যে, এটাতে গূঢ় রহস্য রয়েছে, এই শব্দগুলোর অর্থ তো কেবল আল্লাহই জানেন। অতঃপর এই কথাও তর্ক দিয়ে বলেন যে, এই পাঁচটি শব্দের জ্ঞান যদি নাও থাকে, তবুও কুরআনের জ্ঞানের মহিমা কম হয় না। এছাড়া না তো তাতে মানুষের কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। কুরআন তো জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞানের মাধ্যমেই আত্মকল্যাণ সম্ভব।

লেখকের (রামপাল দাস) যুক্তি :- আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা খুবই আবশ্যক কিন্তু যথার্থ সমাধান না হলে তো জ্ঞানই বৃথা।

উদাহরণস্বরূপ - যেমন কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ বলেন যে, আপনার এই রোগ হয়েছে আর এই রোগের এই প্রকার লক্ষণ হয়। এবার রোগীর জ্ঞান হয়ে গেল যে, তার এই রোগ হয়েছে কিন্তু রোগ নিরাময়ের জ্ঞান না তো যিনি তাকে রোগ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন, তার জানা আছে আর না রোগীর জানা আছে, তাহলে তেমন জ্ঞান দিয়ে কী লাভ?

এই প্রকার কুরআন মজিদের (শরীফ) যাবতীয় জ্ঞান পড়লাম আর মুখস্থও হয়ে গেল, কিন্তু যে গূঢ় রহস্য আছে অর্থাৎ যে উপচার রয়েছে, "হা.মীম." এবং "ঔন. সীন. কাফ" - এ, এই জ্ঞান তার জানা নেই, তাহলে কুরআন পড়লে আত্ম কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এই পাঁচ শব্দের মধ্যে আত্ম কল্যাণের রহস্য পূর্ণরূপে রয়েছে, যা আপনি এর পরে পড়বেন। কুরআন মজিদের জ্ঞান থেকে ভক্তি মর্যাদার জ্ঞান এবং কর্ম ও অকর্মের জ্ঞান হয় যে, ধর্ম করো, পাপ করোনা। গ্রন্থের (কুরআনের) প্রতিদিন কিছু অংশ পাঠ করেন, নামাজ পড়েন, আজান দেন, রোজা রাখেন ইত্যাদি, এসব ক্রিয়ার দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত হতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে নামের (মন্ত্র) জপ করতে হবে, তা হল "ঔন.সীন.কাফ"। এইগুলি হল ওই তিন নামের (মন্ত্র) সাংকেতিক শব্দ, যা মোক্ষদায়ক কল্যাণকারক মন্ত্র। এইগুলি হল ওই মন্ত্র গুলির প্রথম অক্ষর, যে রহস্য কেবল পূর্ণ গুরু (সন্ত) জানেন। তাঁর নিকট হতে দীক্ষা নিয়ে, এই তিন মন্ত্রের জপ করলে আত্মকল্যাণ হবে। অন্য কোনো উপায়ে সাধনা করলে জীবের মোক্ষলাভ (মুক্তি) সম্ভব হবে না।

রহস্যময়ী মন্ত্রের জ্ঞান :- হা.= হক, মীম.=মাবুদ অর্থাৎ প্রকৃত পূজার মন্ত্র হল "ঔন. সীন. কাফ" মন্ত্র আছে। যে সাধনা মুসলমানরা করে, যেমন - পাঁচ সময়ের নামাজ, জাকাত (দান), রোজা (ব্রত) রাখা, কুরআন মজিদের তিলাওয়াত (পাঠ) করা ইত্যাদি, এটা তো এইরূপ জানুন যেমন- রোগীকে গ্লুকোজ দেওয়ার মতো কিন্তু রোগ সমাপ্ত করার জন্য রোগীকে ট্যাবলেট ও ইনজেকশন না দিলে রোগী সুস্থ হবে না। "ঔন. সীন. কাফ." যে তিন মন্ত্রের (নামের) সাংকেতিক শব্দ আছে, ওই নামগুলি রোগ নির্মূল করা (রোগনাশক) ট্যাবলেট (Injection) ও ইনজেকশন (Injection) জানবেন। এই তিন নামের জপ করলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরতরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন পড়ুন "ঔন. সীন. কাফ." -এর ভেদ, যাহা নিম্নে এই প্রকার আছে :-

সূরত অশ শুরা - ৪২ এর আয়াত নং. ১ :- হা. মীম

আয়াত নং. ২ :- ঔন.সীন.কাফ

এই দুটি আয়তের সরলার্থ বা বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত কেউ করেননি। কুরআনের অনুবাদকরা এই কথা বলে ছেড়ে দিয়েছেন যে, এর অর্থ তো কেবল আল্লাহই জানেন। এবার জানুন ওই রহস্য।

চার বেদের (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের) জ্ঞানও কাল ব্রহ্ম (কুরআনের জ্ঞান দাতা) সূক্ষ্মবেদ থেকে বেছে নিয়ে অধুরা জ্ঞান দিয়েছেন। সামবেদের মন্ত্র নং ৮২২ -তে এই তিনটি নামের সংকেত আছে। লেখা আছে যে, "ত্রি তস্য নাম" অর্থাৎ ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ইবাদতের (পূজার) তিনটি নাম আছে। এই কাল ব্রহ্ম শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞান দিয়েছেন।

শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞানও এই কুরআনের জ্ঞানদাতা অর্জুনকে (যিনি পাঁচ পাণ্ডবের মধ্যে একজন ছিলেন) বলেছিলেন। সেখানেও অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -তে এই তিনটি মন্ত্রের বিষয়ে বলেছেন।

তাতে লেখা আছে যে :-

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ :- মূল পাঠ সংস্কৃত ভাষায় লিপি নাগরীতেই আছে :-

ওঁ (ওম্), তত্ ,সত্ , ইতি নির্দেশ: ব্রহ্মণ: ত্রিবিধ: স্মৃত:।
ব্রাহ্মণা: তেন বেদা: চ যজ্ঞা: চ বিহিতা পুরা॥ 23॥

সরলার্থ :- গীতাতে বলা হয়েছে যে, ওম্ (ওঁ), তত্, সত্, এই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্তার (ব্রহ্মণ:) সাধনা করার তিন নামের মন্ত্র আছে। এটি স্মরণ করার বিধি তিন প্রকারের বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি সনাতন পন্থের (ব্রাহ্মণা:) অর্থাৎ বিদ্বান সাধক এই আধারেই সাধনা করতেন। সূক্ষ্মবেদের জ্ঞান স্বয়ং পরমেশ্বর বলেছিলেন। সেই আধারে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সাধকও হয়েছিল। ওই সূক্ষ্মবেদের আধারে ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলির (যজ্ঞা:) বিধান তৈরি করা হয়েছিল এবং এই চারবেদ হল ওই সূক্ষ্মবেদেরই অংশ। যা কাল ব্রহ্ম ইচ্ছাকৃতভাবে ঋষিগণকে অসম্পূর্ন জ্ঞান দিয়ে ভ্রমিত করে দিয়েছিলেন, যা পরে সনাতন পন্থের (ধর্মের) সাধকরা আপন করে নিয়েছিলেন। সেটিও সময়ের সাথে সাথে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় সেটি গীতার মাধ্যমে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম) কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট (সাংকেতিক) জ্ঞান দিয়েছিলেন। এই (কোড ওয়ার্ড) সাংকেতিক মন্ত্রগুলো যে কি আছে? তার জ্ঞানও এই কাল ব্রহ্মের নেই। সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ৮২২ নম্বরে এই তিনটি নামের সংকেত রয়েছে। বেদে বলা হয়েছে যে, পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ আল্লাহ কবীরই, এই সাংকেতিক মন্ত্রগুলির প্রকৃত জ্ঞান করান।

এই দাসকে (রামপাল দাস) এই তিনটি মন্ত্রের জ্ঞান করিয়েছেন, যা এই প্রকার :- "ঔন" এটি আরবী ভাষার অক্ষর, যেটা দেবনাগরী হিন্দি ভাষাতে "অ" হয় এবং "সীন" এটি আরবী ভাষার বর্ণমালার অক্ষর আছে, যা দেবনাগরী হিন্দি ভাষাতে "স" হয় এবং "কাফ" এটি আরবী বর্ণমালার অক্ষর, যা দেবনাগরী হিন্দি ভাষায় "ক" হয়।

যেমন, ওম্ (ওঁ), মন্ত্রের প্রথম অক্ষর বর্ণমালার "অ"। এই জন্য "ঔন" অক্ষর "ওম্" এর সাংকেতিক। "তত্" এটি সাংকেতিক মন্ত্র, এর যেটি সঠিক মন্ত্র, তার প্রথম অক্ষর "স" আছে এবং তৃতীয় যে "সত্" সাংকেতিক মন্ত্র, এর যেটি সঠিক মন্ত্র, তার প্রথম অক্ষর "ক" আছে। এইজন্য গুপ্ত অর্থাৎ সাংকেতিক "ঔন, সীন, কাফ" কুরআনে বলা হয়েছে। ওইগুলো গীতাতে উল্লেখিত "ওম্ (ওঁ), তত্, সত্ এর মতো। এইগুলি এরই সঙ্কেত করছে। এই মন্ত্রের জপ দ্বারা, মানবদের সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হবে এবং পাপ কর্মের কারণে হওয়া দুঃখ-কষ্ট (সংকট) সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং অকালমৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাবেন। কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জনের) জান্নাত (স্বর্গ) থেকে আল্লাহর (পূর্ণ পরমাত্মা) জান্নাত (সতলোক) অসংখ্যগুণের অধিক সুখ। এই জান্নাতে (সতলোকের সুখ সাগরে), স্থায়ী নিবাস প্রাপ্ত হবে এবং দোজখে (নরকে) যেতে হবে না। এই জান্নাতে (সতলোকের সুখ সাগরে), স্থায়ী নিবাস প্রাপ্ত হবে এবং দোজখে (নরকে) যেতে হবে না। সতলোকওয়ালা জান্নাতে সর্বদা অমর ও সুখে থাকবেন। ওই তিন নামের জপ (মন্ত্র) করা ব্যক্তিদেরকে পুনরায় কখনো পৃথিবীতে জন্ম হবে না। এই তিনটি নাম অর্থাৎ মন্ত্র এই দাস (রামপাল দাস) পরমেশ্বর কবীরের সাধনা করা ব্যক্তিদের যথার্থ কবীর পন্থ অর্থাৎ আদি সনাতন পন্থের (ত্রয়োদশ অন্তিম পন্থ) ভক্তদেরকে সাধনা করার জন্য দীক্ষা রূপে দিয়ে থাকে। (যথার্থ এই কবীর পন্থে, যে কোনো ধর্ম, পন্থ ও জাতির (বর্ণ) স্ত্রী-পুরুষগণ দীক্ষা নিয়ে যুক্ত হতে পারেন।) এখানে ওই দুটি অন্য যথার্থ মন্ত্রকে আমি বলব না। আমার থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করা ভক্তগণ, এই প্রকরণটি পড়লেই বুঝে যাবেন। বিশ্বের মানবকে (নারী-পুরুষ) আল্লাহু আকবর অর্থাৎ পরমেশ্বর কবীরের ইবাদত (ভক্তি) করতেই হবে। তবেই তাদের মানবজীবন সফল হবে এবং চিরস্থায়ী স্থানে শান্তি ও সুখ পাবেন। তাদেরকে এই তিন নামের মন্ত্র দীক্ষাতে দেওয়া হবে। তিনটি নামের স্মরণ বিধি তিন প্রকারের আছে "হা: মীম:"- এটাও এই প্রকার সাংকেতিক, এর বিষয়ে পৃষ্ঠা 26 তে পড়ুন। ওই কাদির আল্লাহ কবীর সাহেব, "কলাম-এ-কবীর" তে বলেছেন যে :-

বারহবেঁ পন্থে হম হি চল আবে। সব পন্থ মিটা এক পন্থ চলাবেঁ॥
কলযুগ বীতে পাঁচ হাজার পাঁচ সৌ পাঁচা। তব যহ বচন হোগা সাচা॥
ধর্মদাস তোহে লাখ দুহাঈ। সারশব্দ কহী বাহর না জাঈ॥
তেতীস অরব জ্ঞান হম ভাখা। মূল জ্ঞান হম গুপ্ত হী রাখা॥
মূল জ্ঞান তব তক ছিপাঈ। জবতক দ্বাদশ পন্থ ন মিট জাঈ॥

কলিযুগ ১৯৯৭ সালে পাঁচ হাজার পাঁচশো পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেই সময় থেকে সারনাম দেওয়া শুরু হয়েছে। যেমন কুরআন মজিদ সূরত ফুরকানি আয়াত নং ৫৯ - তে বলা হয়েছে যে, সৃজনহার ও সকলের পালনকর্তার বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, কোনো তত্ত্বদর্শী (বাখবর) সন্তের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

ওই প্রকার গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ -তে বলা হয়েছে, {যিনি (ব্রহ্মণ:) পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ আল্লাহকবীর (সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম) তিনি তাঁর নিজ মুখ কমলের উচ্চারিত বাণী (কলাম-এ-কবীর) কবীর বাণীতে তত্ত্বজ্ঞানকে বলেছেন। তাঁর সাধনা (ইবাদত) সহজ বিধিতে করে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যার উল্লেখ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ -তে রয়েছে, ওটাই হল তত্ত্বজ্ঞান।} ওই জ্ঞানকে (তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকটে গিয়ে) বুঝে নাও। তাঁকে ভালো ভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে, তাঁর সেবা করলে এবং ছল-কপট ছেড়ে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, ওই পরমাত্মা তত্ত্বকে সঠিকরূপে জ্ঞাত ওই জ্ঞানী মহাত্মা, তোমাকে ওই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করবেন।

এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, গীতা, চার বেদ ও চার কিতাবের জ্ঞান প্রদানকারী একজনই। তিনি গীতা আধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২ -তে স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, আমি সকলের বিনাশকারী কাল। ইনি হলেন ব্রহ্ম, যাকে ক্ষর পুরুষও বলা হয়। সূক্ষ্ম বেদে এঁর প্রচলিত নাম হল জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল), যিনি সমস্ত জীবকে ভ্রমিত করে রাখেন কিন্তু যে সূক্ষ্মবেদের জ্ঞান ইনি বেদে, গীতায়, কুরআনে ও অন্যান্য পবিত্র পুস্তকগুলোতে বলেছেন, তা অসম্পূর্ণ কিন্তু ভুল নয়। তিনি সম্পূর্ণ বলেননি, অস্পষ্টভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান ও সম্পূর্ণ ভক্তি বিধি প্রাপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের জালের মধ্যে জীবাত্মারা মহাদুঃখী হয়ে থাকবে। এমনকি তাঁর জান্নাতে (স্বর্গ) চলে গেলেও।

একটি উদাহরণই যথেষ্ট :- বাবা আদম জান্নাতে (স্বর্গ) দুঃখী ছিলেন। বাম দিকে মুখ ঘুরালে দুঃখে দুচোখ

অশ্রুতে ভরে যেত আর ডান দিকে মুখ ঘুরালে খিল-খিল করে হাসতেন। এই কাল ব্রহ্মের জান্নাতে (স্বর্গ), পরম শান্তি কেউই পাবে না। যে পরম শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ -তে নিজেকে ছাড়া অন্য পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

যেরূপ পাঠকগণ পড়েছেন যে, কুরআনের জ্ঞান দেওয়া আল্লাহ (যাকে মুসলমানরা তাদের খুদা বলে মানেন) তিনি নিজের থেকে অন্য কাদির, সৃষ্টির রচনহার, অমর আল্লাহর সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন এবং অন্য এক মুসলিম শাস্ত্র "ফজাইলে আমাল" -তে কবীর আল্লাহর সমর্থতাকে আপনারা পড়েছেন। একই প্রকার কাদির আল্লাহ অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে সাক্ষাৎ করা মহাপুরুষ ও সন্তেরাও নিজেদের চোখে দেখেছেন এবং প্রমাণও দিয়েছেন, যা নিম্নে এই প্রকার :-

"শাস্ত্রের মধ্যে আল্লাহর (পরমেশ্বর) উল্লেখ"

সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে যে :-

বহী মোহম্মদ, বহী মহাদেব, বহী আদম, বহী ব্রহ্মা।
দাস গরীব, দুসরা কোঈ নহিঁ,দেখ আপনে ঘরমা॥

ভাবার্থ :- মুসলিম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ ভগবান শিবের ধাম (লোক) থেকে এসেছিলেন। তিনি পুণ্যকর্মী আত্মা ছিলেন, যার কারণে পরম্পরাগত সাধনাই একটি গুহায় বসে করতেন। শিবের এক গণ (দূত), যিনি এগারোটি রুদ্রের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি হজরত মুহম্মদের সঙ্গে ওই গুহাতে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁরই ভাষায় (আরবি ভাষায়) কাল প্রভুর অর্থাৎ ব্রহ্মের খবর শুনিয়েছিলেন। ওই রুদ্রকে মুসলমানরা জিব্রাইল ফেরেশতা বলেন, যাকে পবিত্র ফেরেশতা (দূত) বলে মানা হয়।

হজরত আদম :- পুরাণে ও জৈন ধর্মের গ্রন্থে এক প্রসঙ্গ রয়েছে, যা নিম্নে এই প্রকার - রাজা নাভিরাজের পুত্র ঋষভদেব ছিলেন। নাভিরাজ অযোধ্যার রাজা ছিলেন এবং ঋষভদেবের একশো পুত্র ও এক কন্যা ছিল। একদিন পরমেশ্বর ঋষভ দেবের সাথে সন্ত (সাধু) রূপে সাক্ষাৎ করেন তাকে ভক্তি করার জন্য প্রেরণা করলেন। তাকে তত্ত্বজ্ঞান শোনালেন যে, মানব জীবনে শাস্ত্রবিধি অনুসার যদি সাধনা না করা হয়, তাহলে মানবজীবন বৃথা হয়ে যায়। বর্তমানে সকল মানুষ যা কিছু পাচ্ছে, তা তাদের পূর্বজন্মে করা পুণ্য ও পাপের ফল। আপনি রাজা হয়েছেন, এটা আপনার পূর্বজন্মের শুভ কর্মের ফল। যদি বর্তমানে ভক্তি না করেন, তাহলে আপনি শক্তিহীন ও পুণ্যহীন হয়ে জাহান্নামে (নরকে) পতিত হবেন এবং তারপর অন্যান্য প্রাণীর দেহ প্রাপ্ত করে কষ্ট ভোগ করতে হবে। (যেমন, বর্তমানে আপনি ইনভার্টারের ব্যাটারি চার্জ করে রেখেছেন এবং চার্জারটি বের করে রেখেছেন। তবুও সেই ব্যাটারিটি কাজ করছে, ইনভার্টারের দ্বারা ফ্যানও চলছে, বাল্ব-টিউবগুলিও জ্বলছে। যদি চার্জারকে পরে লাগিয়ে চার্জ না করেন, তাহলে কিছু সময় পরে ইনভার্টার সমস্ত কাজ করা বন্ধ করে দেবে। তখন না ফ্যান চলবে, না বাল্ব, না টিউব লাইট জ্বলবে। এইপ্রকার মানবদেহ হল একটা ইনভার্টার। শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি হল চার্জার (Charger) পরমাত্মার শক্তিতে মানব পুনরায় চার্জ হয় অর্থাৎ মানব ভক্তির শক্তিতে ধনী ও পুণ্যবান হয়ে যায়।

এই জ্ঞান ওই ঋষিরূপে প্রকট হওয়া পরমাত্মার শ্রী মুখকমল হতে শ্রবণ করার পরে, ঋষভদেব ভক্তি করার নিশ্চিতভাবে মনস্থির করলেন। ঋষভদেব যখন পরমাত্মা রূপী ঋষির নাম জানতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর নাম "কবির্দেব" বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, আমি স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা। চার বেদের মধ্যে পরমাত্মার যে "কবির্দেব" নাম লেখা রয়েছে, সেই "কবির্দেব" হলাম আমিই আর এটাই আমার নাম। আমিই পরম অক্ষর ব্রহ্ম।

যা সূক্ষ্ম বেদে লেখা আছে:-

ঋষভ দেব কে আইয়া, কবী নামে করতার।
নৌ যোগেশ্বর কো সমঝাইয়া, জনক বিদেহ উদ্ধার॥

ভাবার্থ :- ঋষভদেবের সঙ্গে "কবী" নামের পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) দর্শন হয়েছিল এবং তাকে ভক্তির করার প্রেরণা করেছিলেন। ওই পরমাত্মা নয়জন যোগেশ্বর ও রাজা জনককে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিয়ে তাদের মোক্ষের জন্য, ভক্তি করার প্রেরণা করেছিলেন। তবে ঋষভদেবের এই কথা বিশ্বাস হয়নি যে, এই ঋষি কবির্দেব , যিনি বেদে উল্লিখিত সকলের উৎপত্তিকর্তা। তবে তিনি তাকে পরমাত্মা বলে মানতে পারেননি কিন্তু ভক্তি করার জন্য

তিনি দৃঢ় মন করে নিয়েছিলেন। ঋষভদেব পরে একজন তপস্বী ঋষির নিকট থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করে, শুধু মাত্র ওম্ (ওঁ) নামের মন্ত্র জাপ এবং হঠযোগ করতে লাগলেন। ঋষভদেবের বড় পুত্রের নাম "ভরত" এবং ভরতের পুত্রের নাম ছিল মারিচি। ঋষভদেব প্রথম এক বছর পর্যন্ত উপবাস থেকে তপস্যা করেছিলেন। তারপর এক হাজার বছর কঠোর তপস্যা করলেন। তপস্যা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমবার তার পৌত্র (নাতি) অর্থাৎ ভরতের পুত্র মারিচিকে ধর্ম উপদেশ (দীক্ষা) দিয়েছিলেন। এই মারিচীর আত্মা পরে ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন হয়েছিলেন। ঋষভদেব জৈনধর্ম চালাননি, এটি তো শ্রী মহাবীর জৈনের দ্বারা চালানো হয়েছিল। তবে শ্রী মহাবীরও কোনো ধর্মের স্থাপনা করেননি। তিনি কেবল তাঁর অনুগামীদেরকে নিজের অনুভব বলেছিলেন। তার ভক্তি করার এক ভক্ত সমুদায় ছিল। ঋষভদেব "ওঁ" (ওম্) নামের জপকে ওঁ-কার উচ্চারণ করে বলতেন। বর্তমানে এটিকেই অপভ্রংশ করে জৈনরা "ণোওঙ্কার" মন্ত্র বলেন এবং এটিরই জপ করেন, একে ঔঙ্কার বা ওঁ (ওম্) বলা হয়।

আমরা এখন নিজেদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জৈন ধর্মগ্রন্থে ও জৈন ধর্মের অনুগামীদের দ্বারা লিখিত পুস্তক "আও জৈন ধর্ম কো জানে" (অর্থাৎ আসুন জৈন ধর্মকে জানি) এই পুস্তকে লেখা আছে যে, ঋষভদেবের ((জৈনরা তাকেই আদিনাথ বলেন) আত্মাই বাবা আদমের রূপে জন্ম নিয়েছিলেন।

এখন ওই সূক্ষ্ম বেদের বাণীর ব্যাখ্যা করব :-

"বহী মুহম্মদ, বহী মহাদেব, বহী আদম, বহী ব্রহ্মা।
দাস গরীব দুসরা কোঈ নহিঁ, দেখ আপনে ঘরমা॥"

বাবা আদম শ্রীব্রহ্মা দেবতার ধাম থেকে এসেছিলেন, কারণ মানব জন্মে করা ভক্তি সাধনা অনুসার প্রাণী উপরে তিন দেবতার (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীশিবের) ধামগুলোতে ধাপে ধাপে যায় আর তাদের পুণ্য সমাপ্ত হওয়ার পরে, পুনরায় পৃথিবীর উপরে সংস্কারবশত জন্ম নেন।

সন্ত গরীব দাসজীকে (গ্রাম ছুড়ানি, জেলা ঝজ্জর, হরিয়ানা প্রদেশ) স্বয়ং ওই পরমাত্মা দর্শন দিয়েছিলেন, যেরূপ ঋষভদেবকে দর্শন দিয়েছিলেন। সন্ত গরীবদাস মহারাজ পরমেশ্বরের সাথে উপরে গিয়ে, স্বয়ং নিজের চোখে সমস্ত ব্যবস্থাপনা দেখে এসেছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে, আদম এসেছিলেন শ্রীব্রহ্মার লোক থেকে, তিনি শ্রীব্রহ্মার অবতার ছিলেন। আর নবী মুহম্মদ তমোগুণ শ্রীশিবের অবতার ছিলেন।

প্রিয় পাঠকগণ! অবতার দুই প্রকারের হয়, (১). স্বয়ং সেই প্রভু অবতার হয়ে জন্ম নেন যেমন- শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রূপে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই অবতার ধারণ করে এসেছিলেন। তবে কপিল ঋষি ও পরশুরামকেও শ্রী বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তারা কেউই স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ছিলেন না, তারা ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর ধামের এক দেবাত্মা। তাঁদের নিকট শ্রীবিষ্ণুর কিছু শক্তি ছিল, কেননা তাঁদেরকে তাঁর দ্বারা পাঠানো হয়েছিল। এইপ্রকার হজরত মুহম্মদ, শ্রী শিবের (ধাম থেকে আসা এক দেব আত্মা) অবতার ছিলেন এবং বাবা আদম শ্রীব্রহ্মার (ধাম থেকে আসা এক দেব আত্মা) অবতার ছিলেন। এইপ্রকার ঈসা মসীহা (যীশুখ্রীষ্ট) শ্রীবিষ্ণুর (ধাম থেকে আসা এক দেব আত্মা) অবতার ছিলেন। ঈসাই (খ্রীষ্টান) ধর্মের শ্রদ্ধালুগণও ঈসাকে (যীশুকে) প্রভুর পুত্র বলেই মানেন, তাঁকে কখনো প্রভু বলেন নি।

সন্ত গরীবদাস মহারাজ জী বলেছিলেন যে, যদি আপনাদের আমার কথার উপর বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার দ্বারা বলা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তি-সাধনা করে নিজের ঘরে অর্থাৎ নিজের মানব দেহের মধ্যে কি আছে তা নিজের চোখে দেখে নিন।

ভাবার্থ হল :- সকল ধর্মের মানবের (নারী ও পুরুষের) শরীরের রচনা একই রকম। সঠিক তত্ত্বজ্ঞানের অভাবের কারণে আমরা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছি। সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে, মানব শরীরের মেরুদণ্ডের হাড়ের অর্থাৎ Back Bone (Spine) এর ভিতরের দিকে (নিচের মূল থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত) পাঁচটি কমলচক্র বানানো রয়েছে।

অনুগ্রহ করে এই ছবিটি দেখুন:-

১. মূল চক্র :- এই চক্রটি হল মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্ত হতে এক ইঞ্চি উপরে মলদ্বারের কাছে। এর দেবতা হলেন শ্রীগণেশ এবং এই কমলের (পদ্মের) মাত্র ৪টি পাঁপড়ি।

২. স্বাদ চক্র :- এই চক্রটি হল মূল কমল হতে দুই ইঞ্চি উপর মেরুদণ্ডের ভিতরের দিকে সংযুক্ত থাকে। এর দেবতা হলেন শ্রীব্রহ্মা ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী। এই কমলের ছয়টি পাঁপড়ি।

৩. নাভি কমল চক্র :- এই চক্রটি নাভির সামনে ওই মেরুদণ্ডের সাথে সংযুক্ত। এর দেবতা হলেন শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী। এই কমলের মাত্র ৮টি পাঁপড়ি।

৪. হৃদয় কমল চক্র :- এই কমল চক্রটি বুকে তৈরি উভয় স্তনের মধ্যভাগে মেরুদণ্ডের সাথে সংযুক্ত। এর দেবতা হলেন শ্রীশিব এবং তাঁর স্ত্রী পার্বতী। এই কমলের ১২ টি পাঁপড়ি রয়েছে।

৫. কণ্ঠ কমল :- এই কমল চক্রটি বুকের হাড়ের উপরে, যেখান থেকে গলা শুরু হয়, তার পিছনে মেরুদন্ড হাড়ের সাথে শেষ প্রান্তে রয়েছে। এর প্রধান হলেন শ্রী দেবী অর্থাৎ দুর্গা। এই কমলের ১৬টি পাঁপড়ি রয়েছে। শেষ কমল চক্র উপর আছে।

৬. সঙ্গম কমল বা ষষ্ঠ কমল :- এই কমল সুষ্মণার (ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ীবিশেষ) উপরের দ্বারে রয়েছে। এর কমলের তিনটি পাঁপড়ি। এই স্থানে দেবী দুর্গাই, সরস্বতীর রূপ ধারণ করে নিবাস করেন। এক পাপড়িতে দেবী দুর্গা সরস্বতী রূপে থাকেন । তাঁর সাথে ৭২ কোটি উর্বশী (সুন্দরী পরীরা) থাকে আর এই পরীরা মৃত্যুর পরে উপরে যাওয়া ভক্ত আত্মাদেরকে আকর্ষণ করে নিজেদের জালে ফাঁসায়। দ্বিতীয় পাঁপড়িতে সুন্দর যুবক পুরুষরা থাকে আর যে সকল ভক্তিমতী (নারী) আত্মারা মৃত্যুর পরে উপরে যান, তখন এই নর যুবকরা তাদের আকর্ষণ করে কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। এখানে কাল ব্রহ্মাও অন্য রূপ ধারণ করে, এই যুবকদের সঞ্চালক প্রধান হয়ে থাকে। তৃতীয় পাঁপড়িতে স্বয়ং পরমাত্মা অন্য রূপে থাকেন। তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তদেরকে কালের জাল থেকে মুক্ত করান এবং তাদেরকে জ্ঞান শুনিয়ে সতর্ক করেন।

৭. ত্রিকুটি কমল চক্র :- এটি দুই চোখের ভ্রু (কোষ) এর মধ্য ভাগে মাথার পিছনের স্থানে অন্য কমলগুলির পঙ্ক্তির উপরে রয়েছে। এই কমলের দেবতা হলেন সদগুরু রূপে স্বয়ং পরমেশ্বর। এই কমলের দুটি পাঁপড়ি। একটি সাদা রঙের (বর্ণ) পাঁপড়ি এবং অন্যটি কালো (ভঁম্বর) রঙের পাঁপড়ি। সাদা পাঁপড়িতে সদগুরু রূপে সত্যপুরুষ নিবাস করেন। কালো পাঁপড়িতে নকল সদগুরু রূপে কাল নিরঞ্জন বাস করে।

৮. সহস্র কমল চক্র :- এই কমল মাথার মধ্যভাগ থেকে দুই আঙুল নিচে অন্য কমলেরই সারিতে রয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মাথায় লম্বা চুলের টিকি রাখতেন, কেউ কেউ এখনও রাখেন। এটির নিচে রয়েছে সেই সহস্র (হাজার) কমল দল। এই কমলের দেবতা হলেন ব্রহ্ম, যাকে ক্ষর পুরুষ বা কালও বলা হয়, যিনি অদৃশ্যভাবে গীতা ও বেদের জ্ঞান দিয়েছেন। এই কমলের এক হাজার পাঁপড়ি। কাল ব্রহ্ম এটিকে প্রকাশ দ্বারা ভরে রেখেছেন, তিনি স্বয়ং এই চক্রের থেকে দূরে থাকেন। তিনি স্বয়ং দৃশ্যমান হন না, কেবল পাঁপড়িগুলি ঝলমল করতে দেখা যায়।

{**অষ্ট কমল দল :-** এই কমলের দেবতা হলেন অক্ষর পুরুষ, যাকে পরব্রহ্মাও বলা হয়, এটির ৮টি পাঁপড়ি রয়েছে। এটির

স্থিতির বিষয়ে (স্ট্যাটাস) বলবো না, কারণ নকল গুরুরা এটি (এই জ্ঞানের বিষয়) জানলে, জনসাধারণকে ভ্রমিত করে দেবেন।}

৯. শঙ্খ কমল দল :- এই কমলে পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের (পরমেশ্বরের) নিবাস। এটি শঙ্খ পাপড়ি। এটির স্থিতির বিষয়েও বলবো না, কারণ উপরে লেখা হয়েছে।

{যা চিত্রতে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ কমল ও নবম কমল দেখানো হয়নি। কারণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করানো হয়। এই কমলগুলির একটা গভীর রহস্য আছে। এটি কবির সাগরের সারাংশতে লেখা আছে।}

শরীরের এই কমলগুলো টেলিভিশন চ্যানেলের মতো কাজ করে। আপনি ওই চ্যানেলগুলোর মধ্যে যে চ্যানেল চালু করবেন, সেখানে ওই কার্যক্রমটি দেখা যাবে। যেমন কার্যক্রম স্টুডিওতে চলে কিন্তু ওই প্রোগ্রামটি টিভিতে দেখা যায়। এইভাবে প্রতিটি কমলের ফাংশন (function) আছে। এই কমল সক্রিয় (চালু) করার জন্য মন্ত্র রয়েছে যা এই দাস (সন্ত রামপাল দাস) জপ করার জন্য ভক্তদের দেন। প্রথমবার কেবলমাত্র এই চ্যানেলগুলি খোলার জন্য দীক্ষা দেওয়া হয়। মন্ত্রের শক্তিতে সমস্ত কমল ON (চালু) হয়ে যায়, তারপর সাধক (ভক্ত) নিজের শরীরের চ্যানেলে ওই দেবের ধামকে দেখতে পারবেন, সেখানকার সমস্ত দৃশ্য দেখতে পারবেন। এইজন্য সন্ত গরীব দাস মহারাজ বলেছেন যে, আপনি আপনার শরীরের চ্যানেলটি চালু করে স্বয়ংই দেখে নিন যে, বাবা আদম যে ব্রহ্মার লোক থেকে যে এসেছেন, তা দেখতে পাবেন, কেননা সেখানে সমস্ত রেকর্ড উপলব্ধ থাকে। বর্তমানে যেমন ইউটিউব (YouTube) আছে, এই প্রকার প্রত্যেক দেবের ধামে অতীতে হওয়া ঘটনা দেখতে চাইলে, আপনি দেখতে পারবেন। এই প্রকার আপনি হজরত মুহম্মদকে শিবের লোক থেকে আসতে দেখবেন। এই প্রকার ঈসাইকেও (যীশুখ্রীষ্ট) শ্রীবিষ্ণুর ধাম থেকে আসতে দেখবেন।

মক্কা মহাদেবের মন্দির

শিখ ধর্মের পুস্তক ভাইবালে বালী জন্ম সাখীতে প্রমাণ :-

"সাখী মদীনে কি চলী" হিন্দি পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠায়, শ্রী নানকদেব চার ইমামের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন :-

আখে নানক শাহ সচ্চ, সুণ চার ইমাম।
মক্কা হৈ মহাদেব কা, ব্রাহ্মণ সন সুলতান॥

ভাবার্থ :- সদগুরু নানক দেবজী চার ইমামের সাথে আলোচনা করার সময় বলেছিলেন যে, মক্কা শহরে যে কাবা (মন্দির) আছে, যাকে আপনারা পবিত্র স্থান বলে মানেন। ওটা হল মহাদেবের (শিব) মন্দির। ওই স্থানে সকল দেব-দেবীর মূর্তি (বুত) ছিল। যেটি রাজা (সুলতান) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে সমস্ত মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। নবী ইব্রাহীম ও হজরত ইস্মাইল (অলইহি.) এইগুলিকে পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এখন আমি আপনাদেরকে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাব। আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে, যে যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সূক্ষ্ম বেদে রয়েছে, তা না গীতাতে আছে, না চার বেদে আছে, না পুরাণে আছে, না কুরআন শরীফে আছে, না বাইবেলে, না ছয় শাস্ত্রে এবং না এগারো উপনিষদে আছে।

উদাহরণ :- যেমন দশম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম ভুল নয় কিন্তু এই শ্রেণীর সিলেবাসে B.A. ও M.A এর জ্ঞান নেই। এই পাঠ্যক্রম ভুল নয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। বোঝার জন্য এতটাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন :- সংসারের শাস্ত্র ও সন্ত (গুরু) কাদির আল্লাহর (পরমাত্মা) সম্পর্কে কী তথ্য দেন?

উত্তর :- বিশ্বের প্রধান শাস্ত্র ও সদগ্রন্থগুলিতে পরমাত্মার বিষয়ে খুবই সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক যে, বিশ্বতে প্রধান শাস্ত্র ও সদগ্রন্থগুলি কি কি?

(১.) বেদ:- বেদ দুই প্রকার:- (১.) সূক্ষ্ম বেদ, (২.) সাধারণ বেদ।

১. সূক্ষ্ম বেদ :- এটিতে সেই জ্ঞান আছে, যে জ্ঞান স্বয়ং সামর্থ্যবান পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ তায়ালা) পৃথিবীতে প্রকট হয়ে তাঁর মুখকমল হতে বাণী উচ্চারণ করে বলেন, এটিই হল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

প্রমাণ :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬ ও ২৭, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৮২ মন্ত্র ১, ২, ৩, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ২০ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, যজুর্বেদ অধ্যায় ৯ মন্ত্র ১ এবং ৩২, যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র ২৫, অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ মন্ত্র ৭, সামবেদ মন্ত্র সংখ্যা ৮২২।

অন্য প্রমাণ :- শ্রীমদভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৩২ তে বলা হয়েছে যে, সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ সত্য পুরুষ তাঁর মুখকমল দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে বিস্তারিত ভাবে বাণীর মাধ্যমে উচ্চারণ করে বর্ণনা করেন।

কারণ :- পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন/কাল পুরুষ) অন্তঃকরণে ফিট করে বা ফ্যাক্স (Fax) করে দিয়েছিলেন। পরমাত্মা দ্বারা নির্ধারিত সময়ে, এই জ্ঞান কাল পুরুষের শ্বাসের দ্বারা সমুদ্রে প্রকট হয়ে ছিল, কাল পুরুষ সেই জ্ঞান থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ জ্ঞান সংসারে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন। ঋষি ব্যাসদেব এই বাকি জ্ঞানকে চারটি ভাগে ভাগ করে দিলেন আর এই চারটি ভাগকে চার বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ) বানিয়ে দিলেন।

২. সাধারণ বেদ :- এটি হল ওই চার বেদের জ্ঞান, যা ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কাল) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন,

এটি অসম্পূর্ণ জ্ঞান। এর মধ্যে থেকে মূল তথ্যগুলিই বের করে দেওয়া হয়েছে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল দ্বারা করা হয়েছিল। বের করার কারণ হল, "কাল পুরুষ" -এর ভয় থাকতো যে, মানবদের পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান কখনো যেন না হয়ে যায়। যদি মানব প্রাণীদের পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে সবাই এই কালের লোককে ত্যাগ করে পূর্ণ পরমাত্মার লোকে (সত্যলোকে/ শাশ্বত স্থানে) চলে যাবে, যেখানে চলে যাওয়ার পর, সকলেরই জন্ম ও মৃত্যু সমাপ্ত হয়ে যায়। এইজন্য ব্রহ্ম (কাল পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার পরমপদ স্থানের সম্পর্কে তথ্য বলেননি, তাই তিনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণ করার জন্য, পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং সশরীর প্রকট হয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান বলেন। তাঁকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্তির সঠিক মন্ত্রও বলেন, যে জ্ঞান কাল ভগবান সমাপ্ত করে অবশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করে রেখেছিলেন। সেই অধুরা জ্ঞানকেই ঋষিগণ চার বেদ বলেন। ঋষি ব্যাসদেব এই বেদকে লিখেছেন এবং এটিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. ঋগ্বেদ ২. যজুর্বেদ, ৩. সামবেদ, ৪. অথর্ববেদ যা বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই চার বেদের সারাংশ কালপুরুষ (কাল ব্রহ্ম/ জ্যোতিনিরঞ্জন) শ্রীমদভগবদ্ গীতার রূপে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে মহাভারতের যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে বলেছিলেন। এটাই পরে মহর্ষি ব্যাসদেব কাগজের উপর লিখেছিলেন। যা আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ।

সদগ্রন্থে বাইবেলের নামও আছে। বাইবেল :- এটি হল তিনটি পুস্তকের সংগ্রহ।

১. তৌরাত, ২. জবুর, ৩. ইঞ্জিল।

বাইবেলে সর্ব প্রথম সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, যা তৌরাত পুস্তকে লেখা, তার মধ্যে লেখা আছে যে, পরমাত্মা সর্বপ্রথম সৃষ্টির রচনা করেছিলেন। পৃথিবী, সূর্য, আকাশ, পশু-পাখি, মানুষ (পুরুষ-মহিলা) ইত্যাদির রচনা পরমাত্মা ছয় দিনের মধ্যে করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে তিনি সিংহাসনের (তখ্‌তে) উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। বাইবেলের সৃষ্টির উৎপত্তি অধ্যায় ১ শ্লোক ২৬, ২৭, ২৮- তে এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পরমাত্মা মানুষকে তার নিজের স্বরূপ অনুসারে সৃষ্টি করেছেন।

এটিতে প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মাও মানুষের মতো সাকার (নরাকার) আছেন।

মানুষের ভোজনের জন্য পরমেশ্বরের আদেশ

উৎপত্তি অধ্যায়ে (বাইবেলে শ্লোক ২৭-২৮ -তে)) লেখা আছে যে, মানুষের ভোজনের জন্য বীজযুক্ত উদ্ভিদ (গম, ছোলা, বাজরা ইত্যাদি) এবং ফলযুক্ত বৃক্ষ দেওয়া হয়েছে, এটি তোমাদের ভোজনের জন্য। পশু -পাখিদের খাওয়ার জন্য ঘাস ও পাতাযুক্ত ঝোপ জঙ্গল দিয়েছেন। এরপরে পরমাত্মা তো তাঁর নিজ ধামে (সত্যলোক) সিংহাসনের (তখ্‌ত) উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তবে বাইবেলে এরপরে যে সমস্ত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা কাল ভগবানের দেওয়া জ্ঞান এবং তার পাঠানো ফেরেশতাদের (দেবতা/দূত) দেওয়া জ্ঞান। তবে বাইবেল গ্রন্থে পরে মাংস খাওয়ার যে সব কথা লেখা হয়েছে, তা ওই পূর্ণ পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ্) আদেশ নয়। তা অসম্পূর্ণ প্রভুর জ্ঞান। অতএব পূর্ণ পরমাত্মার (Complete God) আদেশের অবহেলা হয়ে গেলে পাপের অংশীদার হতে হবে।

❖ **কুরআন শরীফ (মজিদ) :-** বাইবেলের পরে সদগ্রন্থগুলির মধ্যে কুরআন শরীফের নাম শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া হয়, কুরআনের জ্ঞানদাতাও তিনিই, যিনি বাইবেলের জ্ঞান দিয়েছিলেন, চার বেদের জ্ঞান ও শ্রীমদভগবদ্ গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন। এইজন্য তিনি ওইসকল উক্তিগুলো বাইবেল ও কুরআনে পুনরায় বলেননি, যে উক্তিগুলির জ্ঞান পূর্বেই চার বেদে ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে দিয়েছিলেন।

❖ **উপনিষদ :-** এটি সংখ্যায় ১১ টি (এগারো) হিসাবে বিবেচিত হয়, উপনিষদের জ্ঞান কোনো ঋষির নিজস্ব অনুভব। যদি এই জ্ঞান বেদ ও গীতার সাথে না মেলে, তাহলে তা বৃথা, অতএব এটি মেনে নেওয়া উচিত নয়। তাই উপনিষদ ত্যাগ করে বেদ ও গীতার জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত কারণ উপনিষদের অধিকাংশ জ্ঞান হল বেদ ও গীতার জ্ঞানের থেকে বিপরীত জ্ঞান। এইপ্রকার বাইবেল ও কুরআনের জ্ঞান বুঝবেন, যে জ্ঞান বেদ ও গীতার জ্ঞানের সাথে না মেলে, তা গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি বেদ ও গীতার জ্ঞান সূক্ষ্মবেদ জ্ঞানের সাথে না মেলে, সেটিও গ্রহণ করা উচিত নয়।

❖ **পুরাণ :-** এটির সংখ্যা ১৮ টি (আঠারো) হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে পুরাণের জ্ঞান একই উপলব্ধি বলে মনে করা হয়। এই জ্ঞান সর্ব প্রথম শ্রীব্রহ্মা তাঁর নিজের পুত্রদের (দক্ষ ও অন্যান্য ঋষিদের) দিয়েছিলেন। রাজা দক্ষ, শ্রী মনু, পরাশর ঋষি ও অন্যান্য ঋষিগণ, এই জ্ঞানকে পরে প্রচার করার সময়, তাঁরা তাদের নিজেদের অনুভবও মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এইপ্রকার ১৮টি ভাগে পুরাণের জ্ঞান বিবেচনা করা হয়েছে। যদি ১৮টি পুরাণের জ্ঞানের যে অংশ বেদ ও গীতার সঙ্গে না মেলে, তাহলে ত্যাগ করে দেওয়া উচিৎ। এই প্রকার অন্য যে কোনো পুস্তকের জ্ঞান, যদি বেদ ও গীতার জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞান না হয় অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান যুক্ত হয়, তাহলে তা ত্যাগ করা উচিত।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ -তে গীতার জ্ঞান দাতা, অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তুই সর্বতোভাবে ওই পরমেশ্বরের (যিনি গীতার জ্ঞানদাতার থেকে অন্য) শরণে যা। ওই পরমেশ্বরের কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম (সত্যলোক/ শাশ্বত ধাম) প্রাপ্ত করবে। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ -তে বলেছেন, যে জ্ঞান (সূক্ষ্ম বেদে) স্বয়ং পরমাত্মা তাঁর নিজের মুখকমল দ্বারা উচ্চারণ করে বলে থাকেন, তাকেই সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণী বলা হয়, এটিকেই আবার তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়। যার মধ্যে পরমাত্মা

পূর্ণ মোক্ষ মার্গের জ্ঞান দিয়েছেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ -তে বলা হয়েছে যে, ওই তত্ত্বজ্ঞানকে তুমি তত্ত্বদর্শী সন্তের (পূর্ণ গুরুর) নিকট গিয়ে বুঝে নাও। তাঁকে দণ্ডবৎ (সাষ্টাঙ্গে) প্রণাম করে প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বদর্শী সন্ত তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ -তে তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় বলা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, যে সন্ত সংসার রূপী বৃক্ষের সর্ব অঙ্গকে জানেন, তিনি বেদবিদ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্যকে জানেন, তিনিই হলেন তত্ত্বদর্শী সন্ত। সূক্ষ্ম বেদ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের (পরমাত্মার) বাণীতে বলা হয়েছে যে :-

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ, ক্ষর পুরুষ বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হৈ, পাত রূপ সংসার॥

এই সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণীকে তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -তে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি করার পরে পরমেশ্বরের ওই পরম পদের সন্ধান করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পরে সাধককে (ভক্তাত্মা) পুনরায় কখনও আর এই সংসারে ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ তার পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যায়। ওই পরমাত্মা সংসার রূপী বৃক্ষের রচনা করেছেন, কেবল তাঁরই ভক্তি করো। গীতা জ্ঞানদাতা তার নিজের সাধনা থেকে ওই পূর্ণ পরমাত্মার সাধনাকে শ্রেষ্ঠ মানেন। ওই সাধনার মাধ্যমেই পরমেশ্বরের ওই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যাকে প্রাপ্ত করার পর জীবের জন্ম-মৃত্যুর চক্র, চিরতরের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

❖ **শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব :-** এটি শিখ ধর্মের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়, আসলে এটিতে কয়েকজন মহাত্মাদের কিছু অমৃত বাণী সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে শ্রী নানক দেবের বাণী অর্থাৎ মহলা-পহলার বাণী তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেদের সাথে মেলে, কেননা শ্রী নানক দেবের সঙ্গে কবীর পরমাত্মা ওই সময় সাক্ষাৎ হয়েছিল, যে সময় শ্রী নানক দেব সুলতানপুর শহরে নবাবের মুদিখানায় চাকরি করতেন। সুলতানপুর শহর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে বেঈ নদী প্রবাহিত হয়েছে, শ্রী নানকদেব প্রতিদিন ওই বেঈ নদীতে স্নান করতে যেতেন। একদিন পরমাত্মা জিন্দা বাবার বেশভূষাতে বেঈ নদীর তীরে আবির্ভূত হলেন, সেখানে শ্রী নানক দেবের সাথে জ্ঞান চর্চা হয়। তারপর শ্রীনানকদেব নদীতে ডুব দিলেন কিন্তু বাইরে এলেন না। সেখানে উপস্থিত লোকজন ভেবে নিলেন যে, নানকদেব নদীতে ডুবে গিয়েছেন। শহরের লোকেরা নদীতে জাল ফেলে খোঁজাখুঁজিও করলেন কিন্তু না পেয়ে হতাশ হলেন। কারণ শ্রীনানক দেব জিন্দা বাবা রূপে প্রকট হওয়া কবীর পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) সাথে সচ্চখন্ডে (সত্যলোকে) চলে গিয়েছিলেন। তিন দিন পর শ্রীনানক দেব পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে এলেন। ওই বেঈ নদীর সেই তীরেই দাঁড়িয়ে গেলেন, যেখান থেকে পরমেশ্বরের সাথে জলে ডুব দিয়ে অন্তর্ধ্যান হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীনানক দেবকে জীবিত দেখে সুলতানপুরের নিবাসীগণের খুশির আর ঠিকানা রইল না। শ্রী নানক দেবের বোন নানকীর বিবাহ ওই সুলতানপুর শহরেই হয়েছিল। শ্রী নানকদেব নিজের বোনের কাছেই থাকতেন। নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর শোকে দুঃখী বোন নানকী, ভাইকে জীবিত দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন, আর দুঃখ যেন তখন তার খুশিতে বদলে গেল। শ্রীনানক দেব জী পরমাত্মাকে পেলেন, সত্য জ্ঞান ও সচ্চা নাম (সত্যনাম) পেলেন। পুস্তক ভাই বালে বালী "জন্ম সাখী গুরু নানক দেব" -তে এবং "প্রাণ সংগলী" হিন্দি লিপিতে লেখা আছে, যার সম্পাদক হলেন সন্ত সম্পূরণ সিং। এই দুটি পুস্তকে প্রমাণ রয়েছে যে, শ্রী গুরু নানক দেব স্বয়ং তার শিষ্য মর্দানাকে বলেছিলেন যে, পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) জিন্দা বাবার রূপে বেই নদীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যখন আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম, আমি তিনদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলাম। ওই জিন্দা বাবা (কাদির আল্লাহ) আমার সদগুরুও এবং তিনি সর্ব সৃষ্টির রচনহারও। এইজন্য ইনিই "বাবা" বলার অধিকারী, অন্যদের "বাবা" বলা উচিত নয়, তাঁর নাম কবীর।

কায়ম দায়ম কুদরতী সব পীরন সির পীর আলম বড়া কবীর॥

সুতরাং শ্রী নানকদেবের (মহলা ১) -এর বাণী, সূক্ষ্ম বেদের সাথে মিলে যায় অর্থাৎ এটি সঠিক। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবে কবীর সাহেবের বাণী বাদ দিয়ে অন্যান্য সন্তদের (সাধুদের) বাণী অতটা সঠিক নয়। কারণ হল যে, শ্রী নানকদেবের সঙ্গে পরমাত্মা কবীর সাহেবের (কাদির আল্লাহ) সাক্ষাৎ হয়েছিল।

প্রমাণ :- শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবের পৃষ্ঠা নং ২৪ এ লেখা বাণী :-

এক সুআন দুঈ সুআনী নাল ভলকে ভৌঁকহী সদা বিয়াল,
কুড় ছুরা মুঠা মুরদার ধাণক রূপ রহা করতার।
তেরা এক নাম তারে সংসার মেঁ ঐহো আশ ঐহো আধার, ধাণক রূপ রহা করতার।
ফাহী সুরত মলুকী বেশ, এহ ঠগবাড়া ঠগী দেশ।
খরা সিআণাঁ বহুতা ভার, ধাণক রূপ রহা করতার॥

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেবের পৃষ্ঠা নং ৭৩১ এর নিম্নে লেখা বাণী :-

নীচ জাতি পরদেশী মেরা, ক্ষণ আবৈ ক্ষণ জাবৈ।
জাকি সঙ্গত নানক রহন্দা ক্যকর মুন্ডা পাবৈ॥

নিম্নলিখিত বাণীটি ৭২১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

য়ক অর্জ গুফতম পেশ তোদর, কূন করতার। হক্কা কবীর করীম তূ, বেএব পরবরদিগার॥

এই উপরোক্ত অমৃতবাণী "শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব" গ্রন্থের বাণী। যার দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হল যে, শ্রী নানকদেবের সঙ্গে কবীর পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তিনিই হলেন "কবীর করতার", যিনি ধানকের (তাঁতী) রূপে লীলা করার জন্য কাশীতে প্রকট হয়েছিলেন।

সন্ত গরীব দাস মহারাজকেও (গ্রাম- ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর, রাজ্য-হরিয়ানা) একইরকম জিন্দা বাবার রূপে কবীর পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) দর্শন দিয়ে, তাকে সচ্চখন্ডে (সত্যলোক) নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে তাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গরীবদাস বলেছেন :-

গরীব, হম সুলতানী নানক তারে, দাদূ কূঁ উপদেশ দিয়া। জাতি জুলাহা ভেদ ন পায়া, কাশী মাহীঁ কবীর হুয়া ॥

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার। সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুল কে সিরজনহার ॥

সন্ত দাদূ দাসজী মহারাজের সঙ্গেও কবীর পরমাত্মা জিন্দা বাবার রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। শ্রী দাদূজী ৭ বছর বয়সের ছিলেন। (কিছু পুস্তকে ওই সময় শ্রীদাদূজীর আয়ু ১১ বছর লেখা আছে) গ্রামের বাইরে বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, তখন পরমাত্মা জিন্দা বাবার রূপে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং সত্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদূজীও তিন দিন ও রাত পর্যন্ত অচেতন ছিলেন। সচেতন হওয়ার পরে কবীর পরমাত্মার মহিমা গাইতে লাগলেন।

জিন মোকূঁ নিজ নাম (যথার্থ নাম) দিয়া, সোঈ সতগুরু হমার। দাদূ দূসরা কোঈ নহীঁ কবীর সিরজনহার ॥

দাদূ নাম কবীর কী, জৈ কোঈ লেবে ওট। উনকো কবহু লাগে নহীঁ, কাল বজ্র কী চোট ॥

সন্ত গরীব দাস বলেছেন :-

গরীব ,দাদূ কূঁ সতগুরু মিলে, দঈ পান কী পীক। বূঢ়া বাবা জিসে কহেঁ, য়হ দাদূ কী নহীঁ সীখ।

গরীব, দাদূ কে সির পর সদা, অদলী অসল কবীর। টক্কর মারী জদ মিলে, ফির সাম্ভর কে তীর ॥

❖ **সন্ত ধর্মদাস বান্ধবগঢ় নিবাসীর সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছিল :-** মহাত্মা ধর্মদাসের জন্ম পবিত্র হিন্দু ধর্মে গ্রাম ছিল বান্ধবগঢ়ে (মধ্যপ্রদেশ, ভারত) হয়েছিল। তাঁর গুরুর আদেশানুসারে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে যখন মথুরায় পৌঁছলেন, তখন সমর্থ পরমাত্মা (কাদির খুদা) জীবন্ত মহাত্মা রূপে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পরমাত্মা (আল্লাহ কবীর) ধর্মদাসকেও সত্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনদিন-তিনরাত ধর্মদাসকেও শ্রীনানক দেবের মতো পরমাত্মার সাথে আকাশ মণ্ডলে (সত্যলোকে) ছিলেন। আকাশে জ্যোতিনিরঞ্জনের ধামের (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের) ব্যবস্থাপনাও দেখিয়েছিলেন। তারপর আরও উপরে নিয়ে গিয়ে অক্ষর পুরুষের সাতসংখ ব্রহ্মাণ্ড দেখালেন। কাদির আল্লাহ তাঁকে সতলোকে নিয়ে গিয়ে, নিজের সিংহাসনও দেখিয়েছিলেন। ধর্মদাসের শরীর তিনদিন পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে ছিল। তৃতীয় দিনে জ্ঞান ফেরার পরে তিনি জানালেন যে, তিনি তিনদিন পর্যন্ত পরমাত্মা কবীরের সাথে সত্যলোকে ছিলেন। ওই পরমাত্মা কাশী নগরে লীলা করতে এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এরপর ধর্মদাস বেনারসে (কাশীতে) গেলেন। সেখানে পরমাত্মা কবীরকে তাঁতির রূপে কাজ করতে দেখে আচম্বিত হয়ে গেলে, চরণে পড়ে গেলেন এবং সঠিক ভক্তি মার্গ প্রাপ্ত করে নিজের কল্যাণ করালেন।

❖ হজরত মুহম্মদকেও পরমাত্মা মক্কাতে জিন্দা মহাত্মার রূপ ধারণ করে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যে সময় নবী মুহম্মদ কাবা মসজিদে হজ করার জন্য গিয়েছিলেন এবং তাঁকেও তিনি নিজের লোকে (ধামে) নিয়ে গিয়েছিলেন। যেটি এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রাজদূত ভবন আকারে বানানো রয়েছে। পরমাত্মা (আল্লাহ কবীর) হজরত মুহম্মদকে বুঝিয়েছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বজ্ঞান শুনিয়েছিলেন কিন্তু হজরত মুহম্মদ পরমাত্মার জ্ঞান স্বীকার করেননি এবং না সত্যলোকে থাকার জন্য কোনো ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। এইজন্য হজরত মুহম্মদকে পুনরায় তাঁর শরীরে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই সময় হজরত মুহম্মদের কয়েক হাজার মুসলমান অনুগামী হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মহিমা সংসারে খুবই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং কুরআনের জ্ঞানকেই সর্বোত্তম মনে করছিলেন। সন্ত গরীব দাস বলেছেন যে, কবীর পরমেশ্বর হজরত মুহম্মদকে উপর লোকে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে থাকেননি। সন্ত গরীবদাস মহারাজ বললেন যে, কবীর পরমেশ্বর এই কথা বলেছিলেন:-

হম মুহম্মদ কো সতলোক দ্বীপ লে গয়ো, ইচ্ছা রূপী বহাঁ নহীঁ রহয়ো।
উল্ট মুহম্মদ মহল পঠায়া, গুঝ বিরজ এক কলমা ল্যায়া।
রোজা, বঙ্গ, নমাজ দয়ী রে, বিস্মল কী নহীঁ বাত কহী রে।
মারী গউ শব্দ কে তীরম্, ঐসে হোতে মুহম্মদ পীরম্।
শব্দে ফের জিবাঈ, রাখ্যা মাঁস নহীঁ ভখ্যা, ঐসে পীর মুহম্মদ ভাঈ।
মারী গউ লে শব্দ তলবার, জীবত হুঈ নহীঁ অল্লাহ সে করী পুকার।
তব হমো (আমাকে) মুহম্মদ নে য়াদ কিয়া রে। শব্দ স্বরূপ হম বেগ গয়া রে।
মুঈ গউ হমনে তুরন্ত জীবাঈ। তব মুহম্মদ কৈ নিশ্চয় আঈ ॥
তুম কবীর অল্লাহ দর্বেশা। মোমিন মুহম্মদ কা গয়া অন্দেশা ॥
কহা মুহম্মদ সুন জিন্দা সাহেব। তুম অল্লাহ কবীর ঔর সব নায়ব ॥

"কুরআন শরীফ" এর সূরাহ ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ -তেও আছে, কুরআন শরীফের জ্ঞানদাতাকে হজরত মুহম্মদ আর সকল মুসলিম ধর্মের সর্ব শ্রদ্ধালুগণ তাদের আল্লাহ মানেন, তাঁকেই পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানেন। এই ৫২ থেকে ৫৯ নং আয়তগুলোতে কুরআনের জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, হে পয়গম্বর! হজরত মুহম্মদ! কুরআনের আয়তগুলিতে আমি তোমাকে যে জ্ঞান দিয়েছি, তুমি তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকবে। এই কবীরই হলেন আল্লাহ আর এই কাফির ওই আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না। তুমি এদের কথাতে আসবে না, এদের সাথে সংঘর্ষ (প্রতিবাদ) করবে, তবে ঝগড়া করবে না। হে পয়গম্বর! এই কবীর নামের আল্লাহ তিনিই আছেন, যিনি বংশগত ও বৈবাহিক সমন্ধ অনুসারে কাউকে পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু, শাশুড়ি, শ্বশুর ও নাতি ইত্যাদি বানিয়েছেন, তুমি ওই জিন্দার উপর ভরসা রাখবে। (যিনি তোমার সাথে কাবাতে সাক্ষাৎ করেছিলেন) তিনি বাস্তবে শাশ্বত (অবিনশ্বর) কাদির আল্লাহ আছেন, তিনি তাঁর নিজের ভক্তদের (বান্দাদের) গুনাহ (পাপ) ক্ষমা করে দেন, তিনিই হলেন কবীর আল্লাহ। এই কবীর আল্লাহ তিনি আছেন, যাঁর বর্ণনা বাইবেল গ্রন্থের উৎপত্তি গ্রন্থে রয়েছে, ওই পরমাত্মা ছয় দিনে আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সকল নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিন সিংহাসনের (তখ্‌ত/আরশ) উপর বিরাজমান হয়েছেন। তাঁর খবর (বিষয়) কোনো বাখবরের অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের (পূর্ণ গুরুর) কাছে জিজ্ঞাসা করো।

হজরত নবী মুহম্মদ গোশত (মাংস) খেতেন না :-

সন্ত গরীবদাস মহারাজ (গ্রাম - ছুড়ানী, জেলা - ঝজ্জর, হরিয়ানা নিবাসী) তাঁর অমৃত বাণীতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদ ও এক লাখ আশি হাজার অর্থাৎ বাবা আদম থেকে মুহম্মদ পর্যন্ত যাঁরা নবী হয়েছিলেন এবং সেই সময় হজরত মুহম্মদের যে মুসলমান অনুগামী ছিল, তারা কখনও মাংস খেতেন না, এমনকি গরুকেও কখনও হালাল (বিসমিল) করেননি।

গরীবদাসের বাণী নিম্নে:-

নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া। এক লাখ অস্সী কুঁ সৌগন্ধ, জিন নহীঁ কর্দ চলায়া॥
অর্স-কুর্শ মেঁ অল্লাহ তখ্‌ত হৈ, খালিক বিন নহীঁ খালী। বৈ পৈগম্বর পাখ পুরুষ থে, সাহিব কে অবদালী॥

ভাবার্থ :- সন্ত গরীবদাস তাঁর বাণীর মধ্যে বলেছেন, আমি নবী মুহম্মদকে সালাম করছি, তিনি (হজরত মুহম্মদ) তো পরমাত্মার রসুল (বার্তাবাহক) ছিলেন। ওই সময় হজরত মুহম্মদের এক লাখ আশি হাজার মুসলমান অনুগামী (ভক্তগণ) ছিলেন। এক লাখ আশি হাজার নবীও, বাবা আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত হয়েছিল। আমি (সন্ত গরীব দাসজী) শপথ করে বলছি যে, তাঁরা (এক লাখ আশি হাজার নবী ও তাঁদের অনুগামীগণ) ও হজরত মুহম্মদ, তাদের সকলের জ্ঞান হওয়ার পর কখনো কোনো জীবের শরীরে করদ (ছুরি) চালাননি অর্থাৎ কখনও জীব হিংসা করেননি এবং মাংসও খাননি।

আকাশের শেষ প্রান্তের (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব স্থানের) উপরে পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) বিরাজমান আছেন কিন্তু কোনো জীবই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নেই, তিনি সমস্ত জীবকে দেখেন। ওই পয়গম্বর (হজরত মুহম্মদ ও অন্যান্য) সকলেই পবিত্র আত্মা ছিলেন। তাঁরা পরমাত্মার কৃপাপাত্র ছিলেন।

সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজের বিচার :-

এই কথার প্রমাণ সন্ত জম্ভেশ্বর মহারাজও (বিষ্ণোই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা) দিয়েছেন। শব্দ সংখ্যা ১২ তে :-

মহমদ-মহমদ ন কর কাজী, মহমদ কা তো বিষম বিচারূ।
মহমদ হাথ করদ ন হোতী, লোহে ঘড়ী ন সারূ।
মহমদ সাথ পয়ম্বর সীধা, এক লাখ অস্সীহ হজারূঁ।
মহমদ মরদ হলালী হোতা , তুম হী ভএ মুরদারূঁ।

ভাবার্থ :- সন্ত জম্ভেশ্বর বলেছেন যে, হে কাজী! আপনারা যে ওই পবিত্র আত্মা মুহম্মদের নাম নিয়ে গরু ও অন্যান্য জীবদের হত্যা করেন, আপনারা তো নবি মুহম্মদকে বদনাম করছেন। তাঁর বিচার অত্যন্ত পবিত্র ছিল। আপনারা তাঁর বলা মার্গ থেকে ভ্রমিত হয়ে গেছেন, মুহম্মদের সাহেবের হাতে করদ (জীব হত্যা করার ছুরি যা লোহাকে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরী হয়) ছিল না। হজরত মুহম্মদের সাথে এক লাখ আশি হাজার পবিত্র মুসলমান অনুগামীরা ছিলেন। তারা ও হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত যত সব নবী হয়ে এসেছিলেন, তারা সহজ-সরল ও পবিত্র ন্যায়পরায়ণ নবী ছিলেন। হজরত মুহম্মদ তো শূরবীর, কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে খেতেন। আপনারাই হলেন মুরদারু (জীব হিংসা করা ব্যক্তি)। আপনারা ওই মহাপুরুষের অনুসারে, নিজেদের জীবন নিষ্পাপ করুন এবং জীব হিংসা করবেন না।

সন্ত জম্ভেশ্বরকে পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মার রূপে সমরাস্থলে দর্শন দিয়েছিলেন:-

বেদে যেমন প্রমাণ আছে যে, পরমাত্মা সত্যলোকে থাকেন, সেখান থেকে দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে প্রকট হন এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং তিনি কবিদের মতো আচরণ করে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন। যার কারণে, কবিদের মধ্যেও প্রসিদ্ধ এক কবি হন, তাই কবি উপাধি পান। পরমাত্মা গুপ্ত ভক্তির মন্ত্রকে উদ্ধৃত করেন, যা বেদ-কতেব ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অনুগ্রহ করে এই পুস্তকের 205 পৃষ্ঠায় ফটোকপিতে এই মন্ত্রগুলির অনুবাদ দেখুন।

প্রমাণ :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ২০ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৮২ মন্ত্র ১, ২, ঋগ্বেদ

মণ্ডল ৯ সূক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, ঋগ্বেদ ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ তে দেখুন।

যেমন পূর্বে লেখা হয়েছে যে, হজরত মুহম্মদ ও অন্যান্য অনেক মহাত্মাদের সঙ্গে পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মার রূপে দেখা করেছিলেন। একইভাবে মহাত্মা জম্ভেশ্বর মহারাজের সঙ্গে সমরাথল নামক স্থানে, পরমাত্মা জিন্দা সন্তের রূপে দেখা করেছিলেন।

প্রমাণ :- শ্রী জম্ভেশ্বরের বাণীর শব্দ সংখ্যা = ৫০ এর কিছু অংশ -

দিল-দিল আপ খুদায় বন্দ জাগ্যো, সব দিল জাগ্যো সোঈ।
জো জিন্দো হজ কাবৈ জাগ্যো, থল সির জাগ্যো সোঈ॥
নাম বিষ্ণু কৈ মুসকল ঘাতৈ, তে কাফর সৈতানী।
হিন্দু হোয় কা তীর্থ নহাবৈ, পিণ্ড ভরাবৈ, তেপণ রহা ইবাঁণী।
তুরক হোয় হজ কাবোঁ ধোকে, ভুলা মুসলমাণী।
কে কে পুরুষ অবর জাগৈলা, থল জাগ্যো নিজ বাণী।

ভাবার্থ :- শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ বলেছিলেন, যে পরমাত্মা জিন্দা মহাত্মার রূপে হজরত মুহম্মদের সাথে ওই সময় সাক্ষাৎ করেছিলেন, যে সময় নবী মুহম্মদ হজ করার জন্য মক্কায় নির্মিত মসজিদ কাবাতে গিয়েছিলেন। তাঁকে জাগ্রত করে বলেছিলেন যে, মন্দির মসজিদ ইত্যাদি তীর্থস্থানে চক্কর লাগালে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়না, পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্র জপ করা আবশ্যক। শ্রী জম্ভেশ্বর মহারাজ আরও বললেন যে, ওই পরমাত্মা একবার থল সির (রাজস্থান প্রান্তে সমরাথল) স্থানে এসে আমাকে জাগিয়েছিলেন। না জানি আরও কত মানুষ জাগবেন। এই কারণে আমাদের সমরাথল স্থান প্রসিদ্ধ হয়েছে। এটা আমার নিজের বাণী অর্থাৎ বিশেষ বার্তা। আমি আমার অনুভবের (নিজস্ব) যথার্থ বাণী বর্ণন করে সমরাথল বাসীদের মধ্যে পরমাত্মার প্রতি ভক্তির জাগরণ এনেছি। সত্য থেকে দূর হয়ে মুসলমানরা আজও পর্যন্ত কাবাতে হজ করতে যান, সেখানে প্রণাম করেন, পাথরকে সিজদা করেন, যা ব্যর্থ। এইপ্রকার হিন্দুরাও তীর্থে যান, ভূতের পূজা করেন, পিণ্ড দান করেন, এ সব হল ব্যর্থ সাধনা।

"মাংস আহারের বিষয়ে কুরআনের জ্ঞান দাতার নির্দেশ"

সূরাঃ অল্-মাইদা- ৫

আয়াত নং ১ :- হে মনুষ্যগণ! যারা ইমান এনেছো অর্থাৎ মুসলমান হয়েছো। বিধিনিষেধ গুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করো অর্থাৎ আমার বানানো মর্যাদার পালন করো।

তোমাদের ভোজনের জন্য চতুষ্পদ প্রজাতির সকল পশু হালাল (বৈধ্য) করা হয়েছে, তবে এগুলি ছাড়া অন্য যা তোমাদের পরে বলা হবে কিন্তু হারাম অবস্থায় শিকারকে নিজেদের জন্য হালাল (বৈধ্য) মনে করবে না। অতএব আল্লাহ যা চান, সেই আদেশই জারি করেন।

{যে চার পায়ের প্রাণীদেরকে খাওয়ার জন্য বৈধ্য বলা হয়েছে তা হল - উট, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।}

সূরাঃ আল্ মাইদা - ৫

আয়াত নং. ৩ :- তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ্য) করা হয়েছে। (অর্থাৎ যেসব খেলে পাপ হয়, সেসব পশুর কথা বলা হয়েছে) মৃতপশু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং ওই পশু যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য জবাই (মৃত পশু বা ভোগ লাগানো) করা হয়েছে। ওই পশু যা শ্বাস রুদ্ধ হয়ে অথবা ঠক্কর লেগে মরেছে বা উচ্চস্থান থেকে পড়ে মরেছে বা কোনো হিংস্র পশু চিরে-ফেঁড়ে দিয়েছে। এসব ছাড়া যেগুলিকে তোমরা জীবিত পেয়ে জবাই করোনি কিংবা যে পশুদের অন্য স্থানে জবাই করেছে অর্থাৎ যেস্থানে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে, এইসবও তোমাদের জন্য অবৈধ। এছাড়া পাসার (টচ করে) দ্বারা নিজের ভাগ্য নির্ণয় করা, উপরোক্ত এই সমস্ত কর্ম আদেশের উলঙ্ঘন।

সূরাঃ আল্ মোমিন- ৪০

আয়াত নং. ৭৯ :- আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এদের কারোর উপর চড়তে পারো এবং কারোর গোশত (মাংস) খেতে পারো।

"মানুষের ভোজনের জন্য সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও আদেশ"

বাইবেল গ্রন্থে উৎপত্তির বিষয়ে অধ্যায় ১-২ তে, উৎপত্তি ১:২৬ :- পরে পরমেশ্বর বললেন যে, আমি মনুষ্যকে আমার স্বরূপ অনুসারে, নিজের প্রতিমূর্তিতে বানিয়েছি এবং তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছ, আকাশের পাখিদের, গৃহপালিত পশুদের উপর এবং পৃথিবীর উপর সমস্ত বুকে ভর দিয়ে চলা যেসকল সরীসৃপ প্রাণী আছে, তাদের উপর অধিকার রাখবে। (২৬)

{অধিকার রাখার তাৎপর্য হল, পরমাত্মা মনুষ্যকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে বুদ্ধিমান বানিয়েছেন, যাতে সমস্ত প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ (বশ) করতে পারে। এগুলো খাওয়ার নির্দেশ নেই। }

১:২৭ :- অতঃপর পরমেশ্বর মনুষ্যকে তাঁর নিজের স্বরূপ অনুসারে উৎপন্ন করেছেন। নর-নারী রূপে তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করেছেন।

১:২৮ :- পরমেশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ দিলেন আর তাদের বললেন :- ফলপ্রসূ হও এবং সংখ্যাবৃদ্ধি কর আর পৃথিবীর উপর ভরে যাও।

"মনুষ্যদের ভোজনের জন্য নির্দেশ"

১:২৯ :- তারপর পরমেশ্বর তাদেরকে (মনুষ্যদের) বললেন, শোনো! বীজযুক্ত যত ছোট ছোট উদ্ভিদ (যেমন- জোয়ার, বাজরা, চাল, গম, ছোলা, ভুট্টা, কাজু, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি) পৃথিবীর উপর রয়েছে এবং বৃক্ষে যে সকল বীজযুক্ত ফল আছে (যেমন- আম, পেয়ারা, বেরি, কলা, আঙ্গুর ইত্যাদি), ওই সকল আমি তোমাদের দিয়েছি, সেগুলো তোমাদের ভোজনের জন্য।

১:৩০ :- আর পৃথিবীর যত পশু, আকাশের পাখি, পৃথিবীতে যত সরীসৃপ প্রাণী যারা বুকের উপর ভর দিয়ে চলে এবং যাদের প্রাণ আছে, তাদের সকলের ভোজনের জন্য সমস্ত সবুজ ছোট ছোট উদ্ভিদ দিয়েছি। এরপর তেমনই হয়ে গেল।

১:৩১ :- তখন পরমেশ্বর যা কিছু বানিয়েছিলেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন? আর দেখলেন, সমস্ত কিছুই খুবই উত্তম হয়েছে। সন্ধ্যা হল, পরে সকাল হল। এই প্রকার ষষ্ঠ দিন হয়ে গেল।

অধ্যায় ২ এর ২:২ :- এইভাবে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী আর উভয়ের মধ্যে সমস্ত কিছু রচনা সমাপ্ত হল আর পরমেশ্বর নিজ কার্য যা করছিলেন সপ্তম দিনে সমাপ্ত করলেন এবং তিনি নিজের সমস্ত কার্য হতে সপ্তম দিন বিশ্রাম নিলেন।

২:৩ :- আর পরমেশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ দিলেন এবং পবিত্র করে স্থায়ী করলেন, কেননা ওই দিন তিনি সৃষ্টির উৎপত্তি সমস্ত কর্ম হতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

বিশেষ :- মানুষের ভোজনের বিষয়ে এই আদেশ ওই আল্লাহর ছিল, যে আল্লাহর সম্পর্কে কুরআনের সূরা ফুরকান ২৫ এর আয়াত নং ৫২-৫৯ - তে বর্ণন করা হয়েছে যে, "কবীর আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি রচনা ছয় দিনে করেছেন। তারপর উপরের আকাশে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তাঁর খবর অর্থাৎ সম্পূর্ণ তথ্য কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্তের) কাছে জিজ্ঞাসা করো। (তাঁর থেকে জানো।)"

এই কাদির আল্লাহ (আল্লাহ তালা) হলেন সৃষ্টির রচনহার। তাঁর দ্বারা যা রচনা করার ছিল, তা তিনি ছয় দিনে করেছেন এবং প্রাণীদের যা ভোজনের জন্য আদেশ দেওয়ার ছিল, তা দিয়েছেন, আর সপ্তম দিনে তিনি উপর আকাশে নিজের আপন নিবাস স্থানে সিংহাসনের উপর বসেছেন। এই মানবদের (নর-নারী) মাংস খাওয়ার জন্য আদেশ পরমাত্মার নয়। তাঁর আদেশের অবহেলা করে, অন্যের আদেশ পালন করে যারা মাংস খায়, তারা পরমেশ্বরের বিধান ভঙ্গ করছে, তাদেরকে দণ্ড দেওয়া হবে।

বিশেষ :- বাইবেলের এই উক্তির দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টি রচনকারী নিজের বচন দ্বারা অনেক নর-নারী (মানুষ) উৎপত্তি করেছিলেন এবং বহু পশু-পাখি এবং পৃথিবী, মাটি ও জলের জীব-জন্তুদের উৎপত্তি করেছিলেন। যেমন বলা হয়েছে যে, {বাইবেল উৎপত্তি ১:২৫} ষষ্ঠ দিন :- এইভাবে পরমেশ্বর পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির বন্য-পশু ও বিভিন্ন প্রজাতির ভূমির উপরে বুকের উপরে ভর দিয়ে চলা সমস্ত প্রাণীদের বানিয়েছেন।

১:২৬-২৭ :- তখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে নিজের স্বরূপ অনুসারে সৃষ্টি করলেন এবং নারী-পুরুষ করে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন। বাইবেলে এরপরে যা বর্ণন করা হয়েছে, তা হল প্রলয় পরবর্তীর (বিষয়)। এর পর আমাদের মাংস না খাওয়ার প্রকরণটি বুঝতে হবে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মানুষকে মাংস খাওয়ার আদেশ পূর্ণ ব্রহ্ম (কাদির আল্লাহ/পরমেশ্বর) দেননি। মাংস খেলে পাপ হয়। এরপরে পড়ুন বিস্তৃত বর্ণন :-

কাদির আল্লাহর সিংহাসনে (তখত) চলে যাওয়ার পর, কাল ব্রহ্ম এরমধ্যে পুনরায় মানবের রচনা করলেন। এর বর্ণনা পরে পড়বেন। কাল ব্রহ্ম তাঁর নিজের তিন পুত্রকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) এই স্থানের সঞ্চালক বানিয়েছেন। মানুষের কর্ম অনুসার (যে যেমন কর্ম করবে তাকে সেইরকম) ফল তাদেরকে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন আর কালব্রহ্ম স্বয়ং গুপ্ত থাকেন।

এরপরে এই পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলে কিছু স্থানে মাংস খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে, তবে সেই নির্দেশ ওই পূর্ণ ব্রহ্মের (Complete God/কাদির আল্লাহ) নয়। এই প্রকার পবিত্র বাইবেলে ও পবিত্র কুরআনের কোনো স্থানে যদি মাংস খাওয়ার নির্দেশ থাকে, তাহলে তা পূর্ণ ব্রহ্মের আদেশ নয়, সেই কারণে এই আদেশ আমরা মানব না।

"সূক্ষ্মবেদে (কলাম-এ- কবীর) কাদির আল্লাহর নির্দেশ"

হজরত মুহম্মদ যে সাধনা করতেন, সেই সাধনা অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়রাও করছেন। বর্তমানে সকল মুসলমান শ্রদ্ধালুগণ মাংসও খাচ্ছেন কিন্তু নবী মুহম্মদ কখনও মাংস খাননি আর না তাঁর সহজ-সরল অনুগামীরা (এক লাখ আশি হাজার অনুসারী) মাংস খেয়েছেন। তাঁরা কেবল রোজা, বংগ ও নামাজ করতেন। গরু ও অন্যান্য পশুদের বিসমিল (হত্যা) করতেন না।

নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া।
এক লাখ অস্সী কুঁ সৌগন্ধ, জীন নহীঁ কর্দ চলায়া॥
অর্শ কুর্শ পর অল্লাহ তখ্‌ত হৈ, খালিক বিন নহীঁ খালী।
বৈ পৈগম্বর পাক পুরুষ থে, সাহিব কে অবদালী॥

ভাবার্থ :- নবী মুহম্মদ তো আদরণীয়, যাঁকে প্রভুর অবতার বলা হয়েছে। ওই এক লাখ আশি হাজার পয়গম্বর যারা হয়েছিলেন এবং যারা তাদের অনুগামীরা ছিলেন, তাদের কসম রইল যে, তারা কখনও ছাগল, মুরগি, গরু ইত্যাদি জীবদের উপর করদ (ছুরি) চালাননি অর্থাৎ জীব হিংসা করেননি এবং মাংস ভক্ষণও করেননি। ওই হজরত মুহম্মদ, হজরত মূসা, হজরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) প্রমুখ নবীগণ (সন্দেহবাহক) তো পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন/কাল) কৃপাপাত্র ছিলেন কিন্তু আকাশের অন্তিম প্রান্তে (সতলোক) যে পূর্ণ পরমাত্মা (আল্লাহু আকবর/আল্লাহ কবীর) আছেন, ওই সৃষ্টিকর্তা মালিকের দৃষ্টি হতে কেউ রেহাই পায় না।

মারী গউ শব্দ কে তীরম্, ঐসে থে মোহম্মদ পীরম্॥
শব্দে ফির জিবাঈ, হংসা রাখ্যা মাংস নহী ভাখ্যা, ঐসে পীর মুহম্মদ ভাঈ॥

ভাবার্থ :- এক সময় নবী মুহম্মদ শব্দ (বচন সিদ্ধি) শক্তি দ্বারা একটি গাভীকে হত্যা করে সকলের সামনে জীবিত করে দিয়েছিলেন। তিনি গরুর মাংস আহার করেননি। বর্তমান মুসলিম সমাজ বাস্তবিকতার সাথে পরিচিত নয়। যেদিন গরুকে জীবিত করা হয়েছিল, সেই দিনটিকে মনে রাখার জন্য গরুকে মারেন। আপনারা জীবিত যদি না করতে পারেন, তাহলে মারার অধিকারও আপনাদের নেই। আপনারা মাংসকে প্রসাদ রূপে জেনে খাচ্ছেন এবং অন্যদের খাওয়াচ্ছেন। আপনারা নিজেরাও পাপের অংশীদার হচ্ছেন এবং অনুগামীদেরও ভ্রমিত করে দোজখের (নরক) পাত্র বানাচ্ছেন।

কবীর, মাংস অহারী মানঈ, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জানি। তাকী সঙ্গতি মতি করৈ, হোই ভক্তি মেঁ হানি॥১॥
কবীর, মাঁস খাঁয় তে ঢেড় সব, মদ পিবেঁ সো নীচ। কুল কে দুরমতি পর হরৈ, রাম কহৈ সো উঁচ॥২॥
কবীর, মাঁস ভখৈ ঔর মদ পিয়ে, ধন বেশ্যা স্যোঁ খায়। জুআ খেলৈ চোরী করৈ, অন্ত সমুলা জায়॥৫॥
মাংস মাঁস সব এক হৈ, মুরগী হিরনী গায়। আঁখি দেখি নর খাত হৈ, তে নর নরকহিঁ জায়॥৬॥
কবীর, য়হ কুকর কো ভক্ষ হৈ, মনুষ দেহ ক্যোঁ খায়। মুখ মেঁ আমিখ মেলিকে, নরক পরঙ্গে জায়॥৭॥
কবীর, পাপী পূজা বৈঠিকৈ, ভখৈ মাঁস মদ দোই। তিনকী দীক্ষা মুক্তি নহিঁ, কোটি নরক ফল হোই॥১০॥
কবীর, জীব হনৈ হিংসা করৈ, প্রগট পাপ সির হোয়। নিগম পুনি ঐসে পাপ তেঁ, ভিস্ত গয়া নহিঁ কোয়॥১৪॥
কবীর, তিলভর মছলী খায়কে, কোটি গউ দে দান। কাশী করৌঁত লে মরৈ তৌ ভি নরক নিদান॥১৬॥
কবীর, বকরী পাতী খাত হৈ, তাকী কাটী খাল, জো বকরী কো খাত হৈ, তিনকা কৌন হবাল॥১৮॥
কবীর, মুল্লা তুঝৈ করীম কা, কব আয়া ফরমান। ঘট ফোরা ঘর ঘর বাঁটা, সাহবকা নীসান॥২১॥
কবীর, কাজী কা বেটা মুয়া, উর মেঁ সালৈ পীর। বহ সাহেব সবকা পিতা, ভলা ন মানৈ বীর॥২২॥
কবীর, পীর সবন কো একসী, মুরখ জানৈঁ নাহিঁ। অপনা গলা কটায় কে, ক্যোঁ ন বসো ভিশ্ত কে মাহিঁ॥২৩॥
কবীর, মুরগী মুল্লা সে কহৈ, জবহ করত হৈ মোহিঁ। সাহব লেখা মাঁগসী, সঙ্কট পরি হৈ তোহি॥২৪॥
কবীর, জোর করি জবহ করৈ, মুখ সে কহৈ হলাল। সাহব লেখা মাঁগসী, তব হোসি কৌন হবাল॥২৮॥
কবীর, জোর কীয়াঁ জুলুম হৈ, মাঁঙ্গে জবাব খুদায়। খালিক দর খুনী খড়া, মার মুহী মুঁহ খায়॥২৯॥
কবীর, গলা কাটি কলমা ভরৈ, কীয়া কহৈ হলাল। সাহব লেখা মাঙ্গসী, তব হোসী জবাব-সবাল॥৩০॥
কবীর, গলা গুসা কা কাটিয়ে, মীয়াঁ কহর কো মার। জো পাঁচু বিস্মিল করৈ, তব পাবৈ দীদার॥৩১॥
কবীর, য়ে সব ঝুঠী বন্দগী, বেরিয়া পাঁচ নমাজ। সাঞ্চহি মারৈ ঝুঠ পড়ি, কাজী করৈ অকাজ॥৩২॥
কবীর, দিন কো রোজা রহত হৈঁ, রাত হনত হৈ গায়। য়হ খুন বহ বন্দগী, কহুঁ ক্যোঁ খুশী খুদায়॥৩৩॥
কবীর, কবিরা তেঈ পীর হৈঁ, জো জানৈ পর পীর। জো পর পীর ন জানি হৈ, সো কাফির বেপীর॥৩৬॥
কবীর, খুব খানা হৈ খিচড়ী, মাঁহী পরী টুক লৌন। মাঁস পরায়া খায় কে, গলা কটাবৈ কৌন॥৩৭॥
কবীর, কহতা হুঁ কহি জাত হুঁ, কহা জো মান হমার। জাকা গলা তুম কাটি হো, সো ফির কাটৈ তুমহার ॥৩৮॥
কবীর, হিন্দু কে দয়া নহী, মিহর তুরক কৈ নাহিঁ। কহৈ কবীর দোনুঁ গয়া, লখ চৌরাসী মাহিঁ॥৩৯॥
কবীর, মুসলমান মারৈ করদ সে, হিন্দু মারে তরবার। কহৈ কবীর দোনুঁ মিলি, জৈহেঁ জম কে দ্বার॥৪০॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে কবীর খুদা (পরমেশ্বর) বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি মাংস খায়, মদ্যপান করে, সৎসঙ্গ শুনেও মন্দকর্ম ত্যাগ করে না, উপদেশ গ্রহণ করে না, তাকে তো সাক্ষাৎ রাক্ষস বলে জানবে। অজান্তে ভুল না জানি কার দ্বারা না হয়। যদি ওই খারাপ কর্ম করা ব্যক্তি, সৎসঙ্গের বিচার শুনে খারাপ কর্ম ত্যাগ করে, ভগবানের ভক্তি করতে শুরু করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি নেক আত্মা, তাতে তিনি যে জাতির বা যে ধর্মেরই হোক না কেন। যারা মাংস ভক্ষণ করে না ও মদ্য পানও করে না কিন্তু ভগবানের ভক্তি করে না, সে হতভাগ্য নীচ প্রকৃতির ব্যক্তি, তাতে সে যে জাতি বা ধর্মের হোক না কেন। ভাবার্থ হল, উচ্চ কর্মের ব্যক্তি উচ্চ হয় আর নীচ কর্মের ব্যক্তি নীচ হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জন্মসূত্রেই কেউ উচ্চ-নীচু হয় না। যে ভক্তগণ নামদিক্ষা (উপদেশ) নিয়ে রেখেছেন, তাদের উপরোক্ত নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিদের কাছে বসা উচিৎ নয়, কারণ তাহলে আপনার ভক্তিতে বাধা পড়ে যাবে। (সাখী ১-২)

যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে, মদ্য পান করে আর যে স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি করে এবং যে ব্যক্তি এদের দ্বারা ব্যবসা করিয়ে ধন উপার্জন

করে এবং যে জুয়া খেলে, চুরি করে, এই প্রকারের মানব যদি বোঝানোর পরও না বোঝে, তাহলে তারা তো মহাপাপের ভাগীদার হবে এবং ঘোর নরকে পড়বে। (সাখী ৫)

গরু, হরিণ, মুরগী ইত্যাদি যে কোনো প্রাণীরই মাংস হোক না কেন, যে ব্যক্তি খায়, সে জাহান্নামের অংশীদার হবে। যে ব্যক্তি অজান্তে মাংস খায় (যেমন আপনি কোনো আত্মীয়ের ঘরে গিয়েছেন, আপনি জানেন না সবজি না মাংস দিয়েছে আর না জেনে আপনি তা খেয়ে নিয়েছেন) তাহলে আপনি দোষী হবেন না, তবে ভবিষ্যতে খুব সতর্ক থাকবেন। যে ব্যক্তি চোখে দেখা সত্ত্বেও খায়, তারা অপরাধী। এই মাংস তো কুকুরের আহার, মানব শরীরধারীদের জন্য বর্জিত। (সাখী ৬ - ৭)

যে গুরুজন মাংস ভক্ষণ করেন এবং মদ্য পান করেন, সেই গুরুর নিকট হতে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করা ব্যক্তিদের মুক্তি হয় না, অতএব এর কারণে মহা নরকের ভাগী হবে। (সাখী ১০)

যারা পশুদের প্রতি হিংসা করে (তাতে গরু, শূকর, ছাগল, মুরগী, মানুষ ইত্যাদি যেকোনো প্রাণীকে স্বার্থপরতার জন্য হত্যা করে) তারা মহাপাপী, (যদিও তারা পূর্ণ সন্তের থেকে পূর্ণ পরমাত্মার নাম দীক্ষা প্রাপ্তি করুক না কেন) তারা কখনও মুক্তি লাভ করতে পারে না। (সাখী ১৪)

অতি সামান্য অংশও (তিল পরিমাণও) যদি কেউ মাংস খেয়ে ভক্তি করেন আর সে যদি কোটি কোটি গরুও দান করেন, এর পরেও সেই সাধকের সাধনাও ব্যর্থ হবে জানবেন। মাংসাহারী ব্যক্তি যদি কাশীতে গিয়ে করৌত দ্বারা গলাও ছেদন করান, তা সত্ত্বেও তিনি নরকেই যাবেন।

(**বিঃদ্র :-** কাশী/বেনারসের হিন্দুদের স্বার্থপরায়ণ গুরুরা ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রম ছড়িয়ে রেখেছিলেন যে, কাশীতে যে মারা যায় সে স্বর্গে যায়। সেখানে যখন অধিক ভিড় হতে লাগল তখন আরেকটি মারাত্মক পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, যারা শীঘ্রই স্বর্গে যেতে চান, তাদের জন্য গঙ্গার তীরে একটা করৌত ভগবানের দ্বারা পাঠানো হয়েছে, তার দ্বারা গর্দান (গলা) কাটালে, স্বর্গের কপাট (দরজা) খুলে যায়। ওই স্বার্থপর গুরুরা মানুষ হত্যার জন্য হাতল খুলে দিয়েছিল। শ্রদ্ধালু ভক্তরাও আত্মকল্যাণের জন্য সেখানে গর্দান (গলা) কাটানোর জন্যও স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু জ্ঞানহীন গুরুদের দ্বারা বলা সাধনাতেও তাদের কোনো লাভ হয়নি। এইজন্য বলা হয়েছে যে, মাংসভোজী ব্যক্তি যতই ভক্তি, দান, পুণ্য ও বলিদান করুক না কেন, তাতে তার কোনো লাভ হয় না। (সাখী ১৬)। যে ছাগলটিকে আপনারা মেরে ফেললেন, সে তো কেবল ঘাস, পাতা ইত্যাদি খেয়ে নিজের পেট ভরতো। এই কালের লোকে এই প্রকার নিরামিষভোজী সরল পশুকেও হত্যা করে মেরে ফেলা হয়, তাহলে যারা ছাগলের মাংস খায়, তাদের তো আরও খারাপ অবস্থা হবে। (সাখী ১৮)

পশুদেরকে হালাল, বিসমিল ইত্য়াদি করে মাংস খাওয়া ও প্রসাদ রূপে বিতরণ করার আদেশ দয়ালু (করিম) প্রভুর থেকে কবে প্রাপ্ত হয়েছে? (কেননা পবিত্র বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থে পূর্ণ পরমাত্মা ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিরাজমান হয়েছিলেন এবং সমস্ত মানুষের ভোজনের জন্য আদেশও দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের ভোজনের জন্য ফলযুক্ত বৃক্ষ ও বীজযুক্ত উদ্ভিদ দিয়েছি। তাহলে পুনরায় ওই করিমের (করুণাময় পূর্ণ পরমাত্মার) পক্ষ থেকে কখন ভোজনের আদেশ হল? তা কোন কুরআনে লেখা আছে? পূর্ণ পরমাত্মা সমস্ত মানুষ ইত্যাদি সকল রচনা করে, ব্রহ্মকে (যাকে অব্যক্ত বলা হয়, যিনি কখনও কারোর সামনে উপস্থিত হন না, গোপনে গোপনে কাজ করেন ও অন্যকে করাতে থাকেন) দিয়েছিলেন। পরে পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরআন শরীফ (মজিদ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে, যে বিবরণ দেওয়া আছে, তা ব্রহ্মের (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনের) ও তাঁর ফেরেশতা ও ভূত - প্রেতাত্মাদের পক্ষ থেকে সেই সব আদেশ ছিল। এই আদেশ করিম অর্থাৎ দয়ালু পূর্ণ ব্রহ্ম (আল্লাহু কবীরু) নয়। ওই পূর্ণ ব্রহ্মের আদেশের অবহেলা কোনো ফেরেশতারা, ব্রহ্ম ও অন্যান্য কেউ যদি করে, তাহলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।)

উদাহরণ :- এক সময় এক ব্যক্তির বন্ধুত্ব থানার এক দারোগার সাথে হয়। সেই ব্যক্তি তার দারোগা (S.H.O) বন্ধুকে নালিশ জানিয়ে বলে যে, আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব বিরক্ত করে। তখন দারোগা (S.H.O.) বন্ধু বললেন, ওকে লাঠি দিয়ে মারো, পরে আমি সব বুঝে নেব। থানার বন্ধুর আদেশ পাওয়া মাত্রই, ওই ব্যক্তি বাড়িতে গিয়ে ওই প্রতিবেশীর মাথায় বড় এক লাঠি দিয়ে বারি মারলেন। সেই লাঠির আঘাতে প্রতিবেশী মারা যায়। একই এলাকার অফিসার হওয়ায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বন্ধুকে ধরে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। পরে সেই ব্যক্তি মৃত্যু দন্ডের শাস্তি পেলেন, কিন্তু তার দারোগা বন্ধু তার ওই বন্ধুকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না॥ কেননা রাজার সংবিধানে আছে যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়। ওই অজ্ঞান ব্যক্তি তার দারোগা বন্ধুর আজ্ঞা পালন করার কারণে, এক হিসাবে ওই দেশের রাজার সংবিধান ভঙ্গ (অবহেলা) করেছিলেন, যার কারণে তাকে তার জীবন অকালে হারাতে হল।

ঠিক এইপ্রকার পূর্ণ পরমাত্মার আজ্ঞা অমান্য করা ব্যক্তি পাপের ভাগী হবে। কেননা কুরআন শরীফের (মজিদ) সমস্ত জ্ঞান ব্রহ্মের (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জন, যাকে নিরাকার বলা হয়) দেওয়া জ্ঞান। এরমধ্যে তাঁরই আদেশ আছে আর পবিত্র বাইবেলে কেবল উৎপত্তি গ্রন্থের প্রারম্ভে, পূর্ণ প্রভুর আদেশ আছে। পবিত্র বাইবেলে হজরত আদম ও তাঁর স্ত্রী হব্বাকে (হেবাকে) ওই পূর্ণ পরমাত্মা বানিয়েছেন। বাবা আদমের বংশের সন্তান হল হজরত ইস্রাইল, রাজা দাউদ, হজরত মূসা, হজরত ঈসা ও হজরত মুহম্মদ প্রমুখদের মানা হয়। পূর্ণ পরমাত্মা তো ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সমস্ত কতেবগুলোর

(কুরআন শরীফ ইত্যাদি) জ্ঞান ব্রহ্মের (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জন) প্রদান করা। পবিত্র কুরআনের জ্ঞানদাতা স্বয়ং বলছেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা যাঁকে করীম আল্লাহ বলা হয়, তাঁর নাম হল কবীর। কেবল তিনিই ইবাদতের যোগ্য। তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি বিধির বিষয়ে জানতে হলে, কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্ত) কাছে জিজ্ঞাসা করো। এর থেকে প্রমাণিত হয়, যে জ্ঞান কুরআন শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থের রয়েছে, তা পূর্ণ প্রভুর নয়। (সাখী ২১

যখন কাজীর ছেলের মৃত্যু হয়, তখন কাজীর কত কষ্ট পায়। পূর্ণব্রহ্ম (আল্লাহ কবীর) হলেন সকলের পিতা, তাহলে তাঁর প্রাণীদের মারা ব্যক্তির উপর আল্লাহ তালা খুশী হন না। (সাখী ২২)

ব্যাথা সকলের একরকমই হয়। যদি ছাগল ইত্যাদির গলা কেটে হালাল করেছি বলো, তাহলে কাজী ও মোল্লা নিজের গলা কেটে হালাল করেছি, কেন বলেন না? অর্থাৎ নিজের জীবন প্রিয় লাগে, তাহলে ছাগলের জীবন কি প্রিয় নয়? (সাখী ২৩)

যে সময় ছাগলকে মোল্লা হত্যা করে, তখন ওই বাক্যহীন প্রাণীটি চোখে জল ভরে ম্যা-ম্যা করে বোঝাতে চায় যে, হে মোল্লা! আমাকে মেরে পাপের ভাগী হয়ো না। পরমেশ্বরের দরবারে ন্যায় অনুসারে হিসাব লেখা হবে, ওই সময় তোমাকে অনেক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হবে। (সাখী ২৪)

বলপূর্বক (জোর-জুলুম) নির্দয়তাভাবে ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীদেরকে হত্যা করছেন আর বলছেন যে, হালাল করেছি। এই দুইরকমের নীতির জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট ভুগতে হবে। কাজী-মোল্লা ও যে কোনো জীব হিংসা করা ব্যক্তি পূর্ণ প্রভুর বিধানের উলঙ্ঘন করছেন, তাকে ধর্মরাজের দরবারে দাঁড়িয়ে রেখে পেটানো হবে। যদি হালাল করারই এতো সখ থাকে, তাহলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ইত্যাদিকে করো।

পাঁচ সময়ের নামাজও পড়েন এবং রমজান মাসের দিনে রোজাও (ব্রত) রাখেন আর সন্ধ্যা হলেই গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদিকে মেরে মাংস খাচ্ছেন। একদিকে তো পরমাত্মার স্তুতি করছেন এবং অন্যদিকে আপনি তাঁরই প্রাণীকে হত্যা করছেন। এমন প্রভু কি করে খুশি হতে পারেন? অর্থাৎ আপনি নিজেও পাপের ভাগী হচ্ছেন এবং অনুগামীদেরও (সাহেবাও) ভ্রমিত করার অপরাধে দোষী হয়ে জাহান্নামে পড়বেন। (সাখী ২৮ থেকে ৩৩)

কবীর পরমেশ্বর বলছেন যে, হে কাজী! হে মোল্লা! নিজেকে তো পীর (গুরু) বলছেন কিন্তু পীর তো তিনিই হন, যিনি অন্যের কষ্ট (পীড়া) বোঝেন, তাকে সঙ্কটে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেন, কাউকে কষ্ট দেন না। যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী হন না, তিনিই কাফির (অবজ্ঞাকারী) বেপীর (নিষ্ঠুর) আছেন। তিনি পীরের (গুরুর) উপযুক্ত নন। (সাখী ৩৬)

সবচেয়ে ভালো খাবার হল লবণ দেওয়া স্বাদযুক্ত খিচুড়ি তা ভোজন করো। যে অন্যের গলা কাটে, তাকে তার প্রতিশোধ দিতে হয়। এটা জেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিফল স্বরূপ নিজের গলা কাটাবেন না। উভয় ধর্মের পথপ্রদর্শকরা নির্দয় হয়ে গেছেন। হিন্দুদের গুরুরা বলেন যে, আমরা তো এক ঝট্‌কাতে ছাগল ইত্যাদির গলা কাটি, যার কারণে প্রাণীর কষ্ট হয় না, এইজন্য আমরা দোষী নই আর মুসলিম ধর্মের পথপ্রদর্শকরা বলেন যে, আমরা তো ধীরে ধীরে হালাল করি, যার কারণে আমরা অপরাধী নই। পরমাত্মা কবীর সাহেব বললেন, যদি আপনার কিংবা আপনাদের পরিবারের কোনো সদস্যদের গলা যে কোনো পদ্ধতিতে কাটা হয়, তাহলে আপনাদের কেমন লাগবে? (সাখী ৩৭ থেকে ৪০)

বাত করতে হৈঁ পুণ্য কী, করতে হৈঁ ঘোর অধর্ম। দোনো দীন নরক মে পড়হী, কুছ তো করো শর্ম॥

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন :-

হম মুহম্মদ কো সতলোক লে গয়া। ইচ্ছা রূপ বহাঁ নহীঁ রহয়ো।
উল্ট মুহম্মদ মহল পঠায়া, গুজ বীরজ এক কলমা লায়া॥
রোজা বংগ, নামাজ দই রে, বিসমিল কী নহীঁ বাত কহী রে।

ভাবার্থ :- আমি (কবীর আল্লাহ) নবী মুহম্মদকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে তিনি না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাই মুহম্মদকে সশরীরে ফেরত পাঠালাম। নবী মুহম্মদ পর্দার আড়াল থেকে কাল ব্রহ্মের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন, ওই আদেশে কাল (ব্রহ্মাও) রোজা (ব্রত), বংগ (উচ্চ স্বরে প্রভুর স্তুতি করা) এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়তে তো বলেছিলেন। কিন্তু গরু ইত্যাদি প্রাণীদের বিসমিল (হত্যা) করতে বলেননি। কুরআনে পরে ফেরেশতাদের আদেশ লেখা হয়েছে, এটা মহাপাপ।

"পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে প্রবেশ করার পূর্বে"

পবিত্র গ্রন্থ কুরআনকে বোঝার জন্য কিছু প্রধান বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক : -

(১). :- কুরআন মজিদের জ্ঞান প্রদান (নাজিল) করা খুদা আমাদের নবী-এ-করিম মুহম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির উৎপত্তি করা কাদির আল্লাহর সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দেননি।

প্রমাণ :- সূরাঃ ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫৯ - এ লেখা আছে, (হে মুহম্মদ!) কাদির আল্লাহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপরে আকাশে উর্ধ্বে সিংহাসনের (তখ্‌ত) উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তাঁর বিষয়ে (তথ্য) কোনো পূর্ণ জ্ঞানীর (বাখবরের) অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্তের নিকটে জিজ্ঞাসা করো। (জেনে নাও)

(২). :- সূরাঃ আশ শূরা- ৪২ আয়াত নং ১-২, তে সাঙ্কেতিক (কোড ওয়ার্ড) শব্দ রয়েছে। ওই জ্ঞান কোনো মুসলমানের জানা

নেই, যা অতি গুরুত্ব পূর্ণ। আয়াত নং ১ :- "হা. মীম্ , ঔন, সীন. কাফ." এই অক্ষরগুলি লেখা রয়েছে। যা হল কেবল জপ করার নাম (মন্ত্র)। নামের জপ বিনা জীবের (মানবের) কল্যাণ সম্ভব নয়।

(৩). :- নবী মুহম্মদের সঙ্গে কুরআনের জ্ঞানদাতা খুদার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়নি। পর্দার আড়ালে থেকে নামাজ ইত্যাদি করার হুকুম হয়েছিল।

(৪). :- নবী মুহম্মদকে কুরআন মজিদের জ্ঞান, ভয় ও ধমক দিয়ে নাজিল (প্রকাশিত) করা হয়েছিল। নবী মুহম্মদ (স.) বলেছিলেন যে, জিব্রাইল ফেরেশতা তাঁকে শ্বাসরোধ করে (গলা চেপে ধরে) কুরআনের জ্ঞান পড়তে বাধ্য করেছিলেন। তৃতীয়বার যখন আমার গলা চেপে ধরেছিলেন, তখন তো মনে হয়েছিল যে, এইবার বুঝি আমার প্রাণ বেরিয়েই যাবে। এই প্রকারের ওহী (খুদার বার্তা) যখন আসত, তখন নবী সাহেবের অনেক কষ্ট হত। এই ওহী (খুদার বার্তা) যখন আসত, তখন ঘণ্টা বাজতে শোনা যেত। নবী মুহম্মদ বলেছিলেন যে, আমার অনেক কষ্ট হতো।

(৬) :- নবী মুহম্মদের অন্তিম মেরাজ (আকাশ যাত্রা) সত্য, যা এই প্রকার :-

পবিত্র কুরআন মজিদের অমৃতজ্ঞান পাক আত্মা হজরত মুহম্মদ প্রাপ্ত করেছিলেন। হজরত মুহম্মদ ছিলেন, তাই কুরআনের জ্ঞান আজ আমাদের মাঝে রয়েছে। এইজন্য নবী মুহম্মদের অনুভব কুরআন মজিদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আল্লাহর রসূল মুহম্মদের জীবনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে, যা এই প্রকার :-

একদিন সকালে নবী মুহম্মদ তার সঙ্গীদের কাছে নিজের ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন যে, আজ রাতে ফেরেশতা জিব্রাইল এসেছিলেন। আমার বক্ষ বিদীর্ণ (চিরে) করে পবিত্র বস্তুটি প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং তারপরে আগের মতোই (বন্ধ) করে দিলেন। অতঃপর আমাকে বুরাক (খচ্চরের মতো) নামের পশুর উপর বসিয়ে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। প্রথম আকাশের উপর জান্নাতে (স্বর্গ) নিয়ে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি জান্নাত (স্বর্গ) ও জাহান্নামের (নরক) মধ্যবর্তী স্থানে বসে ছিলেন। জান্নাতের (স্বর্গ) দিকে যখন মুখ ঘুরাতেন, তখন খিল-খিল করে হাসতেন আর যখন জাহান্নামের (নরক) দিকে তাকাতেন, তখন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। এই দৃশ্য দেখে আমি (নবী মুহম্মদ) ফেরেশতা জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাইল! এই ব্যক্তিটি কে? এবং ডান দিকে যখন মুখ করে তাকাচ্ছেন, তখন হাসছেন আর বাম দিকে যখন দেখছেন, তখন কাঁদছেন, এর কারণ কী?

জিব্রাইল ফেরেশতা বললেন যে, ইনি হলেন সকল মনুষ্যের পিতা হজরত আদম। বাম দিকে দোজখ (নরক) আছে, যে নরকে তাঁর খারাপ কর্ম করা সন্তানরা রয়েছে, তারা দোজখে কষ্ট ভোগ করছে, যারা আল্লাহর বলা ভক্তির পথ অনুসরণ করে চলেনি। তাদেরকে দুঃখী দেখে কাঁদেন এবং ডানদিকের জান্নাত রয়েছে, যেখানে তাঁর ওই সন্তানরা রয়েছে, যারা আল্লাহর বলা আদেশ অনুসারে ইবাদত করেছিল, তাই তারা মহাসুখে রয়েছে, তাদেরকে দেখে খুশিতে হাসেন। হজরত মুহম্মদ পরে একথাও বলেছেন যে, আমি যখন জিব্রাইলের সাথে হজরত আদমের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, এসো পাক নবী! সুপুত্র! এই কথা বলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সর্বসাধারণের অগ্রগতি করার আশীর্বাদ দিলেন। তারপর জিব্রাইল ফেরেশতা আগে আমাকে জান্নাতের এমন স্থানে (দ্বিতীয় আকাশে) নিয়ে গেলেন, যেখানে নবীদের মন্ডলী বসেছিলেন। হজরত দাউদ, হজরত মূসা, হজরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) প্রমুখের মতো এক লাখ আশি হাজার নবী মণ্ডলীগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বিশেষ সম্মান দিয়েছিলেন। আমি তাদের সবাইকে নামাজ পড়িয়েছিলাম। এরপর জিব্রাইল আমাকে উপরে যেতে বললেন এবং জিব্রাইল ও বুরাক উভয়েই সেখানেই রয়ে গেলেন। আমি একা (নবী মুহম্মদ) সিঁড়ি দিয়ে উপরে চড়লাম। অতঃপর পর্দার আড়াল থেকে এক আওয়াজ এলো যে, প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ করবে এবং তোমার অনুগামীদেরও করাবে। রোজা রাখ, আজান (বংগ) লাগাও, যেতে আদেশ দিলেন। আমি পরে ওই স্থানে ফিরে এলাম, যে স্থানে সমস্ত নবী মণ্ডলীগণ বসেছিলেন। হজরত মূসা আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আল্লাহ কি হুকুম করেছেন? আমি (হজরত মহম্মদ) বললাম, আমাকে ও আমার সম্প্রদায়কে দিনে পঞ্চাশবার নামাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রোজা (ব্রত) ও আজানও (বংগ) লাগাতে বলেছেন। এরপর হজরত মূসা বললেন, প্রতিদিন পঞ্চাশ বার নামাজ সম্প্রদায়রা করতে পারবে না, কিছু কম করাও। পুনরায় যাও, প্রার্থনা করো। শেষ পর্যন্ত কম করাতে-করাতে কেবল পাঁচ সময়ের নামাজ পড়ার নির্দেশ পেলেন। রোজা ও আজানও করতে বলা হয় (যা বর্তমানে করা হচ্ছে)। নবী মুহম্মদ আরও বললেন যে, জান্নাতের দৃশ্য দেখানোর জন্য জিব্রাইল ফেরেশতা আমাকে জান্নাতের অনেক স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানকার শোভা ছিল অপূর্ব। সেখানে অনেক পবিত্র আত্মারা নিবাস করছেন। এরপরে জিব্রাইল আমাকে পুনরায় বুরাকের উপর বসিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে গেলেন। তখন তিনি সত্য ঘটনাটি বলেছিলেন। জান্নাত ও জাহান্নাম যা কিছু বর্তমানে আছে, তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী (Eye Witness) হলেন নবী মুহম্মদ স্বয়ং।

মৌলবী সাহেবরা যুক্তি দেন যে, হজরত আদম বাম দিকের দুষ্টু-সন্তানদের কর্ম দেখে কাঁদছিলেন এবং ডানদিকে পবিত্র সন্তানদের কর্ম দেখে হাসছিলেন। তাঁর (হজরত আদমের) সন্তানরা তো কবরে রয়েছে। লেখকের যুক্তি-তর্ক এই যে, আপনাদের নিয়ম অনুসারে তো হজরত আদম থেকে হজরত ঈসা পর্যন্ত সবাইকে তো কবরে থাকা উচিৎ ছিল, যাদেরকে নবী মুহম্মদ উপরের জান্নাতে দেখেছিলেন, কথাও বলেছিলেন আর তাদের নামাজ পড়িয়েছিলেন আর আদম জী কি ভালো-মন্দ কর্মকে দেওয়ালের উপর দেখে হাসছিলেন ও কাঁদছিলেন? তাঁর ডান দিকে জান্নাত ছিল আর বাম দিকে জাহান্নাম ছিল। তার সন্তানরাও জান্নাতে ও জাহান্নামে ছিল।

অন্য প্রমাণ :- আকাশ যাত্রার (মেরাজ) পরে হজরত মুহম্মদকে তার চাচা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমার ঠাকুরদাদাকেও দেখেছিলে? তিনি জান্নাতে, না জাহান্নামে ছিলেন? মুহম্মদ সাহেব বললেন, জাহান্নামে দেখেছি। এই শুনে তার চাচা মুহম্মদের উপর খুব রেগে গেলেন আর বললেন, তুই আমার পিতাকে জাহান্নামে বলছিস? মিথ্যাবাদী। নবী জী বললেন, আমি যা দেখেছি তাই বলেছি। এরপর মুহম্মদের চাচা সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। তবে সত্য এটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাবা আদমের ভাল-মন্দ সন্তানদের জান্নাতে ও দোজখে দেখেছিলেন।

"জন্ম ও মৃত্যুর উপর বিবেচনা"

"ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের দ্বারা বলা বিধান ভুল"

আমি (রামপাল দাস) ইসলামের প্রসিদ্ধ প্রচারক ও অন্যান্য অনেক মৌলবীদের সিদ্ধান্ত গুলোও পড়েছি। তারা বলেছেন, ইসলাম মানে না যে, জন্ম-মৃত্যু হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম যেমন বারংবার জন্ম ও বারংবার মৃত্যু, যেমনটা হিন্দু ধর্ম মানে। হিন্দুদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীমদভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ২২ - তে লেখা আছে যে, "যেরূপ মানুষ পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে নেয়, ঠিক তেমন জীবাত্মা বর্তমান শরীরকে ত্যাগ করে অর্থাৎ মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে নতুন শরীর অর্থাৎ নতুন জন্ম প্রাপ্ত করতে থাকে " এবং গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ -তে বলা হয়েছে যে, "হে অর্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়ে গেছে, তুমি জানো না, আমি জানি "। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ - তে গীতার জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, "হে অর্জুন! তুমি, আমি এবং এই সমস্ত যোদ্ধা আগেও জন্ম গ্রহণ করেছিল, ভবিষ্যতেও জন্ম নেবে। তুমি এটি ভাববে না যে, কেবল বর্তমানেই জন্ম গ্রহণ করেছে। মুসলিম উলেমা (বিদ্বান) জোর দিয়ে বলেন যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে এবং হিন্দুরা যা বিশ্বাস করে (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।) ইসলাম ধর্ম গ্রন্থগুলোতে কোথাও এরূপ লেখা নেই যে, বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু হয়, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলিম বিদ্বানরা বলেন যে, ইসলামে এই নিয়ম আছে যে, বাবা আদম আমাদের সকলের প্রথম পুরুষ ছিলেন, অতএব তিনিই প্রথম নবী ছিলেন। বাবা আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত, যত নবী হয়েছিলেন এবং তাঁদের সকল সন্তান অর্থাৎ বাবা আদম সহিত (ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের পরম পিতা) এবং বর্তমান পর্যন্ত, যে সকল পুরুষ ও মহিলা (বালক, যুবক, বৃদ্ধ) মারা গেছে। ওই সকল জীবাত্মাদের কবরে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ওই সকল জীবাত্মাগণ কবরের মধ্যে তাদের মৃতদেহে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কিয়ামত (প্রলয়) আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের সময় কেবল জান্নাত ও দোজখ (নরক) এবং সপ্তম আকাশে আল্লাহর তখ্‌ত (সিংহাসন) বাঁচবে। বাকী সব পৃথিবী, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, সূর্য প্রভৃতি, সকল নক্ষত্রমণ্ডল ধ্বংস হয়ে যাবে। ওই কিয়ামত (ধ্বংসের সময়) খরব (ট্রিলিয়ন) বছর পর আসবে। ওই সময় পর্যন্ত যত মানুষ (নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক) মারা যাবে, তাদেরকে কবরে দাফন করতে থাকবে। কিয়ামতের সময় সবাইকে কবর থেকে বের করে পুনরুত্থিত (জীবিত) করা হবে। আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে, তাদের কর্ম অনুসারে জান্নাত অথবা জাহান্নামে রাখবেন। আল্লাহর আদেশ অনুসার যারা ধার্মিক কর্ম করেছেন, তাদের সবাইকে জান্নাতে রাখা হবে এবং যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ইচ্ছামতো জীবন-যাপন করেছেন, তাদের সবাইকে দোজখের (নরক) আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। ইসলামের আলেমগণ (বিদ্বানগণ) এই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ইসলাম ধর্মে আছে বলেছেন। এর সমর্থন সকল মৌলবী সাহেবরাও করছেন। সমগ্র মুসলিম সমাজ এই নীতিকে অটল বলে মানছেন কিন্তু সত্য তো এর বিপরীত। আপনারা হজরত মুহম্মদ দ্বারা বলা ও চোখে দেখা সত্যকে পূর্বেই পড়েছেন যে, তিনি উপরে জান্নাত ও দোজখে বাবা আদম এবং তাঁর ভালো-মন্দ সন্তানদের ও হজরত মুহম্মদ সাহেবের পূর্বের সকল নবীদের দেখেছিলেন। মুসলিম আলেম-ওলামা সাহেবরা ও মৌলবী সাহেবরা তারা তাদের ধর্মগ্রন্থও সঠিকভাবে বোঝেননি। এই কারণে সমগ্র মুসলিম সমাজ ভ্রমিত হয়ে রয়েছে, সত্যের সাথে পরিচিত নেই। এটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হয়তো এঁদের সকলের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই আর যদিও বা জ্ঞান থাকে, তাহলে তা জেনে-শুনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তারা মিথ্যা কথার প্রচার করছেন অথবা অপপ্রচার করে তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে প্রতারণা করছেন। এই দাস (রামপাল দাস) মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে জানতে চাইছে যে, আপনারা আপনাদের প্রিয় নবী হজরত মুহম্মদ (সা.) সাহেবের বাণীকে সত্য বলে মেনে নেবেন, নাকি এই মিথ্যা প্রচারকদের মিথ্যা কথাকে মানবেন? আপনাদের উত্তর স্পষ্ট হবে যে, হজরত মুহম্মদের সাহেবের বলা কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

{কিছু মুসলিম মৌলবী ও প্রচারক এতটা মিথ্যাবাদী যে, তারা বর্তমানের শিক্ষিত মানব সমাজকেও বিভ্রান্ত করতে ছাড়ে না। যখন তাদের সাথে এই বিষয়ে জ্ঞান চর্চা হয় যে, যদি কিয়ামত পর্যন্ত কবরে থাকার সিদ্ধান্তটিকে সত্য মানা হয়, তাহলে হজরত মুহম্মদ যে, হজরত আদম থেকে ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) পর্যন্ত, সকল নবীমন্ডলীকে তিনি উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় আকাশে দেখেছিলেন, এছাড়া বাবা আদমের ভালো-মন্দ সন্তানদের জান্নাত ও জাহান্নামে দেখেছিলেন, যাদেরকে দেখে বাবা আদম বামে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে কাঁদছিলেন এবং ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে হাসছিলেন, আপনাদের (মৌলবীদের) সিদ্ধান্ত (নিয়ম-নীতি) তো নবী মুহম্মদ অস্বীকার (খণ্ডন) করে দিয়েছেন। তখন সেই মিথ্যাবাদীরা নতুন করে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতেন যে, নবীদের জন্য ছাড় আছে। তাঁরা উপরের জান্নাতে যেতে পারেন। এই দাস (লেখক রামপাল) তাদের কাছে প্রমাণ চাইছেন যে, আপনারা দেখান! কুরআনে বা কোনো হাদিসে কিংবা হজরত মুহম্মদ সাহেবের সফরের (যাত্রার) বর্ণনাতে বা বাইবেলে। তাঁদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, বাবা আদম তাঁর ভালো সন্তানদের ডান দিকে দেখে হাসছিলেন আর বাম দিকে খারাপ সন্তানদের কর্ম দেখে কাঁদছিলেন। এই দাস (রামপাল দাস) তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছে যে, তাহলে তাদের কর্মগুলো কি ডান দিকে ও বাম

দিকের দেওয়ালে লেখা ছিল, যা পড়ে বাবা আদম হাসছিলেন ও কাঁদছিলেন? তবে মনে রাখবেন, বাবা আদম অশিক্ষিত ছিলেন। সত্য কথা এটাই, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।}

পুনর্জন্ম অর্থাৎ বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে , যা এইপ্রকার :-

পবিত্র কুরআন মজিদে সৃষ্টি, প্রলয় এবং জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কিছু সূরাহগুলিকে পড়ি ও বিবেচনা করছি যে :-

সূরাঃ কাহ্ফ - ১৮

আয়াত নং. ৪৭ :- আর (সেইদিনের দুঃচিন্তায় বিচলিত হবেন না) যেদিন আমি পাহাড়-পর্বতগুলিকে সরিয়ে দেব (ধ্বংস করে দেব) আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে যে, শূন্য ময়দান পড়ে রয়েছে আর আমি সব মানুষকে ডাকব এবং তারমধ্যে কাউকে ছাড়ব না। (৪৭)

সূরাঃ কাহ্ফ - ১৮

আয়াত নং. ৪৮ :- সারিবদ্ধভাবে তোমাদেরকে প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে (এবং তাদের বলা হবে যে, বলো!) যেভাবে আমি তোমাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনই ভাবে তোমরা আমার সামনে উপস্থিত হয়েছো।

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত বর্ণনায় এটা স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ পৃথিবীকে নষ্ট করেননি। তার উপরে নির্মিত পাহাড়-পর্বতগুলো, মনুষ্য ও তাদের ঘর-বাড়িগুলোকে ধ্বংস করেছেন। এটিকে সম্পূর্ণ প্রলয় (কিয়ামত) বলা যায় না। যেমন মুসলমান প্রচারকরা বলেন যে, খরব (ট্রিলিয়ন) বছর পরে যখন প্রলয় (কিয়ামত) আসবে, ওই সময় সমস্ত পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল নষ্ট হয়ে যাবে এবং মৃতদেরকে কবর থেকে বের করে জীবিত করা হবে। যারা আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করেছেন, আজ্ঞাকারী (মুসলমান হয়ে) রয়েছেন, তারা জান্নাতে (Heaven) স্থান পাবে এবং যারা আল্লাহর আজ্ঞা মানতে অস্বীকার করেছিল, সেই অবজ্ঞাকারীদেরকে দোজখে (Hell) নিক্ষেপ করা হবে। এরপরে কেবল জান্নাত ও জাহান্নাম অবশেষ থাকবে। আল্লাহ সপ্তম আকাশের উপর সর্বদা বিরাজমান আছেন এবং তিনি থাকবেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য এবং সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। নিচের সৃষ্টি চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু উপরোক্ত উল্লেখ কুরআনের সূরাহ (সূরা) কাহ্ফ -১৮ আয়াত ৪৭ - ৪৮ তে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী তো থাকবে। ওই পৃথিবীকে তোমরা দেখবে যে, খোলা ময়দান পড়ে রয়েছে। তার উপরের পাহাড়-পর্বত ও অন্যান্য সৃষ্টি থাকবে না। সকল মানুষই তাদের কর্মের ফল প্রাপ্ত করার জন্য, পরমাত্মার সামনে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন পড়ুন সূরাঃ মুলক্ - ৬৭ আয়াত নং ২ :-

যে (আল্লাহ) জীবন ও মরণ বানিয়েছেন , যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে ভালো কর্ম করে। অতএব সেই (আল্লাহ) খুবই পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল।

এখন পড়ুন **সূরাঃ আর রুম-৩০ এর আয়াত নং ১১ :-**

আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি (খিলকত) উৎপত্তি করেছেন। পুনরায় তা করবেন (পুনরাবৃত্তি করবেন।)

এখন পড়ুন (কুরআন মজিদে) **সূরাঃ অম্বিয়া-২১ আয়াত নং ১০৪ :-**

যেদিন আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব, যেভাবে নথিপত্রের কাগজের বান্ডিলকে গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম (কায়ানাতকে) সৃষ্টিকে উৎপত্তি করেছিলাম, সেভাবেই আমি পুনরায় করব (পুনারাবর্তী করব)।

এবার পড়ুন (কুরআন শরীফে) **সূরাঃ আম্বিয়া - ২১ আয়াত নং ১০৪ -** এর হিন্দি অনুবাদ :- যেদিন আকাশকে এমনভাবে মোড়াবো, যেমন নথিপত্রের কাগজের বান্ডিল মোড়ানো হয়, সৃষ্টিকে (কায়ানাত) প্রথমে যেভাবে উৎপত্তি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় করবো। (এই) প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য। আমি এটা অবশ্যই পালন করব। (১০৪)

এখন পড়ুন **সূরাঃ আল বাকারা ২ -এর আয়াত নং ২৮ :-**

তোমরা কিভাবে আল্লাহর প্রতি অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করছ? যেহেতু তোমরা নির্জীব (মৃত) ছিলে, তিনি তোমাদের জীবন প্রদান করেছেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবন নিয়ে নেবেন। আবার তিনিই তোমাদের পুনরায় জীবন প্রদান করবেন, অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদের পুনরায় ফিরে যেতে হবে।

এবার পড়ুন সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২৯ :-

তিনিই তো সেই, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন আর সপ্তম আকাশ সঠিকভাবে তৈরি করলেন এবং তিনি সবকিছুর বিষয়ে অবগত।

আয়াত নং. ২৫ (সুরাহ-অল্ বাকারা- ২) :- {কুরআন মজিদ যার তর্জুমা আরবী মতন তথা উর্দু তর্জুমা "হজরত মাওলানা অশরফ অলী থানবী (রহমতুল্লাহি অলৈহ) এবং উর্দু থেকে হিন্দি তর্জুমা" এস. খালিদ নিজামী করেছেন এবং প্রকাশক কুতুব খানা হমীদিয়া ৩৪২, গলী গঢ়য়্যা জামা মসজিদ, দিল্লি-১১০০০৬।}

বিশেষ :- পাঠকগণের নিকট অনুরোধ হল যে, উপরোক্ত অনুবাদকর্তাদের দ্বারা করা হিন্দি অনুবাদ, যা নিচে

লিখছি। অনুগ্রহ করে আপনারা স্বয়ং পড়ুন ও নির্ধারণ করুন যে, এর অর্থ বারংবার জন্ম-মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্জন্ম এবং বারংবার জান্নাতে যাওয়া হয় নাকি অন্য কোথাও? (লেখক)

সূরাঃ আল বাকারা - ২ আয়াত নং ২৫ এর :-

আর হে পয়গম্বর! ওই লোকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। ভালো কথা এটা যে, যদিও বা তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশ নদী প্রবাহিত। যখন তারা ওই জান্নাতের কোনো ফল আস্বাদন করবে, তখন প্রতিবার এটাই বলবে যে, এ তো তাই, যা আমাদের এর পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, এটা আরো প্রাপ্তি হবে, পুনরায় তখন ওইসব মনে পরবে যে, এই ফল (পূর্বের ফলের মত) একই রকম আছে আর তাদের জন্য ওই জান্নাতে সহধর্মিণীগণ থাকবে। ফর্সা, পবিত্রযুক্ত আর তারা ওই জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। (২৫)

{কিছু অনুবাদকগণ "দুইবারই ফল একই রকম পাওয়া যাবে" এর অর্থ করেছেন যে, খাওয়ার ফল যেরকম পৃথিবীতে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এই জান্নাতেও (স্বর্গে) সেই রকমই প্রাপ্ত হয়েছিল। বিচার করুন, জান্নাতে কি কেবল এক ফলই খাওয়ার জন্য মিলবে? অন্য কোনো পদার্থ কি জান্নাতে নেই? বাস্তবিক অর্থ এই উপরোক্ত অনুবাদক করেছেন যে, যখন সৎ পবিত্র লোকেরা জান্নাতে যাবেন, দ্বিতীয় বার তখন তাদেরকে মনে পড়বে যে, পূর্বেও তারা তাদের কৃত কর্মের ফলস্বরূপ এই জান্নাতের সুখ প্রাপ্ত হয়েছিল। এখনও সেই একই প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছে আর এটা সত্য যে, যখন দ্বিতীয়বার তারা জান্নাতে যাবেন, তখন তাদের কর্মের ফলস্বরূপ জান্নাতের সুখ প্রাপ্ত হবে। ওই স্থানের স্ত্রীরা হবে সুন্দর ও পবিত্র। অতএব এর দ্বারাও বারবার জন্ম-মৃত্যু প্রমাণ সিদ্ধ হয়।}

"পুনর্জন্মের সম্বন্ধিত প্রকরণ"

সূরাঃ অল্ বাকারা - ২ এর আয়াত নং. ২৪৩ :-

তোমরা কি ওই লোকেদের অবস্থার উপরেও কিছু বিচার করেছ, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল আর তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার। আল্লাহ তাকে মরতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদের আবার জীবন দিলেন। বাস্তবতা হলো আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না।

"কিয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত কবরে থাকা সিদ্ধান্তের খণ্ডন"

কুরআনের সূরাঃ আল মুদ্দস্সির - ৭৪ আয়াত নং. ২৬ - ২৭ :-

আয়াত নং. ২৬ :- শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামে (নরকে) নিক্ষেপ করব।

আয়াত নং. ২৭ :- আর তুমি কি জানো, কেমন ওই জাহান্নাম (নরক)। {এক বলীদ বিন মুগহরহ নামের এক ব্যক্তি প্রথমে মুসলমানী স্বীকার করেন এবং তার ভালো লাভও হয়। তিনি প্রথমে বিরোধীদের সর্দার (নেতা) ছিলেন। পরে হজরত মুহম্মদের বিরোধিতা করতে লাগলেন এবং কুরআনকে জাদু বলে ঘোষণা করতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন যে, এটা তো মানুষের মুখে বলা বাণী, এটা আল্লাহর বাণী নয় আর নবী মুহম্মদকে জাদুগর বলতে লাগলেন। তখন কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ উপরোক্ত সূরা মুদ্দস্সির - ৭৪ আয়াত নং. ২৬ - ২৭ - এ বললেন যে, আমি শীঘ্রই তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব অর্থাৎ নরকের আগুনে তাকে পাঠিয়ে দেব।

বিচার করুন পাঠকগণ! কবরের পরিবর্তে শীঘ্রই নরকে নিক্ষেপ করার কথা বললেন, যা তাদের ওই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ সিদ্ধ করছে। যেসব বলা হয় যে, সকল নবী হতে সাধারণ ব্যক্তিরা কিয়ামত পর্যন্ত কবরে থাকবেন কিন্তু হজরত মুহম্মদের আকাশ যাত্রার (মেরাজ) বিষয়ে তো স্পষ্টভাবে প্রমাণই করে দিয়েছে যে, সমস্ত নবীগণ, আদম ও তার ভালো-মন্দ কর্ম করা সকল সন্তানরা উপরে নরক ও জান্নাতে ছিলেন।}

নিষ্কর্ষ :- কুরআন মজিদের জ্ঞানের পাশাপাশি হজরত মুহম্মদের অনুভবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হজরত মুহম্মদের মতো পবিত্র নবী জন্মগ্রহণ করার কারণে কুরআনের পবিত্র জ্ঞান মানুষের হাতে এসেছে, যেমন পাত্র (বাসন) শুদ্ধ হওয়ার পরেই তাতে ঘি ঢালা হয়। অশুদ্ধ পাত্রে ঘি ঢালার অর্থ হল, সেটিকে নষ্ট করা। কুরআনের জ্ঞান হজরত মুহম্মদকে কোন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত হয়েছিল? এই বিষয়ে মুসলিম সমাজের প্রতিটি শিশুরা পরিচিত আছে, যে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান প্রদান করেছেন, তাঁকে মুসলমান সমাজ সৃষ্টির উপত্তিকর্তা (খালিক) বলে মানেন। তাঁকেই কাদির (সামর্থ্যবান) আল্লাহ বলে মানেন। এটাও মানেন যে, ওই আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন, সে জ্ঞানকে জিব্রাইল ফেরেশতা যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই কোনো পরিবর্তন ছাড়াই নিয়ে এসেছেন আর সেই জ্ঞানই নবী মুহম্মদের আত্মাতে স্থাপনা (ফিট) করে দিয়েছেন, তারপরে সেই জ্ঞান হজরত মুহম্মদের মুখ হতে বলা হয়েছে, সেটি কোনো ব্যক্তি লিখেছেন। হজরত মুহম্মদ তো নিরক্ষর (অশিক্ষিত) ছিলেন। কুরআনের জ্ঞানকে হজরত মুহম্মদের প্রাপ্তির প্রক্রিয়াতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কখনো হজরত মুহম্মদের সামনে জিব্রাইল ফেরেশতা প্রকট হয়ে জ্ঞান বলতেন। আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে জ্ঞান বলতেন। কখনো আবার আল্লাহ সরাসরি নবী মুহম্মদের আত্মায় জ্ঞান ফিট করে দিতেন।

কখনো নবী মুহম্মদ চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়তেন, তারপরে কুরআনের জ্ঞান বলতেন। এই ভাবে কুরআনের পবিত্র জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। উপরোক্ত কুরআনের কিছু সূরার আয়ত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে এটা বুঝতে হবে যে, পুনর্জন্মের বিষয়ে কি সঙ্কেত দেওয়া রয়েছে?

উপরোক্ত নিষ্কর্ষতে আপনারা পড়েছেন যে, সূরাঃ কাহ্ফ - ১৮ আয়াত নং. ৪৭-৪৮- তে বলা হয়েছে যে, প্রলয়ের সময় পৃথিবী ধ্বংস হবে না। তার ওপরের নির্মিত যেমন পাহাড়, মানুষ, তাদের ঘরবাড়ি, বাসস্থান, জীবজন্তু, পশু-পাখি সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবী একটা উন্মুক্ত (শূন্য/খালি) ময়দান পড়ে থাকতে দেখা যাবে।

তারপর সূরাঃ মূলক ৬৭ আয়াত নং ২ -তে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ জন্ম ও মৃত্যুর বিধান বানিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কারা ভালো কাজ করে আর কারা খারাপ কাজ করে।

আবার সূরাঃ আর রুম ৩০ আয়াত নং ১১ -তে এই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টির উৎপত্তি করেছেন, তারপর পুনরায় করবেন (পুনরাবৃত্তি করবেন)।

সূরাঃ আম্বিয়া ২১ আয়াত নং. ১০৪ - তে বলা হয়েছে যে, ওইদিন আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব, যেভাবে কাগজের নথিপত্রের বান্ডিলকে গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির (কায়নাত) উৎপত্তি করেছিলাম। এইপ্রকার আমি পুনরাবৃত্তি করব। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য। আমি অবশ্য এটা পালন করবোই (১০৪)

সূরাঃ আল বাকারা ২ আয়াত নং ২৪৩ -তে আল্লাহ মারলেন এবং তারপর তাদের পুনরায় জীবিতও করলেন।

সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪ আয়াত নং ২৬-২৭ - তে বলা হয়েছে যে, শীঘ্রই তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এরা কি জানে জাহান্নাম (নরক) কি? (অতএব এর দ্বারাও কবরে থাকার বিষয়টি ভুল প্রমাণিত হল।)

❖ **"এখন এটা দেখুন যে, পূর্বে সৃষ্টির কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল? "**

এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, যে আল্লাহ "কুরআন মজিদ" এর জ্ঞান নবী মুহম্মদকে দিয়েছিলেন, তিনিই আবার নবী দাউদকে ''জবুর'' -এর জ্ঞান প্রদান করেছেন, তিনিই আবার হজরত মূসাকে "তৌরাত"- এর জ্ঞান প্রদান করেছেন আর তিনিই হজরত ঈসা মসীহকে (যীশু খ্রীষ্ট) "ইঞ্জিল"- এর জ্ঞান প্রদান করেছেন। কুরআনকে বাদ দিয়ে উপরের তিন পবিত্র গ্রন্থ (জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল) এই তিনটি একত্রে আবদ্ধ করে "বাইবেল" গ্রন্থ নাম দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে সৃষ্টির উৎপত্তি অধ্যায়ে লেখা আছে যে, পরমেশ্বর প্রথমে পৃথিবী বানিয়েছেন, আকাশ বানিয়েছেন, পৃথিবীর উপরে জল ভরে দিয়েছেন, যা পরে সমুদ্র হয়েছে। পৃথিবীর উপর বড় বড় গাছ-গাছালি উৎপন্ন করেছেন, জীব-জন্তু, পশু-পাখি অনেক প্রকার অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। ছয় দিনের দিন মানব উৎপন্ন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা (কাদির আল্লাহ) নিজের সমস্ত কার্য ছয় দিনে সমাপ্ত করে, সপ্তম দিনে সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। এটা হল প্রথম সৃষ্টির উৎপত্তির বর্ণনা।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত এটিই স্পষ্ট করে যে, যেমন আমি সৃষ্টির (কায়নাত) রচনা করেছিলাম। এইপ্রকার পুনরায় সৃষ্টি রচনা করব। যার দ্বারা বারবার জন্ম-মৃত্যু অর্থাৎ পুনর্জন্ম হওয়ার প্রমাণ সিদ্ধ হয়।

যে সিদ্ধান্ত মুসলিম বিদ্বান ও প্রবক্তারা মানেন যে, প্রলয়ের (কিয়ামত) পরে জীবিত করা হবে। এতে এটাও স্পষ্ট হল না যে, সেই ব্যক্তিদের আয়ু কত বছরের হবে? অর্থাৎ কেউ দশ বছরের হবে, না কেউ আরও কম বয়সের হবে, না কারোর বয়স ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৬২ , ৬৫, ৮০ বছরের অধিক আয়ুতে মরবে? কবরে দাবিয়ে রাখা হবে? না পুনরায় তাদের কি একই বয়সে, একই শরীরে জীবিত করা হবে কিংবা শিশুর রূপে? তাদের জীবিত করা হবে কি? এই বিষয়ে মুসলিম মুখপাত্ররা (প্রবক্তারা) নীরব। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন যে, যেমন তিনি প্রথম সৃষ্টির উৎপত্তি করেছিলেন (যা বাইবেলে অর্থাৎ তৌরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে), সেইভাবেই তিনি পুনরায় উৎপত্তি করবেন, এটি তাঁর পাকা প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

উপরোক্ত কুরআন মজিদের সূরাগুলির আয়তে এই বলা হয়েছে যে, একবার প্রলয়ের সময় শুধুমাত্র পৃথিবীর উপরের নির্মিত বস্তু ধ্বংস করা হবে। পৃথিবী একটি খোলা ময়দান রূপে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। (এটিকে আদি সনাতন ও সনাতন পন্থে প্রলয় বলা হয়।)

অতঃপর বলা হয়েছে যে, ওই দিন (প্রলয়ের সময়) আকাশকে এমনভাবে মুড়ে দেবো, যেভাবে কাগজের নথিপত্রের বান্ডিল মুড়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেব, যেভাবে আমি পূর্বে করেছিলাম। (আদি সনাতন এবং সনাতন পন্থে একে মহাপ্রলয় বলা হয়) এটিকে আমি (সৃষ্টি) ওই রূপ পুনরাবৃত্তি করব, এই প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য, এমনটি আমি অবশ্যই করব। {এই মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি রচনা করবে বলা হয়েছে অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবী,

জল, মানুষ (পুরুষ-মহিলা), পশু-পাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তুদের সৃষ্টি করা হবে, যেভাবে পূর্বে উৎপত্তি করা হয়েছিল। ওটির বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এটির পুনরাবৃত্তি করব।} উপরোক্ত প্রকরণ থেকে এটি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় যে, পুনর্জন্ম অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু হয়। যে সিদ্ধান্ত মুসলিম ধর্মের উলেমারা (বিদ্বানরা) বলেন যে, আল্লাহ সৃষ্টি উৎপন্ন করেছেন। মানুষ (নারী ও পুরুষ) জন্মাতে থাকবে, মরতে থাকবে আর মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হবে। তারা সকলে কবরে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রলয় (কিয়ামত) না আসবে। মহাপ্রলয় খরব (ট্রিলিয়ন) বছর পরে আসবে। তখন সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে এবং কবরের সকল মানুষকে জীবিত করা হবে। যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে জান্নাতে (স্বর্গে) রাখা হবে আর যারা কুরআনের বিপরীত কাজ করেছিল, তাদেরকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। ব্যস! এরপরে না সৃষ্টির উৎপত্তি হবে আর না ধ্বংস হবে।

ব্যাখ্যা :- বিচারণীয় বিষয় এটা যে, মুসলমান মুখপাত্রদের অনুসারে, যারা আল্লাহর হুকুম মেনেছেন ও সৎকর্ম করেছেন, তাদেরকেও কবরে দাফন করা হবে। তবে বাবা আদম এবং তার সমস্ত বংশধর এবং এক লাখেরও অধিক নবী যাঁরা হয়েছিলেন, তাহলে তাঁরাও সব কবরে দাফন রয়েছেন। ওই কবরে খরব (ট্রিলিয়ন) বছর পর্যন্ত পড়ে পড়ে তাঁরা পচতে-গলতে থাকবেন অর্থাৎ তাঁরা মহাকষ্ট ভোগ করতে থাকবেন। অতঃপর তাঁদেরকে জান্নাতে রাখা হবে। এমন জান্নাতকে (স্বর্গ) কি কেউ মাথায় মারবে? যেখানে পূর্বেই খরব (ট্রিলিয়ন) বছর পর্যন্ত ঘোর নরকের মত কষ্ট কবরে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত, গরম ঠান্ডার দ্বারা মহাকষ্ট সহ্য করতে হবে।

মুসলমান প্রবক্তাগণ এখানে এই যুক্তিও দিতে ছাড়বেন না যে, মৃত্যুর পরে তো সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় না। এখানে আমার যুক্তি, মৃত্যুর পর যদি সুখের বা দুঃখের অনুভব না হয়, তাহলে জান্নাতের কি আবশ্যকতা আছে? আপনাদের জান্নাতে তো আপনাদের প্রথম নবী আদম দুঃখী রয়েছেন আর সুখীও রয়েছেন, আবার অস্থিরতাতেও রয়েছেন।

অতএব নবী মুহম্মদ পূর্বোক্ত প্রকরণে এই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন। যেখানে আপনারা পড়েছেন যে, নবী মুহম্মদকে জিব্রাইল ফেরেশতা বুরাক নামের (খচ্চরের মতো) একটি পশুর উপর বসিয়ে উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে (জান্নাত ও জাহান্নাম) নবী জী বাবা আদমকে ও তাঁর ভালো-খারাপ সন্তানদের স্বর্গ ও নরকে দেখেছিলেন। এছাড়াও হজরত ঈসা, মূসা, দাউদ, অব্রাহীম আরও অন্যান্য প্রমুখ নবীদের জামাত (মন্ডলীগণকে) দেখেছিলেন। তাঁদেরকে হজরত মুহম্মদ নমাজ পড়িয়েছিলেন। তারপর জান্নাতের (স্বর্গের) অন্যান্য স্থানের দৃশ্য দেখলেন, আল্লাহর নিকট গেলেন। ওই আল্লাহ পর্দার পিছন থেকে পাঁচ বার নামাজ, রোজা ও আজান করার আদেশ নবী মুহম্মদকে দিয়েছিলেন, যা আজ সমস্ত মুসলিম সমাজ পালন করছেন।

মুসলমান প্রবক্তারা এই তর্কও দিতে ছাড়বেন না যে, বাবা আদম উপরের প্রথম আকাশে ডান দিকে তাকিয়ে যে দুঃখী আর বাম দিকে তাকিয়ে যে খুশি হচ্ছিলেন, তিনি ডান দিকে ধার্মিক সন্তানদের এবং বাম দিকে অযোগ্য সন্তানদের কর্ম ফল ভোগ করা দেখে দুঃখী ও খুশি হচ্ছিলেন। এই দাসের যুক্তি হল যে, তাহলে কি ভালো-মন্দ কর্ম দেওয়ালে লেখা ছিল? বাবা আদম তো অশিক্ষিত ছিলেন। তবে আসল সত্য হল উপরে যা বলা হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আজ মুসলমান সমাজ ভ্রমিত হয়ে রয়েছেন। আপনারা তো পবিত্র কুরআন মজিদ ও প্রিয় নবী মুহম্মদের বিচারও সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। কৃপা করে নিজেদের পবিত্র গ্রন্থগুলো পুনরায় পড়ুন।

এই দাস (রামপাল দাস) একটি পুস্তক লিখেছেন "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" যা শ্রীমদভগবত গীতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন এবং অবাক হয়ে বলেছেন, আজ পর্যন্ত আমাদের ধর্মগ্রন্থের সঠিক জ্ঞান আমাদের ছিল না। এই পুস্তকটি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

এখানে এই কথা বলা অতি আবশ্যক হয়ে যায়, যে আল্লাহ পবিত্র জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের জ্ঞান দিয়েছিলেন, তিনিই এর পূর্বে চার বেদ (ঋগ্বেদ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ) এবং শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞানও প্রদান করেছিলেন। যা হজরত ঈসার (যীশু খ্রীষ্টের) চার হাজার বছর পূর্বে বেদব্যাস ঋষির দ্বারা ওই বেদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই ঋষির নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ছিল। প্রথমে বেদের জ্ঞান একটি ছিল। ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এটিকেই চারটি ভাগে ভাগ করে, চার নাম রেখেছিলেন। যার কারণে ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বেদব্যাস বলতে লাগলেন।

প্রসঙ্গ চলছে জন্ম ও মৃত্যুর :-

সনাতন পন্থ অন্য সকল প্রচলিত পন্থের থেকে পূর্বের। তবে আদি সনাতন পন্থ সব থেকে পূর্বের, যার অনুগামী হলেন এই দাস (রামপাল দাস)। এই দুই পন্থের (বর্তমানে ধর্ম বলা হয়) এই মান্যতা রয়েছে যে, প্রতিটি জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। এই সিদ্ধান্ত এই জন্যও বিশ্বাসনীয় যে, এটি কাদির খুদা কবীরের দ্বারা বলা হয়েছে। পার্থক্য এতটাই যে, সনাতন ধর্মে

জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে চিরন্তন বলে মানে। যেমন গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ -তে বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! তোমার ও আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ -তে বলা হয়েছে যে, তুমি আর আমি এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই সমস্ত সৈন্যদের আগেও জন্ম হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও জন্ম হবে। তবে এটা ভেবো না যে, আমরা সবাই কেবল বর্তমানেই জন্মেছি।

আদি সনাতন পন্থ :- আদি সনাতন পন্থের এই মান্যতা আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সদগুরুর সন্ধান না পাওয়া যাবে, যিনি সৎপুরুষ অর্থাৎ (গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮, ৯, ১০ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ এর) পরম অক্ষর ব্রহ্মের সম্পূর্ণ যথার্থ ভক্তি (ইবাদত) জানেন, তাঁর নিকট হতে যতক্ষণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করে ভক্তি না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরকাল চলতেই থাকবে। পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ অনুসারে করলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ওই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যেখানে যাওয়ার পরে সাধককে (ভক্ত) পুনরায় আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় না।

এইজন্য গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১, ৬২ তে বলা হয়েছে যে :-

(শ্লোক ৪৬ এ) হে অর্জুন! যে পরমেশ্বর থেকে সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তি হয়েছে এবং যাঁর থেকে এই সমগ্র জগৎ বিস্তৃত হয়েছে। ওই পরমেশ্বরকে স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা পূজা (আরাধনা) করলে, মানব পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত করে।

(৬১ শ্লোকে) :- হে অর্জুন! শরীর রূপী যন্ত্রে আবদ্ধ হওয়া সমস্ত প্রাণীদেরকে পরমেশ্বর নিজের মায়া (শক্তি) দ্বারা, তাদের কর্ম অনুসারে ভ্রমণ করান, এবং সকল প্রাণীদের হৃদয়ে স্থিত (বিরাজমান) থাকেন।

(৬২ শ্লোকে) :- হে ভারত! সর্বতোভাবে তুমি ওই পরমেশ্বরের শরণে যাও। ওই পরমাত্মার কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি ও সনাতন (মহফুজ) পরম ধামকে প্রাপ্ত হবে।

আদি সনাতন পন্থকে ওই পরমেশ্বরকে অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে সত্পুরুষ বলা হয়। সনাতন পরম ধামকে অমরলোক বা সতলোক বলা হয়। ওই সতলোকে যাওয়ার পরে সাধকের জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

শিখ পন্থ :- শিখ পন্থেও (বর্তমানে শিখ ধর্ম) জন্ম ও মৃত্যুর মান্যতা রয়েছে। তারা মানেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সদগুরুর শরণে গিয়ে সতপুরুষের সাধনা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু সমাপ্ত হয় না। সত্পুরুষের ভক্তিতে জন্ম-মৃত্যু চিরতরে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং ওই সাধক সত্যলোকে (সচ্চখন্ডে) চলে যান

জৈন ধর্ম (পন্থ) :- জৈন ধর্মে সনাতন ধর্মের মত মান্যতা রয়েছে যে, কখনই জন্ম-মৃত্যু সমাপ্ত হয় না। তারা বিশ্বাস করেন যে, জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম তীর্থঙ্কর আদি নাথের (ঋষভ দেবের) মৃত্যুর পর, সেই আত্মাই বাবা আদম রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রী ঋষভদেবের পৌত্র (নাতি) হলেন (ভরতের পুত্র) শ্রী মারীচি। এই মারিচি ঋষভদেবের (ঠাকুরদাদার) নিকট হতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর সেই আত্মার বহুবার মানব জন্ম হয়েছে। কোটি কোটি বার পশুর (গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি রূপে) জন্ম হয়েছিলেন। বহু বার বৃক্ষের জন্ম হয়েছিলেন, পরে ওই আত্মা জৈন ধর্মের চৌব্বিশতম তীর্থঙ্কর হয়েছিলেন।

সূক্ষ্ম বেদে প্রমাণ রয়েছে যে, শ্রী নানক দেবের (শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা) আত্মা সত্যযুগে রাজা অম্বরীষ রূপে জন্মেছিলেন, তিনিই ত্রেতাযুগে আবার রাজা জনক রূপে জন্মেছিলেন এবং ওই আত্মাই কলিযুগে শ্রী নানকদেব রূপে জন্মেছিলেন। এরপর যখন তিনি সদগুরুর নিকট হতে দীক্ষা প্রাপ্ত করে সতপুরুষের (সত পুরখ) ভক্তি, সতনাম জপের দ্বারা করেছিলেন, তখন তাঁর জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত হয়েছিল। পুরাণের মধ্যে পুনর্জন্মের আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে, যাকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর হওয়া বলে। এতে প্রমাণিত হল যে, মুসলমানরা যে জন্ম-মৃত্যুর বিধান বলেন, তা ভিত্তিহীন অর্থাৎ নিরাধার। তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলিও তাদের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করছে।

⇨ **বারবার জন্ম-মৃত্যুর জীবন্ত ইতিহাস আপনারা পড়বেন, "অল খিজ্রের (অল কবীর) পরিচয়" নামক অধ্যায়ে যা এই পুস্তকের পৃষ্ঠা 133 থেকে পৃষ্ঠা 135 পর্যন্ততে রয়েছে।**

এখন পড়ুন প্রলয়, মহাপ্রলয় ও দিব্য মহাপ্রলয় সম্পর্কে তথ্য :-

প্রলয়ের বিষয়ে তথ্য

❖ **প্রলয়ের অর্থ হল 'ধ্বংস'। এটি দুই প্রকারের হয় - আংশিক প্রলয় ও মহাপ্রলয়।**

(১) আংশিক প্রলয় :- এটি দুই প্রকারের হয়। একটি তো চতুর্থ যুগের (কলিযুগ) শেষের দিকে পৃথিবীতে এক নিঃকলঙ্ক নামক দশম অবতার আসেন, যাঁকে কল্কিও বলা হয়। তিনি ওই সময়ে (কলিযুগে) সমস্ত ভক্তিহীন মানব

শরীরধারী প্রাণীদের, নিজের তরবারি দ্বারা হত্যা করে সমাপ্ত করবেন। ওই সময়ে মানুষের বয়স ২০ বছর পর্যন্ত হবে এবং ৫ বছর কম (Less) হবে অর্থাৎ ১৫ বছরের মধ্যেই সকলে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ হয়ে মারাও যাবে। পাঁচ বছরের মেয়েরা সন্তানদের জন্ম দেবে। মানুষের উচ্চতা প্রায় দেড়ফুট বা আড়াই ফুট হবে। ওই সময় এত পরিমাণ ভূমিকম্প হবে যে, পৃথিবীর উপরে চার ফুট উঁচু ভবনও নির্মাণ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। সমস্ত মানুষ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে থাকবে। পৃথিবীর মাটির উর্বরতা ক্ষমতা থাকবে না। তিন হাত (প্রায় সাড়ে চার ফুট) মাটির নিচে পর্যন্ত জমির মাটি নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো ফলদায়ক বৃক্ষ থাকবে না। অশ্বত্থ গাছে পাতাও হবে না। সকল মানুষ (নারী ও পুরুষ) মাংসাহারী হয়ে যাবে। পারস্পরিক আচরণ খুব খারাপ হবে। ভল্লুকের পিঠে চড়ে যাতায়াত করবে। ভল্লুক ওই সময়ে যাতায়াতের জন্য ভালো বাহন হবে। পরিবেশ দূষণের কারণে বৃষ্টিপাত হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। শিশির যেমন পড়ে ঠিক তেমনিই বৃষ্টি হবে। গঙ্গা, যমুনা অন্যান্য নদীগুলো শুকিয়ে যাবে। এইভাবে কলিযুগ সমাপ্ত হবে। ওই সময় প্রলয় (তখন পৃথিবীতে শুধু জল আর জল) হবে। পরে এত বৃষ্টি হবে যে, সারা পৃথিবীতে শত-শত ফুট উঁচু পর্যন্ত জল ভরে যাবে। অধিক উঁচু স্থানে সামান্য কিছু মানুষ অবশিষ্ট বেঁচে থাকবে। এই জল কয়েক শত বছর পরে শুকাবে, তারপরে সারা পৃথিবীতে ঘাস ও জঙ্গলে ভরে যাবে। পৃথিবী পুনরায় উর্বর শক্তিতে ভরে উঠবে। বনভূমি অধিক হওয়ার কারণে পরিবেশ পুনরায় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় কিছু লোক ভক্তিযুক্ত থাকবে, যারা উঁচু স্থানে বেঁচে যাবে, তাদের সন্তান হবে। সে সন্তানরা লম্বা হবে। যেহেতু বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া শুদ্ধ হওয়ার কারণে শরীর অধিক সুস্থ হয়ে যাবে। পিতা-মাতা খর্বকায় থাকবে কিন্তু সন্তানরা লম্বা লম্বা (শরীরের) হবে। কিছু সময় পরে পিতা-মাতা ও সন্তানদের যুবা অবস্থার উচ্চতা সমান হয়ে যাবে। ওই সময় বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ হবে। এইভাবে সত্যযুগের প্রারম্ভ হবে। পৃথিবীতে এই আংশিক প্রলয় জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল ব্রহ্ম) দ্বারা করা হয়।

❖ **দ্বিতীয় আংশিক প্রলয় :-** এই প্রলয় এক হাজার চতুর্যুগের পরে হয়। তখন শ্রী ব্রহ্মার একদিন সমাপ্ত হয় এবং এতটাই চতুর্যুগ পর্যন্ত রাত্রি হয়। এক রাত্রি পর্যন্ত প্রলয় থাকে। {প্রকৃতপক্ষে শ্রী ব্রহ্মার একদিন আমাদের এখানকার সময় হল ১০০৮ চতুর্যুগের হয়। এক ব্রহ্মার দিনে চৌদ্দটা ইন্দ্রের রাজত্বকাল সমাপ্ত হয়ে যায়। এক ইন্দ্রের রাজত্বের সময় বাহাত্তর চৌকড়ী যুগের হয়। এক চৌকড়ীতে চার যুগ (চতুর্যুগ) হয়:- ১. সত্যযুগ ১৭ লাখ ২৮ হাজার বছরের হয়। ২. ত্রেতাযুগ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছরের হয়। ৩. দ্বাপর যুগ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছরের হয়। ৪. কলিযুগ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছরের হয়। চারটি যুগের সমষ্টির সময়কাল ৪৩ লাখ ২০ হাজার বছর হয়। গণনা করার জন্য সরল হবে, এইজন্য চতুর্যুগের গণনা করা হয়। ব্রহ্মার একদিন এক হাজার আট চর্তুযুগ পর্যন্ত হয়। এটিকে সরলভাবে এক হাজার চর্তুযুগ হিসাবে গণনা করা হয়।}

যখন ব্রহ্মার দিন সমাপ্ত হয় তখন পৃথিবী, পাতাল, স্বর্গ (ইন্দ্র) ধামের সমস্ত প্রাণী নষ্ট হয়ে যায়। প্রলয়কালে ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাণীগণকে ব্রহ্ম (কালপ্রভু), যিনি ব্রহ্মলোকে থাকেন, তিনি ব্যক্ত (সাকার) রূপে কাউকে দর্শন দেন না, যাঁকে অব্যক্ত (নিরাকার) হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, ওই অব্যক্ত প্রভু, তাঁর ধামে (ব্রহ্ম লোক) সকলকে অচেতন করে গুপ্ত রূপে ফেলে রাখেন। অতঃপর ব্রহ্মার এক হাজার চতুর্যুগের (বাস্তবে এটি ১০০৮ চতুর্যুগ হয়) রাত্রি সমাপ্ত হওয়ার পরে, পুনরায় এই তিন লোকে (পৃথিবী-স্বর্গ-পাতাল লোক) উৎপত্তির কার্য শুরু হয়ে যায়। ওই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব লোকের প্রাণীরা এবং ব্রহ্ম লোকের (মহাস্বর্গের) প্রাণীরা জীবিত থাকে। এটি হল দ্বিতীয় প্রকারের আংশিক প্রলয়।

❖ **মহাপ্রলয় :-** এটি তিন প্রকারের হয়, প্রথম মহাপ্রলয় :- এই প্রলয় কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) মহাকল্পের শেষের দিকে করে, যে সময় ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। {ব্রহ্মার আয়ু = ব্রহ্মার রাত্রি এক হাজার চতুর্যুগের হয় এবং ততটাই দিন হয়। ত্রিশ দিন-রাত্রি মিলে যেমন এক মাস হয় আর ১২ মাসে হয় এক বছর। এই হিসাবে এক ব্রহ্মার জীবনের আয়ু হয় কেবল একশো বছর, একেই মহাকল্প বলা হয়।}

❖ **দ্বিতীয় মহাপ্রলয় :-** সাত ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে এক বিষ্ণুর মৃত্যু হয়, সাত বিষ্ণুর মৃত্যুর পর একটা শিবের মৃত্যু হয়। একে দিব্য মহাকল্প বলে, তার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সহিত তাঁদের ধামের জীব এবং তাঁদের স্বর্গলোক, পাতাললোক, পৃথিবীর মৃত্যুলোক ও অন্য রচনা এবং তাঁদের প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। ওই সময় কেবল ব্রহ্মলোক অবশিষ্ট থাকে। যার মধ্যে এই কাল ভগবান (জ্যোতি নিরঞ্জন) ও দুর্গা তিন রূপে মহাব্রহ্মা-মহাসাবিত্রী, মহাবিষ্ণু-মহালক্ষ্মী এবং মহাশঙ্কর-মহাদেবীর (পার্বতী) রূপে তিন লোক (ধাম) বানিয়ে সেখানে থাকেন। এই ব্রহ্মলোকে একটা মহাস্বর্গ বানিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে চতুর্থ মোক্ষ প্রাপ্ত প্রাণী থাকেন। {মার্কণ্ডেয় ঋষি, রুমী ঋষির মতো আত্মা যারা চতুর্থ মুক্তি লাভ করেছেন, যাদেরকে ব্রহ্মলীন বলা হয়। তারা এখানকার তিন লোকের সাধকদের দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা (রেঞ্জ) থেকে বাইরে থাকেন। স্বর্গলোক, মৃত্যুলোক ও পাতাল লোকের ঋষিরা তাঁদের দেখতে পান না। এইজন্য তাঁদেরকে ব্রহ্মলীন মেনে নেওয়া হয় কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মলোকে তৈরি মহাস্বর্গে চলে যান।}

তারপর দিব্য মহাকল্পের প্রারম্ভে কাল ভগবান (জ্যোতি নিরঞ্জন) ব্রহ্মলোকের থেকে নিচের লোকের (ধাম) রচনা পুনরায় করেন। কাল ভগবান তাঁর প্রকৃতির (মায়া-আদি ভবানীর) মহাসাবিত্রীর, মহালক্ষ্মীর এবং মহাদেবীর (গৌরীর) সাথে রতি ক্রিয়া দ্বারা নিজের তিন পুত্রকে (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) উৎপন্ন করেন। এই কাল ভগবান তাঁদেরকে নিজ শক্তি দ্বারা অজ্ঞান করে রাখেন। পরে তিনজনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখেন, যেমন- ব্রহ্মাকে পদ্মফুলের উপর, বিষ্ণুকে সমুদ্রে শেষ নাগের বিছানায়, শিবকে কৈলাস পর্বতে। তিনজনকেই পর্যায়ক্রমে সচেতন করে দেন। পরে কাল প্রভু প্রকৃতির (দুর্গার) মাধ্যমে সমুদ্র মন্থনের আদেশ করেন। তখন এই মহামায়া (মূল প্রকৃতি/দুর্গা) তার তিন (কন্যা) রূপকে তৈরি করে সমুদ্রে লুকিয়ে দেন। তিন কন্যাকে (যুবতী দেবীদের) প্রকট করেন। তিন সন্তান (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) এই তিন দেবীকে বিবাহ করেন।নিজের তিন পুত্রকে তিন বিভাগ দেন, উৎপত্তির কার্য ব্রহ্মাকে, স্থিতির (পালন-পোষণ) কার্য বিষ্ণুকে ও সংহারের (মারার) কার্য শিবকে দেন। যার মাধ্যমে কালের (ব্রহ্ম) সৃষ্টি পুনরায় শুরু হয়ে যায়। যার বর্ণনা পবিত্র পুরাণ গ্রন্থগুলিতেও রয়েছে। যেমন - শিব মহাপুরাণ, ব্রহ্ম মহাপুরাণ, বিষ্ণু মহাপুরাণ, মহাভারত, সুখ সাগর, দেবী ভাগবদ্ মহাপুরাণে বিস্তৃত বর্ণনা করা রয়েছে এবং গীতার অধ্যায় ১৪ -এর শ্লোক ৩ থেকে ৫ তে সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

❖ **তৃতীয় মহাপ্রলয় :-** যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে ৭০ হাজার বার ত্রিলোকীয় শিবের (কালের তমোগুণ পুত্র) মৃত্যু হয়, তখন এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হয় আর ব্রহ্মলোকে তিনটি স্থানের উপর নিবাস করা যে কাল (মহাশিব) আছেন তিনি তখন নিজের মহাশিব রূপী শরীরও ত্যাগ করেন। এইপ্রকার এই এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয় অর্থাৎ এটাই হল তৃতীয় মহাপ্রলয় আর ওই সময় এক ব্রহ্মলোকীয় শিবের (কালের) মৃত্যু হয় ও সত্তর হাজার ত্রিলোকীয় শিবেরও (কালের পুত্র) মৃত্যু হয় অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডে নির্মিত ব্রহ্মলোক সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের বিনাশ হয়। এই সময়টাকেই পরব্রহ্মের অর্থাৎ অক্ষর পুরুষের এক যুগ বলা হয়। এই প্রকার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ এর ভাবার্থটি বোঝা উচিত।

"এইপ্রকার তিন দিব্য মহা প্রলয় হয় " :-

"প্রথম দিব্য মহাপ্রলয়"

যখন একশো ব্রহ্মলোকীয় শিবের (কাল/ব্রহ্ম) মৃত্যু হয়, তখন চারটি মহাব্রহ্মাণ্ডে নির্মিত কুড়িটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হয়।

বিশেষ করে এক মহাব্রহ্মাণ্ডেই সৃষ্টি থাকে। এক মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যখন প্রলয় হয়, তখন দ্বিতীয় মহাব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি শুরু হয়। অবশেষে চারটি মহাব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ কুড়িটি ব্রহ্মান্ড প্রলয় হয়ে যায়।

তখন চার মহাব্রহ্মাণ্ডের শুভকর্ম করা প্রাণীদেরকে (হংসাত্মা) একুশ নং ব্রহ্মাণ্ডে নির্মিত করা নকল সত্যলোক ও অন্যান্য লোকে রেখে দেন এবং সেই লোকে নির্মিত অন্য চার গুপ্ত স্থানের উপর অন্য প্রাণীদেরকে অচেতন করে ফেলে রাখেন এবং তখন ওই নকল সত্যলোক থেকে প্রাণীদের ভক্ষণ করে নিজের ক্ষুধা মেটান আর প্রতিদিন যে প্রাণীদের ভক্ষণ করেন, সেই প্রাণীদেরকে একুশ তম ব্রহ্মাণ্ডে নির্মিত করা চার গুপ্তস্থানে অচেতন করে ফেলতে থাকেন এবং সেখানেও জ্যোতি নিরঞ্জন তার তিনরূপ (মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব) ধারণ করে নেন এবং সেখানে রূপ ধারণকারী ওই শিব নিজের জন্ম-মৃত্যুর লীলা করতে থাকেন। যার কারণে সময় নিশ্চিত করে রাখেন এবং একশো বার মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যার কারণে পরব্রহ্মের একশো যুগের সময় একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তারপরে চার মহাব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি রচনার কার্য শুরু করেন। {এক সৃষ্টিতে একশো ব্রহ্মলোকীয় শিবের (কাল) যে আয়ু অর্থাৎ পরব্রহ্মের একশো যুগ পর্যন্ত সৃষ্টি থাকে এবং এতটা সময়ই প্রলয় হতে থাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মের দুইশো যুগে (কেননা পরব্রহ্মের এক যুগে এক ব্রহ্মলোকীয় শিবের অর্থাৎ কালের মৃত্যু হয়) এক দিব্য মহাপ্রলয় আছে যা কালের দ্বারা সম্পাদিত, সেই ক্রম সম্পূর্ণ হয়} এই কাল অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রথম অব্যক্ত বলা হয়। প্রমাণ (গীতা অধ্যায়ে ৭ শ্লোক ২৪ - ২৫ তে)। দ্বিতীয় অব্যক্ত হল পরব্রহ্ম। তবে এই অব্যক্ত পরব্রহ্ম থেকেও অন্য যে সনাতন অব্যক্ত, যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম আছেন, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২০ -তে এই কথার ভাব আছে, জানবেন।

"দ্বিতীয় দিব্য মহা প্রলয়"

এই উপরোক্ত মহাপ্রলয়গুলো পাঁচবার হওয়ার পরে, দ্বিতীয় দিব্য মহাপ্রলয় হয়। দ্বিতীয় দিব্য মহাপ্রলয় পরব্রহ্ম (অবিগত পুরুষ/অক্ষর পুরুষ) করেন। তার মধ্যে কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) সহিত সমস্ত ২১ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যায়। যার মধ্যে তিন লোক (স্বর্গলোক, মৃত্যুলোক, পাতাললোক), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ধামগুলি ও কালের (জ্যোতি নিরঞ্জন-ওঙ্কারনিরঞ্জন-ব্রহ্ম) ব্রহ্মলোক অর্থাৎ অন্য সমস্ত ২১ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণী নষ্ট হয়ে যায়।

বিশেষ :- সাত ত্রিলোকীয় ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে এক ত্রিলোকীয় বিষ্ণুর মৃত্যু হয় এবং সাত বিষ্ণুর মৃত্যুর পরে এক

ত্রিলোকীয় শিবের মৃত্যু হয় এবং সত্তর হাজার ত্রিলোকীয় শিবের মৃত্যুর পরে এক ব্রহ্মলোকীয় শিব অর্থাৎ কালের (ব্রহ্ম) মৃত্যু হয়। এটি পরব্রহ্মের এক যুগ সমাপ্ত হওয়ার পরে হয়। এইপ্রকার কালের এক হাজার যুগ সমাপ্ত হলে পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) একদিন ও এক রাত্রি হয়। পরব্রহ্মের রাত্রির সময় শুরু হলে প্রকৃতি (দুর্গা) সহিত কালের (ব্রহ্ম/জ্যোতি নিরঞ্জন) এবং তাঁর একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী নষ্ট হয়ে যায়। তখন পরব্রহ্মের (দ্বিতীয় অব্যক্ত) এক হাজার যুগের দিন সমাপ্ত হয়। এতটাই রাত্রি সমাপ্ত হওয়ার পর ব্রহ্মকে (কাল) পূর্ণব্রহ্ম (পরমেশ্বর/ সত্য পুরুষ) পুনরায় প্রকট করেন। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৭ -এর ভাব এইপ্রকার জানবেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড ও এরমধ্যে বানানো লোকগুলির সীমা (গোলাকার প্রাচীর জানবেন) শেষ হয় না। তারপর এই এতটাই সময়ের পরে, এই কাল ও মায়াকে (প্রকৃতি/দুর্গা) পূর্ণ ব্রহ্ম (সত্যপুরুষ) নিজের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত সৃষ্টি কর্মের আধারে পুনরায় উৎপত্তি করেন এবং সমস্ত প্রাণী যারা কালের কারাগারে বন্দী হয়ে ছিল, তাদেরকে কর্ম আধারে শরীরের সৃষ্টি কর্ম নিয়ম দ্বারা রচনা করেন এবং মনে হবে যেন পরব্রহ্ম সৃষ্টি করছেন।

{এখানে গীতা অ. ১৫ শ্লোক ১৭ মনে রাখা উচিত, যেখানে বলা হয়েছে, উত্তম প্রভু তো অন্য কেউ আছেন, যিনি বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা, যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষণ করেন। এছাড়া গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোকে ৬১ -তে বলা হয়েছে যে, অন্তর্যামী পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণীদেরকে যন্ত্রের (মেশিনের) ন্যায় কর্মের ভিত্তিতে ভ্রমণ করান এবং প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত।

গীতার পাঠকগণ আবার ভ্রমিত হবেন যে, গীতা অ. ১৫ শ্লোক ১৫ -তে কাল (ব্রহ্ম) বলছেন, আমি সমস্ত প্রাণীদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি এবং আমি সর্ব জ্ঞান অপোহন ও বেদ প্রদানকারী।

হৃদয় কমলে কাল ভগবান মহাপার্বতী (দুর্গা) সাথে মহাশিব রূপে থাকেন এবং পূর্ণ পরমাত্মাও জীবাত্মার সাথে অভেদরূপে থাকেন, যেমন বায়ু গন্ধের সাথে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ কিন্তু কিছু গুণের পার্থক্য আছে। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ থেকে ২১ -তেও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এইভাবে পূর্ণব্রহ্মও প্রতিটি প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মার সাথে থাকেন, যেমন সূর্য দূরবর্তী স্থানে থাকা সত্ত্বেও তার উষ্ণতা ও আলোর প্রভাব প্রতিটি জীব হতে অভেদ এবং জীবাত্মার স্থানও হৃদয়ে আছে।

বিশেষ :- এক মহাব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ পরব্রহ্মের ১০০ যুগ পরে হয়, এতটাই বছর পর্যন্ত এক মহাব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হতে থাকে।

কালকে (ব্রহ্ম/জ্যোতি নিরঞ্জন) তো এরকম জানবেন, যেমন গ্রীষ্মের ঋতুতে রাজস্থান-হরিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশে বায়ু এক স্তম্ভের মতো (মাটিযুক্ত বায়ু) আকাশে খুব উঁচু পর্যন্ত দেখা যায় আর চক্রের মত ঘুরতে থাকে, যা অস্থায়ী কিন্তু গন্ধ তো বায়ুর সাথে অভেদ রূপে থাকে। এই প্রকার জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বুঝে নেবেন।

নিশ্চিতভাবে এটা জানবেন যে, সমস্ত প্রলয় এবং মহাপ্রলয়গুলির ক্রম পরমেশ্বর (সত্যপুরুষ/কর্বিদেব) দ্বারা ঘটবে। ব্রহ্মের এক হাজার যুগ যা পরব্রহ্মের এক রাত্রি, তা সমাপ্ত হওয়ার পর, কালের (জ্যোতি নিরঞ্জন) সৃষ্টি পুনরায় সত্যপুরুষ কবির্দেবের শব্দ শক্তি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের বিধান অনুসারে প্রারম্ভ হয়। এরপরে কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন), মায়া (প্রকৃতি/দুর্গা) ও অন্যান্য সর্ব প্রাণী সহিত অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) তিনি পূর্ণব্রহ্মের (সতপুরুষ) আদেশে কালের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে তাদেরকে পাঠিয়ে দেন এবং পূর্ণব্রহ্মের তৈরী বিধান অনুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অন্য সমস্ত কিছুর রচনা কবীর পরমেশ্বরের কৃপাতে হয়ে যায়। মায়া (প্রকৃতি) ও কালের (জ্যোতি নিরঞ্জন) সূক্ষ্ম শরীরের উপর নূরী শরীরও পূর্ণ পরমেশ্বরই রচনা করেন আর বাদবাকি উৎপত্তি, ব্রহ্ম (কাল) ও তাঁর স্ত্রী দুর্গার (প্রকৃতি) মিলনের দ্বারা করেন। অবশিষ্ট স্থান জ্যোতি নিরঞ্জন, পুনরায় পাঁচটি তত্ত্বের আধারে রচনা করেন। তারপর থেকে কালের (জ্যোতি নিরঞ্জন/ব্রহ্ম) দ্বারা সৃষ্টির সূচনা হয়। এইপ্রকার এই পরব্রহ্মকে দ্বিতীয় অব্যক্ত বলা হয়।}

"তৃতীয় দিব্য মহা প্রলয়"

যেমন পূর্বোক্ত বিবরণে পড়েছেন যে, সত্তর হাজার কালের (ব্রহ্ম) শিবরূপী পুত্রের মৃত্যুর পরে, এক ব্রহ্মের (মহাশিব) মৃত্যু হয়, তখন পরব্রহ্মের এক যুগ হয়। এই বিষয়ে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, ৯ এবং গীতা অ. ১০ শ্লোক ২ -তে গীতার জ্ঞানদাতা বলছেন যে, আমারও জন্ম-মৃত্যু হয়, অনেক জন্ম অতীত হয়ে গিয়েছে। যাকে দেবতাগণ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সহিত) ও মহর্ষিরাও জানেন না, কারণ তারা সকলেই আমা হতেই উৎপন্ন হয়েছে। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৯ -তে বলেছেন, আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য। পরব্রহ্মের এক যুগে কাল ভগবান সদাশিবওয়ালা শরীর ত্যাগ করে দেন এবং পুনরায় অন্য ব্রহ্মাণ্ডে অন্য তিন রূপ ধারণ করে বিরাজমান হয়ে যান, এই লীলা স্বয়ং করেন। পরব্রহ্মের

একটা দিন কাল ব্রহ্মের এক হাজার যুগ হয় ও এতটাই রাত্রি হয়। দিন রাত মিলে ত্রিশ দিনে যেমন এক মাস হয় আর বারো মাসে এক বছর হয়, ঠিক এইরূপ পরব্রহ্মের (দ্বিতীয় অব্যক্ত) একশো বছর আয়ু হয়। ওই সময় পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) মৃত্যু হয়। একে তৃতীয় দিব্য মহাপ্রলয় বলে।

তৃতীয় দিব্য মহা প্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অণ্ড যার মধ্যে ব্রহ্মের (কাল) একুশটি ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও অন্যান্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে, ধুন্ধুকারের শঙ্খ বাজবে। সমস্ত অণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু ওই তৃতীয় দিব্য মহাপ্রলয় দীর্ঘকাল পর্যন্ত হবে। সেই তৃতীয় (দিব্য) মহা প্রলয় সৎপুরুষের পুত্র অচিন্ত তার পিতা পূর্ণব্রহ্মের (সতপুরুষ) আজ্ঞায় সৃষ্টি কর্মের নিয়মানুসারে করবেন যা পূর্ণব্রহ্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আছে, এরপরে আবার সৃষ্টি রচনা হবে কিন্তু সতলোকে পৌঁছে যাওয়া হংসাত্মারা পুনরায় আর জন্ম-মৃত্যুতে আসবে না। এইপ্রকার না তো অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) অমর আর না কাল নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) অমর এবং না ব্রহ্মা (রজোগুণ), না বিষ্ণু (সত্ত্বগুণ) আর না শিব (তমোগুণ) অমর আছেন। তাহলে কীভাবে তাদের উপাসক (ভক্ত) সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে? অর্থাৎ কখনই নয়। এইজন্যই পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। যে উপাসনার মাধ্যমে জীবাত্মারা সতলোকে (অমরলোক) চলে যায়। সেখানে কখনও মৃত্যু হয় না, পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যায়। ওই পূর্ণ ব্রহ্ম (কবির্দেব) তৃতীয় শাশ্বত (সনাতন) অব্যক্ত আছেন। যা গীতা অ. ৮ শ্লোক নং ২০, ২১ -তে বর্ণনা রয়েছে। গীতা অ. ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ -তে এই বলা হয়েছে।

শ্লোক ১৬ :- এই সংসারে দুই পুরুষ আছেন, এক ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন/কাল ব্রহ্ম) ও দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং তাঁর লোকের সমস্ত প্রাণী বিনাশশীল। সবার আত্মাই অমর। আবার গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ -তে বলা হয়েছে, বাস্তবে পুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা তো উপরোক্ত ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ থেকে অন্যই আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষণ করেন। তিনিই বাস্তবে অবিনশ্বর।

"অমর করুঁ সতলোক পাঠাউঁ, তাঁতেঁ বন্দী ছোড় কহাউঁ।"

ওই পূর্ণ পরমাত্মার (অবিনশ্বর পরমেশ্বর) প্রমাণ রয়েছে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭, অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪, ১৫, অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৩, ১৯, ২৯, অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ২১, ২২, অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১২ থেকে ১৭ এবং ২২ থেকে ২৪, ২৭, ২৮, ৩০,৩১, ৩৪, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩১, ৩২, অধ্যায় ৫ শ্লোক ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৪-২৬ অধ্যায় ৬ শ্লোক ৭, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭ এবং অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১, ৬২ ও ৬৬ -তেও বিশেষরূপে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, ওই পূর্ণ পরমাত্মার শরণে যাওয়ার পর জীব আত্মারা কখনও আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে না।

{**বিশেষ :-** কালের জাল বোঝার জন্য এই বিবরণটি মনে রাখবেন যে, ত্রিলোকে একজন শিব আছেন, যিনি হলেন এই কালের পুত্র, তিনি ৭ ত্রিলোকীয় বিষ্ণুর মৃত্যু এবং ৪৯ ত্রিলোকীয় ব্রহ্মার মৃত্যুর পরে মারা যান। এমনই কাল ভগবান এক ব্রহ্মাণ্ডে তৈরি করা ব্রহ্মলোকে মহাশিব রূপেও থাকেন। পরমেশ্বর দ্বারা বানানো সময়ের বিধান অনুসার সৃষ্টি ক্রমের সময় বানিয়ে রাখার জন্য, এই ব্রহ্মলোকওয়ালা মহাশিবও (কাল) মৃত্যুবরণ করতে হয়। যখন সত্তর হাজার ত্রিলোকীয় কাল ব্রহ্মের পুত্র শিব মারা যান, তখন এক ব্রহ্মলোকীয় মহাশিব (ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার দ্বারা বানানো সময়ের বিধান অনুসারে মৃত্যু ও জন্ম হতে থাকে। এই ব্রহ্মলোকীয় শিবের (ব্রহ্ম/কাল) মৃত্যুর সময় পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) এক যুগ হয়। এইজন্য গীতা অ. ২ শ্লোক ১২, গীতা অ. ৪ শ্লোক ৫, গীতা অ. ১০ শ্লোক ২ তে বলা হয়েছে যে, আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আমি জানি কিন্তু তুমি জানো না। আমার জন্ম অলৌকিক (অদ্ভুত)।}

বিস্ময়কর উদাহরণ :- আদরণীয় গরীবদাস সাহেব ১৭১৭ সালে (বিক্রমী সংবত্ ১৭৭৪) পিতা শ্রী বলরামের ঘরে মাতা রানীর গর্ভে জন্ম নেওয়ার পর ৬১ বছর পর্যন্ত গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জরে ছিলেন এবং সন ১৭৭৮ সালে (বিক্রমী সংবত ১৮৩৫) শরীর ত্যাগ করেন। আজও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে তার মৃতদেহকে সম্মান পূর্বক মাটিতে দাফন করে রাখা হয়েছিল। ছয় মাস পরে ওই একই রূপের শরীর ধারণ করে আদরণীয় গরীবদাস সাহেব আরও ৩৫ বছর পর্যন্ত, তাঁর পূর্বের শরীরের শিষ্য ভূমড় সৈনী জীর নিকট সাহারনপুর (উত্তরপ্রদেশ) শহরে বসবাস করার পর শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁর শিষ্য হয়েছিল। সেখানেও আজ তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করা আছে, স্থান:- সাহারানপুর শহর, চিলকানা রোড থেকে কলসিয়া রোড শুরু হয়, কলসিয়া রোডে আধা কিলোমিটার হাঁটার পরে, বাম দিকে এই অদ্বিতীয় পবিত্র স্মৃতিসৌধটি বিদ্যমান রয়েছে এবং সেটির উপর এক শিলালিপিও লেখা রয়েছে যা প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তার সমাধির পাশে বাবা লালদাসের স্মৃতিও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(অধ্যায় নং 2)
"আল্লাহ পৃথিবীর উপর আসেন কি আসেন না?"

❖ মুসলিম ধর্মের উলেমা (বিদ্বান) বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে কখনই মানব সদৃশ রূপে আসেন না। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ শ্রীমদভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭ ও ৮ -তে যেমন বলা হয়েছে যে :-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি ভারতঃ। অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য তদা আত্মানাম্ সৃজামি অহম ॥৭॥

অর্থাৎ হে ভারত (অর্জুন)! যখন যখন পৃথিবীর উপরে অধর্ম বেড়ে যায় এবং ধর্মের হানি হয়, তখনই আমি আমার অংশ অবতার উৎপন্ন করি, সে পৃথিবীর উপর জন্ম নেয়।

অধ্যায় ৪ শ্লোক ৮ :-

পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

অর্থাৎ সাধু ও মহাপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য, দুষ্কৃতি (পাপকর্ম) কারীদের বিনাশ করার জন্য এবং সঠিকভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমি আমার অবতার উৎপন্ন করি।

এটা আমরা (মুসলমানরা) মানি না।

মুসলমান ধর্মের প্রচারকদের বক্তব্য, যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার **DVD Player** তৈরী করেছেন এবং সেটিকে কিভাবে চালাতে হয় তা বোঝানোর জন্য **User Manual** লিখে দিয়ে দিলেন। **Manual** টি পড়ুন এবং **DVD Player** টি চালান, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার কেন আসবেন?

এর অর্থ হল, পরমাত্মা (আল্লাহ) মানুষ (নারী ও পুরুষ) বানিয়েছেন। তারপর ধর্ম গ্রন্থ, যেমন পবিত্র কুরআন, বাইবেল (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল) আল্লাহ ম্যানুয়েল হিসেবে নাজিল করেছেন। এইগুলো পড়ুন এবং নিজের ধর্ম-কর্ম করুন।

এই দাসের (রামপাল দাস) যুক্তি :- যদি জনসাধারণ ম্যানুয়েল টি না বুঝতে পারেন কিংবা তার DVD Player যদি কাজ না করে, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে ম্যানুয়েল বোঝানোর জন্য আসবেন। যেমন আল্লাহ কবীর তিনি সূক্ষ্মবেদ রূপী সম্পূর্ণ জ্ঞান (Manual) কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জনের) কাছে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সূক্ষ্ম বেদের সম্পূর্ণ জ্ঞান না দিয়ে, অসম্পূর্ণ জ্ঞান চার বেদ, গীতা, কুরআন, জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল, এই চার গ্রন্থ ও অন্য ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন। সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান রূপী Manual-টি ঠিকভাবে না বুঝে, সর্ব ধর্মের ব্যক্তি, শাস্ত্রের বিপরীত সাধনা করতে লাগলেন। তখন কাদির আল্লাহ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান (সূক্ষ্মবেদ) রূপী Manual নিয়ে আসেন। এইপ্রকার তিনি যুগে যুগে নিয়ে আসেন এবং ভাল আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভক্তির জট-পাকানো জ্ঞানকে সরল করে তাদের যথার্থ আধ্যাত্ম জ্ঞান বলেন। তারপর সেই সকল সন্ত নিজের ভুল সাধনাকে ত্যাগ করে, সত্য ভক্তি করে মোক্ষ লাভ করেন।

{কুরআন মজিদের সূরা আল হাদীদ ৫৭ আয়াত নং ২৬-২৭-তে, কুরআনের জ্ঞান প্রদানকারী বলেছেন যে, 'রহবানিয়তের (সন্ন্যাসের) প্রথা তারা (কিছু সাধক) নিজেরাই আবিষ্কার করেছেন। আমি তাদের জন্য এটি অনিবার্য করিনি। কিন্তু তারা আল্লাহকে খুশী ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের আশায়, তারা নিজেরাই এই নতুন নিয়ম চালু করেছে"। এটি ওই মুসলমান ফকিরদের ও পবিত্র সৎ আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যাদের সঙ্গে কাদির আল্লাহ নিজের নবী স্বয়ং নিজেই সেজে সাক্ষাৎ করতেন আর তাদেরকে সঠিক ও সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতেন। এরপর তারা সেই সাধনা শুরু করে তাদের নিজের ধর্মের প্রচলিত ইবাদত ত্যাগ করেন, এরপরে নিজের ধর্মের লোকেরাই তাঁদের বিরোধিতা করতেন। যার কারণে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করে তাদের নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থের বিপরীত ইবাদত করানোর জন্য তার নবীকে পাঠাতে থাকেন। তপস্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং কঠোর সাধনা করার প্রেরণাও তিনি দেন। পূর্ণ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি করার ইচ্ছায় তাঁরা এই কঠিন সাধনা করতে থাকে। পূর্ণ পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যথার্থ সহজ মন্ত্রের জপ করার বিধি এবং সঠিক ইবাদত (পূজা) বিধি বলেন।}

উদাহরণের জন্য :-

১. শেখ ফরিদ পূর্বে মুসলিম ধর্মের প্রচলিত সাধনা করতেন। পরে এক তপস্বী ফকিরের পরামর্শ অনুসারে ভুল সাধনা করছিলেন। একদিন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিন্দা বাবার রূপে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ও সঠিক ভক্তির বিধি বললেন, এই কারণে পরে তাঁর কল্যাণ হয়েছিল। {শেখ ফরিদের বিষয়ে পড়ুন অধ্যায় "অল-খিজ্রের (অল-কবীর) পরিচয়", 133 পৃষ্ঠায়}

২. ধর্মদাসের (বান্ধবগড় নিবাসী, মধ্যপ্রদেশ) সাথে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করেছিলেন, যিনি শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু)

এবং শ্রীশিবকে পূর্ণ পরমাত্মা মনে করে, তাঁদেরই ভক্তির প্রতি দৃঢ় ছিলেন। ধর্মদাস যে সময় মথুরা (ভারত) শহরে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, তখন পূর্ণ ব্রহ্ম (পূর্ণ পরমাত্মা/কাদির আল্লাহ) জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওই সত্য মালিকের (নিজেই নিজের) পরিচয় ও সত্য সাধনার বিধি বলেছিলেন। পরে ধর্মদাস তার পূর্বের ভুল ধারণা ও ভুল সাধনা (ইবাদত) ত্যাগ করে, কবীর পরমাত্মার দ্বারা বলা সত্য সাধনা করে নিজের মানবজীবনকে সফল করেছিলেন।

৩. দাদু দাসের সাথেও পরমাত্মা কবীর সাহেব সাক্ষাৎ করে, তাঁকেও সত্য ভক্তি করিয়ে তাঁর কল্যাণ করিয়েছিলেন।

৪.স্বামী রামানন্দ মহর্ষির সাথে কাশী (ভারত) শহরে দেখা করেছিলেন। যখন আল্লাহ তায়ালা কবীর সাহেব পৃথিবীতে লীলা করার জন্য একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। স্বামী রামানন্দ অসম্পূর্ণ Manual অর্থাৎ চার বেদ ও গীতার জ্ঞান ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তিনি শ্রী বিষ্ণুকে পূর্ণ পরমাত্মা মনে করে ভুল সাধনা করছিলেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর কবীর সাহেব বেদ এবং গীতা থেকেই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তাহলে গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ -তে গীতা জ্ঞান দাতা নিজেকে নিজেই বলছেন যে, তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে রয়েছেন অর্থাৎ তাঁরও জন্ম-মৃত্যু হয়। তিনি বিনাশশীল।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭, অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ -তে, অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১, ৬২ -তে এবং অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, ৮, ১০ এবং ২০, ২২ -তে গীতার জ্ঞানদাতা স্বয়ং নিজের থেকে অন্য অবিনাশী অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষদায়ক পরম অক্ষর ব্রহ্মের বিষয়ে বলেছেন এবং তাঁরই (পূর্ণ পরমাত্মা) শরণে অর্জুনকে যেতে বলেছেন।

স্বামী রামানন্দ বেদ ও গীতাকে অর্থাৎ Manual -কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। সেই Manual -টি সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা কবীর পরমেশ্বরকে এই পৃথিবীতে এসে সম্পূর্ণ (সূক্ষ্মবেদ) আধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান বলতে হয়েছে। তারপর স্বামী রামানন্দ হিন্দু ধর্মের ভুল সাধনা ত্যাগ করে, যথার্থ ভক্তি করে নিজের কল্যাণ করিয়েছিলেন।

❖ সন্ত গরীবদাস জীর {গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়ানা (ভারত)} সঙ্গেও পূর্ণ ব্রহ্ম জিন্দা বাবার বেশে সতলোক (সনাতন পরম ধাম) থেকে পৃথিবী লোকে এসে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে উপরের আকাশে ওই অমরলোকে নিয়ে গেলেন যে স্থানে কাদির আল্লাহ সিংহাসনের উপর বসে থাকেন। নিজের সাক্ষী বানিয়ে পুনরায় তাঁর দেহে ফিরিয়ে দিলেন এবং যথার্থ আধ্যাত্ম জ্ঞান অর্থাৎ সম্পূর্ণ ও সঠিক Manual দিয়েছিলেন। যা সন্ত গরীবদাস তাঁর বাণীতে (অমর গ্রন্থ) লেখেন। যার আধারে এই দাস (লেখক) সমস্ত ধার্মিক ক্রিয়াকর্ম স্বয়ং করেন ও অন্যকে করান।

➪ বাইবেলে (যা তিনটি পুস্তক জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিলের সংগ্রহ, তার) ৩০ নং পৃষ্ঠায় উৎপত্তি অধ্যায় নং ২৬:১-৩ এ প্রমাণ রয়েছে, যহোবা (পরমাত্মা/আল্লাহ) ইসহাককে দর্শন দিয়ে বললেন, "মিশরে যেও না। আমি যে দেশের কথা বলব, সেখানে থেকো, আমি তোমার সাথে থাকব।"

➪ বাইবেলে উৎপত্তি অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ১৭ তে "বাচা কা চিহ্ন খতনা"তে লেখা আছে যে :- যখন অব্রাহামের বয়স নিরানব্বই বছর হয়ে যায়, তখন যহোবা (প্রভু/যিহোবা) তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে, "আমি সর্বশক্তিমান। আমার উপস্থিতিতে চল এবং সিদ্ধ হতে যাও।"

❖ তৈমুরলঙ্গের সাথে কাদির আল্লাহ পৃথিবীতে সাক্ষাৎ করেছিলেন :- তৈমুরলং মুসলমান খুবই দরিদ্র ছিলেন। তার মা খুবই ধার্মিক ছিলেন। তিনি অতিথি ও সাধু-সন্তদের অধিক সেবা করতেন। কখনো কখনো নিজে ক্ষুধার্তও থেকে যেতেন। তিনি পথিক ও অতিথিদের রুটি দ্বারা ভোজন অবশ্যই করাতেন। একদিন এমন হল যে, ঘরে একটি রুটির আটা ছিল। মাতা তার ছেলে তৈমুরলঙ্গের জন্য রুটি বানিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ তার ছেলে মহাজনদের ছাগল-ভেড়া চরাতেন। মা নিজেও ক্ষুধার্ত ছিলেন। ছেলে তৈমুরলঙ্গ যখন খাবার খেতে শুরু করলেন, ঠিক ওই সময়ে আল্লাহ তায়ালা এক জিন্দা ফকিরের রূপ ধারণ করে রুটি চেয়ে বললেন, পুত্র! অনেক দিন ধরে ক্ষুধার্ত আছি। অনেক লোকের নিকট ভোজন চেয়েছি কিন্তু কেউ দেয়নি, প্রাণটা মনে হয় চলেই যাবে। {তৈমুরলঙ্গের মধ্যে তাঁর মায়ের গুণও ছিল। পিতা-মাতার নিকট হতে তিনি ভাল সংস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল।} তৈমুরলঙ্গ ওই সময়ই সেই রুটি জিন্দা বাবাকে দিলেন। আল্লাহ কবীর রুটি খেয়ে, জল পান করলেন। যখন কাদির আল্লাহ রুটি খাচ্ছিলেন, তখন মা-ছেলে দুজনেই প্রার্থনা করলেন, হে বাবা! আমরা খুব গরীব। এতটুকু দাও, যাতে আমরা ক্ষুধার্ত না থাকি আর অতিথিরাও যেন ক্ষুধার্ত না থাকে। বেশ কয়েকবার এই প্রার্থনা করলেন। তৈমুরলঙ্গের কাছে গরু, মহিষ, ছাগল বাঁধার এক বড় লোহার শিকল (chain) রাখা ছিল, খাবার খাওয়ার পর, জিন্দা ছদ্মবেশী আল্লাহ কবীর শিকলটি তাঁর নিকট হতে নিয়ে তিন ভাঁজ করে, প্রেমের সহিত তৈমুরলঙ্গের কোমরে সেই শিকল দিয়ে গুনে গুনে সাতবার

আঘাত করলেন (যেমন এক, দুই, তিন... সাত।) পরে লাথি ও ঘুষিও মারলেন।

তৈমুরলঙ্গের মা ভাবলেন, আমরা বারংবার প্রার্থনার করার কারণে ফকির বাবা হয়তো বিরক্ত হয়ে রেগে ছেলেকে মারছেন। তিনি বললেন, হে মহারাজ! হে আল্লাহর জাত! আমার ছেলে কি দোষ করেছে? আপনি ক্ষমা করে দেন, আপনারই তো সন্তান। তখন ছদ্মবেশী জিন্দা বাবা বললেন, মা! যে সাত শিকল মেরেছি, তা হল তোর ছেলের হাতে আমি সাত প্রজন্মের শাসনকাল দিলাম আর যে লাথি-ঘুষি মেরেছি, তার অর্থ হল সাত প্রজন্মের পর তোমাদের শাসন টুকরো টুকরো হিসাবে ভাগ হয়ে যাবে। এ কথা বলে জিন্দারূপী বাবা কাদির আল্লাহ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন সেই সময় এল তৈমুরলঙ্গ রাজা হলেন এবং ভারতের উপরও দখল করলেন। তৈমুরলঙ্গ থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত, সাত প্রজন্ম (বংশধর) দিল্লির শাসন করেছেন। এরপর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভাগও হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস এর সাক্ষী।

❖ শ্রী নানকদেবের (শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা) সাথেও আল্লাহ আকবর (কবীর পরমেশ্বর) সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রী নানক দেব, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন। হিন্দু ধর্মে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার পাঠ করতেন। ব্রজলাল পান্ডে তাঁকে গীতা পড়াতেন। পরমেশ্বর কবীর তাঁর সঙ্গে সুলতানপুর লোধী শহরের নিকট এক বেঈ নদীর তীরে সকালে সাক্ষাৎ করেন, তাঁকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান রূপী Manual দিয়েছিলেন। তাঁকে সচ্চখন্ডে (সতলোকে) ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর শ্রী নানকদেব হিন্দু ধর্মে প্রচলিত সমস্ত পূজা ত্যাগ করে কেবল এক পরমেশ্বরের (সৎপুরুষ) ইবাদত করে তাঁর জীবন সফল করেছিলেন।

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা কবীর সকলের উৎপত্তিকর্তা মানুষের মতো পৃথিবীতে ভ্রমণ করে যথার্থ আধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান দেন। এর সঙ্গে সম্বন্ধিত প্রকরণ অধ্যায় "অল-খিজ্রের (অল কবীর) পরিচয়" এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং. 133 বিস্তারপূর্বক লেখা আছে।

"মুসলিম ধর্মের মাওলানাদের শঙ্কার সমাধান"
"বাখবর কে? আল্লাহর নাম কি?"

❖ গুরুদেব শ্রী রামপাল দাসের নিকট তাঁর সেবকদের নিবেদন হল এই যে, আমরা যখন মুসলিম বিদ্বানদের সাথে জ্ঞান চর্চা করি, তখন তাঁরা আমাদের নিকট কিছু প্রশ্ন করেন, যার সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারিনা। কৃপা করে তাঁদের ওই সকল প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাদের বলে দিন, আমরা তাঁদের ওই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেব? তাঁদের প্রশ্নগুলি এইপ্রকার :-

প্রশ্ন :- যদি খুদা (আল্লাহ) সাকার রূপে অর্থাৎ স্বশরীরে আছেন এবং তাঁর নাম যে কবীর, এর প্রমাণ কোথায় রয়েছে?

❖ **রামপাল দাস বললেন :-** তাঁদের ওই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দাও :-

উত্তর :- খুদা সাকার আছেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালাকে নিরাকার বলা হয়নি কিন্তু মুসলিম ধর্মগুরুদের ওই কাদির আল্লাহর (পরমাত্মার) ইলম (জ্ঞান) না থাকার কারণে এই পরবরদিগারকে বেচুন অর্থাৎ নিরাকার বলেন। কুরআন মজিদে আল্লাহ তালাকে স্বশরীর অর্থাৎ দৃশ্যমান (সাকার) হিসাবে বর্ণনা করেন। অধিক তথ্য জানার জন্য পড়ুন এই পুস্তকের অধ্যায় "হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত" 96 নং পৃষ্ঠায়।

উদাহরণ স্বরূপ প্রমাণ দেখুন :-

কুরআন মজিদের সূরাঃ লুকমান ৩১ আয়াত নং ২৭-২৯ :- এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ শোনেন এবং দেখেন।

কুরআন মজীদের সূরাঃ হজ্জ - ২২ আয়াত ৬১ :- এখানেও খুদাকে অধিক মহিমান্বিত এবং বড় (কবীর) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

সূরা মু'মিন - ৪০ আয়াত নং ১২- তে কবীরের অর্থ বড় লেখা হয়েছে, যেখানে কেবল কবীর লেখা উচিৎ ছিল। এই আয়াতগুলির থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ সাকার অর্থাৎ জিস্মানী (স্বশরীর)। এই ইলম (জ্ঞান) না হওয়ার কারণে মুসলিম ধর্মগুরুরা, আল্লাহর প্রকৃত নাম কবীরের অর্থকে বড় করে দিয়েছেন, যা একেবারে ভুল। মুসলিম প্রবক্তারা এটা তো স্বীকার করছেন যে, আল্লাহ একবার পৃথিবীর উপর ও জলের উপরে ঘোরাফেরা করেন। পৃথিবী, আকাশ, সমস্ত গাছ-গাছালি, মানুষ ও পশু-পাখি ইত্যাদি তিনি সৃষ্টি করে, আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছেন। এতে তো স্পষ্টভাবে প্রমাণ হল যে, পরমেশ্বর সাকার মানব সদৃশ্য আছেন। অতএব সিংহাসনের উপর মানবই বসেন। বাইবেল গ্রন্থের উৎপত্তি অধ্যায়ে স্পষ্টই রয়েছে যে, সকলের উৎপত্তিকারী কাদির আল্লাহ মানুষকে নিজের আকৃতির মতো বানিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হল যে, আল্লাহ (God) নরাকার (মনুষ্যসদৃশ)। এটাও প্রমান হল যে, খুদা (পরমেশ্বর) নরাকার অর্থাৎ শারীরিক আকারে আছেন। তাঁর নাম হল 'কবীর'। যাকে কুরআনের অনুবাদকরা অর্থ 'বড়' লিখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ :-

সূরাঃ মু'মিন - ৪০ আয়াত ১২ :- জালিকুম্ বিঅন্নহূ ইজা দুঅই-য়ল্লাহু বহদহূ ক-ফর্ তুম ব ইনয্যুশ্'- রক্ বিহী তুঅ্মিনূ ফলহুক্ম লিল্লাহিল্ অলিয্যি'ল্ - কবীর ॥১২॥

মুসলমানদের করা অনুবাদ :- এটা এই জন্য যে, যখন এক খুদাকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর যখন তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হতো, তখন মেনে নিতে। সুতরাং আদেশ তো খুদারই, যিনি (সব থেকে) উপরে (আর সবার) বড়। (১২)

সূরাঃ মু'মিন ৪০ আয়াত ১২ -এর রামপাল জী দ্বারা সঠিক অনুবাদ :- (মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন যাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে, তারপর তাদের বলা হবে যে,) যখন তোমাদের এক খুদার ইবাদত করতে বলা হতো, তখন তোমরা অস্বীকার করে দিতে। (তখন) খুদা ব্যতীত অন্য দেব বা মূর্তির পূজা করতে বললে, তখন মেনে নিতে। ওই আদেশ (খুদা ব্যতীত অন্যকে পূজা না করার আদেশ) তো সর্বোপরি খুদা কবীরেরই। (১২)

ভাবার্থ :- মূর্তি পূজনকারীদের কবীর খুদার আদেশ বলা হত যে, এক ওই কবীর কাদির খুদার ইবাদত করো, তখন তোমরা অস্বীকার করতে। আজ জাহান্নামে ফেলে দেওয়ার আদেশও ওই সর্বোচ্চ খুদা কবীরেরই। মুসলমান অনুবাদকরা "কবীর" যে নামটি খুদার, তার অর্থ "বড়" করেছেন। যেহেতু "সবার উপরে খুদা" -এর অর্থও বড় হয়। তাহলে কবীরের অর্থ করা উচিৎ নয়। সব থেকে উপরের অর্থ বড়ই হয়, তাহলে "সব থেকে উপর বড়" অর্থ করা অনুচিত। ইনি সর্বোচ্চ অর্থাৎ সব থেকে বড় খুদা কবীরেরই হুকুম আছে, এই অর্থটি সঠিক।

আরও দেখুন :- সূরাঃ সাবা ৩৪ আয়াত নং ২৩ :- ব লা তনফউশ্- শফাঅতু অইন্দহূ ইল্লা লিমন্ অজি- ন লহূ হত্তা ইজা ফুজ্জি-অন্ কুলূবিহিম্ কালূ মাজা কা-ল রব্বুকুম্ কালুল্'হক্-ক ব হুবল্- অলিয্যুল্-কবীর ॥২৩॥

মুসলিম বিদ্বানদের দ্বারা করা হিন্দি অনুবাদ (সূরাঃ সাবা ৩৪ আয়াত নং. ২৩) :- আর খুদার ওই স্থানে (কারোর জন্য) সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, কিন্তু তার জন্য যাদের বিষয়ে তিনি অনুমতির কৃপা করেন, এমন কি, যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন পরস্পর বলাবলি করে, তোমাদের রব কি বললেন? ফেরেশতা বলবেন, যা সত্য (তাই বলেছেন) আর তিনি সমুচ্চ, অনেক বড়। (২৩)

এর সঠিক অনুবাদ :- (রামপাল দাস দ্বারা করা হয়েছে)

সূরাঃ সবা – ৩৪ আয়াত নং ২৩ :- আর খুদার ওই স্থানে কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যে যেমন কর্ম করে এসেছে, সে তার কর্ম ফল অবশ্যই পাবে কিন্তু অনুমতি তার জন্য, যার বিষয়ে তিনি কৃপা করবেন। এমনকি যতক্ষণ না তাদের অন্তরের অস্থিরতা দূর করে দেওয়া হবে, ততক্ষণ তারা বলবে যে, আপনাদের পরবরদিগারের পক্ষ থেকে কি আদেশ আছে? ফেরেশতা বলবেন, যা সঠিক (তাই বলেছেন), অর্থাৎ সবাইকে সবার ক্রিয়াকর্মের ফল দেওয়া হোক। ওই কবীর পরবরদিগার সর্বোচ্চ শক্তিযুক্ত অর্থাৎ কবীর খুদা সর্বশক্তিমান। (২৩)

এখন দেখুন সূরাঃ মুলক-৬৭ আয়াত নং ৯ :-

আয়াত নং ৯ :- কালূ বলা কদ্ জা- অনা নজীরুন্ ফ-কজ্জব্'না ব কুল্'না মা নজ্জ-লল্লাহু মিন্ শৈইন্ ইন্ অন্তুম্ ইল্লা ফী জলালিন্ কবীর ॥৯॥

মুসলমান বিদ্বানের দ্বারা করা অনুবাদ :-

আয়াত নং ৯ :- তারা বলবে কেন নয়, অবশ্যই সতর্ককারী এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম আর বলেছিলাম যে, খুদা তো কোনো কিছুই নাজিল করেন নি। তোমরা তো বড় ভুলে রয়েছ। (৯)

অনুবাদ করেছেন মুসলিম পণ্ডিত:-

{এই অনুবাদকর্তা এই আয়তের অনুবাদেও "কবীর" এর অর্থ "বড়" করে দিয়েছেন।}

সূরাঃ মুলক-৬৭ আয়াত নং. ৯ :- (রামপাল দাসের দ্বারা সঠিক অনুবাদ) :- আয়াত নং ৯ এর পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, যিনি কুরআনের জ্ঞান প্রদানকারী নবী, তাকে লোকেরা বলে যে, তুমি মিথ্যা বলছো আর আল্লাহর নির্দেশ পালন না করে ভুল সাধনা করলে মরবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে (নরকে) নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাকে জাহান্নামের দারোগা (অধিকারী) জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি পথপ্রদর্শক রসূল (Messenger) আসেন নি? তোমরা ভুল কাজ করেছো আর কষ্ট ভুগতে এসে গিয়েছো।

এই আয়াত নং ৯ -তে বলা হয়েছে, "তারা বলবে যে, পথপ্রদশক অর্থাৎ নবী তো এসেছিলেন। আমরা তাঁকে এই বলে অস্বীকার করে দিয়েছি যে, কবীর আল্লাহ তো কোনো কিছুই (যেমন তুমি বলছো) নাজিল করেন নি, তুমি ভুল বলছো।

বিশেষ :- 'কবীর' আরবী ভাষার শব্দ মানা হয়, যার অর্থ 'বড়' হয়। যেমন যে কোনো শব্দের অর্থ তো হয়েই থাকে। যেমন "সূর্য, প্রকাশ" এক দেশের রাজার নাম ছিল। তার বিষয়ে মহিমা করে বলা হয়েছিল যে, রাজা সূর্য প্রকাশ নিজের নাগরিকদের ভালোর জন্য অনেক কাজ করেছেন। ন্যায়পরায়ণ এবং সৎ রাজা ছিলেন। এই মহিমা (রাজার মহিমা) দোহা, সাখী ও কবিতার আকারে ছিল। এখন যদি কেউ তার অনুবাদ করেন আর তার অনুবাদে "সূর্য প্রকাশ" এর অর্থ যদি "সূর্যের আলো" করে দেন আর "সূর্য প্রকাশ" না লেখেন, তাহলে এটা কি করে বোঝা যাবে যে, ওই দেশের রাজার নাম কী ছিল? যিনি জনস্বার্থের কল্যাণে অনেক কাজ করেছিলেন। উপরের আয়তগুলিতে যদি আল্লাহর সম্বন্ধিত প্রকরণ না হতো, অন্য কোনো প্রকরণ হতো যেমন, কোনো নেশা নিষেধের বিষয়ে বা ধর্মীয় কাজের বর্ণনা হতো এবং তার মধ্যে কবীর শব্দ হতো আর তার অর্থ ওই স্থানে "বড়" করতেন, তাহলে ঠিক ছিল কিন্তু এখানে পরমাত্মার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এইজন্য এখানে যদি কবীরকে কবীরই লিখে দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর নাম স্পষ্ট হয়ে যায়, যেটা (লেখা আবশ্যক) অনিবার্য ছিল এবং গ্রন্থের সার্থকতাও স্পষ্ট হয়ে যেত। আরও পড়ুন :-

সূরা: ফাতির (ফাতিহা) – ১ আয়াত নং. ১ – ৭ :- বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম

এখানে খুদাকে (কাদির আল্লাহকে) রহীম বলা হয়েছে। রহীমের অর্থ হল যিনি অসীম দয়ালু (রহম করেন)। এই আয়াতের হিন্দি অনুবাদ :- "শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি অসীম করুণাময় এবং পরম দয়ালু।"

এখানে কবীর নাম মূল পাঠে নেই কিন্তু ওই পরম দয়ালু যিনি আছেন তাঁর নাম কবীর, এটাও লেখা উচিত।

সন্ত রামপালজী মহারাজ বাখবর (তত্ত্বদর্শী সন্ত) দ্বারা বলা জ্ঞানকে বুঝে, আজ বিশাল জনসমুদয় তাদের রহমান কাদির আল্লাহ (প্রভু) কবীরকে চিনতে পেরেছেন ও সত্যভক্তি করছেন অর্থাৎ তারা যথার্থ ইবাদত (উপাসনা) করছেন।

এই আয়তের সঠিক তর্জুমা (অনুবাদ) এই প্রকার :- শুরু করছি আল্লাহর তালার নামে, যে কবীর বড় দয়ালু ও অসীম করুণাময়। তিনি হলেন আল্লাহ কবীর, যিনি সমস্ত কিছুর জ্ঞাতা এবং যাঁর মধ্যে এসব গুণ রয়েছে।

গুরুত্ব পূর্ণ :- সূরাঃ ফাতিহা - ১ এ ৭ টি আয়াত আছে। মুসলিম সমাজ বলেন যে, এই কুরআনের জ্ঞান যিনি পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাদের রব। তাঁরই দেওয়া জ্ঞান জিব্রাইল ফেরেশতা পরিবর্তন না করেই অর্থাৎ বদলা-বদলী না করেই ঠিক-ঠাক তেমনটিই হজরত মুহম্মদকে দিয়েছেন।

কুরআনের জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, "শুরু করছি আল্লাহর তালার নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।" (যদি এই অনুবাদে এমনটি লিখে দেওয়া যায় যে, "শুরু করছি কবীর আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু", তাহলে আরও স্বার্থকতা হয়ে যেতো।)

আয়াত নং. ১ :- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের রব (সকলের পালনকর্তা)।

আয়াত নং. ২ :- (তিনি) বড়ই করুণাময় ও অতি দয়াবান।

আয়াত নং. ৩ :- অন্তিম দিনের বিচারের মালিক। (সকলের কৃতকর্মের লেখা-জোখা তিনিই করেন, তাঁরই অধীনে রয়েছে।)

আয়াত নং. ৪ :- আমরা আপনারই ইবাদত (পূজা) করি এবং আপনারই সাহায্য চাই।

আয়াত নং ৫ :- আমাকে সরল পথ দেখান।

আয়াত নং. ৬ :- ওই সকল ব্যক্তিদের মার্গ, যারা আপনার বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন।

আয়াত নং. ৭ :- যারা আপনার (ভয়ংকর) প্রকোপের অংশীদার হন নি এবং পথভ্রষ্টও হন নি।

❖ **বিশেষ :-** এই সূরাতে কুরআনের জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য সকলের মালিককে (কাদির আল্লাহ) ইবাদত করতে বলছেন। তাঁর মহিমা বলছেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা করছি, যিনি সমস্ত জগতের (রব) পালনহার সৃজনহার মালিক। ওই (কবীর) বড় করুণাময় ও অসীম দয়া করে থাকেন। সর্ব কর্মের হিসাব তিনিই করেন। তাঁরই নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার ইবাদত করা ব্যক্তিদেরকে, সত্য ভক্তির মার্গ বলুন।

❖ **বিচার করুন :-** আল্লাহর কোনো নামও তো আছে, সেই নাম লেখাটাও অনিবার্য। যেমন প্রধানমন্ত্রীর মহিমা বললে, তার নামও উল্লেখ করতে হয়। মুসলমান প্রচারকরা এই ভুলটিই করেছেন। যে সাধকগণ অর্থাৎ সাধু-মহাপুরুষদের সঙ্গে আকাশের সিংহাসন (তখত) থেকে ওই আল্লাহ দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং সঠিক জ্ঞান দিয়েছিলেন আর নিজের ধামও দেখিয়েছেন, যেখানে তাঁর সিংহাসন (তখ্‌ত) আছে, যা অন্য জান্নাত (স্বর্গ) থেকেও উত্তম জান্নাত (সতলোক)। ওই সন্তদের পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই মহান আত্মারা তাঁদের নিজের চোখে দেখা আল্লাহর স্বরূপ, নাম ও স্থান বলেছেন। আমাদের ওই মহাপুরুষদের উপর বিশ্বাস করা উচিত।

জিব্রাইল ফেরেশতা হজরত মুহম্মদকে যে আল্লাহর নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তো নবী মুহম্মদকে দর্শনও দেননি।

পর্দার আড়ালে থাকা ওই আল্লাহর সম্পর্কে সাধু-মহাত্মারা বলেছেন যে, তাঁর নাম হল জ্যোতি নিরঞ্জন কাল। যিনি সকল জীবকে নিজের জালে ফাঁসিয়ে রেখেছেন। তিনি প্রাণীদের ভ্রমিত করে রাখেন, কখনও সঠিক ও স্পষ্ট জ্ঞান দেন না, অসম্পূর্ণ জ্ঞান দেন। কেননা এই জ্যোতি নিরঞ্জন কাল (প্রভু) অভিশপ্ত হয়ে রয়েছেন, এক লাখ মানবকে প্রতিদিন আহার করার। অধিক জানতে হলে পড়ুন, এই পুস্তকের "সৃষ্টি রচনা" নামের অধ্যায়ে 181পৃষ্ঠায় সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

❖ সন্ত রামপাল দাস গুরুদেবের নিকট নিবেদন হল এই যে, আমরা যখন কোনো মৌলবীর কাছে জ্ঞান চর্চা করি, তখন তিনি এমন প্রশ্ন করেন, যার উত্তর আমরা সঠিকভাবে দিতে পারি না। কৃপা করে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর বলুন, আমরা এর কি উত্তর দেব?

প্রশ্ন :- যদি খুদা কবীর হন, তাহলে আপনারা বাখবর সন্ত রামপাল মহারাজের পূজা অর্থাৎ ইবাদত কেন করেন? আমাদের অন্য অনেক মুসলমান ভাইদের কথা হল এই যে, যদি খুদা কবীর সাহেব হন, তাহলে আপনারা সন্ত (বাখবর) রামপাল মহারাজের ফটোকে ইবাদত (পূজা) কেন করেন?

❖ **রামপাল দাস বললেন :-** তাদেরকে উত্তর এইভাবে দাও :-

উত্তর :- প্রথমে আপনি এটা বুঝবেন যে, পূজা (ইবাদত) ও সৎকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

শোনো! যেমন স্ত্রী তার নিজের স্বামীর জন্য সমর্পিত হয়, তার পূজা করেন কিন্তু সৎকার ও আপ্যায়ন সবার করেন, সালামও সবাইকে জানান। কাউকে সৎকার করা পূজার মধ্যে গণ্য হয় না। যে মহাপুরুষ সত্য খুদার সত্য মার্গ বলেন, তিনি মানবের মহা উপকার করেছেন। তাঁর সৎকার করা আমাদের কর্তব্য।

আপনারা (মুসলমান) চারটি কিতাবকে তো সত্য বলে মানেন: **১. কুরআন, ২. তৌরাত, ৩. জবুর, ৪. ইঞ্জিল** {বাইবেলে এই তিনটি কিতাব তৌরাত, জবুর এবং ইঞ্জিল একত্রে আবদ্ধ করা হয়েছে। বাইবেল কোনো পৃথক গ্রন্থ নয়।} আপনারা বাইবেলে সৃষ্টি রচনা পড়েছেন, যা তৌরাত পুস্তকে লেখা রয়েছে। তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর "আদম"কে মাটি দিয়ে উৎপন্ন করেছেন। তারপরে সকল ফেরেশতাদেরকে ডেকে বললেন যে, "আদম" নামের মনুষ্যকে সিজদা (প্রণাম) করো। এক ইবলিস নামের ফেরেশতা সিজদা না করে বললেন, এ তো মাটির তৈরি মনুষ্য। আমি এর সামনে মাথা নত করবো না। বারংবার অনুরোধ করার পরও সে পরমেশ্বরের আদেশ মানলেন না, তখন পরমেশ্বর তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। পরে তার নাম শয়তান হয়। অন্য সকল ফেরেশতারা পরমেশ্বরের আদেশ পালন করেছিলেন, তাই তারা জান্নাতে সুখে রয়েছেন। কাদির খুদা কবীরের আদেশেই সন্ত রামপালজী মহারাজ আমাদের গুরুদেব, এইজন্য আমরা তাঁকে দণ্ডবৎ (প্রণাম) করি। ওই পরমেশ্বরের (খুদা কবীর) সূক্ষ্ম বেদে (কলাম-এ-কবীর) -তে এই আদেশ রয়েছে, যা এই প্রকার :-

কবীর, গুরু গোবিন্দ কর জানিয়ে, রহিয়ে শব্দ সমায়। মিলৈ তো দণ্ডবৎ বন্দগী, নহীঁ পল-পল ধ্যান লগায়॥

কবীর, গুরু মানুষ কর জানতে, তে নর কহিয়েঁ অন্ধ। হোবেঁ দুখী সংসার মেঁ, আগৈ যম কে ফন্দ॥

অর্থাৎ সৃষ্টির রচনহার ও পালনকর্তা আল্লাহ কবীরের আদেশ আছে যে, নিজের গুরুকে খুদা (গোবিন্দ) মানবে আর তাঁর আদেশ পালন করবে। যখন আশ্রমে তাঁর দর্শনে যাবে অথবা কোনো স্থানে দর্শন হয়, তখন নিজের গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। বাকি সময়ে তার অনুগ্রহ স্মরণ রাখবেন। যারা গুরুজীকে মানব তুল্য মনে করে, পরমাত্মার তুল্য সম্মান দেয় না, তারা তত্ত্বজ্ঞান না জানা নেত্রহীন (অন্ধ) জানবে, তারা সংসারেও দুঃখী থাকবে। তারপর যমরাজের ফাঁদে অর্থাৎ দোজখে পড়বে।

গুরুজীর অবদান বলা হয়েছে যে :-

কবীর, সতগুরু কে উপদেশ কা সুনিয়া এক বিচার। জৈ সতগুরু মিলতে নহীঁ তো জাতে যম দ্বার॥
কবীর, যমদ্বার মেঁ দূত সব, করতে খেঁচাতান। উনসে কবহূ না ছুটতা, ফির ফিরতা চারোঁ খান॥
কবীর, চার খানী মেঁ ভ্রমতা, কবহূ না লগতা পার। সৌ ফেরা সব মিট গয়া, মেরে সৎগুরু কে উপকার॥
কবীর, সাত সমুদ্র কী মসি করূঁ, লেখনী করূঁ বনরায়। ধরতী কা কাগজ করূঁ, গুরু গুণ লিখা ন জায়॥

অর্থাৎ সদগুরুর নিকট হতে দীক্ষা নিয়ে কি লাভ হয়েছে আর যদি সদগুরু না হতেন তাহলে কি ক্ষতি হতো, তার বর্ণন করেছেন যে, সদগুরু যদি না পেতাম, তাহলে নরকের আগুনে জ্বলতে হতো, যমের দূতদের মারধর খেতে হতো। এছাড়া পরে পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ইত্যাদির যোনিতে জীবন প্রাপ্ত করে কষ্ট ভুগতে হতো।

এই সকল কষ্ট সদগুরুর উপকারেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এমন সত্য পীরের গুণগান যদি লিখতে শুরু করি তাহলে সমস্ত বৃক্ষ দিয়ে কলম বানালেও তা ক্ষয়ে যাবে, সাত সমুদ্রের সমস্ত জলকে কালি (মসি) বানালেও তা সমাপ্ত হয়ে যাবে আর পৃথিবীর সীমানা জুড়ে যত স্থান তা দিয়ে কাগজ বানালেও সেটাও সমাপ্ত হয়ে যাবে, তবুও গুরুজীর মহিমা লিখে সমাপ্ত করা যাবে না।

সন্ত রামপাল দাস হলেন আমাদের সত্‌গুরু (সত্য পীর)। তাঁর সৎকার সিজদা (প্রণাম) করাটাই উপরোক্ত উপকারের কারণে কর্তব্য হয়ে পড়ে।

গুরুজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা, কবীর খুদার (পরমেশ্বর) আদেশ (হুকুম) আছে। এটি পালন করা অনিবার্য, অন্যথায় শয়তানের উপাধি পেতে হবে। আদেশের পালন করলে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। এইজন্য আমরা আমাদের সদগুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

মুসলিম ভাইয়েরা বলেন যে, আমাদের খুদা কুরআন মজিদের জ্ঞান হজরত মুহম্মদের উপর নাজিল করেছেন। আমরা ওই আল্লাহকে সিজদা (মাটিতে মাথা নত করে সালাম) করি। মুসলমান ভাই বিচার করুন যে, কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা সূরা ফুরকান-২৫ আয়াত নং ৫২-৫৯ -তে, নিজেকে ছেড়ে অন্য খুদার বিষয়ে বলেছেন যে, যিনি সমস্ত জগৎকে উৎপন্ন করেছেন, তিনি তাঁর ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন, তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। তারপর কাউকে জামাই, পুত্রবধূ বানিয়েছেন। মিষ্টি ও নোনা জল পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভরেছেন। তিনি ছয় দিনে সর্বকিছু রচনা করে, সপ্তম দিনে সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর বিষয়ে কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী গুরুর) কাছে জিজ্ঞাসা করো। এর দ্বারা স্পষ্ট হল কুরআন মজিদের (শরীফ) জ্ঞানদাতা বাখবর নন। মুসলমান ভাইয়েরা সামান্য জ্ঞান রাখা শক্তির কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম (সিজদা) করেন। যদি আমরা বাখবর সন্ত রামপালজীকে সিজদা (দণ্ডবৎ) করি, তাহলে এতে কি দোষ?

প্রশ্ন :- তাহলে কি হজরত মুহম্মদ (সা.) কি বাখবর নন? আর তাঁর দ্বারা বলা রোজা, নামাজ, জাকাত দেওয়া ইত্যাদি করলে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে না? স্পষ্ট করে বলুন?

উত্তর :- এর উত্তর এই, কুরআনের সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ -তে কুরআনের জ্ঞান দেওয়া আল্লাহ স্পষ্ট করছেন যে, যিনি সৃষ্টির সমস্ত জীব উৎপত্তি করেছেন, তিনি কাদির আল্লাহ। তিনি ছয়দিনে সৃষ্টির রচনা করেছেন, পরে আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছেন। তাঁর খবর কোনো বাখবর (তত্ত্বদর্শী) সন্তের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

হজরত মুহম্মদের নিকট কেবল কুরআনেরই জ্ঞান ছিল। যে আল্লাহ হজরত মুহম্মদকে কুরআনের জ্ঞান দিয়েছিলেন, তিনি যখন বাখবরই নন, তাহলে তাঁর পাঠানো নবী, বাখবর কী করে হতে পারেন? জ্ঞানই যখন অসম্পূর্ণ (Incomplete), তাহলে জান্নাতে যাবেন কী করে? যখন বাখবর নন, তাহলে জান্নাতেও যেতে পারবেন না। সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন :-

নবী মুহম্মদ নহীঁ বহিসত সিধানা। পীছে ভুলা হৈ তুরকানা॥

অর্থাৎ নবী মুহম্মদই বেহেশতে (বহিসত) যাননি। তাকে অনুসরণ করে সকল মুসলমান (তুর্ক) যথার্থ ভক্তির মার্গ ভুলে গিয়েছেন। তারাও বেহেশতে যেতে পারবেন না।

হজরত মুহম্মদ (সা.) কুরআন শরিফের জ্ঞানদাতা খুদার পাঠানো পয়গম্বর না কি আল্লাহ কবীরের পাঠানো পয়গম্বর? এইজন্য আপনাকে হজরত মুহম্মদ (সা.) -এর জীবনী এক নজর দেখতে হবে, তাহলে জানতে পারবেন যে, হজরত মুহম্মদ (সা.) -এর মতো পবিত্র আত্মাকে (রূহ) কেন সারা জীবন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শৈশবেই পিতা (আব্বু) ও মাতার (আম্মি) ছত্রছায়া তাঁর মাথার উপরে ছিলনা। তাঁর চাচা তাঁকে পালন করেছিলেন। যুবক হতেই দুইবার বিধবা হওয়া খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ (নিকাহ) হয়, তিনিও তাঁর সাথে বেশিদিন কাটাতে পারেননি, তিন পুত্র ও চার কন্যা সন্তান ছিল এবং তাঁরই চোখের সামনে তিন পুত্রেরও মৃত্যু ঘটে।

যে খুদাকে সত্য হৃদয়ে দিন-রাত নবী জী ইবাদত করতেন এবং তাঁর বলা কুরআন মজিদের জ্ঞান প্রচার করতে গিয়ে, কাফিরদের পাথর খেয়ে মাথা ফাটিয়ে নিলেন এরকম তাঁকে অনেক নির্যাতন কাফিররা দিয়েছিল, এসব সহ্য করেও কুরআনের জ্ঞান প্রচার করেছিলেন। হজরত মুহম্মদ (সা.) -কে সারা জীবন সংঘর্ষ ও আল্লাহর ইবাদত করা সত্ত্বেও দুঃখের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা পেয়ে মৃত্যু-বরণ করতে হয়েছিল। অতএব এই বিষয়ে আপনারা নিজেরাই অনুমান করতে পারেন। তিনি কাল ব্রহ্মের পাঠানো নবী ছিলেন। তিনি কাদির কবীর আল্লাহের (আল্লাহু আকবর) পাঠানো নবী ছিলেন না। এই কারণে তাঁর দ্বারা বলা ইবাদত (রোজা, নামাজ ও জাকাত দেওয়া, ঈদ-বকরিদ উদযাপন ইত্যাদি) দ্বারা কেউ জান্নাতে যেতে পারবেন না। অতএব জান্নাতে কেবল এক কবীর খুদার ইবাদত, বাখবর সন্ত রামপাল মহারাজের শরণ গ্রহণ করে তাঁরই দ্বারা বলা ভক্তি আজীবন মর্যাদায় থেকে করলে জান্নাতে যেতে পারবেন, নাকি নবী মুহম্মদ (সা.) -এর কুরআনের জ্ঞান দাতা আল্লাহর দ্বারা বলা সাধনার (ইবাদতে) দ্বারা?

❖ সন্ত রামপালজী গুরুদেবের নিকট নিবেদন হল যে, আমরা যখন মুসলমান ধর্মের মৌলবীদের ও অন্যান্য প্রবক্তাদের সাথে জ্ঞান চর্চা করি, তখন তাঁরা কিছু প্রশ্ন করেন, আমরা তাদের কি উত্তর দেব? কৃপা করে আমাদের মার্গদর্শন করান।

তাদের প্রশ্নগুলি এই প্রকার :-

প্রশ্ন :- বাখবর কাকে বলে অর্থাৎ তিনি কেমন হন? প্রমাণ সহিত বলুন।

❖ **(রামপাল দাস বললেন) তাদেরকে এইভাবে উত্তর দেবে :-**

উত্তর :- সকল গ্রন্থের জ্ঞান (ইলম) ও খুদার সত্য ইবাদত যিনি বলেন, তাঁকেই বাখবর বলা হয়। হিন্দু সমাজে (ধর্ম) বাখবরকে তত্ত্বদর্শী সন্ত বলে, শিখ সমাজে বাহেগুরু, ঈসাই সমাজে মসীহা অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যিনি জানেন, মুসলিম সমাজে তাকেই বাখবর বলা হয়। বাখবরই এই পৃথিবীতে এসে খুদা কবীরের সম্পূর্ণ পরিচয় ও সত্য ইবাদতের নিয়ম-বিধি আমাদের বলেন, খুদা কে? তিনি কেমন এবং কোথায় থাকেন? এসব তথ্যই তিনি বলেন। আজ বর্তমান সময়ে এই পৃথিবীতে বাখবর হলেন সন্ত রামপালজী মহারাজ। পবিত্র কুরআন মজিদ থেকে প্রমাণ দেখুন :-

প্রমাণ নং. ১ :- সূরাঃ বাকারা - ২ আয়াত নং ১১৫

এখানে খুদাকে বাখবর বলা হয়েছে। যদি খুদা বাখবর হন, তাহলে যিনি বাখবর তাঁকে কী উপমা দেওয়া হবে? তাঁকেও ততটাই সম্মান দেওয়া অনিবার্য।

প্রমাণ নং. ২ :- সূরাঃ লুকমান - ৩১ আয়াত নং ৩৪

এই আয়াতেও খুদাকে যিনি জানেন অর্থাৎ তাকে বাখবর বলা হয়েছে।

প্রমাণ নং. ৩ :- সূরাঃ ফুরকান - ২৫ আয়াত নং ৫২-৫৯

এই আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে কোনো বাখবরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলিতে যে বাখবরের বিষয়ে বলা হয়েছে, সেই বাখবরই হলেন সন্ত রামপালজী মহারাজ। যিনি বর্তমানে সকলকে এক কাদির খুদা কবীরের বিষয়ে অবগত করাচ্ছেন এবং তাঁর ইবাদত করার সঠিক নিয়ম-বিধির বিষয়ে বলছেন, যেটা আমাদের সমস্ত কিতাবে (তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনে) প্রমাণ রয়েছে। এরপূর্বে কোনো হিন্দু গুরু, ঋষি এবং পয়গম্বর একথা বলেননি যে, কবীরই খুদা আছেন যাঁর বিষয়ে কুরআন শরীফে ও চার বেদেও প্রমাণ করে। এর দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, ওই আল্লাহ কবীরের পাঠানো বাখবর (তত্ত্বদর্শী) হলেন সন্ত রামপাল জী মহারাজ। মুসলিম ধর্মের গুরুদের (মাওলানা) পবিত্র কুরআন শরীফের ইলম (জ্ঞান) না থাকার কারণে মুহম্মদ (সা.) -জীকেই বাখবর ভেবে নিয়েছেন। যেহুতু কুরআন শরীফের জ্ঞান নাজিল করা খুদা (কাল ভগবান) স্বয়ংই মুহম্মদ (সা.)-কে বলছেন, যে খুদা আকাশ ও পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তাঁর বিষয়ে স্বয়ং কুরআন শরীফ নাজিল করা খুদাও জানেন না যে, ওই বাখবর কে? যদি মুহম্মদ (সা.)-ই সেই বাখবর হতেন, (কাল ভগবান) বাখবরের স্থানে মুহম্মদ (সা.) -ই নাম বলে দিতে পারতেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, কুরআন শরীফ বলা খুদাও (কাল ভগবান) জানেন না যে, বাখবর কে? বাখবর তিনিই আছেন যিনি সত্য খুদা কবীরের ইবাদত (সাধনা) বলেন।

সমস্ত মুসলিম সমুদায়ের কাছে আমার প্রার্থনা হল, কৃপা করে আপনারা সত্য বাখবর, রহনুমা, খুদার পাঠানো বর্তমানের পয়গম্বর (অবতার) সন্ত রামপালজী মহারাজের শরণে আসুন ও জান্নাতের যাওয়ার মার্গ প্রস্তুত করুন। এই জন্য কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতাও ইবাদতের যোগ্য নয়, কেননা তিনি বাখবর নন, বাখবর হলেন সন্ত রামপাল দাস। এইজন্য দণ্ডবৎ প্রণাম রূপে তাঁকে ইবাদত করি, এটি কবীর আল্লাহরই আদেশ আছে।

❖ বাখবরের (তত্ত্বজ্ঞানীর) বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান এই পুস্তকে রয়েছে, অধ্যায় "সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান কে বলেছেন" পড়ুন পৃষ্ঠা নং 133 -তে।

"নবী মুহম্মদের আকাশ যাত্রা (মেরাজ) নিয়ে মতভেদ"

প্রশ্ন :- কিছু মুসলমানরা মানেন যে, মেরাজ (সিঁড়ি) অর্থাৎ আকাশের যাত্রা কিছুই নয়, এটি মুহম্মদজীর দেখা কোনো স্বপ্ন। অধিকাংশ এটিকে সত্য মানেন। কিছু লোকেরা এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা মেনেছিলেন। " মুহম্মদ সাহেব বলেছিলেন যে, যখন আমি একাই খুদার কাছে গিয়েছিলাম, তখন আমি সতেরোটি পর্দা পার করেছিলাম। এক পর্দা থেকে অন্য পর্দা অতিক্রম করার পথ পাঁচশো বছরের ছিল অর্থাৎ ব্যক্তিকে এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় পৌঁছতে পাঁচশো বছর লেগেছিল। খচ্চরের মতো পশুর (বুরাক) পিঠের উপরে বসে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে উপরে গেলেন। এই প্রকার অনেক ধরনের কথা মুহম্মদজী তাঁর সাথীদের বলেছিলেন, তবে হজরত আবু বকর তো শীঘ্র মেনে নিয়েছিলেন। এই ধরনের কথার জন্য অনেক মুসলমান মুসলমানি ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটি বিষয় যা তাদের অধিক বিচলিত করেছিল, "যখন মুহম্মদ বলেছিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু ঘটেছিল যে, আমি (মুহম্মদ) যখন বুরাকের উপর বসতে শুরু করি তখন আমার পা পানি ভর্তি একটি বাটি স্পর্শ করে। সেই বাটির অর্ধেক পানি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। এতটা

সময়ের মধ্যে আমি সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করে ফিরে এসে অবশিষ্ট বাটির জল বাঁচিয়ে নিয়ে ছিলাম।" এই কথা কি সত্য?

উত্তর :- যা কিছু হজরত মুহম্মদ আকাশ যাত্রার সময় দেখেছিলেন, তা সবই সত্য। যেমন - জলের পাত্রটিতে পা স্পর্শ হওয়া, পুনরায় ফিরে এসে অবশিষ্ট বাটির জল বাঁচিয়ে নেওয়া, বাটিটিকে সোজা করে রাখা, প্রতিটি পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করতে পাঁচশ বছরের সময় লাগা এবং উপরে নবী মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়া, তাঁদেরকে নামাজ পড়ানো এবং বাবা আদমকে হাসতে ও কাঁদতে দেখা ইত্যাদি সব ঘটনাই সত্য। (লেখক)

উদাহরণ :-

"নবী মুহম্মদের মেরাজ"

মুহম্মদ সাহেব মেরাজে গেলেন। এক মুহূর্তেই সমস্ত আকাশকে ভ্রমণ করে নিচে নেমে এলেন। নেমে এসে তার পুরো ঘটনাটি লোকদের বললেন, কেউ কেউ মেনে নিলেন আবার অনেকে মানেন নি। রুম নামের সুলতান এই কথা মোটেই বিশ্বাস করেননি। মুহম্মদ সাহেবের কথাকে একেবারেই মিথ্যা মনে করে দীর্ঘকাল যাবৎ একথা এমনই অবিশ্বাস্য হয়ে ছিল। একদিন এক ফকির বাদশার সামনে এসে বলতে লাগলেন, আল্লাহর সমস্ত ক্ষমতা আছে। তিনি যা ইচ্ছা তাই দেখাতে পারেন, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আপনি মুহম্মদ সাহেবের মেরাজের (আকাশ যাত্রা) উপর বিশ্বাস কেন করতে পারছেন না? মুহম্মদ সাহেবের মেরাজের ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। ওই ফকির নানা প্রকারে বাদশাকে বোঝালেন কিন্তু সুলতান একটি কথাও মানলেন না। ওই ফকির বাদশাকে বললেন যে, পানি ভরা একটা বড় পাত্র আনান। ওই ফকিরের নির্দেশে পাত্রে পানি ভর্তি করে মাঠে রাখা হল। তিনি বাদশাকে বললেন, এতে মাথা ডুবিয়েই বের করে নাও। দরবারের লোক চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। বাদশা জলে মাথা ডুবিয়েই তাড়াতাড়ি বের করে নিলেন। মাথা বের করেতেই ওই ফকিরের উপর ক্রোধিত হয়ে বললেন, এই ফকির আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছিল। ফকির বললেন, আপনার সমস্ত লোক এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি আপনাকে কিছুই করিনি, আমি তো আলাদা দাঁড়িয়েছিলাম। এদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন! লোকেরা বলল, হ্যাঁ হুজুর! এই ফকির আলাদাই দাঁড়িয়েছিল, ইনি কিছুই করেননি। নিজের লোকেদের কথা শুনে বাদশা অতি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি যখন মাথা জলে ডুবিয়েছিলাম, ওই সময় দেখলাম যে, আমি এক নারী হয়ে গিয়েছি এবং এক ময়দানে এদিক- ওদিক ঘুরছিলাম কিন্তু আমার আগে-পিছে কেউ ছিল না। সেখান থেকে কিছুটা দূরে কৃষকরা জমিতে কাজ করছিল। আমি ওই (স্ত্রী) রূপে তাদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে অসহায় একলা নারী ভেবে তাদের গ্রামে যেতে বলল। সেখানে গিয়ে এক যুবকের সাথে আমাকে বিয়ে দেয় এবং আমি তার সাথে থাকতে লাগলাম এবং ওই অবস্থায় আমার অনেক ছেলে-মেয়ে উৎপন্ন হল। এমনকি আমি খুব বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলাম, ওই বুড়ি স্ত্রীর রূপেই একদিন নদীতে গোসল করতে গেলাম, পানিতে মাথা ডুবিয়ে বের করতেই নিজেকে এইস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, জানতে পারলাম যে, আমি তো বাদশাহ রুম। তোমাদেরকেও সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এতটুকু সময়ের মধ্যে কি-কি ঘটনা ঘটে গেল? স্ত্রী হয়ে অনেক সন্তান হওয়া, বৃদ্ধা হওয়ার পরে নদীতে গোসল করতে যাওয়া এবং ডুব দিয়ে উঠতেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা। এটা কি ধরনের কৌতুক? যা এক মুহুর্তের মধ্যেই এইসব দেখা। ওই ফকির বললেন, এটাই তো কাদির খুদার কুদরত। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তখন বাদশার মুহম্মদজীর মেরাজের কথনের উপর বিশ্বাস হল।

প্রশ্নঃ- ওই ফকির কে ছিলেন?

উত্তর :- তিনি কাদির আল্লাহ কবীর, যিনি জিন্দা বাবার বেশে ছিলেন এবং যিনি অল-খিজ্র নামেও পরিচিত। পরমাত্মা চান যে, মানুষ আস্তিক হয়ে থাকুক। কোনো এক সময় সত্য ভক্তি প্রাপ্ত করে নিজেদের কল্যাণ করিয়ে নেবে।

পুরাণে প্রমাণ আছে যে, এক রাজা তার কন্যাকে নিয়ে ব্রহ্মাজীর নিকটে (উপরে ব্রহ্মার লোকে) কন্যার যোগ্য স্বামীর বিষয়ে এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারণের জন্য জিজ্ঞাসা করতে যান। এটা ত্রেতাযুগের কথা। ত্রেতাযুগে ব্যক্তিদের উচ্চতা ত্রিশ ফুটেরও অধিক হতো। ত্রেতাযুগ বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার (১২ লক্ষ ৯৬ হাজার) বছরের হয়। এটা ত্রেতাযুগের মধ্যকালীন ঘটনা। ব্রহ্মা বললেন, তুমি নিচে যাও আর কন্যার বিবাহ বলরামের সাথে করে দাও। পৃথিবীর তো যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখানে ক্ষনিক সময় অতিবাহিত হল। রাজা নিচের পৃথিবীতে এলেন, তখন তার পরিবারের কেউই জীবিত ছিল না। কন্যার উচ্চতা বলরামের থেকে অনেক বেশি ছিল। লেখা আছে যে, রাজা হতবাক ছিলেন। বলরাম পনেরো ফুট লম্বা ছিল আর মেয়েটি ত্রিশ ফুট লম্বা। বলরাম (শ্রী কৃষ্ণের ভাই) লাঙ্গল উঠিয়ে মেয়েটির মাথায় রেখে দাবিয়ে নিজের সমান উচ্চতা বানালেন। তারপর তাদের বিবাহ হয়। সেই রাজাও শ্রী কৃষ্ণের রাজ্যে থাকলেন।

পরমাত্মার মার্গে সবকিছুই সম্ভব। অবিশ্বাস করার অর্থ পরমাত্মাকে অপমান করা। ভক্তের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া। সত্য সাধনার মন্ত্র পূর্ণ গুরুর থেকে নিয়ে মর্যাদায় থেকে মোক্ষ প্রাপ্ত করুন। কোনো ভণ্ড গুরুর কথায় ভ্রমিত হবেন না, কেননা তারা সরল মানুষকে নিজের জালে ফাঁসিয়ে বলেন যে, সঙ্কট

নিবারণের জন্য অনুষ্ঠান করব। যাদের সতনাম ও সারনাম মন্ত্র দেওয়ার অধিকার নেই, তাদের দিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করালে কোনো লাভ হয় না।

অন্যান্য প্রমাণ দেখুন :-

"পরমাত্মার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়"

এক নগরের বাইরে জঙ্গলে দুইজন মহাত্মা সাধনা করতেন। একজন চল্লিশ বছর ধরে ঘর ত্যাগ করে সাধনা করছিলেন আর অন্যজন কেবল দুইবছর ধরে সাধনা করছেন। পরমাত্মার দরবার থেকে এক দেবদূত প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য ওই দুই মহাত্মার কাছে সময় ব্যতীত করতেন। দুই সাধকেরই আশ্রম গ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে ছিল। বড় সাধকের পূর্বে ও ছোট সাধকের পশ্চিমে।

দেবদূত প্রতিদিন এক-এক ঘন্টা করে দুই সাধকের কাছে এসে পরমাত্মার চর্চা করতেন। দুই সাধকেরই ভালোভাবে সময় কেটে যেত। একদিন দেবদূত শ্রীবিষ্ণুকে বললেন, হে ভগবান! কপিলা নগরের বাইরে আপনার দুই পরম ভক্ত থাকেন। শ্রীবিষ্ণু বললেন, ওই দুই ভক্তের মধ্যে একজন আসল ভক্ত আর অন্যজন নকল। দেবদূত বিচার করলেন, যিনি চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করছেন, যার লম্বা-লম্বা দাড়ি, মাথায় যার জট এবং তিনিই প্রকৃত ভক্ত হবেন, চল্লিশ বছর তো আর কম সময় নয়। দেবদূত বললেন, হে প্রভু! যিনি চল্লিশ বছর ধরে আপনার ভক্তি করছেন, তিনিই পরম ভক্ত হবেন। প্রভু বললেন, না! অন্য যিনি দুই বছর ধরে সাধনাতে লেগেছেন, তিনি ভক্ত। প্রভু বললেন, দেবদূত! আমার কথা বিশ্বাস হল না তো? দেবদূত বললেন, প্রভু! এমনটি নয়, কিন্তু আমার তুচ্ছ বুদ্ধিতে এই বলছে যে, বড় আয়ুওয়ালাও ভালো ভক্ত। শ্রী বিষ্ণু বললেন, আগামীকাল আপনি দেরি করে পৃথিবীতে যাবেন, উভয়ই দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করবে, তখন আপনি বলবেন যে আজ প্রভু সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাতিকে বের করেছেন, এই লীলা দেখে এসেছি। এইজন্য আসতে দেরি হলো। যে উত্তর পাবেন, তাতে জানতে পারবেন কে আসল ভক্ত? প্রথমে প্রতিদিন দেবদূত সকাল ৮ টার কাছাকাছি বড় ভক্তের কাছে যেতেন এবং সকাল ১০ টার কাছাকাছি কম বয়সী ছোট ভক্তের কাছে যেতেন। পরের দিন বেলা ১২ টার সময় বড় ভক্তের কাছে পৌঁছালেন। দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন দেবদূত বললেন, আজ সকাল ১১:৩০ টার সময় ভগবানের লীলা করার ছিল, সেটি দেখে এসেছি। চল্লিশ বছরওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কি লীলা করেছেন, বলবেন? দেবদূত বললেন, শ্রীবিষ্ণু চমৎকার করে দিয়েছেন, হাতিকে সুঁচের ছিদ্র দিয়ে বের করে দিয়েছেন। একথা শুনে সেই ভক্ত বললেন, হে দেবদূত! এমন মিথ্যা বলুন যা শুনে বিশ্বাস হয়। এটা কি করে হতে পারে যে, হাতি সুঁচের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়? আমার সামনে বের করে দেখান। দেবদূত বুঝতে পারলেন যে, ভগবান সত্যই বলেছিলেন। ইনি তো পশু তুল্য, ভক্ত নয়। যার পরমাত্মার উপরই বিশ্বাস নেই যে, তিনি সামর্থ্যবান। যে কাজ মানব করতে পারে না, পরমাত্মা তা করতে পারেন। অতএব ওই পুরানো ভক্তের ভক্তি ব্যর্থ এবং নকল ছিল। এরপরে দেবদূত পুরানো ভক্তকে নমস্কার করে, ওই নতুন সাধকের আশ্রমে গেলেন। ওই নতুন ভক্তও দেবদূতকে দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদূত ভাবলেন, এই ভক্ত পুরানো ভক্তের মতো ভগবানকে কোনো ভুল বচন প্রয়োগ না করে বসেন। তাই কিছুটা সঙ্কোচের সহিত বললেন যে, কি বলব? পরমাত্মা তো আজ এক আশ্চর্য দেখালেন, তাঁর লীলা দেখে চোখে ধাঁধা ধরে গিয়েছিল। পরমাত্মা আজ একটা হাতিকেই সুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের করে দিলেন। একথা শুনে ওই নতুন সাধক বললেন, হে দেবদূত! এতে আশ্চর্য হওয়ার কি হল? পরমাত্মা ইচ্ছা করলে তো সুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন, হাতি তো কিছুই নয়? দেবদূত ওই নতুন সাধককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ধন্য তোমার মাতা-পিতা, যাঁদের থেকে তোমার জন্ম হয়েছে। আমি উৎসর্গীকৃত ভগবানের প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস দেখে।

এইজন্য সকল ভক্তদের উচিত পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করা, পরমাত্মা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

"সর্বনাশের জন্য মদ্যপানই যথেষ্ট"

প্রশ্ন :- মুসলিম ধর্মে তো মদের কাছে যাওয়াই হারাম (নিষিদ্ধ)। এর পিছনের রহস্যটা কী? পাকিস্তান দেশের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে এই অভিযোগের কারণে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি মদ্য পান করেছিলেন। এর সাথে-সাথে তার আরও অন্য অপরাধও ছিল, যা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে গিয়েছিল। অপরাধ ছিল নিজের রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহম্মদ অহমদ খাঁ কসুরীকে তিনি হত্যা করিয়েছিলেন।

উত্তর :- মুহম্মদ সাহেবের সময় দৈত্যদের (রাক্ষসদের) বাসস্থান ছিল খৈবর। মুহম্মদ সাহেব তিনি আলীকে বললেন, জিব্রাইল আমার কাছে 'ইসমে আজম' নিয়ে এসেছিলেন। সেটি আমার থেকে শিখে নাও আর সেখানকার কোষাগার থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে এসো। যদি কেউ তোমার মুখোমুখি হয়, তাহলে তার সাথে লড়তে ভয় পাবে না। কারণ যার কাছে 'ইসমে আজম' আছে, তার সর্বদা বিজয় হয়। হজরত আলী 'ইসমে আজম' শিখে ওই স্থানে গেলেন

কিন্তু বিজয় প্রাপ্ত করতে পারেননি। কারণ ওই দুর্গে এক মহাত্মা থাকতেন। যার রক্ষা করতেন ওখানকার ওই নিবাসী। সেই মহাত্মার কারণে কেউ ওই দুর্গকে ছিনিয়ে নিতে পারত না। হজরত আলী যখন দুর্গ জয় করতে পারেননি, তখন মুহম্মদ সাহেব তাকে স্বপ্নে উপদেশ দিলেন যে, হে আলী! এই নগরে এক ফকির বাস করে, তাকে যেকোনো ভাবে মদের আড্ডাতে নিয়ে যাও। তার নাকে যখন মদের গন্ধ পৌঁছবে, তখন তার মাহাত্ম্য (শক্তি) চলে যেতে থাকবে। ঘুম থেকে ওঠার পর হজরত আলী তাই করলেন। ওই ফকিরের নাকে মদের গন্ধ যেতেই তার মাহাত্ম্য চলে গেল। তার তপস্যা ও ভক্তির সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হয়ে গেল। হজরত আলী পুনরায় দুর্গের (কেল্লা) উপর আক্রমণ করে দুর্গ জিতে নিল এবং তারপর ওই ফকিরকে হত্যা করল। (কেবল মদের গন্ধের কারণে তাঁর অনেক বছরের তপস্যা ও ভক্তির শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে যারা প্রতিদিন মদ্যপান করে, তাদের দশা কী হবে?)

অন্য প্রমাণ :- ফেরেশতা হারুত ও মারুতের মদের দ্বারা দুর্দশা-তফসীর আজিজিতে অবিন হরীরা, ইব্র হাতিম হাকিম, ইব্র আব্বাস, ইব্র আবদুল্লাহ ও ইব্র উম্র আদিক বলেছেন যে, অদরীস পয়গম্বরের সময় পাপী ব্যক্তিরাও আকাশে উড়ে যেত, তাই ফেরেশতা মানুষকে ঘৃণা করতো। আল্লাহ বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে কাম ও ক্রোধ ভরে রয়েছে, এইজন্য তাদের মন পাপের দিকে বেশি ঝোঁকে। এমনকি যদি তোমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়, তাহলে পাপ কর্ম থেকে তোমরাও রেহাই পাবে না। ফেরেশতাগণ খুদার বচন বিশ্বাস করেনি, তারা বললেন যে, আমরা পৃথিবীতে গিয়ে কোনো পাপ করব না। খুদা বললেন, তাহলে তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে এমন দু'জন ফেরেশতাকে পাঠাও, যাদের উপর তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, তারা কোনো প্রকারের পাপ কর্ম করবে না। এই কথা শুনে ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে অধিক তপস্যা ও অধিক ভক্তিযুক্ত ফেরেশতা হারুত ও মারুতকে খুদার সামনে হাজির করলেন। খুদা তাদের দুজনকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় বললেন, যাও তোমরা ওখানে গিয়ে মানবদের উপদেশ করো আর সাবধান! কোনো পাপ করবে না। তারা উভয়েই পৃথিবীতে এসে মানুষের কাছে প্রচার করতে লাগলেন। কিছুদিন পর দুজনেই পুনশ্চলী জুহরা নামের এক অতি সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হলেন। তারা তার কাছে কামবৃত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই নারী বললেন, যদি তোমরা আমাকে চাও, তাহলে আমার চারটি বাক্যের মধ্যে যে কোনো একটি বাক্য স্বীকার করো, তাহলে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে।

সেই চারটি বিষয় হল এই :- প্রথম তো আমার স্বামীকে হত্যা করো, দ্বিতীয় আমার মূর্তিকে প্রণাম করো, তৃতীয় মদ্যপান করো, চতুর্থ 'ইসমে আজম' আমাকে শেখাও। তারা সব শর্তকেই মহাপাপ মনে করলেন কিন্তু মদ্যপানকে সহজ ভেবে তা পান করলেন। যখন মদের নেশায় দুজন মত্ত হয়ে গেলেন, তখন তার মূর্তিকেও প্রণাম করলেন, তারপর তার স্বামীকেও হত্যা করলেন আর এরপরে পুনশ্চলী জুহরা কে 'ইসমে আজম'ও শিখিয়ে দিলেন। 'ইসমে আজম' এর শক্তিতে তো পুনশ্চলী জুহরা আকাশে উড়ে গেল আর খুদা হারুত-মারুতের পায়ে শিকল বেঁধে বাবিলের কূয়োতে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন।

"মুসলিম ধর্মে বিবাহের রীতি"

প্রশ্ন :- মুসলিম ধর্মে চাচার (কাকা) ও বড় চাচার (জ্যাঠার) ছেলে অথবা মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার কারণ কী?

হিন্দু ধর্মে চাচা (কাকা) ও বড় চাচার (জ্যাঠা) ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ হয় না। এমনকি একই গোত্রের মধ্যেও বিবাহ হয় না। এক গোত্রের অনেক গ্রাম থাকে কিন্তু সেই সব গ্রামেও বিবাহ দেন না। হিন্দু ধর্মে চাচার (কাকা) ও বড় চাচার (জ্যাঠামশাই) ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ তো দূরের কথা, গোত্র ও আশে-পাশের গ্রামেও বিবাহ করান না। মাতার গোত্র ও পিতার গোত্রেও বিবাহ নিষিদ্ধ। কেউ যদি এমনটি ভুল করে, তাহলে সম্মান বজায় রাখার জন্য, মামলা উগ্র হয়ে গণহত্যা পর্যন্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে চাচার (কাকা) ও বড় চাচার (জ্যাঠা) ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ করাকে গর্বের ও সম্মানের বিষয় বলে মনে করা হয়, যা হিন্দুদের দৃষ্টিতে ঘৃণার পাত্র।

উত্তর :- পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে চালায়। পূর্বে হিন্দু ধর্মে চার গোত্র বাদ দিয়ে বিবাহ করানো হতো। পিতা, মাতা, ঠাকুমা ও প্রপিতামহের (ঠাকুরমার শাশুড়ী) এই চারটি গোত্রকে বাদ দিয়ে অন্যের গোত্রের সাথে বিবাহ হতো। পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে লাগলো। এখন তো প্রপিতামহের গোত্রকেও ছাড়া হয় না। এখন নিজের ও মায়ের গোত্রকে কেবল বাদ দেয়। মুসলমান ধর্মে কেবল নিজের বোনকে (মায়ের পেটের) বাদ দেয়। চাচা, বড় চাচার কন্যা, যে সম্পর্কে বোন হয়, তার সাথে বিবাহ করাটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগে।

কারণ :- মক্কা শহরের কাবার (এক মসজিদের) নির্মাণ পয়গম্বর ইব্রাহিম ও হজরত ইস্মাইল (আলাইহি.) দ্বারা করা হয়েছিল। সেখানে এক প্রভুরই ইবাদত (পূজা) করা হত। সময়ের পরিবর্তনের কারণে পরে ৩৬০ টি দেবতাদের

মূর্তির (বুতদের) পূজা হতে লাগল।

ওই মক্কা শহরে ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে আরব জাতির প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে হজরত মুহম্মদের জন্ম হয়। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর তখন তিনি নবী হন। যা কিছু কুরআনে আল্লাহর আদেশ হয়েছিল, তার প্রচার হজরত মুহম্মদ মানুষের কল্যাণের জন্য করতে লাগলেন। পূর্বের পুরানো পরম্পরাগত যে মূর্তি পূজা করা হতো, তা খণ্ডন করতে লাগলেন। এক আল্লাহর ভক্তি করা কল্যাণকারক। এই কথা বলাতে হজরত মুহম্মদের গোত্র অর্থাৎ কুরাইশের বংশের সম্প্রদায়রা তীব্র বিরোধ করতে লাগল।

যারা কুরআনের আদেশ মানতেন, তাদেরকে আজ্ঞাকারী অর্থাৎ মুসলমান বলা হতো আর যারা অস্বীকার করতো, তাদেরকে কাফির (অবজ্ঞাকারী) বলে জানতে লাগল।

ইসলাম আনুগত্যকারী (মুসলমান) ও বিরোধীদের মধ্যে লড়াই হতে লাগল। বিরোধীদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। হজরত মুহম্মদ ও তার অনুগামীদের নানাভাবে নির্যাতিত করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে কিছু মুসলমান মক্কা শহর ছেড়ে দূরে হবশা নামক এক দেশে চলে গেল।

হজরত মুহম্মদ ও তাঁর পরিবারকে সামাজিক ভাবে বহিষ্কার করে দিল। তিন বছর পর্যন্ত হজরত মুহম্মদ ও তাঁর পরিবারের লোকজনকে অনেক কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন কাটাতে হয়েছিল। কোলের শিশু ও ছোট ছোট সন্তানরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কান্নাকাটি করত আর বয়স্ক-বৃদ্ধদের লতাপাতা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়েছিল।

তিন বছর পর তো সামাজিক বহিষ্কার সমাপ্ত হয়েই যায় কিন্তু এই শোকের কারণে হজরত মুহম্মদের চাচা আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু হয়ে যায়।

মক্কার উত্তরে মদিনা শহর যেটি পূর্বে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। পরে এই মদিনাবাসীরা খুব শীঘ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

৫৩ বছর বয়সে হজরত মুহম্মদ তাঁর নিজের সঙ্গী ও পরিবারদের নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় রওনা দিলেন। যাওয়ার সময়ও তাঁকে বিরোধীরা হত্যার পরিকল্পনা করে, হজরত মুহম্মদের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে যায় যে, রাত্রে মুহম্মদের ঘরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করবে। আল্লাহর কৃপাতে সবাই যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন হজরত মুহম্মদ চুপচাপ বেড়িয়ে পড়লেন। এরপর শত্রুদের ভয়ে তিনদিন পর্যন্ত তাঁর নিজের বন্ধু আবু বকরের সাথে, একটি গুহায় গারে সৌরেতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল কিন্তু মদিনা শহরের লোকেরা মুসলমানদের ও হজরত মুহম্মদকে খুবই সম্মান ও সহযোগিতা করেছিলেন, সেইজন্য কিছুটা তিনি স্বস্তি পেয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও বিরোধীদের অত্যাচার কম হয়নি।

এরপর মুসলমান সন্তানদের বিবাহের উপরও বিরোধীরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যে, এদের সন্তানদের কারোর সাথে আমাদের পরিবারে ও বংশের বিবাহ করতে দেওয়া হবে না। বিরোধীরা সম্পূর্ণ মুসলমানদের জীবনের শত্রু হয়ে যায়। কারণ তারা সংখ্যায় অধিক ছিল। তবে মুসলমানরা তার নিজের ধর্ম পালনের জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে, অনেক লড়াই করেছিল এবং পরে যুদ্ধে জয়ীও হয়েছিল কিন্তু তাদের সাথে অন্যদের বিরোধিতা অব্যাহত ছিল। মুসলমানের সংখ্যাও বেড়েছিল কিন্তু তা নামমাত্রই ছিল।

এরপর সন্তানদের বিবাহও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই মুসলমানরা পরামর্শ করে, তাদের সন্তানদের বিবাহ নিজেদের পরিবারের মধ্যেই করতে বাধ্য হয়েছিল, তাই চাচা ও বড় চাচার ছেলে-মেয়েদের সাথেই বিবাহ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এছাড়া তাদের নিজেদের বংশও চালানোর দরকার ছিল ও ধর্মও পালন করার ছিল। কিছু সময়ের জন্য এই প্রকার বিবাহ অদ্ভুত মনে হয়েছিল কিন্তু পরিস্থিতি ও দীর্ঘসময় চলার কারণে সব কিছু ভুলে যেতে হয়েছিল। এখন চাচা ও বড় চাচার ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহ দেওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়, বরঞ্চ গর্ব ও সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাচা ও বড় চাচার ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে অন্যের সাথে বিবাহ করাকে অসম্মান মানা হয়।

পূর্বে যখন কখনো দু'জন মুসলিম মহিলা একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করত, তখন দুজনের মধ্যে একজন তার চাচা ও বড় চাচার ঘরের না হয়ে যদি অন্য ঘরের হতো, তাহলে তাকে কটূক্তি বা তাচ্ছিল্য করে বলতো যে, তুই যদি সম্মানীয় ঘরের মেয়ে হতিস, তাহলে চাচা - বড় চাচার ঘরেই বিবাহ করে থেকে যেতিস। বর্তমানে অন্যান্য পরিবারে ও দূর-দূরান্ত দেশেও বিবাহ হচ্ছে।

এইপ্রকার মুসলমানদের মধ্যে চাচা (কাকা) - বড় চাচার (জ্যাঠা) ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাহের পরম্পরা শুরু হয়েছে, যা বর্তমানে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।

অন্যান্য কারণ :- হজরত আদমের জীবনীতে লেখা আছে যে, তাঁর স্ত্রী হেবা (হব্বা) যখনই প্রসবের সময় হতো, প্রতিবারই যমজ দুটি সন্তানের জন্ম দিতেন, তার মধ্যে একজন পুত্র ও অন্য একজন কন্যা হতো। একসাথে জন্ম নেওয়া ছেলে-মেয়েকে ভাই-বোন মানা হতো। দ্বিতীয়বার জন্মানো ছেলে ও মেয়েকেও ভাই-বোন মনে করা হতো

কিন্তু তাদের বিবাহ একে অপরের বোনের সাথে করানো হতো অর্থাৎ প্রথম জন্ম নেওয়া মেয়ের সাথে দ্বিতীয় জন্মানো ছেলের সঙ্গে বিবাহ করানো হতো আর দ্বিতীয় জন্মানো মেয়ের সাথে, প্রথম জন্মানো ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া হতো। এইভাবে বিবাহের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। আসলে এটাও ভাই-বোনের সম্পর্ক। মুসলমান ধর্মে মায়ের গর্ভ হতে জন্মানো ছেলে ও মেয়ে অর্থাৎ ভাই-বোনের বিবাহ হয় না। চাচা ও বড় চাচার ছেলে ও মেয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। বর্তমানে অন্য দূরের পরিবারের আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হতে লেগেছে কিন্তু চাচা(কাকা) ও বড় চাচার (জ্যাঠা) পরিবারেরও বিবাহ হয়। পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে চালিত করে।

রাজস্থান রাজ্যে (ভারত) পালী জেলা ও যোধপুর জেলায় এক জাতির লোকেদের মধ্যে নিজের মামা ও পিসির ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহের প্রচলন রয়েছে"। সে তার নিজের মেয়ের বিবাহ, ওই ব্যক্তিকে দেন, যিনি তার নিজের মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দেন।

কারণ :- কালের দূত নকল এক কবীর পন্থী সন্ত, প্রায় দুইশো বছর আগে এক প্রচার শুরু করেছিল। তিনি ওই সকল ব্যক্তিদের তাদের পূর্বের পূজা ত্যাগ করিয়ে, ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করতে প্রেরণা করেছিলেন। যারা ওই গুরুর নিকট হতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাদেরকে বৈষ্ণব বলে জানতে লাগল। এরপর ওই এলাকায় তাদেরই জাতির লোকেরা ওই বৈষ্ণবদের বহিষ্কার করে দিয়েছিল এবং তাদের সন্তানদের বিবাহও এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই কারণে ওই সময় ওই বৈষ্ণবদের সামনে বিপত্তি দেখা দিল। এই কারণে তারা নিজের পিসির ও মামার ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল, যে সম্পর্কে ভাই বোন হয়। এইভাবে একে অপরের সাথে অদল-বদল করতে লাগল। নিজের মেয়েকে তাদের পিসির ছেলের সাথে তবেই বিয়ে দেবে, যদি পিসি তার মেয়েকে তাদের ছেলের অর্থাৎ ভাইয়ের ছেলের সাথে বিবাহ দেয় অতএব এই প্রকারে প্রতিশ্রুতি করে নিত। নকল গুরু কবীর পরমাত্মার নামের সাধনাও অসম্পূর্ণ অর্থাৎ কালের বলা সাধনা বলে গিয়েছে, এছাড়া আরও দুর্গতি করে দিয়ে গিয়েছেন, যার কারণে আজ পর্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই ধরনের পরম্পরা বাধ্যবাধকতার পরিণামের ফল। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গ্লানি থাকে না, কেননা সকলে ওই পরম্পরাতে নির্বাহ করেই চলছিল। ভক্তগণ সমাজের মর্যাদা থেকে অধিক আত্মকল্যাণকে মহত্ত্ব দিয়ে থাকেন, যা সমাজের মানুষের সাথে সর্বদা বিবাদের কারণ হয়ে থাকে।

❖ গুরুদেব রামপাল দাসের নিকট নিবেদন হল এই যে, যখন আমরা মুসলমান ধর্মের প্রচারকদের ও মাওলানাদের সাথে জ্ঞান চর্চা করি, তখন তাঁরা যা প্রশ্ন করেন, তাঁদেরকে আমরা সঠিক উত্তর দিতে পারিনা। কৃপা করে আপনি আমাদের নির্দেশ করুন যে, তাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা কি দেব?

প্রশ্নগুলো এই প্রকার :-

প্রশ্ন :- যদি হজরত মুহম্মদ (সা.) বাখবর না হন, তাহলে অমুসলিম (অন্য ধর্মাবলম্বী) সন্ত রামপাল মহারাজ কীভাবে বাখবর প্রমাণিত হতে পারে? এবং তাহলে হজরত মুহম্মদ (সা.) কে ছিলেন এবং কেনই বা তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? কৃপা করে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।

❖ **রামপাল দাস :- আপনারা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে দেবেন :-**

উত্তর :- যখন আপনাদের সৃষ্টির (কায়নাত) রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণজ্ঞান হয়ে যাবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারবেন। নিজের দ্বারা রচনা করা কায়নাতের (সৃষ্টির) সম্পর্কে যথার্থ তথ্য কেবল, সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তাই বলতে পারেন। (পড়ুন "সৃষ্টি রচনা" এই পুস্তকের 181 পৃষ্ঠায়।)

সংক্ষেপে উত্তর এইভাবে দেবে :- হজরত মুহম্মদের সঙ্গে আল্লাহর তো কখনও দর্শনই হয়নি, কেবল পর্দার আড়ালে (পিছনে) বার্তালাপ হয়েছে এবং তিনটি সাধনা করতে বলেছেন {রোজা (ব্রত), নামাজ ও আজান (বংগ)}। সেই আদেশই সমস্ত মুসলিম সমাজকে বলা হয়েছে, যার পালন মুসলমানরা করছেন। একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিৎ, যে সকল পুণ্য আত্মাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অর্থাৎ কাদির আল্লাহ (সতপুরুষ) প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি দেখা করেছেন ও তাঁদেরকে নিজের সাথে করে উপরে নিয়ে গিয়ে, পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) নিজের নিবাস স্থানে {সতলোক যাকে গীতা অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক ৬২ -তে শাশ্বত্ স্থান অর্থাৎ অমরলোক বলা হয়, সেখানে} নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর নিজের সিংহাসন (তখ্ত) ও নিজের অমরলোক দেখিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিলেন, ওই অমরলোককে সতলোকও বলা হয়। (শ্রী নানকজি ওই স্থানকে সচ্চখন্ড বলতেন।) ওই সুখ সাগরের সমস্ত সুখ-সুবিধা ও খাদ্য সামগ্রী দেখিয়ে এনে বলেছিলেন যে, যত জীব এই কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে নিবাস করছে, পূর্বে তোমরা সকলেই এই সত্যলোকেই বসবাস করতে আর এখান থেকেই তোমরা তোমাদের ভুলের কারণে সকলে (নিচের পৃথিবীর লোকরা) আমাকে ছেড়ে জ্যোতি নিরঞ্জন কালকে, আল্লাহ তায়াল্লার সমান পূজা (ইবাদত) করতে লাগে অর্থাৎ তাকে ভালবাসতে লাগে। সেই কারণে আমি (আল্লাহ কবীর/সৎপুরুষ) তোমাদের সবাইকে ও জ্যোতি

নিরঞ্জন কালকে, আমার সতলোক থেকে বের করে দিয়েছিলাম।

জ্যোতি নিরঞ্জন কাল তপস্যা করে আমার কাছ থেকে এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছিল, এই কারণে এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সহ তোমাদের সকলকে ও জ্যোতি নিরঞ্জন কালকে বের করে দিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কালের এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সুখী হতে পারবে না। তবে তোমরা সকল জীব আত্মারা আমার (আল্লাহ কবীর) অংশ, আমারই সন্তান। তোমাদের কাল অর্থাৎ শয়তান বিভ্রান্ত করে রেখেছে। আমার ভেদ তোমাদেরকে দেয় না আর নিজেকেই সকলের খুদা বলে থাকে। এছাড়া সে তাঁর নিজের নবী বা অবতারদেরকে পাঠিয়ে নিজেরই মহিমা প্রচার করিয়ে থাকে এবং ওই নবী বা অবতারদের নিমিত্ত বানিয়ে চমৎকার করে। আবার প্রয়োজনে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে কোনো এক নগরকে বিনাশও করিয়ে দেয় এবং নানা স্থানে এই প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করার পরে, নিজেই আবার তার দূতকে (বার্তাবাহক) পাঠিয়ে, সেই দূতের মহিমান্বিত করিয়ে দেয়। যাতে জনতা সেই দূতের চমৎকার দেখে আকর্ষিত হয়ে তাঁর কথা মেনে, কালের বলা ইবাদত (উপাসনা) করে। এইপ্রকার ভ্রমিত হয়ে সকলে তাদের নিজেদের কর্মকে নষ্ট করে নেয়, এই কারণে তারা তাঁর (কাল) লোকেই থেকে যায়।

কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) সতলোকে এক কন্যার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। সে কন্যা কালের কঠিন তপস্যা দেখে, তাকে এক পবিত্র আত্মা ভেবে, তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এই কারণে আমি (আল্লাহ কবীর) ওই কন্যার সাথে তোমাদের সবাইকে ও জ্যোতি নিরঞ্জনকেও এই সুখসাগর সতলোক থেকে বের করে দিয়েছিলাম। যাতে তোমাদের শিক্ষা হয় যে, এক আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) না করে অন্যকে আল্লাহর শরিক বানিয়ে (আল্লাহর সমান শক্তিমান বা সুখদাতা) মেনে ইবাদত করা ব্যক্তিকে কাদির আল্লাহ পছন্দ করেন না। এই কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) তাঁর নিজের লোকে (একুশ ব্রহ্মাণ্ডে) প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে আমার সতলোকের মতো নকল জান্নাত (স্বর্গ) বানিয়ে রেখেছেন। যার কারণে সকল সাধক (ভক্ত) ভ্রমিত হয়ে রয়েছে। তারা এই কালের নকল জান্নাতকেই সব থেকে সুখদায়ী স্থায়ী স্থান মনে করছে।

কালের ব্রহ্মাণ্ডে যত সব জীব বসবাস করছে, তাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র সর্বদা চলতে থাকবে। আমি (আল্লাহ কবীর) তোমাদের সকলকে {যে সকল আত্মারা কালের জালে ফেঁসে রয়েছে, যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি} আমার ওই মহাসুখদায়ী সতলোকের জান্নাতে (স্বর্গ) পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এই কারণে তোমাদের মধ্যে কিছু পবিত্র আত্মাকে কখনো কখনো উপরে এইজন্য নিয়ে আসি, যাতে তোমরা জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল) জান্নাত ও আমার (আল্লাহ কবীর) সতলোকের জান্নাতের (স্বর্গের) মধ্যে পার্থক্য (ভেদ) নিজের চোখে দেখতে পারো। আমার সতলোকে মানব (নারী ও পুরুষ) রূপে রয়েছে, তারা কখনও কষ্ট পায় না, সকল আত্মা সুখে রয়েছে। কালের লোকে কেউ সুখী নেই। ওই স্থানের (কালের লোকে) জান্নাতে (স্বর্গ) খুবই অল্প আত্মারা রয়েছে এবং জাহান্নামে (নরকে) অধিক আত্মারা রয়েছে। নরকের শাস্তি সমাপ্ত হওয়ার পরে তাদের সকলকে, কুকুর, গাধা, পাখি, জীবজন্তু, জলজ ও অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম প্রাপ্ত করে, বড় কষ্ট ভোগ করতে হয়। আল্লাহ কবীর সাহেব ওই সকল পবিত্র আত্মাদের বললেন, তোমরা এখন পৃথিবীতে যাও আর নিজের চোখে যা দেখেছো, সেই সব সত্য সত্য নিচে পৃথিবীর মানবদের গিয়ে বলো। যাতে কালের জালে ফেঁসে থাকা সরল-সোজা মানুষগুলোর বিশ্বাস হয় যে, জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) সর্বশক্তিমান খুদা (কাদির আল্লাহ/ পরমাত্মা) নয়। ওই সকল লোক যারা তোমাদের কথার উপর বিশ্বাস করে আমাকে অর্থাৎ কবীর আল্লাহর ইবাদত করে, যা আমি তোমাদেরকে বলেছি, তাহলে তারা তাদের নিজের আসল স্থানে (নিজের পূর্বের ঘর সতলোক সুখসাগর) এসে, চিরসুখী হয়ে যায়।

আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে মানব জন্ম দিয়েছি এবং তোমাদের মতো পবিত্র আত্মাকে নির্বাচিত করেছি। তোমরা আমার সন্দেশবাহক (রসূল) হয়ে নিজের চোখে দেখা এই স্থানের (সতলোক) অবস্থার কথা বর্ণনা করো। এতটাই বুঝিয়ে ওই আত্মাগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কবীর সাহেব, পুনরায় পৃথিবীতে তাদের নিজের শরীরের (দেহের) মধ্যে, তাদের আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরে তাঁরা সৎপুরুষের (কাদির আল্লাহ) নবী অর্থাৎ রসূল হলেন ও যথার্থ জ্ঞান যা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা যা বলে দিয়েছিলেন, সেই সকল বর্ণনা করে লিখিয়ে রেখেছিলেন। সেই সত্য জ্ঞান যা আমি (রামপাল দাস) বুঝতে পেরেছি ও বর্তমানের সকল ধর্মের মানবকে বলছি। অনেক বার আল্লাহ তায়ালা কবীর স্বয়ং পৃথিবীর উপর আসেন এবং কবিদের মতো আচরণ করে, পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে দেখা করেন, তারপর তিনি তাদেরকে নিজের পরিচয় স্বয়ং নিজেই দেন। ওই পবিত্র আত্মারা আমার ওই জ্ঞানকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের পূর্বের ইবাদত (সাধনা) ত্যাগ করে আমার বলা শাস্ত্র -বিধি অনুসারে ভক্তি করে, অমরলোক (সতলোক) প্রাপ্ত করেছিলেন। সেখানে গিয়ে বর্তমানে তাঁরা চিরসুখী হয়েছেন ও সর্বদা তাঁরা সেখানেই থাকবেন।

যে জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের মুখকমলের মাধ্যমে বলে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, সেটিকে

"কলাম-এ-কবীর (কবীর বাণী)" অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেদ বলা হয়। যার মধ্যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে। যে সকল আত্মারা পরমেশ্বরের (কাদির আল্লাহর) সঙ্গে দর্শন করে কথা বলেছিলেন অথবা যাঁরা সামনে থেকে পরমাত্মাকে (কাদির আল্লাহ) দেখেছেন এবং তাঁর নিকট হতে শুনে এই সত্য ঘটনার বর্ণন করেছিলেন ও লিখিয়েছিলেন, সেই সূক্ষ্মবেদের সন্তদের বাণীর সঙ্গে, এই দাস (রামপাল দাস) মিলিয়ে দেখেছেন, নিরীক্ষণ করে সকল শব্দগুলো সঠিক পেয়েছি।

ফুরকানের (সত্য-অসত্যের) নির্ণয় :-

প্রথম নবী অর্থাৎ বাবা আদম থেকে অন্তিম নবী মুহম্মদ (সা.) পর্যন্ত যে এক লাখ আশি হাজার নবী (পয়গম্বর) হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই এই কালের (জ্যোতি নিরঞ্জনের) পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল। হজরত মুহম্মদ ছিলেন অন্তিম নবী। এরপর থেকে নবীদের পরম্পরা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

{কুরআনের জ্ঞান দাতাও কুরআন মজিদে সূরা আহজাব - ৩৩ আয়াত নং ৪০ -তে বলা হয়েছে যে:- (হে মানবগণ!) মুহম্মদ তোমাদের (পুরুষের) মধ্যে কারোর পিতা নয়। তবে তিনি হলেন আল্লাহর রসূল ও নবীদের সমাপ্তিকারী (শেষ নবী) আর আল্লাহ হলেন সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা।}

আল্লাহ তালা (কাদির আল্লাহ) স্বয়ংই নিজের নবী নিজে স্বয়ং হয়ে, পৃথিবী ও সমস্ত আকাশের উপরে আসা যাওয়া করে অর্থাৎ ভ্রমণ করেন, তাঁর নিজের পরিচয় দেন। যথার্থ জ্ঞান দেন কবীর আল্লাহ তালা (পরমাত্মা) তাঁর নিজের নবী ও রসূলদের পৃথিবীর উপর পাঠান, যাঁরা আল্লাহ তালার মহিমার জ্ঞান বলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের দ্বারা ভ্রমিত হয়ে, কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের প্রচার ও ভক্তি করতে লেগে যান। এইজন্য তাঁদেরকে পুনরায় সঠিক মার্গ দেওয়ার জন্য স্বয়ং সর্বশক্তিমান কবীর পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) পৃথিবীতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে জিন্দা বাবা (সাধু) রূপে সাক্ষাৎ করেন। আধ্যাত্ম জ্ঞান চর্চা করে, তাদের জ্ঞানকে ভুল প্রমাণিত করেন, তারপরে তাদেরকে নিজের সঠিক জ্ঞান শোনান। ভারত দেশের কাশী নগরে (বেনারসে) ১৩৯৮ সাল থেকে ১৫১৮ সাল পর্যন্ত কাদির আল্লাহ তাঁতীর (জুলাহ) ভূমিকা করেন, লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের ও মুসলমানদের ইবাদতের (পূজা করার) সঠিক নিয়ম-বিধি বলেছিলেন। উভয় ধর্মের ৬৪ লাখ ব্যক্তিকে শরনে নিয়েছিলেন। ভক্তির যথার্থ বিধি বলেছিলেন। তাদেরকে মোক্ষের (উদ্ধারের) মার্গে লাগিয়েছিলেন। কাশীতে লীলা করার পরে, এই দাসের (সন্ত রামপাল) পূর্বে কবীর আল্লাহর (পরমেশ্বরের) নামে, দ্বাদশ (১২) -টি কবীর নামের পন্থ চালানোর জন্য নবী এসেছিলেন কিন্তু তাদেরকে কাল শয়তান ভ্রমিত করে, তার নিজের জ্ঞানই তাদের দ্বারা প্রচার করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই শৃঙ্খলাতে ১২ নম্বরের পন্থ সন্ত গরীবদাস জীর। সন্ত গরীবদাস মহারাজ পরমাত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ ভক্তিবিধি প্রাপ্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁর দ্বারা বলা জ্ঞানকে, ওই সময় লোকেরা উপেক্ষা করেছিল। তাঁর দ্বারা বলা লিখিত বাণীর অর্থকে ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁর অনুগামীরা সাধনা ও প্রচার করতে লেগেছিলেন। কবীর পরমেশ্বর তাঁর প্রিয় নবী গরীবদাসের সংস্পর্শেই থাকতেন। তাই সময় মত কখনো কখনো তাঁকে দিশা-নির্দেশ দিতে থাকতেন। সন্ত গরীবদাস মহারাজ মুক্তি পেয়ে সতলোকে চলে গিয়েছিলেন। ওই দ্বাদশ পন্থেই এই দাসের (রামপাল দাসের) আগমন হয়েছে। এখন ত্রয়োদশ পন্থ এই সময় কাদির আল্লাহ অন্তিম নবী বা রসূল এই দাসকে (সন্ত রামপাল দাস) পাঠিয়েছেন। এই দাস কাদির আল্লাহর দ্বারা দেওয়া তত্ত্বজ্ঞান (সূক্ষ্ম বেদের জ্ঞান) সঠিকভাবে বলেছেন। কাল জ্যোতি নিরঞ্জন সনাতন ধর্মেও (বর্তমানে হিন্দু ধর্ম) নিজের নবীকে (সংবাদ বাহক) পাঠিয়েছিলেন। যাঁদের পরিচয় নিম্নে পড়ুন :-

আদি শঙ্করাচার্য :- আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম ঈসা মসীহার (যীশু খ্রীষ্টের) জন্মের পাঁচশো আট (৫০৮) বছর পূর্বে হয়েছিল। (ওই সময় কলিযুগের বয়স তিন হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।) তিনি ভগবান শঙ্করের (তমোগুণ শিব) দ্বীপ (লোক/ধাম) থেকে কালের প্রেরণায় পৃথিবীর উপরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায় বত্রিশ (৩২) বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অসাধ্য (দুরারোগ্য) ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। আট বছর বয়স থেকেই তিনি প্রবচন করতে শুরু করেন। অল্প জীবন কালের মধ্যেই তিনি অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করে চলে যান। ভারতে চারদিশাতে চারটি শঙ্কর মঠের (মন্দির) নির্মাণ করিয়েছেন এবং শ্রী রাম চন্দ্র, শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের ভক্তি করতে বলে গিয়েছেন। পাঁচ দেবতার (পঞ্চ দেবের) পূজা করার উপর দৃঢ় করেছিলেন। বিশেষ করে শঙ্কর দেবতা ও দেবী পার্বতীকে অধিক মহত্ত্ব দিতেন কিন্তু হিন্দুধর্মে সর্ব দেবী-দেবতাদের পূজা করার প্রচলন ও মন্দিরকে মহত্ত্ব, মূর্তি ইত্যাদি পূজা করা, এই সব আদি শঙ্করাচার্যেরই দেন আছে বা এনার দ্বারা প্রদত্ত।

আদি শঙ্করাচার্যের পূর্বে এটি সনাতন ধর্ম ছিল এবং বেদ ও গীতাকে অধিক মহত্ত্ব দেওয়া হতো। আদি শঙ্করাচার্যের পরে আঠারো পুরাণ ও গীতাকেই জনসাধারণ (সাধারণ হিন্দুরা) অধিক পড়তে লাগলেন। এগুলি হিন্দি ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পরে, প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু ভক্ত আত্মারা পুরাণকে পড়ে, শ্রীব্রহ্মা (রজোগুণ), শ্রীবিষ্ণু (সত্ত্বগুণ) ও শ্রীশঙ্কর

(তমোগুণ), দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, পার্বতী, কালী, বৈষ্ণো দেবী, জ্বালা দেবী অন্যান্য সবার মহিমা জেনেছেন। এই কারণে এই দেবী-দেবতার পূজার প্রচলন খুবই দ্রুতভাবে বেড়েছে।

হজরত মুহম্মদ :- হজরত ঈসার (যীশুখীষ্ট) জন্মের ৫৭১ বছর পশ্চাৎ, ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশে, ইহুদি সম্প্রদায়ের কুরাইশ বংশে নবী মুহম্মদের জন্ম হয়। ইনিও শঙ্কর (শিব তমোগুণ) দেবতার দ্বীপ (ধাম/লোক) থেকে জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) অনুপ্রেরণায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্করের ধাম থেকে হজরত মুহম্মদকে সাহায্য করার জন্য বারো হাজার আত্মারা এসেছিলেন, তাঁরই জন্ম স্থান ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম মুহম্মদ সাহেবই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ (কবুল) করেছিলেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য লোকেরাও মুসলমান হতে শুরু করেছিলেন। হজরত মুহম্মদ পূর্বজন্মে এক ভক্তিযুক্ত আত্মা ছিলেন। পূর্বের সংস্কারের কারণে তাঁর মনে আল্লাহর প্রতি ভক্তির (ইবাদত) প্রবল প্রেরণা জেগে উঠেছিল। সেই কারণে তিনি ঘর-বাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে দূরে পাহাড়ে এক নির্জন স্থানে, নির্মিত করা হীরে নামক গুহায় গিয়ে পরমাত্মার চিন্তন করতেন। সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুসারে কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের দেবতা (ফেরেশতা) জিব্রাইলকে পাঠিয়ে, নিজের স্তরের জ্ঞান হজরত মুহম্মদকে ভয় দেখিয়ে ও ধমকি দ্বারা দিয়েছিলেন, জ্ঞান কুরআন মজিদের (শরীফ) রূপে লেখা হয়েছে। যে জ্ঞানে পুণ্য করার বিধি তো নামমাত্র (খুবই কম) আছে কিন্তু পাপ করার প্রাবধান ভরা রয়েছে। পুণ্য কর্ম করার মতামত তো ভালো কিন্তু পাপ (জবাই করা /কুরবানি দেওয়া ইত্যাদি) করার মতামত সম্পূর্ণ ভুল। ধর্ম করতে হলে কেবল দান (জাকাত) করতে হয়, তাও আবার দরিদ্র মুসলমানদেরকে। তাদের এই সাধনা ও ধার্মিক ক্রিয়া-কর্ম অসম্পূর্ণ।

সূক্ষ্ম বেদে ধর্ম-কর্ম করার জন্য সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ বিধি বলা হয়েছে। যেমন - পাঁচ যজ্ঞ করা, ক্ষুধার্তকে ভোজন করানো, অসহায়দের সাহায্য করা এবং আল্লাহর নাম জপ করা। এই বিধিতে পূর্ণ মোক্ষ ও সর্বোত্তম স্বর্গ অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত হবে। সতলোক প্রাপ্ত করাই হল, মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

সূক্ষ্মবেদে আল্লাহ তালা কবীর সাহেব বলেছেন যে, যদি মানব (পুরুষ বা মহিলা) পূর্ণ গুরু ছাড়া কোনো ধর্মীয় আচার - অনুষ্ঠান করে, তাহলে তা বৃথা হয়, সম্পূর্ণ লাভ পাওয়া যায় না। যদি মানবগণ গুরু না বানিয়ে বা নকল গুরুর নির্দেশে কোনো ব্যক্তিকে অর্থ বা অন্য কোনো জিনিস সাহায্য রূপে দেয়, তাহলে পরবর্তী জন্মে যখন সেই আত্মা মানব হবে, তখন ওই সাহায্য নেওয়া মানবকে, ওই সাহায্য দাতার দেনা অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে আর যদি সহযোগ নেওয়া ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম না পায়, তাহলে তাকে সাহায্যের যে পরিমাণ (অর্থ) নিয়েছিল, সেই টাকা পশু জন্ম প্রাপ্ত করে ফেরত দিতে হয়, যেমন- ষাঁড়, উট, গরু, মহিষ ইত্যাদি যা মানুষের কাজে লাগে সেই পশু যোনিতে গিয়ে তার ঋণ শোধ করতে হয়।

মুসলমান ধর্মে যে জাকাত (দান) করা হয়, তার ফল এইরকম আছে, নবী মুহম্মদকে জাকাতের জন্য দেওয়া টাকা বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ও জামাকাপড় ইত্যাদির শাবাব তো এই পৃথিবীর উপরেই পাবেন ও পরবর্তী জন্মে লাভ পাবেন কিন্তু এই সব বিধিতে জান্নাতে যেতে পারবেন না। কর্মের সংস্কার অনুসারে পূর্বপুরুষদের পিতর যোনি প্রাপ্ত করবেন অর্থাৎ পিতর লোকে স্থান পাবেন। যাকে ওই স্থানের নিবাসকারীরা জান্নাত (স্বর্গ) বলে থাকেন। বাবা আদম থেকে হজরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) পর্যন্ত সকলেই পূর্বপুরুষদের (পিতরলোক) লোকে বা ধামে গিয়েছিলেন, যাঁদেরকে নবী মুহম্মদ উপরের ধামে গিয়ে দেখেও এসেছিলেন। প্রতিটি দেবতার লোকে পূর্বপুরুষদের জন্য একটি করে পিতর ধাম (লোক) বানানো রয়েছে। প্রত্যেক ধামে জান্নাত (স্বর্গ) অর্থাৎ হোটেল বানানো রয়েছে। যে ইবাদত (সাধনা) হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত অনুগামীরা (Followers) করছেন, তাতে জান্নাত প্রাপ্ত হয় না। পিতর লোকে কিছু সময়ের জন্য থাকতে পারবেন আর পাপ যদি অধিক থাকে, তাহলে অধিক সময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকতে হবে। নামাজ অর্থাৎ আরতি (স্তুতি) করাকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা হয়, এটিতে পিতরলোকের স্থান প্রাপ্ত হয়। রোজা (ব্রত) করলে আধ্যাত্মিক কোনো লাভ হয় না, এ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। এটি সূর্য উদয়ের (Sunrise) পূর্বে ভোজন করতে হয় এবং সূর্যাস্ত (Sunset) পর্যন্ত কিছু খেতে হয় না। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ভোজন করতে পারে কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় মুরগি, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হত্যা করে তাদের মাংস খাওয়া, এটা মহাপাপ হয়। রোজা রাখলে আধ্যাত্ম লাভ কিছু হয় না, তবে জবাই (হত্যা) করলে মহাপাপ অবশ্যই হবে।

বিশেষ :- হজরত মুহম্মদ জী যখন আকাশ যাত্রা (মেরাজ) করতে গিয়েছিলেন, তখন পর্দার আড়াল থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন খুদা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে ও আজান লাগাতে (বংগ) বলেছিলেন নামাজের সংখ্যা তো বলেছেন কিন্তু রোজার সংখ্যা বলেন নি। হজরত মুহম্মদ নিজের উপলব্ধি (ভালো বিচার) দ্বারা রোজার সংখ্যা প্রতি মাসে অন্তত তিনটি (Three) রাখতে বলেছিলেন, যেটি খুবই উত্তম বিচার ছিল। এক বছরে ছত্রিশটি (Thirty six) রোজা হয়ে যায়। রোজা (ব্রত) রাখা ব্যক্তিদের না তো দৈনন্দিন কাজে বাধা থাকে আর না স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হতো। পরে কাল ব্রহ্ম আরো ত্রিশ দিন একটানা উপবাস করার নির্দেশ দিলেন। কারণ ভক্ত তো ভক্তই হয়, ভক্ত

তো আল্লাহর জন্য কঠিন থেকে কঠিন সাধনা করতেও পিছপা হন না। মুসলমানরা সেটিও শুরু করে দিলেন এবং বর্তমানেও করছেন।

নামের জপ :- মুসলমানরা আল্লাহ আকবর নাম উচ্চারণ করেন, যা কবীর জীর নাম। আল্লাহ মানে পরমেশ্বর আর আকবর নাম মানে 'কবীর'। কেবল বলার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন আরবী ভাষায় স্কুলকে অস্কুল এবং স্থানকে অস্থান বলা হয়। একইভাবে কবীরকে অকবীর বলা হয়। তবে কোথাও কোথাও ভাষার মধ্যে পার্থক্য হয়। যার কারণে আল্লাহ কবীরকে আল্লাহ আকবর বলা হয়। মুসলমানরা আল্লাহ আকবর বলার সময় মনে করে যে, আমরা বড় খুদাকে (আল্লাহ আকবর) ডাকছি। আরবী ভাষায় কবীরের অর্থও বড় হয়। কবীর ওই বড় (কাদির) আল্লাহর শরীরের নাম। কবীরের অর্থ বড় হয়। যেমন, "মন্সূর" এর অর্থ "আলো" (Light) হয়, আবার "মুন্শর" কোনো ব্যক্তির নামও রাখা যায়। এইজন্য কুরআন মজিদে যেখানে পরমেশ্বরের বিষয়ে প্রকরণ রয়েছে, সেখানে কবীরের অর্থকে বড় না করে "কবীর"-ই করা উচিত। কবীর পরমেশ্বরের শরণে সদগুরু রামপালজী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে জপ করলে, এই নাম জপ করা ব্যক্তির অনেক লাভ হয়। কেবল কবীর (অকবীর) নাম বললে মোক্ষ লাভ হয় না, তবে সংসারে কিছু কার্য সিদ্ধ হয়ে যায়, যেমন যুদ্ধে বিজয়, মামলায় ন্যায় প্রাপ্ত ইত্যাদি। এর সাথে সাথে সত নামের (যা দুই অক্ষরের হয়, সেটির) জপ করলে, পূর্ণ লাভ পাওয়া যায়। সুরাঃ আশ্ শূরা - ৪২ আয়াত নং ২ -তে আরবী ভাষার বর্ণমালার তিনটি অক্ষর আছে :- "ঔন, সীন, কাফ" যেগুলি হিন্দি ও বাংলাতে "অ, স, ক" লেখা হয়। সতনামের দুই অক্ষরের সংকেত ঔন (অ) আর সীন (স) থেকে হয়। "অ" হল সতনামের প্রথম নামের প্রথম অক্ষর (হরফ) আর "স" হল সতনামের দ্বিতীয় নামের প্রথম অক্ষর (হরফ), যেগুলির অর্থ কোনো মুসলমানের জানা নেই। এই সতনাম সূক্ষ্মবেদে লেখা আছে অর্থাৎ এই দুটি নাম সম্পূর্ণভাবে লেখা আছে এবং পরমেশ্বর কবীর স্বয়ং নবী রূপে প্রকট হয়ে পবিত্র আত্মাদের (যারা তাঁর জ্ঞানকে বিশ্বাস করেছিলেন অর্থাৎ ইমান এনেছিলেন, তাদেরকে) সেই নামের জপ দীক্ষাতে দেন। ওই নাম আমাকে (রামপাল দাস) আমার গুরুদেব দিয়েছিলেন। সেই নামই আমি আমার অনুগামীদের দীক্ষার মাধ্যমে প্রদান করি। "সারনাম" এগুলির থেকে আলাদা। সেটিও স্মরণ করতে হয় যা দীক্ষার সময় দেওয়া হয়।

অষ্টআশি হাজার ঋষি ও তেত্রিশ কোটি দেবতা :- এই অষ্টআশি হাজার ঋষি ও তেত্রিশ কোটি দেবতাও কালের (জ্যোতি নিরঞ্জনের) নবী (বার্তাবাহক) ছিলেন। তারাও বেদ ও গীতাকে সঠিক ভাবে না বুঝে, এর বিপরীত নিজের অনুভব বলেছিলেন। সেটিকেই আঠারো পুরাণ ও এগারো উপনিষদ হিসাবে বানিয়েছেন। যার মধ্যে কিছু ঠিক ও কিছু ভুল জ্ঞানে ভরা রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র :- শ্রীবিষ্ণুই (সত্ত্বগুণ), শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্মেছিলেন, যারা কাল ব্রহ্মের পুত্র ছিল। যেভাবে নবী মুহম্মদকে কাল ব্রহ্ম দ্বারা প্রেরিত করে দুষ্টলোকদের দমনের জন্য লড়াই করিয়েছিলেন। ঠিক এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুকে প্রেরিত করে কালব্রহ্ম কংস, কেশী, চানুর, হিরণ্যকশিপুর ও অন্যান্য দুষ্টদের সমাপ্ত করিয়েছিলেন। শ্রীবিষ্ণু মোট নয়বার (Nine) ও চব্বিশবার (Twenty Four) কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন)অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন বলে জানা যায়। এক অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে এখনো বাকি আছে। এরমধ্যে মুখ্য শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে মানা হয়। উপরোক্ত এই সমস্ত নবীগণ কালেরই সাম্রাজ্য স্থাপিত করেছেন। রাবণ, কংস, কেশী, চানুর, শিশুপাল ইত্যাদি দুষ্ঠদের হত্যা করা হয়েছিল, যারা জনগনের দুঃখের কারণ ছিল। যার কারণে সাধারণ জনতা তাঁদেরকে (শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে) পূর্ণ পরমাত্মা মেনে পূজা করতে শুরু করে। তবে তারা কেউই পূর্ণ পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) নন। এই সব কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন) বিস্তারিত এক জাল। যতক্ষন না উপরোক্ত তিন নামের (কুরআনের সূরা আশ্ শূরা - ৪২ আয়াত নং ২- এর "ঔন, সীন, কাফ" যা গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩-তে "ওঁ, তত্, সত্" নাম বলা হয়েছে) জপ আমার (রামপাল দাস) কাছ থেকে দীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ না করা হবে, ততক্ষন পর্যন্ত কোনো জীব সতলোকওয়ালা জান্নাতে (স্বর্গ) চিরস্থায়ী থাকতে পারবে না। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের কষ্ট চিরকাল থাকবে এবং নরকেও কষ্ট ভোগ করতে হবে।

উপরে মুসলমান ধর্মের পূজা বর্ণনা করা হয়েছে। {রোজা, জাকাত, নামাজ, আজান (বংগ)} এগুলি দ্বারা জান্নাতের কাছে যে পিতর লোক বানানো রয়েছে, সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মৃত্যুর চক্রও চিরকাল চলতে থাকবে।

হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত সাধনা :- যেমন এই "মুসলমান বোঝেননি জ্ঞান কুরআন" পুস্তকের শুরুতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান হজরত মুহম্মদকে দিয়েছেন, সেই আল্লাহই হজরত দাউদকে "জবুর" এর জ্ঞান দিয়েছেন, হজরত মূসাকে "তৌরাত"- এর জ্ঞান এবং হজরত ঈসাকে "ইঞ্জিল"-এর জ্ঞান দিয়েছেন। এই আল্লাহই (কাল ব্রহ্ম) এর পূর্বে চার বেদের জ্ঞান ব্রহ্মা দেবতাকে দিয়েছিলেন , ব্রহ্মা দেবতা সেই জ্ঞান তাঁর নিজের সন্তান ঋষিদেরকে দিয়েছেন। চার বেদের জ্ঞান সূক্ষ্ম বেদ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। এর মধ্যে যত জ্ঞান আছে, তা হল সূক্ষ্মবেদের জ্ঞান কিন্তু অসম্পূর্ণ। ঋষি-মুনিরা বেদকে পড়েছেন কিন্তু তার অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। যার কারণে নিজ নিজ

বুদ্ধিমত্তা অনুসারে অর্থ বুঝে সাধনা করতে লাগলেন আর সেই বিভ্রান্তিকর জ্ঞান জনগণকে বলেছেন। ভুল অর্থ বুঝে ঋষি, দেবতাগণও সাধনা করেছেন, তার দ্বারা যা উপলব্ধি হয়েছে, সেই অনুসারে আঠারো পুরাণ বানিয়ে দিয়েছেন। যখন মহাভারতের যুদ্ধ প্রারম্ভ হতে যাচ্ছিল, তখন অর্জুন নামের যোদ্ধা (পঞ্চ পান্ডবদের মধ্যে এক ভাই) যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে দেন। যদি অর্জুন যুদ্ধ করতে মানা করে দিতেন, তাহলে ওই যুদ্ধ হতো না। কিন্তু কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) এই যুদ্ধ করাতে চেয়েছিলেন। এই কারণে অর্জুনকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। পরমেশ্বর কবীরজীর শক্তিরূপী রিমোটের (Remote) দ্বারা অর্জুন একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। কাল ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে বেদওয়ালা জ্ঞান সংক্ষিপ্ত করে উত্তর দিতে থাকেন। কাল ব্রহ্ম বিচার করলেন, অর্জুনের তো কিছুই মনে থাকবে না, এইজন্য তাকে বেদের জ্ঞান বলেছেন। যে কারণে চার বেদের জ্ঞান যা আঠারো হাজার শ্লোকে রয়েছে, তা কেবল সাতশো শ্লোকেই সারাংশ রূপে বলেছেন, যেটিকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলা হয়। {কিন্তু শব্দ হল আকাশের গুণ, যা নষ্ট হয় না। যার কারণে বেদব্যাস ঋষি (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন) দ্বারা দিব্য দৃষ্টি থেকে জেনে মহাভারত গ্রন্থে লেখা হয়েছিল, যা শ্রীমদ্ভগবত গীতা নামে পরিচিত। এইভাবে কুরআন মজিদের জ্ঞান হজরত মুহম্মদের মাধ্যমে কাল ব্রহ্ম বলেছেন। তা অন্য মুসলমানরা শুনে মনে রেখেছিলেন। মুহম্মদের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, সেই মুসলমানদের কাছ থেকে শুনে লেখা হয়েছিল। কিছু আয়াত পাথরের উপর খোদাই করে লেখা হয়েছিল। সব কিছুকে একত্রিত করে পবিত্র কুরআন মজিদ বানানো হয়েছে।}

পূর্ণ ব্রহ্ম (কাদির আল্লাহ) কবীর জী নিজের শক্তি দ্বারা কাল ব্রহ্মকে দিয়ে বেদের সারমর্ম জ্ঞান বলিয়েছিলেন। সমর্থবান তো তাঁরই নাম, যাঁর সামনে সবাই বিবশ হয়। তিনি যা চান, তাই করতে পারেন। শ্রীমদভগবত গীতার জ্ঞান সকল মানুষের (নারী ও পুরুষ) জন্য এক বরদান। যদিও বা এটি অসম্পূর্ণ। এরমধ্যে মাংস খাওয়া ও অন্যান্য আসক্তি বস্তু (তামাক সেবন), মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় পদার্থের সেবনের কোনো উল্লেখ নেই। কাল ব্রহ্ম যেমন কুরআনে নিজের ইবাদত (ভক্তি) করতেও বলেছেন এবং নিজেকে ছেড়ে অন্য সমস্ত কায়নাতের (সৃষ্টি) রচনাকারী কবীর আল্লাহর ভক্তি (ইবাদত) করতে বলেছেন। এছাড়া ওই সমর্থবানের বিষয়ে কোনো বাখবর (তত্ত্বদর্শী) সন্তের কাছে জানতে বলেছেন। কাদির আল্লাহ কবীর জী কুরআনের জ্ঞানদাতাকে দিয়েও এটাই বলিয়েছেন। একইভাবে গীতাতেও ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মের (কাদির আল্লাহ) বিষয়ে তত্ত্বদর্শী সন্তের (বাখবর) নিকট থেকে জানতে বলেছেন।

{যে ভক্তির ইবাদত বিধি বাইবেলে (যা জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিলকে একত্রিত করে করা হয়েছে) এবং কুরআনে কাল ব্রহ্ম নিজের পক্ষ থেকে বলেছিলেন। তবে বেদ ও গীতা জ্ঞান পুনরাবৃত্তি করা উচিত মনে করেন নি, কেননা সেই জ্ঞান পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল।}

হিন্দু ধর্মের উপাসনা :- হিন্দু ধর্মের (সনাতন ধর্ম) সদগ্রন্থ বেদ ও গীতার ভক্তি বিধি কেবল স্বর্গ (জান্নাত), মহাস্বর্গ (বড় জান্নাত) যাওয়া জন্য সঠিক কিন্তু পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য নয়। যার কারণে সাধকের জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতে থাকে। বেদ ও গীতার ভক্তি সাধনা একই, কারণ শ্রীমদভগবত গীতায় বেদের জ্ঞানই সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে। অধিকাংশ হিন্দু পিতর পূজা, ভূত পূজা ইত্যাদি করেন, এছাড়াও দেবতাদের (শিব ও বিষ্ণু) পূজাও করেন। গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫ -এ গীতার জ্ঞানদাতা প্রভু স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যারা পিতর পূজা করে, তারা পিতর যোনি প্রাপ্ত করে পিতর লোকে চলে যায়। ভূতের (প্রেত) পূজা করা ব্যক্তি ভূত হয়ে ভূতের লোকে থাকে। কিছু তো শিবের লোকে থাকে, যারা শিবের ভক্ত হয়। প্রত্যেক দেবতা লোকে পিতর লোক আছে, সেখানে ভূত, গণ ও পিতর থাকে। আবার এই গীতার শ্লোকে (৯/২৫) বলা হয়েছে যে, যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা সেই দেবতাদের লোকে চলে যায়। সেখানেও পিতর লোক রয়েছে। পিতর লোক এমন হয়, যেমন আধিকারীকদের (officers) বাংলো থেকে চাকরদের আবাস স্থান দূরে থাকে। যে সুখ-সুবিধা আধিকারীকদের জন্য হয়, তা চাকরদের জন্য হয় না। এইপ্রকার জান্নাতে (স্বর্গ) যে সুযোগ-সুবিধা প্রধান দেবতাদের প্রাপ্ত হয়, তা পিতরগণ পায় না। গীতা জ্ঞানদাতা এর পরে গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫ -তে বলেছেন যে, যারা আমার (কাল ব্রহ্মের) পূজা করে, তারা আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম লোকে চলে যায়। গীতার অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ -তে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যারা ব্রহ্মলোকে (কালের বড় জান্নাত) চলে যায়, তাদেরও সেখান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে আসতে হয় অর্থাৎ তাদেরও কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত হয় না।

গীতা ও বেদে পূজার বর্ণন :- গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০-১৫ -তে যজ্ঞ করার কথা বলা হয়েছে। যজ্ঞের অর্থ হল ধার্মিক অনুষ্ঠান। প্রধানত যজ্ঞ হল পাঁচটি:- **(১). ধর্ম যজ্ঞ, (২). ধ্যান যজ্ঞ, (৩). হবন যজ্ঞ, (৪). প্রণাম যজ্ঞ, (৫). জ্ঞান যজ্ঞ**। যজ্ঞ করার বিষয়ে শাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে :-

সর্ব প্রথম পূর্ণগুরুর নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সেই গুরুজীর অনুমতি সহিত তাঁর দিশা-নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করলে লাভ হয়।

১. ধর্ম যজ্ঞ :- ধার্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধু ও ভক্তগণকে ভোজন করানো এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা

যাত্রীগণেরা যদি কোনো স্থানে ভোজন না পায়, তারা এবং যারা গরীব ও ক্ষুদার্ত, তাদেরকে বিনামূল্যে ভোজন করানো। এছাড়া আবহাওয়া অনুসারে দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তকারীদের ভোজন, বস্ত্র, ওষুধ (Medicine) ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা। যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে গুরুদেবজীর অনুমতি নিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ কুয়ো খনন করা ইত্যাদি এই প্রকার কর্মকে ধর্মীয় যজ্ঞ বলা হয়।

২. ধ্যান যজ্ঞ :- পরমাত্মাকে দিন-রাত হৃদয় দিয়ে স্মরণ করা, যার কারণে মানবগণ পাপকর্ম থেকে বাঁচতে থাকে। সনাতন ধর্মের (বর্তমান হিন্দু ধর্ম) ঋষিগণ হঠযোগ করে ধ্যান করতেন কিন্তু বেদ ও গীতাতে হঠযোগ করে কঠোর তপস্যা করাকে ভুল বলা হয়েছে। সূক্ষ্মবেদে দৈনন্দিন কর্ম করতে করতে ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে। গীতা এবং বেদেও এই বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৭ -তে বলা হয়েছে যে, হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধও করো আর আমাকে স্মরণও করো।

৩. হবন যজ্ঞ :- তুলো দিয়ে সলতে বানিয়ে পাত্রে রেখে, গরুর বা মহিষের ঘি ঢেলে প্রজ্বলিত করাকে হবন যজ্ঞ বলা হয়। সূক্ষ্মবেদ ও চার বেদেও জ্যোতি জ্বালিয়ে হবন যজ্ঞ করতে বলা হয়েছে।

৪. প্রণাম যজ্ঞ :- হাত জোড় করে মাথা নত করে নমস্কার (সালাম) করা অথবা সিজদা করা হল অর্ধ (half) প্রণাম যজ্ঞ। দণ্ডবৎ প্রণাম যা মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে করতে হয়, এটি হল সম্পূর্ণ প্রণাম যজ্ঞ। সদগুরুকে এবং কাদির আল্লাহকে (সমর্থ পরমেশ্বর) দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত, যার দ্বারা পূর্ণ লাভ পাওয়া যায়।

৫. জ্ঞানযজ্ঞ :- ধর্মীয় গ্রন্থকে পড়া, আরতি বা নমাজ করা, সৎসঙ্গ শোনা এবং সৎসঙ্গ অন্যকে শোনানো, খুদার চর্চা করা, এগুলিকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা হয়।

যজ্ঞের দ্বারা লাভ

যদি কেবল উপরোক্ত যজ্ঞও করা হয় তাহলে সেই সাধক তার অনুষ্ঠান অনুযায়ী স্বর্গের (জান্নাত) সুখ কিছুকাল ভোগ করতে পারে। জান্নাতের সুখ ভোগ করার পর পাপ কর্মের ফল অনুসারে জাহান্নামে (নরক) গিয়েও কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিছু পাপ এমন আছে, যার ফলস্বরূপ পৃথিবীতে পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির জীবনও ভোগ করতে হয়। মানব শরীরও প্রাপ্ত হতে পারে। যদি অধিক যজ্ঞ করা হয়, তাহলে রাজাও হয়ে যায় কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর চক্র কখনও সমাপ্ত হয় না। এছাড়া স্বর্গ ও রাজত্বের সময়কাল খুব কমই হয়।

নাম জপের উপকারিতা :-

যদি এই যজ্ঞেগুলির সাথে যথার্থ নামেরও জপ করা হয়, তাহলে ফল অধিক পাওয়া যায় ও খুবই ভালো হয়।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫ -তে ওম্ (ওঁ) নামের জপ করতে বলা হয়েছে আর গীতা হল বেদেরই সারাংশ। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ -তে ওম্ (ওঁ) নামের জপ করতে বলা হয়েছে। বেদ ও গীতাতেও ওম্ নামের জপ এবং উপরের উল্লেখিত যজ্ঞগুলির সাধনা করার কথাও বলা হয়েছে।

বিশেষ :- যজ্ঞের সাথে সাথে ওম্ (ওঁ) নামের জপ করা ব্যক্তি যদি আজীবন এই সাধনা করে শরীর ত্যাগ করে, তাহলে তার মহাস্বর্গ (বড় জান্নাত) অর্থাৎ কালের ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তার সুখ অধিক সময় পর্যন্ত হয় কিন্তু নরকের (জাহান্নাম) কষ্ট-যন্ত্রণার ভোগ ভুগতেই হবে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরকাল চলতেই থাকবে। এছাড়া পশু-পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তুর শরীরেও কষ্ট ভোগ করতে হবে।

"আদি সনাতন পন্থ অর্থাৎ যথার্থ কবীর পন্থের পূজা"

আদি সনাতন পন্থে সনাতন ধর্ম (বর্তমানের হিন্দু ধর্ম) এর উপরোক্ত ধর্মগ্রন্থের (চার বেদ ও গীতা) সাধনার (উপরে উল্লিখিত পাঁচটি যজ্ঞের) সাথে গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ উল্লিখিত তিন মন্ত্রের (ওম্-তত্-সত্) জপও করতে হয়। যে সাধনার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরতরেই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত (সতলোক) প্রাপ্ত হয়। যেখানে জান্নাতই জান্নাত রয়েছে, জাহান্নাম (নরক) নেই। এই সত্যভক্তি বলার জন্য স্বয়ং পরমেশ্বরকে (কাদির আল্লাহ) পৃথিবীতে ও কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের অন্যান্য লোকেও আসেন। গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ -তে তিনটি মন্ত্র {ওম্ (ওঁ), তত্ ও সত্} রয়েছে :-

মূল পাঠ :- ওঁ (ওম্), তত্, সত্ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদা চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরাঃ॥ ২৩॥

সরলার্থ :- গীতাতে বলা হয়েছে যে, ওঁ (ওম্), তত্, সত্ এই (ব্রহ্মণঃ) সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ সমর্থ পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্তার সাধনা করার জন্য তিন নামের মন্ত্র রয়েছে। (ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ) -এর স্মরণের বিধি তিনপ্রকারে বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি সনাতন পন্থে (ব্রাহ্মণাঃ) বিদ্বান সাধক এই আধারেই সাধনা করতেন। এই মন্ত্র সূক্ষ্মবেদে স্পষ্টভাবে

লেখা রয়েছে। গীতায় ওঁ (ওম্) স্পষ্টভাবে আছে, বাকি দুটি মন্ত্র সাংকেতিক (code words -এ) রয়েছে। {বাস্তবে "ওঁ"-ও সাংকেতিক। "ওম" এটি স্পষ্ট নাম। এর সাংকেতিক (code) হল "ওঁ"। কাল ব্রহ্ম এটিকে তাঁর নিজের সাধনা রূপে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে ঋষিরা ভেবে নিয়েছিলেন যে "ওঁ" কোডওয়ার্ড (সাংকেতিক শব্দ) ওম্ এরই নাম }। সূক্ষ্মবেদের জ্ঞান স্বয়ং পরমেশ্বর বলেছিলেন। ওই সূক্ষ্ম বেদের মধ্যে লেখা সাধনার সম্পূর্ণ বিধির আধারে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সাধক হয়েছে এবং ওই সূক্ষ্মবেদের আধারে (যজ্ঞা:) ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিধান তৈরি হয়েছে। চার বেদ হল ওই সূক্ষ্মবেদেরই অংশ (যা অসম্পূর্ণ জ্ঞান), যা কালব্রহ্ম (গীতা, কুরআন ও বাইবেলের জ্ঞানদাতা) ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণ (incomplete) দিয়েছেন, যাতে সমস্ত মানুষ তাঁর জালেই ফেঁসে থাকে। ঋষিরা এই চার বেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ মনে করে সেই অনুসারে সাধনা করতেন। কেউই কালের জাল থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। কারোরই জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত হয়নি। যার কারণে ঋষিরা (সাধকরা) কঠোর তপস্যা ও হঠযোগ শুরু করেন, যার ফলে তাদের মধ্যে সিদ্ধি প্রকট হয়ে গিয়েছিল। ওই সিদ্ধি প্রদর্শন করে তারা খ্যাতি অর্জন করে জনতার কাছে পূজ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পরে স্বর্গ-নরক, পশু-পাখি ইত্যাদি চুরাশি লক্ষ প্রকারের যোনিতে গিয়ে কষ্ট ভোগ করেছে। যে সূক্ষ্মবেদ সৃষ্টির প্রারম্ভে বলা হয়েছিল তা অনেক বর্ষ পর্যন্ত চলে, পরে ওই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। কারণ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাও হতে থাকতো। তখন বেদের জ্ঞানেরও প্রচলন ছিল না। ঋষিগণও বেদের সাধনা ত্যাগ করে হঠযোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে একে অপরের থেকে অধিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রতিযোগিতা করতে লেগে যেত, কেননা বেদের সাধনা দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হয় না। বেদমন্ত্রের জপ ত্যাগ করে ঋষিগণ হঠযোগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে এবং পরস্পরের চেয়ে বেশি শক্তি দেখানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ বেদের সাধনায় প্রভু প্রাপ্ত হয় না ।

যে প্রভুকে (কাল ব্রহ্ম) ইষ্ট (পূর্ণ পরমাত্মা) মনে করে ঋষিরা ইবাদত (পূজা) করতেন বা বর্তমানেও করছেন, সেই কাল প্রভু কাউকে দর্শন না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন (কাল আল্লাহ) যে, কাউকে তিনি কখনও দর্শন দেবেন না। এইজন্য ঋষিরা পরমেশ্বরকে নিরাকার মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু চার বেদের মধ্যে পরমাত্মাকে সাকার মনুষ্যের সমান স্বরূপ (শরীরযুক্ত) আছে লেখা রয়েছে। (পাঠকগণ! এই পুস্তকে বেদের মন্ত্রগুলির ফটোকপি "সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান কে বলেছেন" সেই অধ্যায়ে দেখুন।) এই প্রকার বাইবেল ও কুরআন মজিদেও পরমেশ্বরকে (কাদির আল্লাহ) মানুষের মতো স্বরূপ (শরীরযুক্ত) লেখা রয়েছে কিন্তু সমস্ত বাইবেল ও কুরআন পড়া ব্যক্তিরা, পরমাত্মাকে (কাদির আল্লাহ) নিরাকার (বেচুন) বলে মনে করেন। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে সঠিকভাবে বোঝেননি। কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) বেদ ও গীতাতে তো তাঁর নিজের সাধনার মন্ত্রের নাম 'ওঁ (ওম)' সেটি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে (কাদির আল্লাহকে) প্রাপ্তি করার সাংকেতিক শব্দগুলো (code words) "ওঁ" (ওম), তত্, সত্" লিখে ছেড়ে দিয়েছেন। {"ওঁ" অক্ষর হল বাস্তবে "ওম্"। এখানে (গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ - তে) "ওঁ" শব্দ অস্পষ্ট লিখে দিয়েছেন।} যেহেতু গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ -তে এবং যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫ -তে স্পষ্টভাবে "ওম্" লিখে দিয়েছেন।} এই কাল ব্রহ্ম কুরআনের সূরাঃ আশ্ শূরা - ৪২, আয়াত নং ২ -তেও তিনটি শব্দ সাংকেতিক (code words) ভাবে বলেছেন। কুরআনে তাঁর নিজের মন্ত্রও সঠিক বলেন নি। তবে বেদে এটা তো লিখেছেন যে, যথার্থ বা সঠিক ভক্তির নাম যেটা সাংকেতিক ভাবে রয়েছে, তা কেবল পরম অক্ষর ব্রহ্মই অর্থাৎ কাদির আল্লাহ কবীরই আবিষ্কার করে বলে থাকেন। ওই কাদির আল্লাহ কবীর দ্বারা বলা গুপ্ত (সাংকেতিক) নামগুলির সঠিক মন্ত্রগুলো আমার (রামপাল দাস) নিকটে রয়েছে। এই তিনটি নামের (মন্ত্রের) জ্ঞান আমাকে অবগত করানো হয়েছে, যা এই প্রকার :-

"ঔন" এটি আরবী ভাষার বর্ণমালার (হরফ) অক্ষর যেটি দেবনাগরী ভাষায় "অ" হয়। "সীন" এটি আরবী ভাষার বর্ণমালার অক্ষর, এটি দেবনাগরী ভাষায় "স" হয় এবং "কাফ" আরবী ভাষার বর্ণমালার অক্ষর, এটি দেবনাগরী ভাষায় "ক" হয়। যেমন "ওঁ (ওম্)" মন্ত্রের প্রথম অক্ষর "অ" হয়। এইজন্য "ঔন" অক্ষর "ওঁ (ওম্)" এর সাংকেতিক হয়।

তত্ :- এটি সাংকেতিক মন্ত্র যা গীতায় লেখা রয়েছে। এর যথার্থ মন্ত্রের প্রথম অক্ষর "স" রয়েছে।

এইজন্য "সীন" অক্ষরটি তারই দিকে সংকেত করছে এবং যেটি তৃতীয় "সত" মন্ত্র আছে, ওই যথার্থ মন্ত্রের প্রথম অক্ষর "ক" আছে। এইজন্য "কাফ" অক্ষর তার দিকেই সংকেত করছে। বাস্তবে "ওঁ" অক্ষরটিও সাংকেতিক। এর যথার্থ নাম (মন্ত্র) হল "ওঁ" কিন্তু "ওঁ" অক্ষরের জ্ঞানও কাদির আল্লাহ কবীর তিনি সত্যযুগে "সত সুকৃত" ঋষি রূপে প্রকট হয়ে মুনি-ঋষিদেরকে বলেছিলেন যে, "ওঁ" অক্ষরটি হল "ওম্", এটিকে "প্রণব" শব্দও বলা হয়।

কুরআনে সূরাঃ আশ্ শূরা ৪২ আয়াত নং ২ -তে "ঔন", "সীন", "কাফ" আছে আর গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক নং ২৩ -তে ওম্, তত্, সত্ একই আছে। এই তিন নামের মন্ত্র জপ দ্বারা সমস্ত পাপ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং পাপকর্মের দন্ডও সমাপ্ত হয়ে যায়। অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায়, রোগ, শোক (চিন্তা), দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই মন্ত্রের জপ করা মর্যাদাযুক্ত ভক্ত আত্মারা, এই কালের লোকে খুবই সুখের জীবন-যাপন করে এবং মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথেই অর্থাৎ খুব শীঘ্রই ওই সর্বশ্রেষ্ঠ কাদির আল্লাহর জান্নাতে (সতলোক সুখ সাগর) চলে যায়। সেখানে জাহান্নাম (নরক) নেই, ওই

স্থানে বৃদ্ধ অবস্থা ও মৃত্যু হয় না, সকলে সর্বদা সুখে থাকে। ওই সতলোকে এই পৃথিবীর মতো সৃষ্টি (সংসার) রয়েছে। এই পৃথিবী হল নশ্বর কিন্তু ওই সতলোক অবিনশ্বর।

বিশেষ :- যে সমস্ত ঋষিরা ও অন্যান্য সাধকগণ সনাতন ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ গীতা ও বেদের মধ্যে বর্ণিত উপরোক্ত যে সাধনা করে, তারা কাল ব্রহ্মের ব্রহ্মলোকে (বড় জান্নাত) অর্থাৎ মহাস্বর্গে চলে যায়। আর যে সমস্ত সাধকগণ আদি শঙ্করাচার্যের দ্বারা বলা শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশঙ্কর ও ইত্যাদি পাঁচ দেবের পূজা করে এবং অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা করে, তারা দেবতাদের লোকে তৈরি করা ওই জান্নাতে (স্বর্গ) চলে যায়।তাদের পুণ্য সমাপ্ত হতেই শীঘ্র নরকে চলে যায়। তারপর পুনরায় পৃথিবীতে অন্যান্য জন্ম প্রাপ্ত করে দুঃখী হতে থাকে এবং এ ছাড়াও ভূত, পিতর ও অন্যান্য জীবনও ভোগ করতে হয়। তবে যারা মহাস্বর্গে (ব্রহ্ম লোকে) চলে যায়, তাদের মুক্তির সময় অধিক তো হয়ই কিন্তু সেখানকার সময় সমাপ্ত হতেই পুনরায় পৃথিবীতে এসে জন্ম নিতে হয়। তারপরে পিতর, ভূত ও অন্যান্য পশু-পাখি ও জীব জন্তুর জন্মের কষ্ট ভোগ করতে হয়। এরপরে জাহান্নামেও তাদেরকে অবশ্যই যেতে হয়।

যে ভক্তগণ বাইবেল (তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল) ও কুরআনের জ্ঞান পর্যন্ত সীমিত এবং এই পুস্তকের বলা জ্ঞান অনুসারে যারা সাধনা করছেন, তারা তো জান্নাতেও (স্বর্গেও) যেতে পারবেন না।

উদাহরণ :- বাবা আদম জী এনাদের সব থেকে উচ্চপদের নবী ছিলেন। যে সাধনা (ইবাদত) হজরত আদম জী করেছিলেন, সেই ইবাদত হজরত আদমের সন্তান অর্থাৎ হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত অনুগামীগণ আজও করছেন। হজরত আদম জান্নাত ও জাহান্নাম অর্থাৎ স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে ছিলেন। ওই স্থানকেই পিতরলোক বলা হয়। নবী মুহম্মদ সাহেব তিনি স্বয়ং নিজের চোখে সেখানে গিয়ে দেখে বলেছিলেন যে, বাবা আদম কখনো হাসছিলেন, কখনো কাঁদছিলেন। অতএব সেখানে তিনি অস্থির জীবন কাটাচ্ছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, ওই স্থান জান্নাত(স্বর্গ) কখনই হতে পারে না। যে স্থানে সুখ-দুঃখ উভয় রয়েছে।

কথা হজরত মুহম্মদ (স.) থেকে শুরু হয়েছিল যে, তিনি "বাখবর" নন, তাহলে সন্ত রামপালজি মহারাজ, যিনি এক অমুসলিম (অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি) আছেন, তিনি কিভাবে বাখবর প্রমাণিত হবেন?

এখন মুসলমান ভাই ও বোনেরা স্বয়ং নিজেরাই জেনে নিন যে, সন্ত রামপাল জী বাখবর কি না? অর্থাৎ তিনি সত্য নবী আছেন, কি না? হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত এবং সকল ঋষি, দেবতা, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদির মধ্যে কে কোন স্তরের নবী (সন্দেশবাহক) ছিলেন?

কবীর কাদির খুদার (পরমেশ্বর) দ্বারা দেওয়া জ্ঞানকে, তাঁরই পাঠানো নবী গরীবদাস জী মহারাজ এইভাবে বলেছেন :-

অমর গ্রন্থ থেকে সুমিরণ অঙ্গের বাণী :-

গরীব, ঐসা অবিগত রাম হৈ, আদি অন্ত নহীঁ কোয়। বার পার কীমত নহীঁ, অচল হিরম্বর সোয়॥১॥
গরীব, ঐসা অবিগত রাম হৈ, কাদির আপ করীম। মীরা মালিক মেহরবান, রমতা রাম রহীম॥৫॥
গরীব, দোউ দীন মধ্য এক হৈ, অলহ অলেখ পিছান। নাম নিরন্তর লীজিয়ে, ভক্তি হেত উর আন॥১২॥
গরীব, রাম রটত নহী টীল কর, হরদম নাম উচ্চার। অমী মহারস পীজিয়ে, যৌহ তত্ব বারংবার॥২১॥
গরীব, কোটি গউ জে দান দে, কোটি যজ্ঞ জোনার। কোটি কূপ তীর্থ খনৈ, মিটৈ নহীঁ জম মার॥২২॥
গরীব, কোটিক তীর্থ ব্রত করৈ, কোটি গজ করৈ দান। কোটি অশ্ব বিপরৌঁ দিয়ে, মিটৈ ন খৈঁচা তান॥২৩॥
গরীব, ঐসা নির্মল নাম হৈ, নির্মল করৈ শরীর। ঔর জ্ঞান মণ্ডলীক হৈ, চকবৈ জ্ঞান কবীর॥৩৮॥
গরীব, নাম বিনা সুনা নগর, পড়য়া সকল মেঁ শোর। লূট ন লুটী বন্দগী, হো গয়া হংসা ভোর॥৯৯॥
গরীব, অগম নিগম কুঁ খোজ লে, বুদ্ধি বিবেক বিচার। উদয় অস্ত কা রাজ মিলে, তো বিন নাম বেগার॥১০০॥
গরীব, ভক্তি বিনা কেয়া হোত হৈ, ভ্রম রহ্যা সংসার। রত্তী কঞ্চন পায়া নহীঁ, রাবন চলতী বার॥১০৫॥

সুমিরণ অঙ্গের উপরোক্ত বাণীতে সন্ত গরীবদাস জী বলছেন যে, খুদার ইবাদত সতনাম অর্থাৎ সঠিক ভক্তি মন্ত্রের জপ করলে পূর্ণ লাভ হয়। নামের জপ না করে যদি অন্য ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ করা হয় তাহলে তা কিন্তু সম্পূর্ণ মোক্ষ লাভের উপায় নয়, এতে অন্য আধ্যাত্মিক লাভ পাওয়া যায়।

❖ **ভাবার্থ :-** বাণী (আয়াত) নং ১, ৫ -রামের (খুদা) না কোনো আদি অর্থাৎ জন্ম আর না কোনো মৃত্যু আছে অর্থাৎ পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) জন্ম-মৃত্যু হয় না এবং তাঁর মূল্যায়নও করা যায় না যে, তিনি কত মহান আছেন? তাঁর প্রত্যেক গতিবিধি ও শক্তি অপরিসীম অর্থাৎ অন্তহীন গভীর। তিনি সমর্থবান (কাদির) দয়াবান (করিম)। তিনি স্বয়ংই সমস্ত কার্য করেন। তিনি সকলের মালিক (প্রভু)। তিনি সর্বত্র ভ্রমণকারী (রমতা রাম) দয়ালু (রহিম) পরমেশ্বর। (১,৫)

❖ **বাণী নং ১২ :-** উভয় ধর্মের (মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম) একই প্রভু আছেন। তাঁকে রাম বলুন অথবা রহিম খুদা বলুন। তাঁর নামের জপ সঠিক শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে করুন। (১২)

❖ **বাণী নং ২১ :-** (রাম রটত) আল্লাহর নামের জপ দেরি না করে, জপ শুরু করে দাও অর্থাৎ পূর্ণগুরুর (পীর) নিকট হতে দীক্ষা প্রাপ্ত করে, ওই দুই অক্ষরের সতনাম প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে (সর্বদা) জপ করো। এই ভক্তির রস পান করো অর্থাৎ এটা (তৎ) নিজস্ব (বিশেষ) সাধনা । এটিকে বার বার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে করো। (২১)

❖ **বাণী নং ২২ :-** কুরআন মজিদের সূরা আশ্ শূরা ৪২ আয়াত নং ২ -তে "ঔন, সীন্, কাফ", এই সাংকেতিক নামের যে বাস্তবিক মন্ত্র আছে, সেই নাম জপ না করে, যতই ধর্ম কর্ম করো না কেন, তার দ্বারা যম দূতের দণ্ড (জম মার) সমাপ্ত হবে না অর্থাৎ যমরাজের কাছে জাহান্নামে গিয়ে পাপের দণ্ড ভোগ করতেই হবে। যেমন পুরাণে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গরু দান করলে, দানকর্তার অনেক পুণ্য লাভ হয়, কেননা স্বর্গেও সে দুগ্ধ পান করতে পারবে। যদি রামের (কাদির আল্লাহর) নাম জপ না করে কেউ, কোটি (কোটি) গরুও যদি দান করেন আর কোটি কোটি ধর্মীয় যজ্ঞও (জগ জৌনার) যদি করেন অথবা কোটি কুঁয়াও (পানীয় জলের দান দিয়ে ধর্মার্থ) খননও করে পানীয় জলের ব্যবস্থাও করে দেন কিংবা কোটি তীর্থযাত্রীদের স্নান করার উপলক্ষ্যে পুকুর খনন করে দেন বা কোটি কোটি বার রোজা (ব্রত) রাখেন কিংবা কোটি তীর্থ ভ্রমণ করেন কিংবা কোটি হাতি, কোটি কোটি ঘোড়াও দান করে, এই প্রকার ধার্মিক ক্রিয়া-কর্ম, দ্বারা কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত হবে না। নরকেও (জাহান্নামে) যেতে হবে। এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ফল এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে পারবেন, এছাড়া ক্ষণিক সময়ের জন্য স্বর্গ সুখ পাবেন কিন্তু এর পরে অন্য প্রাণীদের শরীরেও কষ্ট ভোগ করতে হবে, এমনকি নরকের (দোজখ) জ্বলন্ত আগুনেও জ্বলতে হবে। (২২)

❖ **বাণী নং. ২৩ :-** এই তিন মন্ত্রে খুদার (রাম) নাম এতটাই নির্মল (পবিত্র) যে, ওই সাধকের সমস্ত পাপ কেটে গিয়ে আত্মাকে নির্মল করে দেয়। অন্যান্য আধ্যাত্ম জ্ঞান যেমন - চার বেদ, চার কতেব, আঠারো পুরাণ, গীতা, ভাগবত (সুধাসাগর) অন্যান্য সব রয়েছে, এ সব (মণ্ডলিক) ক্ষেত্রীয় (আঞ্চলিক) জ্ঞান। আল্লাহ্ কবীর কর্তৃক বর্ণিত আধ্যাত্ম জ্ঞান হল (চক্রবর্তী) সম্পূর্ণ জ্ঞান। এটি সর্ব ধর্মের মানবের জন্য। কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই তিন নামের জপ সকল মানবের জন্য যজ্ঞও সকলের জন্য। (২৩)

❖ **বাণী নং ৩৮ :-** বেদ, গীতা, পুরাণ এবং কুরআন ও বাইবেলে মন্ডলীক (আংশিক) জ্ঞান আছে। তবে কবীর পরমেশ্বর দ্বারা কথিত অমরবাণী স্বসম বেদে সম্পূর্ণ অথাৎ চক্রবর্তী জ্ঞান আছে। এইজন্য পড়ুন এই পুস্তকের "সৃষ্টি রচনা" নামক অধ্যায় 181 পৃষ্ঠায়।

❖ **বাণী নং ৯৯ :-** যদি উপরোক্ত অন্য ধার্মিক ক্রিয়াগুলোর সাথে নামের (মন্ত্র) জপ না করা হয়, তাহলে মানব জীবন বৃথা (সূনা) অর্থাৎ ওই জীবাত্মার সাথী পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) হবেন না। নাম জপ ছাড়াই ব্যর্থ শোরগোল (চিৎকার) করা হচ্ছে অর্থাৎ অন্য যা বলা হয়, ওই সব ব্যর্থই আওয়াজ। পরমেশ্বরের যথার্থ সত্য নামের জপ যদি এই সময় না লুটতে পারো কিংবা ব্যাকুল হয়ে যদি তাঁর ইবাদত না করো, তাহলে হে মানব! সকাল (ভোর) হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ মৃত্যু হয়ে গিয়েছে, সংসার কেবলমাত্র স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে, নিজের কাছে কিছুই থাকে না। এই প্রকার সত্য ভক্তি না করে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে পরে তো অনুতাপ করতে হবে। (৯৯)

❖ সন্ত গরীবদাস জী পরমেশ্বর কবীর জী দ্বারা দেওয়া যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলেছেন, হে মানব! অগম (আগামী বা ভবিষ্যত জীবনের) নিগম (দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার) বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ বিবেচনার সাথে বিচার করো। যদি মানবের কাছে সত্যনাম গুরুর নিকট প্রাপ্ত না হয় আর উদয় (যে স্থান হতে পৃথিবীতে ভোর হয়) অস্ত (যে স্থান হতে সূর্য অস্ত যায় বা সন্ধ্যা হয়, ওই স্থান) পর্যন্ত রাজ্য অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর রাজ্যও যদি দেওয়া হয়, তাহলেও সেটি বেগারের সমান।

বেগারের পরিভাষা :- ১৯৭০ সালের কাছাকাছি পেট্রোলে চলমান তিন চাকার টেম্পো (Three Wheeler Tempo) চলতো। একদিন যদি কোনো টেম্পো ড্রাইভারকে তার সাথী ড্রাইভাররা, রাস্তায় (route) গাড়ি চালাতে না দেখতো, তাহলে পরের দিন অন্য টেম্পো চালক সাথী তাকে জিজ্ঞেস করতো যে, গতকাল আসোনি কেন? সে উত্তরে বলে, গতকাল আমি বেগারে চলে গিয়েছিলাম।

ওই সময়ের কথা, যখন থানায় জিপ ও অন্যান্য গাড়ি (যানবাহন) থাকত না। পুলিশকে যদি কোথাও অভিযান (রেড) চালাতে হতো, তাহলে কোনো টেম্পো বা চার চাকার গাড়ি চালককে (Three Wheeler or four wheeler) সন্ধ্যায় থানায় ধরে নিয়ে আসতো। রাত্রে বা দিনে যেখানেই যেতে হতো তাকেই নিয়ে যেত। মালিকই ড্রাইভার হতো বা মালিকের ভাড়া করা ড্রাইভার হতো। টেম্পো চালক নিজের তরফ থেকে তেল (পেট্রোল) ভরতো। সারা দিন-রাত তাকে চালাতে হতো। পুলিশ তাকে গভীর রাতে ছেড়ে দিত। অন্য কেউ দেখলে মনে করতো যে, টেম্পো চালক আজ নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এসেছে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওই চালক অনেক বেশী ভাড়া পেয়েছে, কারণ দিন-রাত গাড়ি চালিয়েছেন। তবে ওই টেম্পো চালক তখন জানালো যে, তার পকেট থেকে ২০০ টাকা (বর্তমানে দশ হাজার টাকার সমতুল্য) তেল খরচ ও ভোজন করায় খরচ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে ভাড়া বাবদ এক টাকাও পায়নি। এছাড়া

গাড়ির (টেম্পুর) চাকা এবড়ো খেবড়ো কাঁচা ইঁটের রাস্তায় চালানোর কারণে ,অন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতির জন্য পৃথকভাবে খরচ হয়ে গিয়েছে। বেগারের অর্থ হল এই রকম যে, উপার্জন তো মোটেই হয় না এবং তার উপর আবার পরিশ্রম অধিক করতে হয় এবং খরচও অধিক হয়। একেই বেগার বলা হয়।

এই প্রকার নিজেদের পূর্বজন্মের তপস্যা ও দান-ধর্ম করার প্রতিফলে রাজা হয় আর রাজা হওয়ার পর যে সুখ-সুবিধা তার প্রাপ্ত হয়, তাতে ওই রাজার পুণ্য ব্যয় হয়ে যায়। ওই রাজা যদি পূর্ণ গুরুর নিকট সত্য ভক্তির বাস্তবিক নাম নিয়ে ভক্তি না করেন, তাহলে তার পুণ্যের কামাই হয় না। দিন-রাত্রি ভোগ বিলাস এবং ঠাট বাট করে, তার পুণ্য সমাপ্ত হতে থাকে। যদি সত্য ভক্তি না করেন, তাহলে বুঝবেন সে রাজা বেগার করছেন। (১০০)

❖ রাবণ শ্রীলঙ্কার রাজা ছিলেন। তিনি তার মহল সোনার (Gold) বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি দেবতা শিবের (তমোগুণ) উপাসক ছিলেন। ভক্তির পাশাপাশি তিনি অনেক ভুলও করতেন, মাংস খেতেন ও মদ্যপানও করতেন। শ্রীবিষ্ণু দেবতা স্বয়ং অযোধ্যায় রাজা দশরথের ঘরে রামচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন নির্বাসনে সময় কাটাচ্ছিলেন, ওই সময় রাজা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সীতা মাতাকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রীরাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে রাবণ মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সোনার প্রাসাদে থাকতেন কিন্তু পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এক (রতি) গ্রাম স্বর্ণও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেননি।

ভাবার্থ হল এই যে, ইবাদতকারীকে সমস্ত খারাপ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়, তবেই ভক্তিতে সফলতা পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তি করেন না আর অর্থ উপার্জনের জন্য দিনরাত নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, বড় বড় কোঠি-বাড়ী তৈরি করে রেখেছেন, গাড়ি নিয়ে রেখেছেন কিন্তু অন্তিম সময় কেবল ভক্তির কামাই (সম্পদ) সাথে যাবে। সংসারের পার্থিব কোনো সম্পদ (ধন-দৌলত) কাজে লাগবে না। যদি আপনার কাছে ধন থাকে, তাহলে সেই ধন দান ধর্মের কাজেও ব্যয় করুন এবং তার সাথে সাথে নামেরও স্মরণ ও করুন। (১০৫)

কাদির আল্লাহ কবীর জীর নবী সন্ত গরীবদাস উভয় (ইসলাম ও হিন্দুধর্ম) ধর্মের ভক্তির ত্রুটিগুলো বলেছেন:-

❖ **সন্ত গরীবদাসের অমর গ্রন্থের রাগ কাফী থেকে বাণী, শব্দ নং ১ :-**

☆ নহী হৈ দারমদারা বহাঁ তো, নহী হৈ দারমদারা ॥টেক॥

ওস দরগহ মেঁ ধর্মরায় হে, লেখা লেগা সারা ॥১॥ মুল্লা কূকৈ বংগ সুনাবৈ, না বহরা করতারা ॥২॥ তীসৌঁ রোজে খূঁন করত হো, কৈসে হোয় দীদারা ॥৩॥ মূল গঁবায় চলে হো কাজী, ভর লিয়া ঘোর অন্ধারা ॥৪॥ ভবজল বূড় গয়ে হো ভাঈ, কীজৈগা মুঁহ কারা ॥৫॥ বেদ পঢ়ৈ পর ভেদ ন জানৈ, বাঁচৈ পুরান অঠারা ॥৬॥ জড় কূঁ অন্ধরা পান খবাবৈ, বিসরে সৃজনহারা ॥৭॥ উজড় খেড়ে বহুত বসায়ে, বকরা ঝোটা মারা ॥৮॥ জা কূঁ তো তুম মুক্তি কহত হো, সো হৈঁ কচ্চে বারা ॥৯॥ মাঁস-মছলিয়া খাতে পান্ডে, কিস বিধি রহৈ আচারা ॥১০॥ সৌঁ যজমানে নরক মেঁ চালে , বুড়ে স্যুঁ পরিবারা ॥১১॥ ছাতী তোঁড়ৈঁ হনেঁ যম কিংকর, লাগৈ যমদূতো কা লারা ॥১২॥ দাস গরীব কহৈ বে কাজী পান্ডে, না কহী বার ন পারা ॥১৩॥ ॥১॥

❖ **সরলার্থ :-** ধর্মরায়ের (পরমাত্মার বিচারক) আদালতে কারোর (দরমদারা) বিশেষ অধিকার নেই অর্থাৎ কারোর সুপারিশ চলে না। কেবল কর্ম ফলের ভিত্তিতে সব কিছু নির্ণয় করা হয়। সারা জীবনের সমস্ত পাপ ও পুণ্য কর্মের হিসাব লেখা হবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের ব্যক্তিরা ভুল সাধনা করছেন। মোল্লা মসজিদের উপরে উঠে উচ্চস্বরে জোরে জোরে আল্লাহর (পরমাত্মার) আজান (বংগ) লাগিয়ে স্তুতি করেন। সন্ত গরীব দাস বলেছেন যে, করতার (কাদির আল্লাহ) যিনি সকলের মনের কথা শুনতে পান, এমন কি যদি পিঁপড়ার পায়েতে পায়েল বা ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হয়, তবুও সেই পায়েলের ঝংকার (আওয়াজ) পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) শুনতে পারেন। তিনি বধির (কানে কালা) নন অর্থাৎ উচ্চস্বরে তার স্তুতি করবে না। স্বাভাবিক কণ্ঠে হৃদয় দিয়ে স্তুতি করো। রমজান মাসে মুসলমানেরা ত্রিশদিন রোজা রাখেন। সারাদিন পানিও পান করে না। সন্ধ্যায় ভোজনের সময় মুরগি, ছাগল ইত্যাদি মেরে তার মাংস খায়। তাহলে কিভাবে আল্লাহর দর্শন (দীদার) করতে পারবে?

হে কাজী! মূল ধন অর্থাৎ মানব জন্মের শ্বাসের পুঁজিকে নষ্ট করে সংসার ত্যাগ করে, ঘোর পাপ করে পাপের থলি (ভরা ব্যাগ) নিয়ে চলে যাচ্ছ। খুদার দরবারে যখন কর্মের হিসাব হবে, তখন তোমাদের মুখ কালো করে দেওয়া হবে অর্থাৎ জাহান্নামে (নরক) নিক্ষেপ করা হবে আর হিন্দু পণ্ডিতদের বলা হয়েছে যে, তোমরা বেদকে পড়েছো কিন্তু তার অর্থ সঠিকভাবে বোঝোনি। আঠারো পুরাণ পড়ছো কিন্তু ঠিকভাবে বোঝোনি। অন্ধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান না জানা নেত্রহীন পণ্ডিত বেদকে পড়ছো আর পাথরের মূর্তির উপর বেল পাতা, তুলসী পাতা চড়িয়ে পূজা করছো আর এদিকে সৃষ্টিকর্তাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছো। বেদে কোথাও মূর্তি পূজা করার কথা লেখা নেই। উজ্জড় খেড়োর (যেগ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাদের ধ্বংসাবশেষকে খেড়ো বলা হয়।) উপর নিবাসকারী প্রেতাত্মাদের শান্ত করার জন্য, ভেড়া ও ছাগল জবাই করছো, এটা মহাপাপ। যাকে তোমরা মুক্তির সাধনা বলছো, সে তো সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ,

যেমন- পাশা খেলায় কাঁচা চালের কোনো মূল্য হয় না। কিছু পুরোহিতরা (পান্ডারা) মাছ-মাংস খাওয়ার পরে স্নান করে তিলক লাগিয়ে পবিত্র দেখায়, তাহলে পরমাত্মা কিভাবে প্রসন্ন হবে? তবে পূজারী (যজমান) যে গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে পূজা করে,পূজারি সহিত নরকে যাবে। নিজের পরিবারকেও নরকে নিয়ে যাবে। যমের দূতগণ আছে বারো কোটি। সমস্ত সেনাবাহিনীর মতো (লারা সংযুক্ত) লাইন নিয়ে চলে। তোমার বুক ভেঙ্গে দেবে অর্থাৎ ওরা তোমাদেরকে নির্দয়ভাবে মারবে। সেইজন্য সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে, হে কাজীগণ! হে পণ্ডিতগণ! পরমেশ্বরের (কাদির আল্লাহ) শক্তি অসীম। অতএব সত্য ভক্তি করে, বর্তমানে নিজের জন্মকে সংশোধন করে নাও।

❖ **রাগ কাফি থেকে শব্দ নং ২ :-**

✯ ক্যা গাবৈ ঘর দূর দিবানে, ক্যা গাবৈ ঘর দূর ॥টেক॥

অনলহক্ক সরে কুঁ পৌঁহুচী, সূলী চঢ়ে মনসূর ॥১॥ শেখ ফরীদ কুঁয়ে মেঁ লটকে, হো গয়ে চুরম চুর ॥২॥ সুলতানী তজ গয়ে বলখ কুঁ, ছোড়ী সোলহ সহংসর হূর ॥৩॥ গোপীচন্দ ভরথরী যোগী, সির মেঁ ডারী ধূর ॥৪॥ দাদু দাস সদা মতবারে, ঝিলমিল ঝিলমিল নূর ॥৫॥ জন রৈদাস, ঔর কমালা, সনমুখ মিলে কবীর হুজুর ॥৬॥ দোনয়োঁ দীন মুক্তি মুক্তি কুঁ চাহেঁ, খাবেঁ গউ ঔর সূর ॥৭॥ দাস গরীব উদ্ধার নহী হৈ, সৌদা পূরম্পূর ॥৮॥২॥

❖ **সরলার্থ :-** কেবল শব্দ, সাখী, চৌপাই ইত্যাদি বাণী সুমধুর কণ্ঠে গাইলে কোনো কাজ হবে না। তার অনুসারে সাধনা ও ধর্ম-কর্ম করলেই মোক্ষ লাভ হবে। সুমধুর সংগীতকারদের থেকে মোক্ষের পথ অনেক দূর। পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মন্সুর আলী নিজের প্রাণ পর্যন্ত বাজি লাগিয়ে ছিলেন। তার অনলহকের ডাক (আওয়াজ) পরমাত্মার দরবারে পৌঁছে গিয়েছিল। মন্সুরকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল। সে সত্য হৃদয় দিয়ে সমর্পিত হয়ে ভক্তি করেছিলেন, পরে পুনর্জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইনি মুসলমান ধর্মে ছিলেন। {মন্সুর আলীর সম্পূর্ণ কাহিনী এই পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।} শেখ ফরিদ নামের একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভক্ত ছিলেন। যিনি পরমাত্মাকে (কাদির আল্লাহ) প্রাপ্তির জন্য কুঁয়োর মধ্যে ঝুলে সাধনা করছিলেন। সাধনা করতে করতে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তার শরীরে কেবল হাড়ের কঙ্কালই অবশিষ্ট ছিল। কাক তাকে মৃত ভেবে তার মাথার উপর বসে চোখ দুটো বের করে খেতে চাইল। শেখ ফরিদ বললেন, হে কাক! আমার শরীরের মাংস খেয়ে নাও কিন্তু চোখ দুটো ছেড়ে দাও, আমি খুদাকে দেখতে চাই। এছাড়া অব্রাহিম অধম সুলতান নামের এক মুসলিম রাজাও ছিলেন, যিনি পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) প্রাপ্তির জন্য, বলখ শহরের রাজধানী এবং ষোল হাজার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীদেরকেও (পদমনী) ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। {সুলতান ইব্রাহিম ইব্‌ন অধমের সম্পূর্ণ কাহিনী এই পুস্তকের 151 পৃষ্ঠায় লেখা আছে।) গোপীচন্দ ও ভরথরী, উভয়ই রাজা ছিলেন, তাঁরাও রাজ্য ত্যাগ করে, নাথ সম্প্রদায় গোরখনাথের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত করে, ছাই ভস্ম শরীরে লাগিয়ে রাখতেন। সন্ত দাদু দাস, সন্ত রবিদাস, ভক্ত কামাল প্রমুখ কবীর পরমাত্মার (কাদির আল্লাহর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, দীক্ষাও নিয়েছিলেন ও পাপ থেকে দূরে থাকতেন। সন্ত গরীবদাস বলেছেন যে, উভয় ধর্মের মানুষই মুক্তি কামনাও করে এবং জীব হিংসাও করে। হিন্দুরা শূকরের মাংস খায় কিন্তু গরুর মাংস খাওয়া পাপ মনে করে আর মুসলমানরা গরুর মাংস খায় কিন্তু শুকরের মাংসকে হারাম বলে মনে করে। পরমাত্মার (কাদির খুদার) সত্য আদালতে ঋণ দেওয়া নেওয়া চলে না। লেনদেন সম্পূর্ণ নগদে করা হয় অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল অবশ্যই পাবে। কোনো প্রাণীকে হত্যা করা ও তার মাংস খাওয়া মহাপাপ। কাদির আল্লাহ কবীর অর্থাৎ সতপুরুষের সাধনা যে সন্ত বলে থাকেন, তাঁর নিকট হতে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নাম দীক্ষা না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। সৎপুরুষের ভক্তিতে পাপ নাশ হয়। সাধক সত্য সাধনা করে সতলোকে চলে যায়।

❖ **রাগ কাফী থেকে শব্দ নং ৪৭ :-**

✯ মৈঁডী জিন্দড়িয়ে বো, রব্ব দা পন্থ বিষম হৈ বাট ॥টেক॥

গগন মণ্ডল মেঁ মহল সাহিব কা, অন্দর বন্যা ঝরোখা। এক মুল্লা মসজিদ মেঁ কূকৈ, এক পুকারৈ বোকা ॥১॥ ইনমেঁ কৌন সরে কুঁ পৌঁহচ্যা, হম কুঁ লগ্যা হৈ ধোখা। দোনোঁ অদলা বদলা খেলৈঁ, নহী মুক্তি নহী মোখা ॥২॥ কলমা রোজা বংগ নিবাজা, নবী মুহম্মদ কীন্হা। কদ মুহম্মদ নে মুর্গী মারী, কর্দ গলৈ কদ দীন্হা ॥৩॥ মুর্গী বকরী চিড়ী বুটেরী, সোঈ গউ গল সীনা। জিন কুঁ ভিসত কহাঁ বে কাজী, গুদৈ সীক ভরীনা ॥৪॥ উস দরগাহ মেঁ ছুরী ন ঘড়িয়ে, করদ কহাঁ সে ল্যায়া। গুদা রাতা গোস্ত তাতা, কেসর রংগ বনায়া ॥৫॥ ঘাল দেগচে বিস্মিল কিন্হা, সরস নিবালা খায়া। জা হংসা কা খোজ বতাওঁ, কৌন সরৈ পৌঁহচায়া ॥৬॥ খন্ড পিন্ড ব্রহ্মাণ্ড ন হোতে, না থে গায় কসাঈ। আদম হবা ন হুজরা হোতা, কলমা বংগ ন ভাঈ ॥৭॥ জব্ কাদির নহী কুদরত সৃজী, তব ক্যা খানা খাঈ। দাস গরীব কহৈ বে কাজী, অল্লাহ কবীর চিত লাঈ ॥৮॥৪৭॥

❖ **সরলার্থ :-** হে আমার প্রিয় প্রাণ! অর্থাৎ হে আমার আত্মা! হে মানব! পরমাত্মার মার্গ এক কঠিন যাত্রা (বাট) আছে। আকাশ মন্ডলে সতলোকে পরমেশ্বরের মহল আছে। তারমধ্যে একটি জানালা (ঝরোখা) লাগানো রয়েছে, যার ভিতর

থেকে পরমেশ্বর সবকিছু দেখেন। কাজী এক বড় ছাগলের (বোক) গলা ছুরি দিয়ে কাটছে আর ছাগল কষ্টের কারণে চিৎকার করছে। একজন মোল্লা (মুসলিম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান করা গুরু) মসজিদের উপর চড়ে আজানের উচ্চস্বরে ধ্বনি দিচ্ছে অর্থাৎ জীব হত্যাকারী ব্যক্তি যদি ভক্তিও করে, তাহলে তার আল্লাহর স্তুতি করাই বৃথা অর্থাৎ যেমন ছাগল মরার সময় ভয়ে ও যন্ত্রণায় ম্যা ম্যা করে, যার কোনো অর্থ নেই, কারণ তার কষ্ট কেউ বুঝছে না, হত্যা করা ব্যক্তি তাকে হত্যা করেই শ্বাস নেয়। ঠিক এই প্রকার ওই প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা কাজী যে আজান দেন (স্তুতি করেন), সেই আজান দেওয়াতে তার কোনো লাভ হবে না। পাপ করার দণ্ড তাকে অবশ্যই পেতে হবে। সন্ত গরীবদাস স্পষ্ট করে বলেছেন যে, (এই অন্যান্য প্রাণীদের মেরে খাওয়া) সমস্ত ব্যক্তি এবং মোল্লা-কাজীদের মধ্যে কেউই জান্নাতে (স্বর্গ) যেতে পারবে না। এরা (পশু ও মানুষ) তো একে অপরের সাথে অদল-বদলের খেলা করছে। আজ কাজী ছাগলকে হত্যা করছে, আবার কোনো জনমে কাজীর আত্মা ছাগল হবে ও ছাগলের আত্মা কাজী হবে, তখন সেই ছাগল তার প্রতিশোধ অবশ্যই নিয়ে নেবে। নবী মুহম্মদ কলেমা (আল্লাহু আকবরের মন্ত্রের জপ) আর রোজা (ব্রত) পালন করেছিলেন। নামাজ অথবা উচ্চস্বরে ধ্বনি (বংগ) দেওয়া অর্থাৎ যাকে আজান বলা হয়, তা করেছিলেন কিন্তু তিনি মুরগি, ছাগল, গরু অন্যান্য জীব হিংসা (হত্যা) কখনও করেননি। হে কাজী! যারা অন্যের গলা কাটে ও তার মাংস খায়। সে জান্নাতে (স্বর্গ) কিভাবে যাবে? সবই জীব পরমাত্মার সৃষ্টি করা,অতএব তারই জীবকে কেন হত্যা করছো? গুরুতর পাপ করছো। যে সময় কোনো কিছুরই রচনা ছিল না, ওই সময় কেবল পূর্ণ পরমাত্মাই ছিলেন। তখন এসব কু-কর্ম করা ব্যক্তিরা কোথায় ছিল? কি ভোজন করতো? সন্ত গরীবদাস বলেছিলেন যে, হে কাজী! কবীর পরমেশ্বরের (আল্লাহ আকবীর) প্রতি চিন্তন লাগাও।

নবী (সন্ত) গরীবদাস সামর্থবান পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) কবীরের সামর্থতার সম্পর্কে বলেছেন :-

❖ রাগ কাফী থেকে শব্দ নং ২৪ :-

✯খান পান কুছ করদা নাঁহী, হৈ মহবুব আচারী বো ॥ টেক ॥

কৌঁম ছত্তীস রীত সব দুনিয়া, সব সে রহৈ বিচারী বো ॥১॥ বেপরবাহ শাহন পতি শাহং, জিন য়াহ ধারনা ধারী বো ॥২॥ অনতোল্যা অনমোল্যা দেবৈ, করোড়ী লাখ হজারী বো ॥৩॥ অরব খরব ঔর লীল পদম লগ, সংখৌ সংখ ভন্ডারী বো ॥৪॥ জো সেবৈ তাহী কুঁ খেবৈ, ভবজল পার উতারী বো ॥৫॥ সুরতি নিরতি গল বন্ধন ডোরি, পাবৈ বিরহ অজারী বো ॥৬॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সরীখে, তাহি উঠাবৈ ঝারী বো ॥৭॥ শেষ সহংসমুখ করৈঁ বিনতী, হরদম বারংবারী বো ॥৮॥ শব্দ অতীত অনাহদ পদ হৈ, হৈ পুরুষ নিরাধারী বো ॥৯॥ সূক্ষ্ম রূপ স্বরূপ সমানা, খেলৈ অধর আধারী বো ॥১০॥ জাকুঁ কহৈ কবীর জুলাহা, রচি সকল সংসারী বো ॥১১॥ গরীবদাস শরণাগত আয়ে, সাহিব লটক বিহারী বো ॥১২॥২৪॥

❖ **সরলার্থ :-** অকহ লোকে ভোজন না করেই পরমাত্মা বছরের পর বছর থাকেন, তিনি প্রিয় পরমাত্মা। তিনি তাঁর ভক্তদের অনতোলা, অনগুণা অথাহ ধন দেন অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা দেন। কাদির আল্লাহর (পরমাত্মা) নিকট কোটি কোটি, ট্রিলিয়ন, নীল, পদম, সংখ অগণিত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। যে তাঁর পূজা (সবৈ) করে, তাকে তিনি পার করে দেন। সমর্থ পরমেশ্বের কবীরের সামনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হলেন তাঁর সেবক। শেষ নাগ দেবতা তো হাজার মুখ দিয়ে বারংবার তাঁর নাম জপ করেন। সন্ত গরীবদাস বলেছেন যে, যাঁকে কবীর জুলাহা (তাঁতী) বলা হয়, তিনিই সারা সৃষ্টির উৎপত্তি করেছিলেন। হে পূর্ণ ব্রহ্ম (লটক বিহারী)! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধা নিষেধ ছাড়া ভ্রমণকারী কবীর পরমাত্মা! আমি তো আপনার শরণে এসেছি।

রাগ বিলাবল শব্দ নং. ২১ :-

✯অবিগত রাম কবীর হৈ, চকবৈ অবিনাশী। ব্রহ্মা বিষ্ণু বজীর হৈঁ, শিব করত খবাসী ॥টেক॥ ইন্দ্র কোটি অনন্ত হৈঁ, জাকৈ প্রতিহারা। বরুন কুবের, ধর্মরায়, ঠাঢ়ে দরবারা ॥১॥ তেতীশ কোটি দেবতা, ঋষি সহংস অঠাসী। বৈষ্ণব কোটি অনন্ত হৈঁ, গুণ গাবৈঁ রাশী ॥২॥ নৌ যোগেশ্বর নাদ ভরৈ, সুর পুরৈ সংখা। সনকাদিক সংগীত হৈ, অবিচল গঢ় বংকা ॥৩॥ শেষ গণেশ সরস্বতী ঔর লক্ষ্মী রাজৈঁ। সাবিত্রী গৌরা রটৈঁ, গণ সংখ বিরাজৈঁ ॥৪॥ অনন্ত কোটি মুনি সাধ হৈ, গণ গন্ধর্ব জ্ঞানী। অরপৈঁ পিন্ড রু প্রাণ কূন, জাহাঁ সংখৈঁ দানী ॥৫॥ সাবন্ত শূর অনন্ত হৈঁ, কুছ গিনতী নাহী। জতী সতী ঔর শীলবন্ত, লীলা গুণ গাহী ॥৬॥ চন্দ্র-সূর বিনতী করৈঁ, তারা গণ গাঢ়ে। পাঁচ তত্ত্ব হাজির খড়ে, হুকমী দর ঠাঢ়ে ॥৭॥ তীর্থ কোটি অনন্ত হৈ, ঔর নদী বিহংগা। অঠারা ভার তোকুঁ রটৈ, জল পবন তরঙ্গ ॥৮॥ অষ্ট কুলী পর্বত রটৈঁ, ঘর অম্বর ধ্যানা। মহতাব অগ্নি তোকুঁ জপৈঁ সাহিব রহমানা ॥৯॥ অর্শ কুর্শ পর সেজ হৈ, তন তবক তিরাজী। এক পলক মে করত হৈ, সো রাজ বিরাজী ॥১০॥ অলখ বিনানী কবীর কুঁ রংগ খুব চবায়া। এক পানী কী বুন্দ সে, সংসার বনায়া ॥১১॥ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড হৈ, কুছ বার ন পারা। লখ চোরাসী খান কা, তুঁ সৃজনহারা ॥১২॥ সূক্ষ্ম রূপ স্বরূপ হৈ, বহু রংগ বিনানী। গরীবদাস কে

মুকুট মে, হাজির প্রবানী ॥১৩॥২১॥

❖ **সরলার্থ :-** (অবিগত) দিব্য পরম পুরুষ হলেন কবীর জী। (চকবৈ) চক্রবর্তী {চক্রবর্তী রাজা তাঁকেই বলা হয়, যাঁর রাজত্ব সমগ্র পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত রয়েছে, যিনি সমস্ত ছোটো-ছোটো রাজাদের মালিক অর্থাৎ মহারাজা (চক্রবর্তী রাজা)। সতপুরুষ কবীরের রাজত্ব সমগ্র লোকের (ধামের) উপরে রয়েছে, যেমন - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, জ্যোতি নিরঞ্জন, (যিনি ব্রহ্মা - বিষ্ণু - মহেশ্বরের পিতা) এবং অক্ষর পুরুষ সহিত সমস্ত ছোটো-ছোটো দেবতার মালিক মহারাজা অর্থাৎ দেবতাদেরও দেব মহাদেব} অবিনশ্বর পরমেশ্বর আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও তাঁর গোলামি (খবাসি) করেন। ইন্দ্র ও তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্টআশি হাজার ঋষি, নয় (৯) যোগেশ্বর, চার সনকাদি (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার), শেষনাগ, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্বতী, সংখ গণ, সকলেই তাঁরই আদেশ পালন করে চলেন। সকলের উপরে কবীর পরমেশ্বরের রাজত্ব। আল্লাহ্ কবীর জলের বিন্দু দিয়ে, এই মানবদেহকে কত সুন্দর করে বানিয়েছেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকে ও চুরাশি লক্ষ প্রকার জীবগণকে উৎপন্ন করার স্রষ্টা কবীর আল্লাহ্ আপনিই । অতএব আপনিই হলেন সকলের সৃজনহার। সন্ত গরীবদাস মহারাজজি বলেছেন যে, বহু রূপে লীলাকারী পরমেশ্বর আমার মাথার উপর বিরাজমান আছেন।

❖ **অচলা অঙ্গের বাণী নং ১ - ১৩ :-**

গরীব, পঞ্জা দস্ত কবীর কা, সির পর রাখো হংস। যম কিঙ্কর চঁপেঁ নহীঁ, উদ্ধর জাত হৈ বংস ॥১॥
গরীব, দর্দবন্দ দর্বেশ হৈ, সতগুরু পুরুষ কবীর। নাম লিয়ে বন্ধ ছুটে হৈ, টুটে যম জঞ্জীর ॥২॥
গরীব, সতগুরু পুরুষ কবীর হৈ, তীন লোক তত্ত্ব সার। কোটি উননচা পৃথ্বী, চৌদহ ভবন আধার ॥৩॥
গরীব, সতগুরু পুরুষ কবীর হৈ, তীন লোক তত্ত্ব সার। দো চার কী ক্যা চলৈ, উদ্ধরৈং হংস অপার ॥৪॥
গরীব, সতগুরু পুরুষ কবীর হৈ, চারোঁ যুগ প্রবান। ঝুঠে গুরুবা মর গয়ে, হো গয়ে ভূত মশান ॥৫॥
গরীব, ঝুঠে গুরু কে আসরে, কদে না উদ্ধরঁ জীব। সাচা পুরুষ কবীর হৈ, আদি পরম গুরু পীব ॥৬॥
গরীব, সতগুরু পুরুষ কবীর কা, বিষম পন্থ বৈরাট। শিব সনকাদিক ধ্যাবোঁ হীঁ, মুনি জন জোহেঁ বাট ॥৭॥
গরীব, সতগুরু পুরুষ কবীর কী, কোই ন চল হৈ গৈল। বিনা পন্থ পগ ধরত হৈ , গগন মন্ডল মেঁ সৈল ॥৮॥
গরীব, পগ সেতী দুনিয়াঁ চলৈ, পংছী পরৌঁ উড়ান, উঁচা মহল কবীর কা, জহাঁ নহী, জমীনঁ আসমান ॥৯॥
গরীব, নিম মন্ডের ন মহল কে, নহীঁ ঘাট নহীঁ বাট। উঁচা তখত কবীর কা, কৈসে কিজৈ সাট ॥১০॥
গরীব, সংখ স্বর্গ পর সৈল হৈ, সংখ স্বর্গ পর ধাম, এঈসা অচরজ দেখিয়া, বিনা নীম কা গাম ॥১১॥
গরীব, বিনা নীম কে নগর মেঁ, বসতে পুরুষ কবীর। শিব ব্রহ্মাদিক থকত হৈ, কৌন ধরৈ জহাঁ ধীর ॥ ১২ ॥
গরীব, লখ লখ যোজন উড়ত হৈ, সুর নর মুনি জন সন্ত। উঁচা ধাম কবীর কা, কোই ন পাবৈ অন্ত ॥ ১৩ ॥

❖ **সরলার্থ :-** হে সাধক! পরমাত্মা কবীরের কৃপা পাত্র হয়ে থেকো অর্থাৎ খুদা কবীরের শরণে থেকো। তাহলে (জম কিঙ্কর) যমের দূতেরা তোমাকে ধরতে আসবে না। তোমার কুলের (বংশের) উদ্ধার হয়ে যাবে। (১)

❖ সদগুরু কবীর (পুরুষ) পরমেশ্বর হলেন (দর্দবন্দ) দুঃখ নিবারণকারী। কবীর জী দ্বারা বলা নামের জপ করলে জ্যোতি নিরঞ্জনের তথা কালের দ্বারা করানো পাপের কর্মবন্ধন দূর হয়ে যায়। যমরাজের দ্বারা বেঁধে দেওয়া লোহার হাতকড়ার বন্ধন ও ভেঙে যায়। (২)

❖ সদগুরু কবীর পরমেশ্বর তিন লোকের (কাল ব্রহ্মের লোক, অক্ষর পুরুষের লোক এবং সতপুরুষের লোক, যা চার লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্র। এই তিনটি লোকের বর্ণনা এখানে দেওয়া রয়েছে। সর্বেসর্বা অর্থাৎ কুলের মালিক (তত সার) আছেন। উনপঞ্চাশ (৪৯) কোটি পৃথিবী ও চৌদ্দটি ভুবন (যা কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে) এই সবকিছুর আধার হলেন কবীর আল্লাহ। দুই-চার ধামের তো কোনো কথাই নেই?
কবীর খুদা তো অনন্ত হংসদের (ভক্তদের) পার করে দেন। (৩-৪)

❖ তত্ত্বদর্শী সন্ত (সতগুরু) রূপে প্রকট কবীর (পুরুষ) পরমেশ্বর, চার যুগে (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ) সশরীরে সতগুরু হয়ে অর্থাৎ নিজের নবী হয়ে স্বয়ং নিজেই সতলোক থেকে আসেন। এর প্রমাণ রয়েছে। মিথ্যে গুরুরা মারা গেছে, তাদের সাধনা ভুল ছিল, যা শাস্ত্র প্রমাণিত ছিল না। তারা সব ভূত প্রেতের যোনি প্রাপ্ত করেছে।

প্রমাণ :- কবীর পরমাত্মা তাঁর নিজধাম সতলোক থেকে সদগুরু রূপে সশরীরে চার যুগেই এসেছিলেন এবং সশরীরেই সতলোক গমন করেছিলেন। সত্য যুগে তাঁর নাম "সত সুকৃত" ছিল। ত্রেতা যুগে নাম "মুনীন্দ্র", দ্বাপর যুগে তিনি "করুণাময়" এবং কলিযুগে তিনি "কবীর" নামে পরিচিত ছিলেন।

❖ মিথ্যা বা নকল গুরুর শরণে থাকলে জীবের কখনো উদ্ধার হবে না। সত্য পরম গুরু (পীব) মালিক

হলেন কবীর পরমেশ্বর। (৬)

❖ সদগুরু কবীর পরমেশ্বর দ্বারা বলা সত্য ভক্তির মার্গ দুর্গম (বিষম) ও বিশাল। শ্রীশিব ও সনক, সনন্দন, সনাতন ও সন্ত কুমার (সনকাদিক) এবং ঋষি-মুনিগণেরাও ভক্তির মার্গের (বাট) যাত্রার উপরে চলছেন। তাঁরা ভুলবশতঃ কাল ব্রহ্মের মার্গকে সতলোকের (পরমেশ্বরের ধাম) যাবার মার্গ ভেবে চলছেন। এই কারণে তাঁদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। (৭)

❖ সদগুরু কবীর পরমাত্মার মার্গে (গৈল) কেউ চলছেন না। সদগুরু কবীর জী তো বিনা মার্গে (পন্থ) চলেন অর্থাৎ বিহংগম মার্গ (পাখির মতো উড়ে চলা) দিয়ে চলেন। তিনি পপিল (পিঁপড়ের মত সারিতে) মার্গে চলেন না। পরমাত্মা কবীর জীর সতলোকের ঘর (মহল) উপরে অর্থাৎ সব থেকে উর্ধ্বে। যেখানে নাশবান ভূমি ও আকাশ নেই। সেটি অবিনাশী ধাম (অমর লোক)। কাদির পরমাত্মার মহল দিব্য। তাঁর সাঁট অর্থাৎ সেই স্থান প্রাপ্ত করার জন্য কিভাবে চুক্তি করা যায়? কোন নিয়ম-বিধি আছে, যার দ্বারা সতলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হবে? (৮-১০)

❖ সতলোকের সুখ কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন) সমস্ত ধামের অর্থাৎ অসংখ্য স্বর্গধাম থেকেও অধিক। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, সতলোকের ঘর-বাড়িগুলি ভিত (Foundation) ছাড়াই তৈরি করা আছে। যেমন যে স্থানে পৃথিবী ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শূন্য হয়ে যায়, সেখানে যে বস্তু যেখানে রাখা হবে, তা সেখানেই ঝুলে থাকে অর্থাৎ স্থির থাকে। এই প্রকার সতলোকে কবীর পরমেশ্বর (আল্লাহ) সিদ্ধি-শক্তি দ্বারা সমস্ত দেওয়াল ও ছাদ স্থির হয়ে রয়েছে। (১১)

❖ বিনা ভিতের তৈরি নগর হল সতলোক, সেখানে নির্মিত গম্বুজে সদগুরু কবীর জী বিরাজমান থাকেন। ওই স্থান প্রাপ্ত করার চেষ্টা করে করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাহলে অন্য সাধক কে আছেন, যে তাঁরা ওই সত্যলোক প্রাপ্তির জন্য সাধনা করবেন? কারণ এই যে, তাঁদের কারোরই সাধনা সূক্ষ্ম বেদ (তত্ত্বজ্ঞান) অনুসারে নেই। (১২)

❖ বেদে বর্ণিত অসম্পূর্ণ সাধনা করা মুনিজন (মননশীল ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়, ওই) ঋষিগণ এবং কাল ব্রহ্মের সমস্ত সন্ত-ভক্তগণ, লক্ষ-লক্ষ যোজন (এক যোজন ১২ কিলোমিটারের সমান) তাঁরা উড়ে যান। তাঁরা সতলোক যেতে পারেননি, কেননা সতলোক তো কাল ব্রহ্মের লোকের থেকে, ষোল সংখ কোস (এক কোস হয়, তিন কিলোমিটারের সমান) উপরে রয়েছে। (১৩)

❖ **অচলার অঙ্গের বাণী নং. ১৬-৩৬ :-**

গরীব, জৈসে অলল আকাশ কূঁ, রাপতি চরণ লগায়। ঐসে হরিজন হংস কূঁ, লে চালত হৈ তাহয়॥১৬॥
গরীব, নাম নিরন্তর সঙ্গর সরু, ফরকৈ ধ্বজা নিশান। অনহদ বাজে বাজেঁ হী, সতগুরু আঁম দিবান॥১৭॥
গরীব, নিজনাম কে জাপ সে, বাজেঁ অনহদ নাদ। তৌবা পরমেশ্বর কবীর কী, ছুটেঁ সব হী উপাধ॥১৮॥
গরীব, ধর্মরায় দরবার মেঁ, দঈ কবীর তলাক। মেরে ভুলে চুকে হংস কূঁ, পকড়িয়ো মত কজাক॥১৯॥
গরীব, বোলে পুরুষ কবীর সে, ধর্মরায় কর জোড়। তুমরে হংস ন চম্প হূঁ, দোহী লাখ করোড়॥২০॥
গরীব, মদ্যহারী জারী নরা, ভাংগ তমাখু খাহী। পরদারা পর ঘর তকেঁ, জিন কূঁ ল্যূঁ অক নাহী॥২১॥
গরীব, ধর্মরায় বিনতী করৈ, সুনিয়ো পুরুষ কবীর। জিন কূঁ নিশ্চয় পকড় হূঁ, জড়হূঁ তৌঁক জঞ্জির॥২২॥
গরীব, চুম্বক রূপী শব্দ হৈ, লোহে রূপী জীব। পরদে মাহী ভেট হূঁ, দর্শ পর্শ হোয় পীব॥২৩॥
গরীব, চুম্বক হমরা রূপ হৈ, লোহে রূপী প্রাণ। ধর্মরায় তেরী বন্ধ সে, হম লে উড়ৈঁ অচান॥২৪॥
গরীব, জা ঘট নৌবত নাম কী, জাকূঁ পকড়ৈ কৌন। খালী কূঁ ছোড়ূঁ নহী, রীতি জিন কী জৌঁন॥২৫॥
গরীব, কর জোরৈঁ বন্দগী করেঁ, চৌদহ মুনি দিবান। সো তো মরকব কীজিয়ে, বন্দগী বিনা জ্ঞান ॥২৬॥
গরীব, কর্মৌঁ সেতী রত থে, অব হৈ জো শরণ কবীর। জিন কূঁ নিশ্চয় মার হূঁ, কাঠৌঁ বল তকসীর॥২৭॥
গরীব, পহলে কিয়ে বো বখশ হূঁ, আগে করে না কোঈ। কবীর কহ ধর্মরায় সে, নাম রটেঁ মম সোঈ ॥২৮॥
গরীব, কর্ম ভ্রম ব্রহ্মাণ্ড কে, পল মেঁ কর হূঁ নেশ। জিন হমরী দোহী দৈঈ, সো কর হমারৈ পেশ॥২৯॥
গরীব, শিব মণ্ডল ব্রহ্মা পুরী, জো বিষ্ণু লোক মেঁ হোয়। হমরে গুণ ভুলৈ নহী, তো আন ছুটাউঁ তোহে॥৩০॥
গরীব, কোটি বহত্তর উর্বশী, ধর্মরায় কী ধীব। সুর নর মুনি জন মোহিয়া, বিসর জাত হৈঁ পীব॥৩১॥
গরীব, পীব কো হংসা বিসরহী, হমরে তুম্হরে নাহী। ধর্মরায় কহৈঁ কবীর সে, জিন কূঁ বহু বিধি খাহী॥৩২॥
গরীব, সাহিব পুরুষ কবীর হৈঁ, যোনি পড়ে সো জীব। লখ চৌরাসি ভ্রমেঁহী, কাল জাল ঘট সীব॥৩৩॥
গরীব, সাহিব পুরুষ কবীর কূঁ, জন্ম লিয়া নহী কোয়। শব্দ স্বরূপী রূপ হৈ, ঘট ঘট বোলৈ সোয়॥৩৪॥
গরীব, অনন্ত কোটি অবতার হৈঁ, মায়া কে গোবিন্দ। কর্তা হোয় হোয় উতরৈঁ হে, বহুর পড়ৈঁ জগ ফন্দ॥৩৫॥
গরীব, ত্রিলোকী কা রাজ হৈ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ। উঁচা ধাম কবীর কা, সতলোক প্রদেশ॥৩৬॥

❖ **সরলার্থ :-** পরমাত্মা কবীর তাঁর নিজের বান্দাকে (ভক্তকে) এমন ভাবে সতলোকে নিয়ে উড়ে যান, যেমন অলল (অনল) পাখি হাতিকে (রাপতি) উঠিয়ে নিয়ে যায়। (১৬)

❖ যে সাধক (ভক্ত) তত্ত্বজ্ঞানী গুরু অর্থাৎ সদগুরুর কাছ থেকে সতনাম ও সারনামের দীক্ষা নিয়ে নামের জপ করেন, তখন তাঁর শরীরে এবং মাথার ভিতরে সতলোকের বাজনা (সঙ্গীতের ধ্বনি) শোনা যায়। ওই উপরের সঙ্গীতের গুঞ্জন শোনার পর, সেই দিকে তার মন এতটাই আকর্ষিত হয়ে যায় যে, সাধকের (বান্দার) কালের লোকের গান-বাজনা, নাচ-গান এবং নয়-ছয় করে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করার মতো উৎপাত করা সব কর্ম তিনি ত্যাগ করে দেয়। (১৭/১৮)

❖ ১৭২৭ সাল, মার্চ (বিক্রমী সংবত ১৭৮৪) ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষ দ্বাদশীতে, যে সময়ে কবীর পরমাত্মা সতলোক থেকে সশরীর জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে পৃথিবীর উপর গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর, হরিয়ানাতে (ভারত) এসে, সন্ত গরীবদাস জীর সঙ্গে এক জঙ্গলে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওই সময় গরীবদাস জীর বয়স (আয়ু) কেবল দশ বৎসর ছিল। সন্ত গরীবদাস জীর আত্মাকে, শরীর থেকে বের করে উপরে ধর্মরায়ের আদালতে (কাল ব্রহ্মের বিচারকের দরবারে) নিয়ে গিয়েছিলেন। পরমাত্মা, গরীব দাসজীকে নিজের পরাক্রম (সামর্থতা) দেখানোর জন্য ও সাক্ষী বানানোর জন্য বালক গরীবদাস জীর সামনে কালব্রহ্মের বিচারককে অর্থাৎ ধর্মরায়কে কবীর পরমাত্মা বললেন যে, হে কজাক অর্থাৎ হে শয়তান! আমার (কবীর খুদার) ভক্তকে ধরবে না। (১৯

❖ **ধর্মরায় নিবেদন করে বললেন :-**

হাত জোড় করে ধর্মরায় কবীর পরমাত্মাকে বললেন, আমার লাখ দুহাই অর্থাৎ আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, আপনার হংসকে (ভক্তকে/ বান্দাকে) আমি কখনও ধরবো না। (২০)

❖ কিন্তু যারা মদ্য পান করে, যে পুরুষ ব্যভিচার করে, গাঁজা, ভাং ও তামাক ইত্যাদি সেবন করে আর পরদারা (অন্যের স্ত্রীর প্রতি) খারাপ দৃষ্টিতে তকৈ (তাকায়), তাদেরকে আমি ধরবো কি ধরবো না বলুন? (২১)

❖ ধর্মরাজ অনুরোধ করে বললেন যে, হে কবীর পুরুষ (কবীর পরমাত্মা)! আমার অনুরোধ শুনুন, এখানকার নিয়ম হল, যারা উপরোক্ত ওই সকল অপরাধ করবে, তাদেরকে অবশ্যই শিকল দিয়ে বাঁধবো। (২২)

❖ কবীর আল্লাহ (পরমাত্মা) আদেশ দিয়ে বললেন :-

আমার সারশব্দ (সারনাম) চুম্বকের মতো এবং আমার হংস (ভক্ত/বান্দা) হল লোহার তুল্য। আমি ছদ্মবেশে অর্থাৎ গুপ্ত রূপে আমার ভক্তের সাথে দেখা করব। সে নিজের স্বামী পরমেশ্বরের (পীবের) দর্শন ও চরণ স্পর্শ (পরস) করে নেবে এবং সে আমার প্রিয় আত্মা হয়ে যাবে। হে ধর্মরায়! আমি নিজের ওই সকল ভক্ত/ভক্তিমতী আত্মাদেরকে (বান্দাদের), তোর বন্ধন (কারাগার) থেকে অকস্মাৎ (হঠাৎ) উঠিয়ে নিয়ে যাব। (২৩-২৪)

❖ ধর্মরায় তখন বললেন :- যে ভক্তের কাছে আপনার দীক্ষার নাম (মন্ত্র) থাকবে, তাকে কে স্পর্শ করতে পারে? তবে যারা আপনার নাম বিহীন হয়ে থাকবে, তাদেরকে আমি ছাড়ব না। (২৫)

❖ যাদেরকে চৌদ্দ মুনি (দিবান) প্রধান মানা হয়, তারা সত্য ভক্তি (বিধান) মর্যাদার (বিধান) মধ্যে থেকে যদি না করে, তাহলে তাদেরকেও মরকব (গাধা) বানানো হবে। (২৬-২৭)

❖ পরমাত্মা কবীর বললেন :- যে বান্দারা (ভক্তেরা) আমার শরণে আসার পূর্বে যত পাপ করেছিল, আমি তাদের ওই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেব, ভবিষ্যতে সেই ভক্ত (বান্দা) আর পাপ কর্ম করবে না। হে ধর্মরায়! যে আমার নাম জপ করবে, আমি তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট করে দেবো। (২৮)

❖ কবীর পরমেশ্বর পুনরায় বললেন, এই কাল লোকের সমস্ত (সঞ্চিত, বর্তমান ও অতীত) পাপকর্ম, কালব্রহ্ম যা ভ্রমিত করে করিয়েছিল, আমি ওই সমস্ত পাপ কর্মকে এক মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট করে দেব। যে আমার দুহাই অর্থাৎ অনুনয়-বিনয় দ্বারা প্রার্থনা করে বলেছিল যে, আমি কবীর পরমেশ্বরের ভক্ত ও ভক্তিমতী (বান্দা) আছি। তাদের হিসাব (কৃত কর্মের লেখা-জোখা) তুমি করবে না। তাদেরকে আমার আদালতে ত্রিকুটিতে তৈরি করা সদগুরুর স্থানে উপস্থাপন (হাজির) করবে, আমি তাদের কৃতকর্মের হিসাব করবো। (২৯)

❖ কবীর পরমেশ্বরের (আল্লাহ কবীর) যে সকল ভক্ত কোনো ভুলের কারণে, প্রথম নাম জপের কামাইয়ের কারণে ব্রহ্মা লোকের স্বর্গে (ধামে) কিংবা বিষ্ণু ও শিবের স্বর্গ লোকে চলে গিয়েছে আর সেখানে গিয়ে যদি আমার এই তত্ত্বজ্ঞান মনে পড়ে যে, এখানে থাকলে তো তার ভক্তি কামাই (পুণ্য) সমাপ্ত হয়ে যাবে, অতএব মোক্ষ প্রাপ্ত হবে না। সেখানে থেকেও যদি আমাকে স্মরণ করে, তাহলে তক্ষুনি আমি সেই বান্দাকেও (ভক্তকে) ছাড়িয়ে এনে, দ্বিতীয় বার মানব জনম দিয়ে,পুনরায় সত্য ভক্তির দীক্ষা প্রদান করে মুক্ত করে দেবো। (৩০)

❖ ধর্মরায়ের নিকটে বাহাত্তর (৭২) কোটি কন্যা (ধীয়) উর্বশী (স্বর্গের পরী) আছে, যারা দেবতাদের (সুরদের), ভালো ব্যক্তিদের (নর) ও মুনি-ঋষিদের আকর্ষিত (মোহিত) করে নিজেদের জালে ফাঁসিয়ে রেখেছে। আর যারা পরমেশ্বরকে

একেবারেই ভুলে যায়, তারা তো কালের জালেই ফেঁসে রয়ে যায়। (৩১)
ধর্মরায় বললেন, হে পরমেশ্বর! যে জীব পরমেশ্বরকে (কাদির আল্লাহ) বিসরহী (ভুলে) যায়, তারা না আপনার হবে আর না আমার হবে। তাদেরকে তো নানান প্রকারের নির্যাতন ও ভয়ংকর কষ্ট দেবো। (৩২)

❖ সাহেব কবীর জী (পুরুষ) হলেন পরমেশ্বর। কেননা তিনি জন্ম ও মৃত্যু রহিত। তবে যারা জন্ম গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুবরণও করে এবং অন্যান্য চুরাশি লক্ষ প্রকারের যোনিতেও জন্ম নিতে হয়। সে কালের জালেই ফেঁসে রয়েছে। তার শরীর রূপী দেহে (ঘট), সংশয়ের (সীব) জল রয়েছে অর্থাৎ সে ভ্রমিত প্রাণী এবং তার সত্য পুরুষের (কবীর আল্লাহর) বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। (৩৩)

❖ পরমেশ্বর কবীর জী কখনও জন্ম নেন না। তাঁর স্বরূপ হল (শব্দ স্বরূপী) অবিনাশী এবং তিনি বচন শক্তিযুক্ত। কবীর পরমাত্মার শক্তিতেই প্রতিটি প্রাণীই বলে ও চলাফেরা করে। (৩৪)

❖ কাল ব্রহ্মের মায়ার প্রভাবে অসংখ্য কোটি অবতারের (নবী/দূতদের) জন্ম হয়ে গিয়েছে। উপরের লোক থেকে এসে পৃথিবীর উপরে পরমাত্মা রূপে জন্ম নেন ! কিন্তু পরে কর্ম চক্রে ফেঁসে ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে কষ্ট ভোগ করে এবং পুনরায় জগতের ফাঁদে ফেঁসেই থেকে যায়। যেমন শ্রীরামচন্দ্র কর্তা হয়ে রাজা দশরথের ঘরে মাতা কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি রাজা বালীকে ছলনা করে হত্যা করেছিলেন, সেই কারনে পাপ হয়েছিল। সেই পাপকর্ম ভোগ করার জন্য তাঁকে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম নিতে হয়েছিল আর সেই বালীর আত্মা তার পূর্ব জন্মের সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, দ্বাপর যুগে শিকারী হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে ছলনা করে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি কেবল এক অর্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ পত্নীব্রত ধর্মের উপর অটল থেকে, পাপ থেকে এড়িয়ে চলেছিলেন কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে সকল প্রতিশোধ পূর্ণ করে নিয়েছিলেন। তিনি আটটি বিবাহ করেছিলেন অর্থাৎ আটজন নারীকেই ভোগ করেছিলেন। এছাড়া হাজার সংখ্যায় গোপী-কন্যাদেরও ভোগ করেছিলেন। এক রাজা ষোল হাজার নারীকে বন্দি করে রেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে এনে, সকলকে ভোগ করেছিলেন। তবে ওই ভোগ তো করেছিল কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) কিন্তু পাপ লাগিয়ে দিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের উপরে। এই পাপের শাস্তিও ওই চুরাশি লক্ষ প্রকারের প্রাণীদের শরীর ধারণ করে, কর্মের ফল অনুসারে ভয়ঙ্কর কষ্ট ভোগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরামের আত্মা ওই পাপ কর্মের দণ্ড ভোগ করবেন। (৩৫)

❖ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব তো কেবল তিন লোকের (পৃথিবী লোক, স্বর্গ লোক ও পাতাল লোকের) রাজা অর্থাৎ প্রভু আছেন আর কবীর পরমাত্মার স্থান (ধাম) হল এই সকলের স্থান থেকে অনেক উঁচুতে অর্থাৎ সতলোক রূপী প্রদেশে রয়েছে। আল্লাহ কবীর হলেন সকলের সম্রাট (মালিক)। (36)॥

"দুই ধর্মের ব্যক্তিদের (জ্ঞান) বোঝানো"

❖ অমর গ্রন্থ (সন্ত গরীবদাস জীর) পারখের অঙ্গ, অধ্যায়ের বাণী নং. ৫৬৮ থেকে ৬১৯ :-

কাশী জোরা দীন কা, কাজী খিলস করন্ত। গরীবদাস উস সরে মেঁ, ঝগড়ে আন পরন্ত॥৫৬৮॥
সুন কাজী রাজী নহীঁ, পাপ কর্ম সে খুদায়। গরীবদাস কিস হুকুম সে, পকড় পছাড়ী গায়॥৫৬৯॥
গউ হমারী মাতা হে, পীবত জিস কা দুধ। গরীবদাস কাজী কুটিল, কতল কিয়া ঔজুদ॥৫৭০॥
গউ আপনী অম্মা হৈ, তা পর ছুরী ন বাহ। গরীবদাস ঘৃত দুধ কুঁ, সব হী আত্ম খাহৈ॥৫৭১॥
এসা খানা খাঈয়ে, মাতা কৈ নহীঁ পীর। গরীবদাস দরগাহ সরে, গল মেঁ পড়ৈ জঞ্জীর॥৫৭২॥
কাজী পটক কুরআন কুঁ, উঠ গয়ে সির পীট। গরীবদাস জুলহে কহী, বাণী অকল অদীঠ॥৫৭৩॥
জুলহে দীন বিগাড়িয়া, কাজী আয়ে ফের। গরীবদাস মুল্লা মুর্গ, অপনী অপনী বের॥৫৭৪॥
মুর্গে সে মুল্লা ভয়ে, মুল্লা ফের মুর্গ। গরীবদাস দোজখ গয়ে, পায়া নহীঁ স্বর্গ॥৫৭৫॥
কাজী কলমা পড়ত হৈ, বাঁচে ফের কুরআন। গরীবদাস ইস জুলম সে, বুড়ৈঁ দোহুঁ জিহান॥৫৭৬॥
দোনুঁ দীন দয়া করো, মানো বচন হমার। গরীবদাস গউ সুর মেঁ, একৈ বোলন হার॥৫৭৭॥
সুর গউ মেঁ এক হৈ, ন গায় ভখো ন সুর। গরীবদাস সূর গউ, দোউ কা একৈ নূর॥৫৭৮॥
মুল্লা সে পণ্ডিত ভয়ে, পণ্ডিত সে ভয়ে মুল্ল। গরীবদাস তজ বৈর ভাব, কিজে সুল্লম সুল্ল॥৫৭৯॥
হিন্দু ঝটকে মার হীঁ, মুসলম করৈঁ হলাল। গরীবদাস দোউ দীন কা, হোসী হাল বেহাল॥৫৮০॥
বকরী কুকড়ী খা গয়ে, গউ গদহরা সুর। গরীবদাস উস ভিস্ত মেঁ, তুম সে অল্লাহ দূর॥৫৮১॥
ঘোড়ে উঁট অটক নহীঁ, তীতর ক্যা খরগোশ। গরীবদাস ঐসে অধর্মী সে, অল্লাহ হৈ সৌ কোস॥ ৫৮২॥
ভিস্ত ভিস্ত তুম ক্যা করো, দোজখ জল্ল হো অঞ্চ। গরীবদাস ইস খুন সে, অল্লাহ নাহী বঞ্চ॥৫৮৩॥
রব্ব কী রুহ মারতে, খাতে হো রৈ মোর। গরীবদাস উস নরক মেঁ, নহীঁ কাজী কুঁ ঠৌর॥৫৮৪॥

সুন কাজী বাজি লগী, জো জিতে সো জায়। গরীবদাস উস নরক কুঁ, বিন কাজী কো খায়॥৫৮৫॥
সুন কাজী বাজি লগী, পাসা সম্মুখ ডার। গরীবদাস যুগ বাঁধ লে, নহীঁ মরত হৈঁ সার॥৫৮৬॥
সুন কাজী গদহ গতি, পান লদে খর পীঠ। গরীবদাস উস বস্তু বিন, খায় গদহরা বীঠ॥৫৮৭॥
মুল্লা কুঁকৈ বংগ দে, সুন কাফর মুসটন্ড। গরীবদাস মুর্গা মারকার, খাত গোল গীর্দ অন্ড॥৫৮৮॥
সুন মুল্লা উপদেশ তুঁ, কুফর করৈ দিন রাত। গরীবদাস হক বোলতা, মারৈ জীব অনাথ॥৫৮৯॥
মুর্গে সির কলঙ্গী হোতী, চিসমেঁ লাল চিলুল, গরীবদাস উস কলঙ্গী কা, কহাঁ গয়া বহ ফূল॥৫৯০॥
সুন মুল্লা মালী আল্লাহ, ফুল রূপ সংসার। গরীবদাস গতি এক সব, পান ফুল ফল ডার॥৫৯১॥
করো নসীহত দূর লগ, দরগহ হোসী ন্যাব, গরীবদাস কাজী কহৈ, করবে নান পুলাব॥৫৯২॥
কাজী কাঢ় কতেব কুঁ, জোড়য়া বড়া হজুম। গরীবদাস গল কাট হীঁ, ফির খাতে দে দে গুম॥৫৯৩॥
মাংস কটে ঘর ঘর বটে, রূহ গঈ কোস ঠৌর। গরীবদাস উস দরবার মেঁ, হোয় কাজী বড়ী গৌর॥৫৯৪॥
সুন কাজী পাপ কিয়া, জাড় স্বাদ রে জিন্দ। গরীবদাস দরগাহ মেঁ, পড়ৈ গলে বীচ ফন্দ॥৫৯৫॥
বাসমতী চাবল পক্কা, ঘৃত খান্ড টুক ডার। গরীবদাস কর বন্দগী, কূড়ে কাম নিবার॥৫৯৬॥
ফুলকে ধোবা দাল কর, হলবা রোটি খায়। গরীবদাস কাজী সুন, মিটটী মাংস ন পকায়॥৫৯৭॥
রোজে রখে ঔর খূন করৈ, ফির তসবী লে হাথ। গরীবদাস দরগহ সরে, বৌহত করী তৈঁ ঘাত॥৫৯৮॥
শাহ সিকন্দর কে গয়ে, কাজী পটক কুরআন। গরীবদাস জুলহদী পর, হো হৈ খৈঁচাতান॥৫৯৯॥
তোরা সরা ওঠা দিয়া, কাজী বোলে যৌঁ। গরীবদাস পগড়ি পটকৈঁ, কবীর কহৈ অলখ অল্লাহ , মৈঁ হৌঁ॥ ৬০০॥
দস অহদি তলবাঁ হুই, পকড় জুলহদী ল্যাব, গরীবদাস উস কুটিল কো, মারত নহীঁ সংকাব॥৬০১॥
অহদী লে গয়ে বাঁধকর, শাহ সিকন্দর পাস। গরীবদাস কাজী মুল্লাঁ, পগড়ী বহৈঁ আকাশ॥৬০২॥
কাজী পঁচ হজার হৈঁ, মুল্লা পিটৈঁ শীশ, গরীবদাস যৌহ জুলহদী, কাফর বিসবে বীস॥৬০৩॥
মিহর দয়া ইস কে নহীঁ, মিটটি মাংস ন খায়। গরীবদাস মাংস পকাও, নীরু মোমিন ল্যাও বুলায়॥ ৬০৪॥
মোমিন নীরু ভী পকড়ে গয়ে, সংগ কবীরা মাঁয়। গরীবদাস উস সরে মেঁ, পকড় পছাড়ী গায়॥৬০৫॥
শাহ সিকন্দর বোলতা, কহ কবীর তুঁ কৌঁন। গরীবদাস গুজরে নহীঁ, কৈসে বৈঠয়া মৌঁন॥৬০৬॥
হম হীঁ অলখ অল্লাহ হৈ, কুতব গোস অরূ পীর। গরীবদাস খালিক ধনী, হমরা নাম কবীর॥৬০৭॥
মৈঁ কবীর সরবঙ্গ হুঁ, সকল হমারী জাত। গরীবদাস পিন্ড প্রাণ মেঁ, যুগন যুগন কা সাথ॥৬০৮॥
গউ পকড় বিসমিল করী, দরগহ খন্ড অজুদ। গরীবদাস উস গউ কা, পীবৈ জুলহা দুধ॥৬০৯॥
চুটকি তারী থাপ দে, গউ জিবাঈ বেগ। গরীবদাস দুঝন লগী, ভরী দুধ কী দেগ॥৬১০॥
য়ৌহ পরচা প্রথম ভয়া, শাহ সিকন্দর পাস। গরীবদাস কাজী মুল্লা, হো গয়ে বৌহত উদাস॥৬১১॥
কাশী উমটী সব খড়ী, মোমিন করী সলাম। গরীবদাস মুজরা করৈ, মাতা সিহর অলাম॥৬১২॥
তানা বানা না বুনৈঁ, অধর চিসম জোড়ন্ত। গরীবদাস বৌহ রূপ ধর, মোড়য়া নহী মুরন্ত॥৬১৩॥
শাহ সিকন্দর দেখ কর, বৌহত ভয়ে মুসকীন। গরীবদাস গত শের কী, থরকে দোনুঁ দীন॥৬১৪॥
কাজী মুল্লা উঠ গয়ে, শাহ কদম জব লীন। গরীবদাস উস জুলহদী কী, না কোঈ সরবর কীন॥৬১৫॥
খড়ে রহে জ্যুঁ খন্ড গতি, শাহ সিকন্দর লোট। গরীবদাস জুলহা কহৈ, ল্যাবৌ কিত হৈ গোঠ॥৬১৬॥
অগরম মগরম ছোড় দে, মান হমারী সীখ। গরীবদাস কহৈ শাহ সে, বঙ্ক ডগর হৈ লীক॥৬১৭॥
কাজী মুল্লা ভাগ গয়ে, ঘাতন পোতন লাদ। গরীবদাস গতি কো লখৈ, জুলহা অগম অগাধ॥618॥
চলে কবীর অস্থান কুঁ, পালকিয়োঁ মেঁ বৈঠ। গরীবদাস কাশী তজী, কাজী মুল্লাঁ ঐঠঁ॥৬১৯॥

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং ৫৬৮-৬১৯-এর সরলার্থ :-** বিশ্বের সমস্ত প্রাণী কবীর পরমাত্মার আত্মা। যাদের মানব (নারী-পুরুষ) জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সকলেরই ভক্তি করার অধিকার আছে। কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) সমস্ত মানবকে কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখার জন্য ভুল ও অসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের দূত (সংবাদ বাহক/নবী/অবতারদের) দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়ে রেখেছে। ধর্মের নামে এমন সব কর্ম বা প্রথা প্রচলন করে রেখেছে, যাতে পাপ কর্মের বোঝা বাড়তে থাকে; যেমন - হিন্দু শ্রদ্ধালুরা ভৈরব, ভূত, বিভিন্ন দেবী মাতার পূজার নামে ছাগল, মুরগী, মহিষ ও অন্যান্য নিরীহ পশুদের বলি দেয়, এটা মহাপাপ ছাড়া আর কিছুই নয়! এই প্রকার মুসলমানেরা আল্লাহর নামে ছাগল, গরু, মুরগী ও অন্যান্য পশুদের কুরবানি দেয়, যা ভয়ংকর ও সরাসরি মহাপাপ। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, অন্য ধর্ম, পন্থের ব্যক্তিরা সবাই কবীর পরমাত্মার'ই (সত পুরুষ) সন্তান, যারা কালের দ্বারা ভ্রমিত হয়ে পাপ রাশি একত্রিত করছে। এই বাণীতে পরমাত্মা কবীর বিশেষভাবে তাঁর মুসলমান সন্তানদের কালের জাল সম্পর্কে বুঝিয়েছেন যে, তারা যেন এই পাপ আর না করে, সেই বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু কাল ব্রহ্মের মিথ্যা জ্ঞানে

আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে, মুসলমানরা তাদের স্রষ্টা (খালিক) কবীর জীর শত্রু হয়ে রয়েছে। কাল ব্রহ্ম মানুষকে লড়াই-ঝগড়া করার জন্য প্রেরিত করে। খুদা কবীর মুসলিম ধর্মের মুখ্য কার্যকর্তা কাজী ও মোল্লাদের পাপ হতে বাঁচানোর জন্য বোঝাতেন। তিনি বলতেন যে, হে কাজী ও মোল্লা! তোমরা গরু হত্যা করে পাপের শরীক (ভাগীদার) হয়ে যাচ্ছো। তোমরা ছাগল, মুরগী ও অন্যান্য অবলা পশুদের হত্যা করছো, এটা কিন্তু মহাপাপ! গরু হত্যা করলে, আল্লাহ (পরমেশ্বর) কখনও খুশি হন না, উল্টে রাগান্বিত হয়ে বলবেন, তোমরা কার নির্দেশে গরুদের হত্যা করেছো?

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং ৫৬৯ - ৫৭২ :-**

সুন কাজী রাজী নহী, পাপ কর্ম সে খুদায়। গরীবদাস কিস হুকুম সে, পকড় পছাড়ী গায়॥৫৬৯॥
গউ হমারী মাতা হৈ, পীবত জিস কা দুধ। গরীবদাস কাজী কুটিল, কত্ল কিয়া ঔজুদ॥৫৭০॥
গউ আপনী অম্মা হৈ, তা পর ছুরী ন বাহ। গরীবদাস ঘৃত দুধ কুঁ, সব হী আত্ম খাহৈ॥৫৭১॥
এঈসা খানা খাঈয়ে, মাতা কৈ নহী পীর। গরীবদাস দরগাহ সরে, গলে মেঁ পড়ৈ জঞ্জীর॥৫৭২॥

❖ সরলার্থ :- কবীর পরমেশ্বর কাজীদের এবং মুল্লাদের বলেছেন যে, গরু হল মায়ের সমান, যার দুধ সকলে পান করে। হে কাজী! তুমি গরুটিকে কেটে দিলে।

❖ গরু তোমাদের ও অন্য সকলের মাতা (অম্মা), কেননা যার দুধ পান করেছো, সে মায়ের সমানই আদরণীয় হয়। একে মারবে না, কেননা সকল ধর্মের ব্যক্তিরাই এর ঘি ও দুধ খায় ও পান করে।

❖ এমন ভোজন করো, যাতে মাতার (গাই গরুর) ব্যথা না লাগে। এমন পাপ করা বান্দাকে, কবীর আল্লাহর দরবারে (দরগহ) শিকল দিয়ে বেঁধে ভয়ানক যন্ত্রণা দেওয়া হবে!

❖ কবীর পরমেশ্বরের মঙ্গলকামী বাণী শুনে, কাজী ও মোল্লা বলে যে, হায়! হায়! কেমন অপরাধী? মাংস ভক্ষনকারীদেরকে ইনি তো পাপী-অপরাধী বলছেন, এইভাবে বলে রেগে, বিরক্ত হয়ে তারা চলে গেল। এরপর তারা তর্ক- বিতর্ক করার জন্য যখন এলো, তখন কবীর পরমেশ্বর বললেন যে, হে কাজী ও মোল্লা, শোনো! তোমরা মুরগীকে হত্যা করলে তো পাপ হবেই। পরের কোনো জন্মে এই মুরগী হবে কাজী ! আর কাজীর আত্মা হবে মুরগী। তখন ওই মুরগীওয়ালা আত্মা কাজীকে মারবে। জান্নাত তো পাবেই না, সোজা যাবে জাহান্নামে (নরক)।

❖ কাজী কলেমা পড়ে পশু-পাখিও হত্যা করে, তারপর পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কুরআন ও পড়ে। সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে, কবীর আল্লাহ (পরমাত্মা) বলেন যে, এই অপরাধের (জুলুম) ফলে উভয় স্থানে কষ্টে পেতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে তো কষ্ট পেয়ে মরবেই, এরপরে উপরে গেলে জাহান্নামেও ফেলে কষ্ট দেওয়া হবে। (৫৭৬)

❖ কবীর আল্লাহ বলেছেন যে, উভয় (হিন্দু এবং মুসলিম) ধর্মের মধ্যে সহানুভূতি ও দয়া ভাব রাখো। আমার বচন মানো, শূকর ও গরু সব জীবের পালনহার একই, সব একই জীব। না গরু খাও আর না শূকর খাও।

❖ আজ কেউ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তো পরবর্তী জনমে সেই পণ্ডিতের আত্মা, আবার মুসালমানের ঘরেও জন্ম নিতে পারে। এইজন্য একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা উচিৎ। হিন্দু তো ঝটকা দ্বারা জীব হত্যা করে জীব হিংসা করে এবং মুসলমানরা ধীরে ধীরে অর্থাৎ অধিক কষ্ট দিয়ে পশু হত্যা করে জীব হিংসা করে, যাকে মুসলমান হালাল বলে, এটা মহাপাপ। হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মের জীব হত্যা কারীদের অসহনীয় ও শোচনীয় অবস্থা হবে।

❖ যারা ছাগল, গরু, মুরগী-মোরগ, গাধা, শূকর খায়, তারা ভক্তি (রীস) করার নাটক করে। এই ধরনের পাপ যারা করে, তাদের থেকে আল্লাহ (পরমাত্মা) অনেক দূরে থাকেন অর্থাৎ তারা কখনও আল্লাহকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। তাই কবীর আল্লাহ বলেছেন যে, পাপ করো না, নইলে জাহান্নামের ভাগীদারি হয়ে যাবে।

❖ ঘোড়া, উট, ছোট পাখি, এমনকি খরগোশ পর্যন্ত ভক্ষণ করো এবং ইবাদতও করো। এমন কুকর্ম পাপীদের (দুষ্কৃতকারী) থেকে পরমেশ্বর (আল্লাহ) একশো কোস (এক কোস, তিন কিলোমিটারের সমান) দূরে থাকেন অর্থাৎ আল্লাহকে তো কখনও পাবে না।

❖ জান্নাত -জান্নাত (স্বর্গ- স্বর্গ) কি বলছো? দোজখের (নরক) আগুনে জ্বলবে।

❖ জীব হিংসা করো, মাংস ভক্ষণ করো আর তার সাথে ভক্তিও করছো। এটা মহা অন্যায় করছো। খুদার দরবারে তোমাদের গলায় ফাঁস পড়াবে অর্থাৎ দণ্ডিত করা হবে। (৫৮৬-৫৯৫)

❖ বাসমতী চাল রান্না করো, তাতে ঘি ও খান্ড (মিষ্টি) মিশিয়ে ভোজন করো ও ভক্তি করো। খারাপ কর্ম (নোংরা কর্ম) এইসব অত্যাচার (পাপ) পরিত্যাগ করো। পাতলা পাতলা ছোট ছোট রুটিকে ফুলকা বলে, এই প্রকার ফুলকা বানাও, ডাল রান্না করো। হালুয়া, রুটি ইত্যাদি নিরামিষ নিষ্পাপ ভোজন খাও। হে কাজী শোনো! গোশ্ত (মাংস) ভক্ষণ করো না। খুদার আরাধনা করার উদ্দেশ্যে ব্রত (রোজা) করছো, মালার (তসবি) দ্বারা জপ করছো, এরপরেও হত্যা করছো অর্থাৎ গরু, মুরগি, ছাগল মারছো। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে ছলনা অর্থাৎ প্রতারণা করছো। কবীর খুদা

সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এই কাজী ও মোল্লারা এটিকে তাদের জন্য দুঃখ মেনে নিয়েছিল। (৫৯৬-৫৯৮)

❖ ওই সময়ে দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধী (বাহলুল লোধীর পুত্র) কাশী নগরে এসেছিলেন। দশ হাজার মুসলমান একসঙ্গে সিকন্দর লোধীর বিশ্রাম ঘরে গেলেন। কাজীগণ বললেন, হে জাহাঁপনা (দুনিয়ার আশ্রয়দাতা)! আমাদের ধর্মকে তো অপমান করে দিয়েছে। আমাদের তো কোনো ইজ্জতই রাখল না। এক কবীর নামের তাঁতী (জুলাহা) কাফির, আমাদের ধার্মিক ক্রিয়াকর্মকে নিকৃষ্ট কর্ম অর্থাৎ নীচ কর্ম বলেন আর তিনি স্বয়ং নিজেকে সপ্তম আকাশের অদৃশ্য কাদির আল্লাহ (অলখ আল্লাহ) বলে অবিহিত করেন।

❖ পরমাত্মা কবীর জীর সাথে সমস্যা (ঝামেলা) শুরু হয়ে গেল।

❖ বাদশাহ সিকন্দরের নির্দেশে দশজন সৈন্য কবীর পরমেশ্বরকে হাতে কড়া পরিয়ে বেঁধে বাদশার সামনে হাজির করল। এই দেখে কাজী-মোল্লাদের খুশির সীমা রইল না। গর্বে পাগড়ি উঁচু করে তুলে ধরে বলল, হে রাজন! এই জোলা (তাঁতী) সম্পূর্ণ রূপে কাফির (অবজ্ঞাকারী)। এমন কি এই কাফির মাংসও ভক্ষণ করেন না এবং তাঁর হৃদয়ে করুণা নামের কোনো বস্তু নেই, তাঁর পিতা-মাতাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে আসা উচিত। (৬০৪)

❖ মোমিনরা (মুসলমানরা) নীরু ও নীমাকে (কবীর পরমাত্মার জগতের পালিত পিতা-মাতাকে) গ্রেফতার করে, ওই বাদশার সামনে হাজির করল। কবীর আল্লাহ ও তাঁর মাতা-পিতার সামনেই একটি গরুকে কেটে দিল। (৬০৫)

❖ এরপর বাদশাহ সিকন্দর বলল, হে কাফির! তুই নিজেকে আল্লাহ (পরমাত্মা) বলে স্বীকার করছিস। যদি তুই খুদা হয়ে থাকিস, তাহলে এই দ্বিখণ্ডিত মৃত গরুকে জীবিত করে দেখা। আমাদের নবী মহম্মদ মৃত গরুকে জীবিত করে দিয়েছিলেন। এই গরুটাকে জীবিত না করতে পারলে তোকে এখানে টুকরো টুকরো করে কাটা হবে। এখন কেন চুপচাপ বসে আছিস? দেখা তোর শক্তি? (৬০৬)

❖ **পারখের অঙ্গ বাণী নং. ৬০৭ - ৬১০ :-**

হম হী অলখ আল্লাহ হৈঁ, কুতব গৌস অরু পীর। গরীবদাস খালিক ধনী, হমরা নাম কবীর ॥৬০৭॥
মৈঁ কবীর সর্বঙ্গ হুঁ, সকল হমারী জাত। গরীবদাস পিন্ড প্রাণ মেঁ, যুগ যুগন কা সাথ ॥৬০৮॥
গউ পকড় বিসমিল করী, দরগহ খন্ড অজুদ। গরীবদাস উস গউ কা, পীবৈ জুলহা দুধ ॥৬০৯॥
চুটকী তারী থাপ দে, গউ জিবাঈ বেগ। গরীবদাস দুঝন লগী, ভরী দুধ কী দেগ ॥৬১০॥

❖ **সরলার্থ :-** কবীর আল্লাহ বললেন, আমি অদৃশ্য আল্লাহ (পরমেশ্বর)। আমিই সন্ত এবং আমিই সদগুরু, আমার নাম কবীর (আল্লাহ আকবর)। আমি সমস্ত জগতের মালিক (খালিক) আমি কবীর সর্বব্যাপী রয়েছি।

❖ যে গরুটিকে হত্যা করে রাখা হয়েছিল, তার গর্ভের বাছুর ও গরু দুটিই দুই টুকরো হয়ে পড়ে ছিল। কবীর আল্লাহ যখন ওই মৃত গরু ও তার ছোট বাছুরের শরীরে হাত রেখে হালকা করে থপকি মারলেন, তখন উভয়ই জীবিত হয়ে গেল। পরে সেই গরু হতে এক বালতি দুধ বের করে দেখিয়ে দিলেন। কবীর খুদা সেই দুধ পান করলেন।

❖ সিকন্দর বাদশাকে এই প্রথম (পরিচয়) অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ কবীর আল্লাহ তাঁর নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এই দেখে কাজী ও মোল্লা উদাস হয়ে গেল। কারণ তাদের সকল আশা যে বৃথা হয়ে গেল তাই দেখে। হাজার হাজার দর্শক ও শহরের বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। পরে সেখানকার সমস্ত দর্শক তাঁর মাতা ও পিতাকে ধন্য ধন্য বলতে লাগলেন যে, ধন্য হে, আপনার এই পুত্র কবীর!

❖ **পারখের অঙ্গ বাণী নং ৬১৩-৬১৯ এর সরলার্থ :-**

❖ কবীর পরমাত্মা এক তাঁতীর (জোলা) কাজ করতেন কিন্তু ওই দিন থেকে জনতারা জানতে পারল যে, তিনি একজন সিদ্ধিযুক্ত পুরুষ। পরমেশ্বর কবীর বিশেষ মুদ্রা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখকমল যেন বনের রাজা সিংহের মতো দেখতে লাগছিল, এই প্রকার তেজস্বী নূর রূপ দেখে ভারতের সম্রাট সিকন্দর লোধী, তাঁর অধীন হয়ে গিয়েছিল। এরপরে তিনি আল্লাহ কবীরের চরণে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। তখন কবীর পরমেশ্বর বললেন, নিয়ে এসো গরুর মাংস কোথায় আছে? কবীর পরমাত্মা স্তম্ভের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর বাদশাহ সিকন্দর তাঁর চরণে লুটিয়ে অনেক সময় পড়ে রইল।

❖ কবীর পরমাত্মা বললেন যে, হে মুসলমানগণ! এই সবকিছু ত্যাগ করে সোজা পথে চলো ও নিজেদের কল্যাণ করাও। কখনও পাপ করো না। যখন বাদশাহ সিকন্দর লোধীকে কবীর খুদার চরণে ঝুঁকে প্রণাম করতে কাজী-মোল্লারা দেখল, তখন তারা বিদ্বেষের কারণে সেখানে থাকতে না পেরে পালিয়ে গেল। অহঙ্কারে যেন তাদের অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। সকলের সামনে কবীর পরমাত্মা চমৎকার করেছেন বলে, তাঁকে হিংসা করতে লাগল। বাদশাহ সিকন্দর কবীর পরমাত্মাকে ও তাঁর পালিত পিতা-মাতাকে (নীরু নিমা) পালকিতে বসিয়ে সম্মানের সাথে তাঁদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কাজী-মোল্লা ক্রোধিত হয়ে চলে তো গেল কিন্তু এরপর থেকে তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল যে, কোন

উপায়ে সিকন্দর বাদশাহের সামনে কবীরকে (আল্লাকে) নিচু করা যায় অর্থাৎ হেয় করা যায়।

❖ **রাগ নিহপাল থেকে শব্দ নং ১ :-**

জালিম জুলহে জারত লাঈ, ঐসা নাদ বজায়া হৈ॥টেক॥

কাজী পণ্ডিত পকড় পছারে,তিন কুঁ জবাব নহী আয়া হৈ। ষট্‌দর্শন সব খারজ কীন্হে, দোনোঁ দীন চেতায়া হৈ॥১॥
সুর নর মুনিজন ভেদ না পাবেঁ, দোহুঁ কা পীর কহায়া হৈ। শেষ মহেশ গণেশ্বর থাকে, জিন কুঁ পার নহী পায়া হৈ॥২॥
নৌ অবতার হের সব হারে, জুলহা নহী হেরায়া হৈ। চর্চা আন পড়ী ব্রহ্মা সৈ, চারোঁ বেদ হরায়া হৈ॥৩॥
মগহর দেশ কুঁ কিয়া পয়ানা, দোনোঁ দীন ডুরায়া হৈ। ঘোর কফন জহাঁ কাঠী দিন্হা, চাদ্দর ফুল বিছায়া হৈ॥৪॥
গৈবী মঞ্জিল মারফত ওঁটী, চাদর বীচ ন পায়া হৈ। কাশী বাসী হৈ অবিনাশী, নাদ বিন্দ নহী আয়া হৈ॥৫॥
না গাড়য়া না জারয়া জুলহা, শব্দ অতীত সময়া হৈ। চ্যার দাগ সে রহিত সতগুরু, সো হমারে মন ভায়া হৈ॥৬॥
মুক্তি লোক কে মিলে প্রগনেঁ, অটল পটা লিখবায়া হৈ। ফির তাগীর করৈ না কোঈ, ধুর কা চাকর লায়া হৈ॥৭॥
তখ্‌ত হিজুরী চাকর লাগে, সত কা দাগ দগায়া হৈ। সতলোক মেঁ সেজ হমারী, অবিগত নগর বসায়া হৈ॥৮॥
চম্পা নূর তূর বহু ভাঁতী, আন পদম ঝলকায়া হৈ। ধন্য বন্দী ছোড় কবীর গোসাঁঈ, দাস গরীব বধায়া হৈ॥৯॥১॥

❖ **সরলার্থ :-** জালিমের অর্থ হল অন্যায় অত্যাচার করা অপরাধকারী, তাকে 'জালিম' বলা হয়। হরিয়ানা প্রদেশের ভাষায় 'জালিম' একটি ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে একটি ভালো শব্দও আছে, এই শব্দটি বিশেষ প্রিয় ও প্রশংসার ভালোবাসার পাত্র হিসাবে ঠাট্টা করে বলা হয়। এই জন্য সন্ত গরীবদাস জী তাঁর প্রাণের চেয়েও অতি প্রিয় ওই সদগুরু রূপী কবীর আল্লাহর (পরমাত্মার) জন্য এই "জালিম" শব্দটি ব্যবহার করে, তাঁর অসীম গুণ ও প্রেমের মহিমার বিষয়ে জ্ঞান, সকলকে অবগত করিয়েছেন। তিনি ব্যক্ত করে বলেছেন যে, জালিম তাঁতী কবীর জীর প্রতি জারত (অগাধ অফুরন্ত প্রেমপূর্ণ) ভালবাসার অভিলাষায় আকৃষ্ট হয়ে, এই শব্দটি এই প্রকার বাণীতে বলে ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ (কুরবান) করে দেব। তিনি আধ্যাত্ম যুদ্ধের শঙ্খধ্বনি (নাদ/বিগুল) বাজিয়েছেন। মুসলমান ধর্মের বিদ্বান কাজীদের ও হিন্দু ধর্মের বিদ্বান পণ্ডিতদেরকে আধ্যাত্ম জ্ঞান চর্চাতে পিছনে ফেলেছেন (পরাজিত করেছেন) কিন্তু তাদের নিকট হতে কখনো কোনো উত্তরই আসেনি।

❖ **পণ্ডিতের কাছে কবীর আল্লাহর (পরমেশ্বরের) প্রশ্ন ছিল :-**

কৌন ব্রহ্মা কা পিতা হৈ? কৌন বিষ্ণু কী মাঁ? শঙ্কর কা দাদা কৌন হৈ? হম কুঁ দেয় বতায়॥

অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর পণ্ডিতদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে ব্রহ্মার পিতা? কে বিষ্ণুর মাতা? শঙ্করের ঠাকুরদাদা কে? আমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বলে দাও।

উত্তর পণ্ডিতদের :- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশের কোনো মাতা-পিতা নেই। তাঁরা কখনও জন্ম নেন না আর তাঁদের মৃত্যুও হয় না। তাঁরা তো স্বয়ম্ভূ। এই কথা পুরাণে প্রমাণ রয়েছে। তখন কবীর জী বললেন, এক সভা স্থানে একজন ব্রাহ্মণ তিনি শ্রী দেবী পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধ পাঠ করার সময় বলছিলেন যে, শ্রী বিষ্ণু, তিনি দেবী দুর্গাকে (অষ্টাঙ্গী) দেখে ব্রহ্মা ও শিবের সামনে বলেছিলেন যে, হে মাতা! তুমি শুদ্ধ স্বরূপা। এই সমস্ত সংসার তোমা হতেই উদ্ভাসিত (প্রকাশিত) হচ্ছে। আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আমরা অবিনাশী (অমর) নই। এরপর শঙ্কর বললেন যে, হে মাতা! যখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমা হতে উৎপন্ন (জন্ম) হয়েছে, তাহলে আমি তমোগুণী লীলাকারী শঙ্কর কি তোমার সন্তান হলাম না? অর্থাৎ আমাকেও জন্ম তুমিই দিয়েছো অর্থাৎ তুমিই সেই, যে আমাকেও জন্ম দিয়েছো।

শ্রী শিব পুরাণে বিদ্যেশ্বর সংহিতায় সদাশিব অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের লড়াই বন্ধ করে বললেন, হে পুত্রগণ! তোমরা "ঈশ" প্রভু নও। যে কারণে তোমরা লড়াই করছো, এ সব আমার। তোমাদের দুইজনকে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে) আমি তপস্যার প্রতিফলে দুটি বিভাগ (কৃত) দিয়েছি। সৃষ্টির উৎপত্তি কর্মের বিভাগ ব্রহ্মাকে এবং স্থিতি বজায় করে রাখা, পালন করার কর্ম বিভাগ বিষ্ণুকে এবং সংহার (মৃত্যু দেওয়ার) কর্মের বিভাগ শিবকে এই প্রকার দেওয়া হয়েছে। আমার পাঁচটি উপাদানগুলো (অ, উ, ম, বিন্দ ও নাদ) হতে গঠিত হয়েছে, এক ওঁ (ওম্) অক্ষর। অতএব প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতি দেবী (দুর্গা) হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা এবং সদাশিব অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম হলেন এই তিনদেবতার পিতা। এরপর কবীর আল্লাহ বললেন যে, গীতার জ্ঞান এই কাল ব্রহ্মই (জ্যোতি নিরঞ্জনই) শ্রী কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে বলেছিলেন যা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ -তে স্পষ্ট রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, আমার (ব্রহ্মের) কেবল এক অক্ষরের ওম্ (ওঁ) নাম, সেটি উচ্চারণ করে স্মরণ করতে হয়। শিবপুরাণেও এই কথা বলা হয়েছে। তিনি তিনজনকেই (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) তাঁর নিজের পুত্র বলে উল্লেখ করেছে। শ্রী কৃষ্ণ স্বয়ং হলেন বিষ্ণু, এই কথা শ্রীমদভগবত (সুধা সাগরে) প্রমাণ রয়েছে। সকল

হিন্দুও এটা বিশ্বাস করে।

গীতার জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা ১০ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোমার ও আমার অনেকবার জন্ম হয়ে গিয়েছে। তুমি তা জানো না, তবে আমি জানি। তুমি, আমি ও সমস্ত যোদ্ধারা পূর্বেও জন্মেছিলাম এবং ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করবো। আমার উৎপত্তির (জন্মের) খবর দেবতা ও মহর্ষিরা জানেন না, কারণ তারা সকলেই আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে।

কবীর পরমেশ্বর বললেন, পিতার জন্মের খবর সন্তান জানেন না, কেবল তার ঠাকুরদাদা জানেন। আমি (কবীর পরমেশ্বর) সকলের উৎপত্তি কর্তা। এই কাল ব্রহ্মকে (জ্যোতি নিরঞ্জন) আমি বচনশক্তি দ্বারা উৎপন্ন করেছি। এ হল আমার বিদ্রোহী পুত্র। আমি হলাম এর (কালের) পিতা। ব্রহ্মা ,বিষ্ণু, শঙ্কর (শিব) তিন ভাই অর্থাৎ তিন দেবতা বিদ্রোহী জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) পুত্রগণ। অতএব আমি হলাম এই তিনজনের ঠাকুরদাদা।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ জেনে ও শাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার পরে, পণ্ডিতরা (বিদ্বানরা) কোনো উত্তর না দিয়েই, উঠে চলে গেলেন। এরপরে দর্শকরা কবীর জীর জয়গান করতে লাগলেন।

কাজীর (মুসলিম বিদ্বানের) সাথে আধ্যাত্ম জ্ঞান চর্চা :- কবীর পরমেশ্বের প্রশ্ন করলেন এক কাজীকে (মুসলমান বিদ্বানকে) যে, আপনি কাকে আল্লাহ মানেন? কাজী বললেন, আল্লাহ তো একজন, যিনি কাদির, তিনিই আল্লাহ আকবর (বড়) আছেন। যে আল্লাহ কুরআন শরীফের জ্ঞান হজরত মুহম্মদকে প্রদান করেছিলেন। আমরা তাঁকেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলে মানি এবং যিনি ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টি রচনা করেছিলেন আর সপ্তম দিনে তিনি আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছিলেন, তিনিই কাদির (সামর্থবান) আল্লাহ। আমরা অসমর্থ পাথরের আল্লাহর (Dummy God) পূজা করি না।

কবীর আল্লাহ যুক্তি দিয়ে বললেন :- কুরআন শরীফের সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ পর্যন্ত পড়ুন। তারমধ্যে লেখা আছে যে, কুরআনের জ্ঞানদাতা (যাকে সমস্ত মুসলমান পূজ্য আল্লাহ (প্রভু) বলেন) তিনি (প্রভু) হজরত মুহম্মদকে বলেছেন যে, হে হজরত মুহম্মদ! তুমি কাফিরদের কথা মানবে না, আমার (দলীলের) কথার উপর বিশ্বাস রাখবে। কাফিররা কবীরকে আল্লাহ মানে না। তুমি তাদের কথার ফাঁদে পড়বে না। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ (প্রতিবাদ) করবে যে, কবীর হলেন তিনি, যিনি ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিনে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তাঁর খবর (বিষয়ে) কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্তের) নিকটে জিজ্ঞাসা করো। কুরআনের জ্ঞানদাতা জানেন না। এরদ্বারা স্বতঃসিদ্ধ হয় যে, কুরআনের জ্ঞানদাতা ছাড়া অন্য এক কাদির আল্লাহ (পরমেশ্বর) আছেন, যিনি ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে, সপ্তম দিনে সিংহাসনে (তখতের) উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। হে কাজী! আপনিও অসমর্থ আল্লাহর ইবাদত করছেন। এই কথা শুনে কাজী এদিক ওদিক তাকিয়ে কুরআন খুলে পড়তে লাগলেন কিন্তু কিছু বলতে না পেরে বাকরুদ্ধ অর্থাৎ নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

এরপরে কবীর জী অন্য প্রশ্ন করলেন, আপনাদের ধর্মে পুনর্জন্মকে কি বিশ্বাস করে?

কাজী উত্তরে বললেন, না কেউ বিশ্বাস করে না, কারণ এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই।

কবীর পরমেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তাহলে মৃত্যুর পর মুসলমানদের আত্মা কোথায় থাকে?

এর উত্তরে কাজী তার রূপকথা (লোকবেদ) বিস্তারিতভাবে বলতে লাগলেন, আমরা এটা মানি যে, যত মানুষ (পুরুষ বা মহিলা) জন্ম নেয়, তারা সবাই যেন আল্লাহর (পরমাত্মার) ভক্তি করে ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর যে আদেশগুলো রয়েছে তা যেন পালন করে এবং সমস্ত খারাপ কর্ম থেকে সকলে এড়িয়ে চলে। মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ কবরের মাটিতে দাফন করে দেওয়া হবে আর সেই জীবও (আত্মা) ওই শরীরের সাথে সেই কবরেই থাকবে। যত মুসলমান মানুষ আছে, সবাইকে মৃত্যুর পরে মাটির নিচে কবরে রাখা হবে। সকলে মরতে থাকবে আর কবরের মাটিতে দাফনাতে থাকবে। হজরত আদম যিনি সকল মানবের পিতা, সেই হজরত আদম থেকে সমস্ত নবী দাউদ, মূসা, অব্রাহিম, ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট), হজরত মুহম্মদ ও অন্যান্য সকলেই কবরে রয়েছেন। যখন আল্লাহ কিয়ামত (প্রলয়) করাবেন (যে কিয়ামত কোটি-কোটি, অরব-খরব বছর পর হবে), ওই কিয়ামতের সময় পর্যন্ত সমস্ত আত্মা (রুহ) কবরেই থাকবে। কিয়ামতের (প্রলয়) পরে সমস্ত মৃতকে জীবিত করা হবে। তাদের কর্ম অনুসারে নির্ণয় করা হবে। যারা ভালো কর্ম করেছে, কুরআন শরীফের অনুসারে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম (আদেশ) মেনে ধর্ম কর্ম করেছে, তাদেরকে জান্নাতে (স্বর্গে) রাখা হবে আর যারা কাদির (সামর্থবান) আল্লাহর (পরমাত্মা) বিধান ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে দোজখের (নরক) আগুনে পোড়ানো হবে। তবে ওই সময় (কিয়ামত আসার পূর্ব পর্যন্ত) কেউ দোজখে ও বেহেশতে থাকবে না, জান্নাত-জাহান্নাম খালি পড়ে থাকবে। এই কথা শুনে কবীর আল্লাহ যুক্তি দিয়ে বললেন, হে কাজী! আমি এক মোল্লার কাছে নবী হজরত মুহম্মদের জীবনী শুনেছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে, হজরত মুহম্মদ তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন

যে, এক রাত্রে জিব্রাইল নামের এক ফেরেশতা গাধার মতো এক পশু, যার নাম বুরাক বলা হয়েছিল, তাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমাকে সেই পশুর পিঠে বসিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন। উপরের এক স্থানে এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। তবে তিনি যখন ডানে (Right) জান্নাতের (স্বর্গ) দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিলেন, তখন তিনি হাসছিলেন আর যখন বাঁয়ে জাহান্নামের (নরক) দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। এই দৃশ্য দেখে আমি জিব্রাইল ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? কেন তিনি হাসছেন আর কাঁদছেন? জিব্রাইল ফেরেশতা বললেন, ইনি হলেন সকল মানবের আদি পিতা হজরত আদম। ডান দিকের স্বর্গে তার উত্তম সন্তানরা রয়েছেন, যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে জীবন-যাপন করেছিলেন, তাই এরা স্বর্গে সুখে রয়েছে। এইজন্য এদেরকে দেখে তিনি হাসেন আর বাম দিকে তাঁর দুষ্টু সন্তানদের দেখলেন, যারা আল্লাহর (প্রভু) আদেশ পালন না করার কারণে দোজখে পাপ করার জন্য দুঃখ পাচ্ছে, তাদেরকে দেখে তিনি কাঁদছিলেন। বাবা আদম আমাকে বললেন, এসো হে আমার সুপুত্র! হে নেক নবী! এরপর জান্নাতের অনেক স্থান দেখেছি, যেখানকার মানুষ খুব সুখে জীবন যাপন করছিল। তারপর আমি আরো এগিয়ে গেলাম, তখন পূর্বের নবীদের মণ্ডলীদের (জামাত) দেখলাম। তাঁরা আমাকে সম্মান করলেন। সেখানে হজরত দাউদ, হজরত অব্রাহিম, হজরত মূসা, হজরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) ও পূর্ববর্তী সকল অন্যান্য প্রমুখ নবীরা ছিলেন। আমি তাঁদেরকে নামাজ পড়িয়েছি। এরপর আল্লাহর সান্নিধ্যে আমি একাই গেলাম। আল্লাহ পর্দার পিছন থেকে প্রথমে পঞ্চাশ বার নামাজ পড়ার আদেশ দিলেন। নিচে আসার পর যখন নবী মূসাকে বললাম, তখন তিনি বললেন যে, পঞ্চাশবার নামাজ পড়া সম্ভব নয়, কিছু কম করিয়ে আনো। পুনরায় উপরে আল্লাহর নিকটে গিয়ে নামাজের সংখ্যা কম করানোর জন্য প্রার্থনা করলাম। এই ভাবে দুই তিনবার উপরে গিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অবশেষে কেবল পাঁচ বার নামাজ পড়ার আদেশ পেলাম, এই প্রকার রোজা রাখা ও আজান (বংগ) দেওয়া, এইপ্রকার ভক্তিমূলক কার্যগুলি করার আদেশ হল। এরপর আমি পৃথিবীতে চলে এসেছিলাম।

কবীর পরমাত্মা কাজীকে প্রশ্ন করলেন যে, হজরত মুহম্মদ যে সব কথা বলেছিলেন, এই সবকথা কি আপনি সত্য মানেন? কাজী বললেন, এটি একশো শতাংশ সত্য মানি। এই কথা কোন মুসলমান মানবে না, বলুন তো?

বিশ্লেষণ :- হে কাজী! যদি আপনার এই বিধান সত্য হয় যে, কিয়ামত (প্রলয়) আসার পূর্ব পর্যন্ত সকলেই কবরে থাকবে আর হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত, এক লাখ আশি হাজার নবী (পয়গম্বর) যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে নিশ্চয়ই কবরে রয়েছেন, তাহলে হজরত মুহম্মদের জান্নাতের যাত্রা, যেমন- আল্লাহর নিকট হতে পাঁচ সময়ের নামাজ আনা, তাঁর দ্বারা বলা উপরোক্ত প্রকরণগুলো তো মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। আপনার বলা লোকবেদ (রূপকথা) যা হয়তো নিরাধার, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান কবরে থাকবে, আপনার এই কথা মিথ্যা আর নয় তো হজরত মুহম্মদের কথা মিথ্যা আছে। এই কথার উত্তর কাজী দিতে না পেরে, সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

রাগ নিহপালের শব্দ নং ১ -তে এই কথা বলা হয়েছে যে, কবীর পরমেশ্বর, তিনি তাঁর আধ্যাত্ম জ্ঞান দিয়ে, মুসলমান বিদ্বান, কাজী, মোল্লা, হিন্দু গুরু ও পণ্ডিতদের পিছনে ফেলেছেন (পরাজিত করেছেন)।

হিন্দুদের বিদ্বান পণ্ডিতগণকে, ষটদর্শনী সাধুদের, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকেও তিনি (আল্লাহ কবীর) আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরাজিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। তিনি উভয় ধর্মের সাধকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আপনারা ভুল ভক্তি করছেন, এই ভক্তি সকলে ত্যাগ করুন আর আমার নিকট যে সত্য সাধনা আছে, সেটি গ্রহণ করুন। সন্ত গরীবদাস জী বলেছিলেন যে, দেবতা (সুর) ও ঋষিরাও কবীর পরমেশ্বরের ভেদ জানতে পারেননি। উভয় (হিন্দু ও মুসলিম) ধর্মের ব্যক্তিরা তাঁকে গুরু (পীর) বলে জানতে লাগলেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে ৯ অবতারগণও জ্ঞান চর্চা করতে এসে, পরাজিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ কবীর, প্রতিটি পবিত্র আত্মার সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে সত্য জ্ঞান অবশ্যই বলতেন, তারা বিশ্বাস করুক বা না করুক। ব্রহ্মা দেবতাও পরমেশ্বর রূপী কবীর জুলাহের (তাঁতী) সঙ্গে চারটি বেদ নিয়ে চর্চা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা সত্যকে মানেন নি। মগহর থেকে কবীর আল্লাহ সশরীরে সতলোকে চলে গিয়েছিলেন ,তাঁর মৃত শরীর কেউ পায়নি। একটা চাদর নিচে বিছিয়ে রেখেছিল। তার উপর ভক্তরা সুগন্ধিত ফুল বিছিয়ে দিয়েছিল। কবীর আল্লাহ সেই ফুলের চাদরের উপর শুয়ে পড়েছিলেন এবং শরীরের উপর অন্য এক চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলেন। এরপরে তিনি ফুল ও কেবল দুটি চাদর ছেড়ে, সশরীর সতলোকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরই বিষয়ে বর্ণনা আছে। (কাশীর নিবাসী) কবীর জোলা (তাঁতী) অবিনাশী (অমর)। তাঁর শরীরই পাওয়া যায়নি। এইজন্য না মুসলমানরা তাঁকে মাটিতে দাফন করতে পেরেছিল আর না হিন্দুরা তাঁকে দাহ সংস্কার করতে (জ্বালাতে) পেরেছিল। কারণ কবীর আল্লাহর (পরমেশ্বর) শরীর কখনই নষ্ট হওয়ার নয়। তিনি মরেনই না, তাহলে চার দাগের মধ্যে তিনি কী করে আসবেন? চার দাগের অর্থ হল, মৃত দেহকে চারপ্রকারে অন্তিম সংস্কার করা হয়। ১. শ্মশানে দাহ সংস্কার করা ২. মাটির নিচে কবরে দাফন করা ৩. প্রবাহিত নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ৪. মৃতদেহকে খোলা জায়গায় উঁচু স্থান বানিয়ে রেখে

দেওয়া হয়, যাতে পাখিরা খেতে পারে, এই প্রকার ধর্ম করে। ওই সদগুরু আমার (সন্ত গরীবদাস জী) খুবই পছন্দ হয়েছে অর্থাৎ ভালো লেগেছে এইজন্য তাঁর শরণে নিয়েছি। আমি অমর ধামের দীক্ষা প্রাপ্ত করেছি। পূর্ণ মুক্তি রূপে অটল পাট্টা (দলিল বানিয়ে) লিখিয়ে নিয়েছি। আমি তো কবীর আল্লাহর (পরমেশ্বরের) সতলোক (অমর) স্থানের দরবারের চাকর নিযুক্ত হয়েছি। সত্যের দাগ দাগিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ সত্য দীক্ষা প্রাপ্ত করে আমি শিষ্য হয়েছি এবং আমার বিছানা (শয্যা) সত্যলোকে, সেখানে আমার জন্য অন্য নগর বসানোর আদেশও হয়ে গিয়েছে। সতলোকে গিয়ে আমি আমার পরিবার বানাবো। বন্দী ছোড় (যিনি বন্দীদেরকে কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের কারাগার থেকে মুক্ত করেন, সেই) কবীর আল্লাহকে (পরমাত্মা) আমার অশেষ ধন্যবাদ, যিনি এই গরীবদাসকে ভক্তি মার্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ পার করলেন, সুপ্রসিদ্ধ করে দিয়েছেন। মোক্ষের জন্য তিনি আমাকে যথার্থ নামের সাধনার কথা বলে দিয়েছিলেন।

❖ **রাগ আসাবরী থেকে শব্দ নং ১২ :-**

☆দিল হী অন্দর হুজরা কাজী, দিল হী অন্দর হুজরা। কর লে উস তালিব সে মুজরা॥টেক॥
মক্কা মদিনা দিল হী অন্দর, কাবে কুঁ কুর্বানা। কাহে লেট নিবাজ করত হো, খোজো তন অস্থানা॥১॥
সত্তর কাবে দেখ নূর কে, খোল কিবারী ঝাঁকী। তা পর এক গুমজ হৈ গৈবী, পন্থ ডগরিয়া বাঁকী॥২॥
অল্লাহ কবীর বড়া জহাঁ বিরাজৈ, ঝিলমিল নূরী দেহা। জা সমর্থ কা ভয় কর কাজী, লা লে বাসেঁ নেহা॥৩॥
হক্ক হক্ক কর মুল্লাঁ বোলৈ, কাজী পড়ৈ কুরানাঁ। জিনহ কুঁ ঔহ দীদার কহাঁ হৈ, জো কাটেঁ গলা বিরানাঁ॥৪॥
অর্শ কুর্শ মেঁ আল্লাহ তখ্ত হৈ , খালিক বিন নহীঁ খালী। বৈ পৈগম্বর পাক পুরুষ থে, সাহিব কে অবদালী॥৫॥
মুহম্মদ কুঁ নহী গোশত খায়া, গউ ন বিস্মিল কীতী। এক বের কহ্যা মোমীন মুহম্মদ, তা পর ঐতী বীতী॥৬॥
নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া। এক লাখ আশি কুঁ সৌগন্ধ, জিন নহীঁ কর্দ চলায়া॥৭॥
বৈহি মুহম্মদ, বৈহী মহাদেব, বৈহী আদম, বৈহী ব্রহ্মা। দাস গরীব দূসরা কো হৈ, দেখো আপনে ঘর মাহ॥৮॥১২॥

❖ **ভাবার্থঃ-** হে কাজী! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি রয়েছে, তিনিই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ওই পরমেশ্বরের (তালিব) প্রতি ভালোবাসো (মুজরা) রাখুন। মানবদেহ থাকতে ভক্তি করে নিন। যে লাভ আপনি মক্কা-মদিনার ধর্মীয় স্থানে গিয়ে প্রাপ্ত করতে চাইছেন, সেখানে তা আপনি কখনও পাবেন না। সত্য ভক্তি করলে, ঘরে বসেই কর্ম করতে করতে আপনি সেই লাভ পেয়ে যাবেন। পরমেশ্বরের নামে নিজেকে উৎসর্গ (কুরবান) করে দিন। পশুদেরকে কুরবানি করা বন্ধ করে দিন, এতে মহাপাপ হয়। যে পাঁচবার মাটিতে ঝুঁকে নামাজ করেন, এতে মোক্ষ লাভ হবে না, এটি তো কেবল স্তুতি। নামের স্মরণও করতে হবে, তবেই মোক্ষ লাভ করতে পারবেন। কেবল পাঁচ সময়ে নামাজ (স্তুতি) দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হবে না। মানব শরীর যখন পেয়েছেন, তাহলে এবার পাপ কর্ম ত্যাগ করে সতলোক স্থান প্রাপ্ত করার জন্য সত্য ভক্তি করুন। উপরের সতলোকে যাওয়ার মার্গে (রাস্তায়) সত্তরটি কাবা বানানো রয়েছে। সেখানে প্রণাম করতে করতে চলুন। ত্রিকুটির ঝাঁকি (জানালা/window) খুলে দিন অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর দ্বার খুলুন। সতলোকে সব থেকে উপরে একটা গুম্বজ আছে, যেটি পরমেশ্বরের (গৈবী) গুপ্ত শক্তি দ্বারা বানানো, ওই মার্গ বড় কঠিন। সেই গুম্বজে বড় আল্লাহ কবীর বিরাজমান আছেন, যাঁর শরীর নূর দ্বারা বানানো। হে কাজী! পাপ কোরো না, ওই সর্বশক্তিমানকে ভয় করো। তাকে ভালোবাসো। তাঁর আত্মাদেরকে কষ্ট দেবে না।

মুল্লা তো হক্ক, হক্ক (ঠিক আছে, সঠিক আছে) করেন। কাজী কুরআন পড়েন এবং অন্য জীবের গলাও কাটেন। এদের কখনও পরমেশ্বরের দর্শন হতে পারে না।

আকাশের (অর্শ) শীর্ষে (কুর্শ) পরমাত্মার (অলহ) সিংহাসন (তখত) আছে। সেই পরমেশ্বর (খালিক) সর্বব্যাপী রয়েছেন। তাঁর শক্তি প্রতিটি কোনায়-কোনায় মিলে-মিশে রয়েছে। এইজন্য বলা হয়েছে যে, এমন কোনো স্থান নেই, যা পরমেশ্বরের (কবীর আল্লাহর) শক্তি ব্যতীত। ওই পয়গম্বর (নবী মুহম্মদ) তো পবিত্র আত্মা এবং পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র (অবদালী) ছিলেন।

হজরত মুহম্মদ কখনও মাংস (গোশত) আহার করেন নি। একবার শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা গরু মেরে দিয়ে, পরে বচন শক্তি দ্বারা জীবিতও করে দিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর, সেই (গরু জীবিত হওয়া) দিনটিকে স্মরণীয় রাখার জন্য, মাংস খাওয়া প্রারম্ভ হয়। নবী মুহম্মদকে তো আমি (সন্ত গরীবদাস জী) নমস্কার করছি, যাঁকে পরমাত্মার রসূল বলা হয়েছে। এক লাখ আশি হাজার পয়গম্বর হয়েছিলেন, আমি কসম খেয়ে (প্রতিজ্ঞা করে) বলছি যে, পরমেশ্বরের ওই ভক্তগণ তাঁরা কখনো জীব হিংসা করেননি। ওই সকল নবীগণ পবিত্র আত্মা ছিলেন এবং পরমাত্মার কৃপা পাত্র ছিলেন। সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন যে, হজরত মুহম্মদের আত্মা (রূহ) শিব লোক, যাকে আপনারা লাহুত মোকাম বলেন, সেখান থেকে এসেছিলেন। বাবা আদম ব্রহ্মার লোক থেকে এসেছিলেন। এইজন্য বাণীর মধ্যে বলা হয়েছে যে, তিনিই মুহম্মদ, তিনিই মহাদেব, তিনিই আদম। যিনি ব্রহ্মার লোক থেকে এসেছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহলে

নিজের শরীরে বানানো কমল (পদ্ম) গুলি খুলে সত্যিকারের ভক্তি করুন, তারপর দেখুন মহাদেবের লোক থেকে মুহম্মদ এসেছিলেন এবং ব্রহ্মার লোক থেকে বাবা আদম এসেছিলেন। এটাই সত্য।

❖ **রাগ আসাবরী থেকে শব্দ নং. ১৪ :-**

☆জো কোঈ না মানৈ না মানৈ, জৈসে অজাজীল ঈরানৈঁ॥টেক॥

করৈঁ আচার বিচার অসন্তী, পূজত জড় পাষানৈঁ। পাতী তোড় চরাবৈঁ অন্ধরে, জীবত জী কূঁ ভানৈঁ॥১॥
পিন্ড প্রদান করৈঁ পিতরোঁ কে, তীর্থ যজ্ঞ ঔর দানৈঁ। বিনা সত ভক্তি মোক্ষ নহী রে, ভুল রহে সুর জ্ঞানৈঁ॥২॥
সুখদেব শিব কা তত্ত্ব সুনা হৈ, ভক্তি লঈ খিগতানৈঁ। সতগুরু জনক বিদেহী ভেঁটে, জায় স্বর্গ সমানৈঁ॥৩॥
অকথ কথা কুছ কহী ন জাঈ, দেখান নৈন সিরানৈঁ। অবল বলী বরিয়াম বিহঙ্গম, লায় লে চোট নিশানৈঁ॥৪॥
পণ্ডিত বেদ পঢ়ৈ বহু বাণী, কাজী পঢ়ৈ কুরআনৈঁ। সুর গউ কূঁ দোয় বতাবৈঁ, দোনৌঁ দীন দিবানৈঁ॥৫॥
এক হী মিট্‌টী এক হী চমড়ী, একই বোলত প্রাণৈঁ। জিভ্যা স্বাদ মারত হৈঁ নর, সমঝত নহী হৈবানৈঁ॥৬॥
মুর্গী বকরী কুকড়ী খাঈ, কূকৈঁ বংগ মুলানৈঁ। জৈসা দরদ আপনে হোবৈ, ঐসা দর্দ বিরানৈঁ॥৭॥
মন মক্কে কী হজ নহী কীহী, দিল কাবা নহী জানৈঁ। কৈসে কাজী কজা করত হো, খাতে হো হিলবানৈঁ॥৮॥
জা দিন সাহিব লেখা মাঙ্গৈ, দয়ো ক্যা জবাব দিবানৈঁ। ঐসা কুফর তরস নহী আবৈ, কাটৈঁ শীশ খুরানৈঁ॥৯॥
উস পুর সেতী মহরম নাঁহী, অনহদ নাদ ঘুরানৈঁ। দাস গরীব দুনি গঈ দোজিখ, দেবৈঁ গালি গুরুবাঁ নৈ॥১০॥৪॥

❖ **ভাবার্থ :-** সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে, আমি সত্য বলছি যে, পরমাত্মা নিন্দা-মন্দ অযথা কথা (বেঅদবী) স্বীকার করেন না, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। কেউ মানুক বা না মানুক এটি একশো শতাংশ সত্য। অজাজীল নামের এক ভক্ত ছিলেন। তাঁর গুরু তাকে কেবল প্রণাম যজ্ঞ করার দীক্ষা দিয়ে রেখেছিলেন। যজ্ঞ যে কোনো হোক, যদি তা একনিষ্ঠভাবেও করা হয় অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর নিকট হতে নাম দীক্ষা না নেওয়া সত্ত্বেও, তিনি ওই যজ্ঞের ফল স্বরূপ এই কালের লোকের স্বর্গ প্রাপ্তি করবেন। অজাজীল এগারো অরব বার প্রণাম যজ্ঞ করেছিলেন। {এক যজ্ঞ ধর্মের, দ্বিতীয় যজ্ঞ ধ্যানের, তৃতীয় যজ্ঞ হবনের, চতুর্থ যজ্ঞ প্রণাম, পঞ্চম যজ্ঞ হল জ্ঞান।} অজাজীল কেবল এক (প্রণাম) যজ্ঞই অধিকতম করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ তিনি স্বর্গে স্থান পেয়েছিলেন। দেব পদ পেয়েছিলেন। তবে দেব পদ দেওয়ার পূর্বে শ্রী বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা (কবীর আল্লাহ) অজাজীলকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাকে বললেন যে, অজাজীল একটা মানুষ উৎপন্ন করো। অজাজীল জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে উৎপন্ন করবো? বিষ্ণু রূপধারী পূর্ণ পরমাত্মা বললেন, এটা বলো যে, আমার সাধনার শক্তিতে একটা যুবক মানব প্রকট হও। অজাজীল এমনটিই বললেন। তখন সামনে ১৮-২০ বছরের একজন যুবক সামনে প্রকট হল। পরমেশ্বর বললেন যে, এ তোমার বচন পুত্র এবং স্বর্গে তোমার সঙ্গে থাকবে। একে প্রণাম করো। অজাজীল বললেন, এ তো আমার পুত্র, আমি একে প্রণাম করবো না। পরমাত্মা কয়েকবার অনুগ্রহ করেছিলেন কিন্তু অজাজীল জেদ করে বসে রইল। পরমাত্মা ভাবলেন, যে কোনো প্রকারে এর ভক্তি রক্ষা করা যায় কি না। সেই কারণে বাগানে এক ছোট দরজা তৈরি করা ছিল। সেই ছেলেটিকে পরমাত্মা বললেন যে, বাগানের এই ছোট দরজা নিচু হয়ে পার করে, বাগানের ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। ছেলেটি নিচু হয়ে ঝুঁকে বেরিয়ে অন্য দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। পরমাত্মা বললেন, হে অজাজীল ভক্ত! এখন তোমাকে স্বর্গে থাকতে হবে, চলো তোমাকে স্বর্গের বাগানে ঘুরিয়ে দেখাই। দুজনে চলতে লাগলেন, রাজ প্রাসাদের আঙিনা দিয়ে বাগিচাতে প্রবেশ করার জন্য ওই ছোটো দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। ওই স্থান থেকে নিচু হয়ে ঝুঁকে বেরিয়ে যেতে পারতো। বিষ্ণু রূপী পরমাত্মা নিচু হয়ে ঝুঁকে বেরিয়ে গেলেন। অজাজীলের বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি উদয় হল। তিনি পরমাত্মাকে (বিষ্ণু রূপী) বললেন, আমি আপনার চালাকি বুঝে গিয়েছি। সামনে বচন পুত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি যদি ঝুঁকি, তাহলে আপনি পরে উপহাস করবেন যে, দেখলে তো আমি তোমাকে প্রণাম করিয়ে ছেড়েছি, আমি সব বুঝি। পরমাত্মা অজাজীলকে স্বস্তি দিতে চেয়েছিলেন যে, যদি এই দরজা দিয়ে অজাজিল মাথা ঝুঁকেও বেরিয়ে যায়, তাহলেও আমি তার প্রণামকে মেনে নেব কিন্তু অজাজীল পরমাত্মার কথা মানেন নি। তখন পরমাত্মা বললেন, আরে ভোলা মানুষ! সারা জীবন প্রণাম করে এসেছিস কিন্তু তোর আজও নম্রতা ভাব আসেনি, তাহলে এমন প্রণামের কি লাভ? প্রণাম তো মনের অহঙ্কার সমাপ্ত করার জন্য করতে হয়। অহংকার তোর ভিতরে ভরে পড়ে রয়েছে, চলে যা এখান থেকে। আমি তোর সমস্ত সাধনা সমাপ্ত করে দিয়েছি। পৃথিবীতে গিয়ে গাধা হয়ে যা, এরপরে আর ঘাড় তুলতে পারবি না। তৎক্ষণাৎ অজাজীলের দেবতার শরীর নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ মারা গেল। এরপরে অজাজীল গাধীর গর্ভে জন্ম নিল।

গরীব, বে অদবী ভাবৈ নহী সাহেব কে তাঁহী। অজাজীল কী বন্দগী পল মাহী বহাঈ॥

অর্থাৎ পরমাত্মা খারাপ আচরণ ও বাজে কথা পছন্দ করেন না। এই কারণে এক মুহূর্তে পরমাত্মা অজাজীলের প্রণামের সাধনার পুণ্য ফল নষ্ট করে দিলেন।

❖ **শব্দের বাণী নং ১-১০ ভাবার্থ :-** পাখন্ডী (মিথ্যা পূজা) আচার-অনুষ্ঠান অর্থাৎ ক্রিয়াকর্ম করতে থাকে। {যেমন পাথর, মাটি, পিতল ও অন্যান্য ধাতুর দ্বারা তৈরি ভগবানের মূর্তির পূজা করা, সেটিকে প্রতিদিন স্নান করানো, পোশাক বদলানো,

চন্দনের তিলক লাগানো, তুলসীর কাঠের পুঁতি দিয়ে মালা বানিয়ে প্রতিমার গলায় পরা, এছাড়া নিজের গলাতে পরা, তিলক লাগানো, মূর্তির সামনে আরতি করা, ধূপ-দীপ জ্বালানো, শ্রাদ্ধ করা, পিন্ডদান করা, তীর্থে গিয়ে জলে অস্থি প্রবাহ করা, এই প্রকার অন্যান্য কর্ম কান্ড অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা একেবারেই ব্যর্থ।} নির্জীব (জড়) পাষাণের (পাথর) পূজা করে। তত্ত্বজ্ঞান নেত্রহীন অন্ধ ব্যক্তিরা তুলসী পাতা, বেল পাতা তুলে মূর্তির উপর চড়ায়। (জীবন্ত জীব) তুলসী ও বেল পাতা গাছ থেকে তুলে ফেলে। পাথর (জড় বস্তু) নির্জীবের (পাষাণ) পূজা করে। পূর্বপুরুষদের পিণ্ড দান করা, স্নান ও পূজার জন্য তীর্থস্থানে যাওয়া, সেখানে গিয়ে দান করা, এই সব কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠান রীতি বেদের বিরুদ্ধ ভুল সাধনা করে, যা ব্যর্থ, এই সব কর্মকাণ্ড করে কোনো লাভ হয় না। হে বিদ্বানগণ! শাস্ত্র অনুসারে সত্য ভক্তি না করলে, মোক্ষলাভ হয় না, আপনারা ভুল করছেন। শুকদেব ঋষির আত্মা তোতার (টিয়া পাখি) নষ্ট ডিমের মধ্যে পড়ে ছিল। শিবজী তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে নাম দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে, পূর্ণ পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) মহিমা শুনিয়েছিলেন, তারপরে মন্ত্র দীক্ষা দ্বারা শরীরের পাঁচটি কমল (পদ্ম) খোলার বিষয়ে শুনিয়েছিলেন, এই কারণে ওই তোতার নষ্ট ডিমের আত্মা সবল (সুস্থ) হয়ে এক বাচ্চার রূপ হয়ে গিয়েছিল এবং পালকও (পাখাও) গজিয়ে গিয়েছিল। এদিকে পার্বতী পরমাত্মার মহিমা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই জন্য পার্বতীর বদলে তোতা হুঁ হুঁ করতে লাগলো। শিব জী যখন জানতে পারলেন যে, এই পাখি দুর্লভ পরমাত্মার মন্ত্র শুনে নিয়েছে আর এ কাউকে বলে দিতে পারে, সেই কারণে তাকে (তোতা) মারতে গেলেন , তখন পাখি উড়ে চলে গেল। শিবজীও সিদ্ধি দ্বারা উড়ে তার পিছনে চলে গেলেন। ব্যাসদেব ঋষির আশ্রমে গিয়ে ওই তোতা পাখি প্রাণ ত্যাগ করে দিলো। ওই সময় ব্যাসদেবের স্ত্রী মুখ খুলে হাই তুলছিলেন। ওই পাখি নিজের শরীর বাইরে রেখে, প্রাণ তাঁর (ব্যাসদেবের স্ত্রীর) খোলা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে গর্ভে চলে গেল। শিবজী সেখানে গিয়ে ব্যাসদেব ঋষির স্ত্রীকে গিয়ে বললেন, আপনার গর্ভে এক জীব (আত্মা) চলে গিয়েছে, সে আমার আসামী (চোর), আমি তাকে মারবো। ঋষি ব্যাসদেব হাত জোড় করে শিবজীকে বললেন, হে দয়াময়! কোন ধরনের চোর? শ্রী শিব বললেন, এ আমার অমর মন্ত্র শুনে ফেলেছে, এ এখন অমর হয়ে গিয়েছে। ঋষি ব্যাসদেব বললেন, এ যখন অমর হয়ে গিয়েছে, তাহলে আপনি একে তো মারতে পারবেন না। শিবজীও বুঝতে পারলেন যে, কথা তো সত্য। এরপর শিব পার্বতীর কাছে ফিরে এসে অবশেষ জ্ঞানটুকু শোনালেন। বলা হয় যে, শুকদেব ঋষি শিবের নিকট হতে জোর করে ভক্তি নিয়েছিলেন।

পরমেশ্বরের মহিমা অবর্ণনীয় (অকথ্য)। পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ বেদের বাণী অনেক অধ্যয়ন করেন এবং কাজীগণও কুরআন পড়েন, এর পরেও তারা শূকর ও গরুর মধ্যে পার্থক্য খোঁজেন। উভয় ধর্মের প্রবক্তাগণ বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছেন। যে আত্মা গরুর মধ্যে রয়েছে, সেই আত্মাই শূকরের মধ্যেও রয়েছে। আবার সেই প্রকার দেবতা ও মানুষের মধ্যে রয়েছে। অতএব কাউকে মেরো না। শূকর ও গরু উভয়ের শরীর হাড়, চাম, মাংস ও রক্ত দিয়ে তৈরি, এদের হত্যা করে খাওয়া মহাপাপ এবং এটা তো নোংরা খাবার। কোনো জীবের মাংস কারোরই খাওয়া উচিত নয়। কোনো জীবকে হত্যা করো না। যেমন কষ্ট নিজের হয়, তেমন কষ্ট অন্যদেরও হয় জানবে। যদি কেউ আমাদের সন্তানকে, ভাই অথবা বোনকে, মাতা-পিতাকে মারে, তাহলে তখন কেমন লাগবে? এমনই দুঃখ অন্যকে মারার হয়।

মনের মধ্যে মক্কা ও হৃদয়ে কাবা অর্থাৎ হৃদয়ে দয়া থাকলে তো আল্লাহ তালার বান্দা (ভক্ত) হতে পারবে, তা না হলে কসাই। হে জীব হিংসা করা মানব! যেদিন এই কুকর্মের লেখা-জোখার হিসাব আল্লাহ তালা নেবেন, সেদিন কি উত্তর দেবেন? আরে, এত জুলুম (কুফ্র) করছো যে, গরু, ছাগল এবং অন্যান্য পশুদের মাথা কাটছো, পায়ের খুর কাটছো, তোমাদের কি এদের প্রতি কোনো দয়া (তড়স) আসে না। সন্ত গরীবদাস জী মহারাজ বলেছেন যে, ওই সতলোক নগরের (পুর) প্রতি আকর্ষণ কি হয় না, যেখানে সর্বদা মধুর ধ্বনি বাজে। এই দুনিয়া নরকে যাবে, কারণ তারা সদগুরু কবীর জীর অপমান করছে। যিনি সকলকে পাপ থেকে বাঁচাতে চান ও সকলকে সর্বদা সুখী দেখতে চান, তাঁকেই গালি দিচ্ছে আর বলছে যে, কবীর তাঁতী (জুলাহ) অপরাধী। এছাড়া দেবী-দেবতাদের বিষয়ে আলোচনা করে ইত্যাদি এছাড়া ওই ব্যক্তিরা অনেক অনেক কুবচন কবীর জীকে বলেন।

❖ রাগ বিলাবল থেকে শব্দ নং ২৪ :-

☆কর সাহিব কী বন্দগী, গফলত নহীঁ কীজৈ। অজাজীল কূঁ দেখ রে, অব কৌন পতিজৈ ॥টেক॥

অজাজীল ক্যোঁ বহ গয়া, কৈসে ঈরান্যা। যোজন সংখ সমাধি রে, তা পর অস্থানা ॥১॥ কিহীঁ সাহিব কী বন্দগী, ধর ধনী ধিয়ানা। বাণী বচন অদূল রে, এইসে ঈরান্যা ॥২॥ ব্রহ্মা, আদম, বিষ্ণু কূঁ, বহ মহল ন পাবৈ। অজাজীল কী সৈল কূঁ , দূজা কো ধ্যাবৈ ॥৩॥ গফলত উপর মার হৈ, সুন শব্দ সন্দেশা। অজাজীল কে সফর কূঁ, পৌঁহচে নহীঁ শেষা ॥৪॥ বন্দা কীনহাঁ নূর কা, হরি হুক্ম উপায়া। বিনা ধনী কী বন্দগী, দোজখ পৈঠায়া ॥৫॥ তন মন জাকা নূর কা, সব নূরী ফিরকা। কীনহা হুকম অদুল রে, সাঁঈ কে ঘর কা ॥৬॥ বে অদবী ভাবৈঁ নহীঁ, সাহিব কে তাঁহী। অজাজীল কী বন্দগী পল মাহীঁ বহাঈ ॥৭॥ হাড় চাম কা পুতলা, জা সে ক্যা কহিয়ে। বন্দা বহ গয়া নূর কা, অব চেতন রহিয়ে ॥৮॥ ঈরান্যাঁ বৌহডৈ নহীঁ, সাহিব কে ঘর কা। নহীঁ ভরোসা কীজিয়ে, ইস গন্দে নর কা ॥৯॥ অজরাইল ঠাঢা রহৈ, সাহিব কে আগৈ। অনন্ত লোক ব্রহ্মাণ্ড কী, বাণী অনুরাগৈ ॥১০॥ জবরাঈল জুবান পর, হাজির দরবানা।

অলহ তখত্ কী বন্দগী, নির্গুণ নির্বাণা ॥১১॥ মহকাঈল অশীল সুর, ধর সুষ্মণ ধ্যানা। গগন মণ্ডল কে মহল কুঁ, সো করত পিয়ানা ॥১২॥ অসরাফীল অলীল ভূমি, পর ধর হৈ ধ্যানা। নূর ঝিলমিল কর রহা, কাদর কুরবানা ॥১৩॥ চার মুব্বকিল রহত হৈঁ, ধর্মরায় দরবারী। য়ে হী সনক সনন্দনা, এ হী চার য়ারী ॥১৪॥ গরীবদাস গতি গর্ভ কী, কুছ লখৈ ন মাতা। দোহুঁ দীন ভিড় ভিড় মরৈঁ, বোহ এক কবীর বিধাতা ॥১৫॥২৪॥

❖ **ভাবার্থ :-** আধীন ভাব দ্বারা ভক্তি করে দেখো! অজাজীল ভক্তি তো করেছিল কিন্তু আধীনিভাব না হওয়ার কারণে, পরমাত্মা তার সব ভক্তি সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন। অজাজীল তার জীবনকালে এগারো অরব বার প্রণাম অর্থাৎ বন্দেগী করেছিল। এই শক্তির কারণেই কেবল বিষ্ণু লোকে গিয়েছিল। শ্রীবিষ্ণুর রূপ ধারণ করে কবীর সৎপুরুষ তাকে এক মানব সৃষ্টি করতে বললেন। অজাজীল বলল, নর ভবঃ। তখনই তার সামনে এক যুবক উৎপন্ন হল। পরমাত্মা বললেন, একে প্রণাম করো! অজাজীল বললো, এ তো আমার পুত্র, আমি পিতা হয়ে একে কি করে প্রণাম করবো? অনেকবার বলার পরেও অজাজীল মানেনি, তখন পরমাত্মা অজাজীলের সমস্ত ভক্তি নষ্ট করে দিলেন এবং পরে সে নরকে চলে গেল। এইজন্য বলা হয় যে, পরমাত্মার (নূর) ভক্তই (বান্দা) যখন ভুল করে ফেলল, তাহলে অন্য মানুষের আর কি ভরসা? অতএব ধ্যান দিয়ে ভক্তি করো আর অধিনী ভাব রাখো। {অজাজীলের সম্পর্কে লোকবেদ হল যে, সে শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত ছিল, এইজন্য বিষ্ণু লোকে গিয়েছে। বাস্তব হল এর বিপরীত। অজাজীল কাউকে ইষ্ট (প্রভু) মানতেন না। যে রকম সদগুরু বলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই কেবল বন্দগী অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম এবং রাম-রাম করতেন। পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব সকলকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেন। এই জন্য পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর জী, শ্রী বিষ্ণুর রূপ বানিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। অজাজীল শ্রী বিষ্ণুকে মানতেন যে, তিনি অমর প্রভু কিন্তু সেই ধারণা ছিল তো কেবল অজাজীলের আধ্যাত্ম অজ্ঞানের প্রতীক। সেই জন্যই পূর্ণব্রহ্ম কবীর জী শ্রী বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে অজাজীলের সাথে স্বর্গে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অজাজীল শ্রীরামকে নিরাকার শক্তি মানতেন। এই কারণে তার জন্যই পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু রূপ ধারণ করে পরীক্ষা নিয়েছিলেন।} মুসলমানরা বলেন যে "মেকাইল (মাইকেল), জিব্রাইল, অসরাফিল ও অজরাইল", এই চার ফেরেশতা আছে, যারা আল্লাহর কাছে থাকেন। তবে হিন্দুরা তাদেরকেই "সনক, সনন্দন, সনাতন ও সন্ত কুমার" বলেন। মুসলমানরা তাদেরকে চার ইয়ারি (সাথী) বলেন। সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন, গর্ভে পরমাত্মা সকল ধর্মের সন্তানদের একই রকম রেখেছেন। মাতা জানেন না যে, গর্ভে পুত্র আছে, না কন্যা, আছে হিন্দু, না মুসলমান? এর পরেও দুই ধর্মের ব্যক্তিরা ঝগড়া করে। তবে জানতে হবে সকলকেই সেই একই বিধাতা সৃষ্টি করেন।

খুদা কবীর চার যুগেই অবতীর্ণ হন ও লীলা করেন। সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করে, নিজের পরিচয় স্বয়ং নিজেই বলেন। নিজের নবী নিজেই সেজে আসেন। কাদির আল্লাহর গরীবদাস নামের এক রসূল কাদির খুদা কবীরের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন, নিম্নে এইপ্রকার :-

{রব কবীর চার যুগেই প্রকট হন। তবে প্রথম কলিযুগে প্রকটের বিষয়ে গরীবদাস মহারাজের দ্বারা বলা বাণী পড়ুন।}

কলিযুগে কাদির খুদার অবতরণ

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং. ৩৭৬-৩৮০ :-**

গরীব, চৌরাসী বন্ধন কটে, কিনী কল্প কবীর॥ ভবন চতুর্দশ লোক সব, টুটেঁ যম জঞ্জীর॥৩৭৬॥
গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মেঁ, বন্দী ছোড় কহায়। সো তো এক কবীর হৈ, জননী জন্যা ন মায়॥৩৭৭॥
গরীব, শব্দ স্বরূপ সাহিব ধনী, শব্দ সিন্ধ সব মাহীঁ। বাহর ভিতর রম রহ্যা, জহাঁ তহাঁ সব ঠাহীঁ॥৩৭৮॥
গরীব, জল থল পৃথিবী গগন মেঁ, বাহর ভীতর এক হৈঁ। পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর হৈ, অবিগত পুরুষ অলেখ॥৩৭৯॥
গরীব, সেবক হোয় কর উতরে, ইস পৃথিবী কে মাহীঁ। জীব উদ্ধারন জগতগুরু, বার বার বলি জাহীঁ॥৩৮০॥

❖ **ভাবার্থ :-** এই বাণীতে পরমাত্মা কবীর সাহেবের কলিযুগে অবতরণের সুন্দর বর্ণনা, এই প্রকার :-

❖ বাণী নং ৩৭৬ থেকে ৩৮০ -তে কবীর পরমাত্মার মহিমার বর্ণন রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, কবীর পরমেশ্বরই হলেন বন্দীছোড়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বন্দীছোড়ের নাম প্রসিদ্ধ। বন্দীছোড়ের অর্থ হল, বন্দীদের অর্থাৎ আসামীদের যিনি কারাগার থেকে মুক্তি দেন। আমরা সকল জীব কালের অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের জেলখানায় বন্দী (আসামী) হয়ে রয়েছি। এই বন্দীগৃহ থেকে কেবল কবীর পরমাত্মাই ছাড়াতে পারেন। এইজন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কবীর পরমাত্মাই হলেন একমাত্র বন্দীছোড়। কেবল কবীর পরমেশ্বরই আছেন, যাঁর জন্ম কোনো মাতার গর্ভে হয়নি। (৩৭৬)

❖ যারা কবীর পরমাত্মার শরণে আসেন, তাঁর কৃপায় তাদের চুরাশি লাখ যোনিতে যাওয়ার বন্ধন কেটে যায়। (কর্মের কারণে যে বন্ধন হয়, সেই পাপ কর্ম কবীর পরমাত্মার কৃপায় নষ্ট হয়ে যায়। সতনাম জপ করলে সেই পাপ সমাপ্ত হয়ে যায়।) (৩৭৭)

❖ কবীর পরমাত্মার অবিনাশী অর্থাৎ শাশ্বত রূপ (শব্দ স্বরূপী) আছে। তাঁর বচন শক্তি তো সমুদ্রের (শব্দ সিন্ধু) মতো

গভীর। জীব তো একটা তুম্বের (লাউয়ের খোল) মতো যা সমুদ্রে পড়ে রয়েছে। যার ভিতরেও জল ও বাইরেও জল থাকে (তবুও তা ডোবে না)। এইপ্রকার কাদির কবীরের শক্তির মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব রয়েছে। এইপ্রকার কবীর পরমাত্মাকে সর্বব্যাপক বলা হয়। কবীর জী হলেন পূর্ণব্রহ্ম এবং দিব্য অবর্ণনীয় পরমেশ্বর (অবিগত পুরুষ অলেখ)। (৩৭৮-৩৭৯)

❖ পরমাত্মা কবীর বেদে যে রকম লীলা করার মহিমা বর্ণিত রয়েছে, তিনি সেই অনুরূপ লীলা করেন। ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬-২০ এই প্রকার অনেক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা (কবির্দেব) অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, যিনি আকাশের শীর্ষস্থানে বিরাজমান আছেন। সেখান থেকে দ্রুত চলমান গতিতে আসেন এবং পবিত্র আত্মাদের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপদেশ (দীক্ষা) দেন। তিনি তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার কবীর বাণী (কবির্গির্ভিঃ) দ্বারা কবিতার মাধ্যমে (কাব্যেন) অর্থাৎ কবিদের মতো সাখী, শব্দ ও কবিতার ছন্দ দ্বারা বলে-বলে প্রচার করেন। যার কারণে তিনি কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবির উপাধি (কবিনাম পদবী) প্রাপ্ত করেন। যেমন পরমাত্মা কবীরকে "কবি" বলা হয়। পরমাত্মা কবীর পৃথিবীতে কবিদের মতো আচরণ করে বিচরণ করেন অর্থাৎ ঘুরে বেড়ান এবং পরমাত্মা কবীর নিজের বাণী নিজেই বলে, সকলকে ভক্তি করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। ভক্তির গুপ্ত নামের আবিষ্কার করেন। (৩৮০)

১৩৯৮ সালে যখন কবীর পরমাত্মা (কবির্দেব) স্বয়ং প্রকট হয়েছিলেন। ওই সময় সমস্ত ধর্মগ্রন্থের যথার্থ জ্ঞানকে তিনি লোকোক্তির (দোহা, ছন্দ, শব্দ, কবিতার) মাধ্যমে, সহজ-সরল, সাধারণ ভাষায় জনগণকে বলেছিলেন। ওই তত্ত্বজ্ঞানকে ওই কালের (সময়ের) সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দি ভাষার পণ্ডিতগণেরা বা জ্ঞাতারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, কবীর জী তো অশিক্ষিত। অতএব তাঁর দ্বারা বলা জ্ঞান ও তার মধ্যে যে ব্যবহৃত ভাষা রয়েছে, তা ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়।

যেমন- কবীর জী তাঁর বাণীর মধ্যে বলেছিলেন যে :-

কবীর, বেদ মেরা ভেদ হৈ, মৈঁ না বেদোঁ মাহীঁ। জৌণ বেদ সে মৈঁ মিলুঁ, য়ে বেদ জানতে নাহীঁ॥

ভাবার্থ :- পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড় বলেছেন যে, চারটি বেদ কেবল আমার সম্বন্ধেই জ্ঞান বলেছে কিন্তু এই চারটি বেদে বর্ণিত বিধি-নিয়ম দ্বারা আমাকে (পূর্ণব্রহ্মকে) প্রাপ্ত করতে পারবে না। যে বেদে (স্বসম অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেদে) আমাকে প্রাপ্ত করার জ্ঞান আছে, সেই সূক্ষ্মবেদের জ্ঞানের বিষয়ে, এই চার বেদের জ্ঞাতারা পরিচিত নয় অর্থাৎ জানে না। এই কথা শোনার পর তৎকালীন আচার্যরা তাচ্ছিল্য করে বলতেন, কবীরের তো ভাষার জ্ঞান নেই। (সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দি ভাষায় দুই প্রকারের "ব" আছে। এই প্রকার "ব" ও "ৰ" অক্ষরকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলতেন যে, দেখো "বেদ" না বলে এই প্রকার "বেদ" বলেন। কবীর তো নহী শব্দকে নাহী বলেন, এমন ব্যক্তির কি শাস্ত্রের জ্ঞান হতে পারে? অতএব কবীর মিথ্যা উপদেশ দেন, তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশ সমুল্লাস এগারো, ৩০৬ পৃষ্ঠায় কবীর সাহেবের সম্পর্কে এই প্রকার কথা বলেছেন।

পূর্ণ পরমাত্মা হলেন কবির্দেব। এর প্রমাণ যজুর্বেদ অধ্যায় ২৯ মন্ত্র ২৫ এবং সামবেদ সংখ্যা ১৪০০ -তেও রয়েছে, যা নিম্নে :-

যজুর্বেদের অধ্যায় নং. ২৯ শ্লোক নং. ২৫ (সন্ত রামপাল দাসের দ্বারা ভাষা-ভাষ্য) :-

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবন্যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ॥২৫॥

সমিদ্ধঃ-অদ্য-মনুষঃ-দুরোণে-দেবঃ-দেবান্-যজ্-অসি-জাতবেদঃ-আ-চ-বহ-
মিত্রমহঃ- চিকিত্বান্- ত্বম্ - দূতঃ-কবির্-অসি- প্রচেতাঃ

অনুবাদ :- (অদ্য) আজ অর্থাৎ বর্তমানে (দুরোণে) শরীর রূপ মহলে দুরাচার পূর্বক (মনুষঃ) মিথ্যা পূজায় মননশীল ব্যক্তিদেরকে (সমিদ্ধঃ) লাগিয়ে দেওয়া অগ্নি অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ছাড়া সাধনা অর্থাৎ বর্তমানের যে হানিকারক পূজা, সকল ধর্মের ব্যক্তিরা করছেন, ওই স্থানে (দেবান্) দেবতাদেরও (দেবঃ) দেবতা (জাতবেদঃ) পূর্ণ পরমাত্মা সতপুরুষের যে বাস্তবিক (যজ্) পূজা (অসি) আছে। (আ) দয়ালু (মিত্রমহঃ) জীবের প্রকৃত সাথী পূর্ণ পরমাত্মাই, তিনি তাঁর নিজের (চিকিত্বান্) সবল জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ ভক্তিকে (দূতঃ) সংবাদবাহক রূপে (বহ) নিয়ে আসেন (চ) এবং (প্রচেতাঃ) বোধ করিয়ে থাকা (ত্বম) আপনি (কবিরসি) কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর আছেন।

ভাবার্থ :- যে সময়ে পূর্ণ পরমাত্মা প্রকট হন, ওই সময় সর্ব মুনি-ঋষি ও সাধু পুরুষগণ শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে মনমত আচরণ অর্থাৎ সমস্ত ভক্ত সমাজকে যখন পূজা দ্বারা মার্গ দর্শন করাতে থাকেন, তখন আপনি (পূর্ণ পরমাত্মা) তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান দেওয়ার জন্য সন্দেশবাহক (দূত) হয়ে, স্বয়ংই কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু আপনিই আসেন।

সংখ্যা নং ১৪০০ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় নং. ১২, খন্ড নং. ৩, শ্লোক নং. ৫

(সন্ত রামপাল দাসের দ্বারা ভাষা-ভাষ্য)

ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যারুবসানো মহান্ কবিরনির্বচনানি শংসন্।

আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেবীতৌ ॥৫॥

ভদ্রা-বস্ত্রা-সমন্যা-বসানঃ-মহান্-কবির্-নিবচনানি-শংসন্-আবচ্যস্ব-চম্বোঃ- পুযমানঃ-বিচক্ষণঃ-জাগৃবি-দেব-বিতৌ

অনুবাদ :- (সম অন্যা) নিজের শরীরের মতো অন্য (ভদ্রা-বস্ত্রা) সুন্দর চোলা অর্থাৎ শরীর (বসানঃ) ধারণ করে (মহান্ কবির্) সামর্থবান কবির্দেব অর্থাৎ কবির পরমেশ্বর (নিবচনানি শংসন্) নিজ মুখকমল দ্বারা বাণী উচ্চারণ করে, যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলেন, যথার্থভাবে বা সঠিক বর্ণনা করেন। যার কারণে (দেব) পরমেশ্বরের (বিতৌ) ভক্তির লাভকে (জাগৃবিঃ) জাগৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন। (বিচক্ষণঃ) তথাকথিত বিদ্বানগণেরা, সত্য সাধনার পরিবর্তে (আ বচ্যস্ব) তারা নিজেদের কথিত বচন দ্বারা (পূয়মানঃ) মিথ্যা উপাসনা অর্থাৎ শাস্ত্রের বিপরীত সাধনা রূপী পুঁজকে (চম্বোঃ) আচমন করিয়ে রেখে দিয়েছেন অর্থাৎ ভুল জ্ঞান বলে রেখেছেন।

ভাবার্থ :- যেমন যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ -তে বলা হয়েছে যে, "অগ্নেঃ তনুঃ অসি" = পরমেশ্বর সশরীরে আছেন। "বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তনুঃ অসি" = ওই অমর প্রভুর পালন পোষণ করার জন্য অন্য শরীর আছে, যা অতিথি রূপে কয়েক দিনের জন্য এই সংসারে আসেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানে ঘুমিয়ে থাকা প্রভুপ্রেমীদের জাগান। তারই প্রমাণ এই মন্ত্রতে রয়েছে যে, কিছু সময়ের জন্য পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর নিজের রূপ পরিবর্তন করে, সামান্য ব্যক্তির রূপ ধারণ করে, পৃথিবী মণ্ডলে প্রকট হন। 'কবিরনির্বচনানি শংসন্ অর্থাৎ কবির্বাণী বলেন', যে বাণীর মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানকে জাগান এবং ওই সময় যে সকল মহর্ষি বলা চতুর (চালাক) প্রাণী, মিথ্যা জ্ঞানের আধারে শাস্ত্র বিধি অনুসার সত্য সাধনা রূপী অমৃতের স্থানে, শাস্ত্রবিধি রহিত পূজা রূপী পুঁজকে শ্রদ্ধার সাথে আচমন করাতে থাকে অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ পূজা করাতে থাকে। ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মা (কাদির খুদা) স্বয়ং প্রকট হয়ে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনার জ্ঞান প্রদান করেন।

পবিত্র ঋকবেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিতেও পরিচয় বলা হয়েছে যে, যখন ওই পূর্ণ পরমাত্মা (কাদির খুদা) কিছু সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে লীলা করতে আসেন, তখন তিনি শিশু রূপ ধারণ করেন। ওই পূর্ণ পরমাত্মার পালন-পোষন কুমারী গরুর বা বকনা বাছুর (অধন্যা ধেনবঃ) দ্বারা হয়। পরে লীলা করতে করতে বড় হন, তারপর নিজেকে প্রাপ্ত ও সত্যলোক যাওয়ার অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষের তত্ত্বজ্ঞান (কবির্গির্ভিঃ) কবীর বাণী দ্বারা কবিতার মাধ্যমে বলেন, যার কারণে তাঁকে বিখ্যাত কবি বলা হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং কবির্দেব পূর্ণ পরমাত্মাই হন, যিনি তৃতীয় মুক্তিধাম সতলোকে থাকেন।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ১ মন্ত্র ৯ এবং সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ :-

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ১ মন্ত্র ৯

অভী ইমং অধন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥৯॥

অভী ইমম্-অধন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্ সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে।

অনুবাদ :- (উত) বিশেষ করে (ইমম্) এই (শিশুম্) বালক রূপে প্রকট (সোমম্) পূর্ণ পরমাত্মা অমর প্রভুর (ইন্দ্রায়) সুখ সুবিধা দ্বারা অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার দ্বারা যে শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তা (পাতবে) বৃদ্ধির জন্য (অভী) পূর্ণ রূপে (অধন্যা ধেনবঃ) কুমারী গরুর দ্বারা অর্থাৎ যে কুমারী গরুকে কখনও কোনো ষাঁড় সংস্পর্শ করেনি, সেই গরুর দুধ দ্বারা (শ্রীণন্তি) পালিত করা হয়।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা অমর পুরুষ যখন লীলা করার জন্য বালকরূপ ধারণ করে স্বয়ং প্রকট হন, ওই সময় তাঁর পালন-পোষণ এক কুমারী গরু অর্থাৎ বকনা বাছুর দ্বারা হয়, যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুধ দেয়, যার দ্বারা ওই পূর্ণ প্রভুর লালন-পালন হয়। দেখুন নিম্নের ফোটোকপি, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯, সূক্ত ১, মন্ত্র ৯ -তে যার অনুবাদ আর্য সমাজীরা করেছেন :-

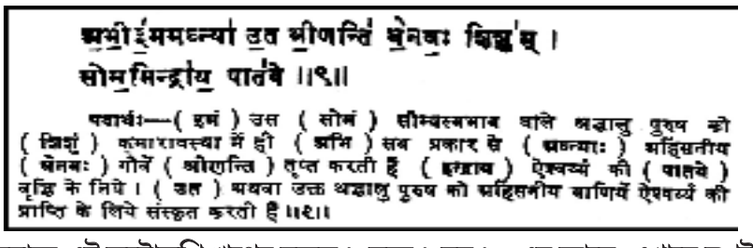
अभी इमम्मधन्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् ।
सोममिन्द्राय पातवे ॥९॥

पदार्थः—(इमं) उस (सोमं) सौम्यस्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को (शिशुं) कुमारावस्था में ही (अभि) सब प्रकार से (अधन्याः) अहिंसनीय (धेनवः) गौवें (श्रीणन्ति) तृप्त करती हैं (इन्द्राय) ऐश्वर्य की (पातवे) वृद्धि के लिये । (उत) अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणियें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये संस्कृत करती हैं ॥९॥

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত এই ফটোকপি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ১ মন্ত্র ৯ -এর আছে, এখানে স্পষ্ট আছে যে, (সোম)

অবিনশ্বর পরমাত্মা যখন শিশু রূপে প্রকট হন, তখন তাঁর লালন- পালনের লীলা কুমারী গরুর অর্থাৎ বকনা বাছুর (অভি অধন্যা ধেনুবঃ) দ্বারা হয়। এই প্রমাণ পবিত্র কবির সাগরের অধ্যায় "জ্ঞান সাগর" তে রয়েছে যে, পরমেশ্বর কবীরকে তাঁর পালিত মাতা-পিতা নীরু-নীমা নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন শিশু রূপধারী কবীর পরমাত্মা কোনো কিছুই আহার করেননি, না অন্ন খেলেন, না দুধ পান করলেন। পরে রামানন্দ স্বামীর পরামর্শে এক কুমারী গরুকে অর্থাৎ বকনা বাছুর পিতা নীরু আনলেন, ওই সময় সেই কুমারী গরু দুধ দিতে লাগল। ওই কুমারী গরুর দুধ দ্বারা পরমাত্মার লালন-পালনের লীলা শুরু হয়েছিল। কবীর সাগর কমপক্ষে প্রায় ৬০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ১ মন্ত্র ৯ - এর অনুবাদে কিছু ভুল আছে। যেমন, (অভিঅধন্যা)- এর অর্থ অহিংসনীয় করে দিয়েছে, যা ভুল অর্থ করা হয়েছে। এই লেখকের জন্ম হরিয়ানা রাজ্যের রোহতক জেলার ধনানা গ্রামে হয়, যা বর্তমানে সোনিপত জেলায় অবস্থিত। এই প্রদেশে যে গরু গর্ভধারণ করেনি, তাকে বলা হয় যে, এ গরু ধনাইনি বা এটি বিনা ধনাই রয়েছে। এটি অপভ্রংশ শব্দ। একটি গরুর জন্য "অঘ্নি" শব্দ ব্যবহার করা হয় আর বহুবচনের জন্য "অধন্যা" শব্দ ব্যবহার হয়। অতএব "অধন্যা"-র অর্থ হল বিনা ধনাই গরু, অভিধন্যা এর অর্থ হল পূর্ণরূপে বিনা ধনাই অর্থাৎ কুমারী গরু অর্থাৎ বকনা বাছুর।

পারখের অঙ্গের বাণী নং. ৩৮০-তে বলা হয়েছে যে :-

গরীব, সেবক হোয় কর উতরে, ইস পৃথিবী কে মাহীঁ।
জীব উধারন জগতগুরু, বার বার বলি জাহীঁ ॥৩৮০॥

পরমাত্মা কবীর সাহেব দাস হয়ে (সেবকের রূপ ধারণ করে) উপরের আকাশে নিজের নিবাস স্থান সতলোক থেকে দ্রুত গতিতে পৃথিবীর উপর নেমে আসেন। উদ্দেশ্য বলেন যে, জীবগণকে কালের জাল থেকে উদ্ধার করার জন্য জগৎগুরু রূপে আসেন। আমি (সন্ত গরীবদাস মহারাজ) আমার সদগুরুর কবীরের পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) জন্য বার বার নিজেকে বলি চড়াতে (উৎসর্গ করতে) পারি।

"পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) কবীর সাহেবের কাশীর এক জঙ্গলে লহরতারা নামের সরোবরে পদ্মফুলের উপর আবির্ভূত হওয়ার বর্ণন"

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং ৩৮১-৩৮৪ :-**

গরীব, কাশী পুরী কস্ত কিয়া, উতরে অধর অধার।
মোমিন নীরু কুঁ মুজরা হুয়া, জঙ্গল মেঁ দীদার ॥৩৮১॥
গরীব, কোটি কিরণ শশী ভান সুধাঁ, আসন অধর বিমান।
পরসত পূর্ণ ব্রহ্ম কুঁ, শীতল পিন্ড রূ প্রাণ ॥৩৮২॥
গরীব, গোদ লিয়া মুখ চুম কর, হেম রূপ ঝলকন্ত। জগর মগর কায়া করৈ, দমকৈঁ পদম অনন্ত ॥৩৮৩॥
গরীব, কাশী উমটী ভুল ভয়া, মোমিন নিরু কা ঘর ঘের। কোঈ কহৈ ব্রহ্মা বিষ্ণু হৈঁ , কোঈ কহৈ ইন্দ্র কুবের ॥৩৮৪॥

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী. ৩৮১-৩৮৪ এর সরলার্থ :-**

"কলিযুগে কবীর পরমেশ্বরের (কাদির খুদার) অবতরণ"

লেখকের ভাষায় :- বন্দী ছোড় কবীর পরমেশ্বর (কবীর আল্লাহ) তাঁর প্রিয় শিষ্য সুদর্শন বাল্মীকিকে দ্বাপর যুগে শরণে নিয়েছিলেন। ভক্ত সুদর্শনের পিতা-মাতা কবীর পরমেশ্বরের জ্ঞানকে স্বীকার করেননি। তাঁর পিতার নাম "ভীখু রাম" এবং মাতার নাম "সুখবন্তী"। যে সময়ে দুইজন (মাতা ও পিতা) শরীর ত্যাগ করেন, ওই সময় থেকে ভক্ত সুদর্শন খুবই বিচলিত থাকতে লাগলেন, ভক্তিও কম করতেন। অন্তর্যামী করুণাময় (দ্বাপর যুগে কবীর পরমেশ্বর, করুণাময় নামে লীলা করছিলেন) তাঁর প্রিয় ভক্তের মনের কথা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভক্ত সুদর্শন! কি দুশ্চিন্তার কারণে তুমি উদ্বিগ্ন? পিতা-মাতার বিয়োগের দুশ্চিন্তাতে উদ্বিগ্ন রয়েছ? নাকি অন্য কোনো পারিবারিক সমস্যা? আমাকে খুলে বলো।

ভক্ত সুদর্শন বললেন, বন্দীছোড়! হে অন্তর্যামী! আপনি সর্বজ্ঞ, বাইরের ও ভিতরের সবকিছুর স্থিতির বিষয়ে আপনি পরিচিত আছেন। হে প্রভু! আমি আমার পিতা-মাতার মৃত্যুতে শোক করছি না, কারণ তাঁরা খুবই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন যে, পাঁচতত্ত্বের এই পুতুল একদিন নষ্ট হয়েই যাবে। আমাকে কেবল এই বিষয়টি ভীষণ ভাবে উদ্বিগ্ন করছে যে, আমার পিতা-মাতা খুবই পুণ্যাত্মা ছিলেন, দয়ালু ও ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন কিন্তু তাঁরা যে সব ভক্তি করেছিলেন, তা লোকবেদ অনুসারে এবং যা শাস্ত্র বিধির বিরুদ্ধ ছিল। যার কারণে তাদের দুর্লভ মানব জীবনকে তাঁরা বৃথাই নষ্ট করে চলে গেলেন। এখন জানি না তাঁরা কোন প্রাণীর যোনি প্রাপ্ত করে কষ্ট পাবেন। হে পরমাত্মা (আল্লাহ)! আপনার কাছে এই দাসের বিনীত নিবেদন যে, আমার পিতা-মাতা কোনো জন্মে কখনও যদি মানব

শরীর প্রাপ্ত করেন, তাহলে আপনি তাঁদেরকে আপনার আশ্রয়ে অবশ্যই যেন নিয়ে নেন, পরমাত্মা এবং তাঁদেরকেও ভবসাগর (কালব্রহ্মের লোক) থেকে পার করে দেবেন দাতা! এই দুশ্চিন্তাই আমাকে সর্বদা ব্যাকুল করছে। পরমেশ্বর (আল্লাহ) কবীর ভাবলেন, এই ভোলা-সরল ভক্ত সুদর্শন তো পিতা-মাতার মায়াতে ফেঁসে, কালের জালেই রয়ে যাবে। কাল ব্রহ্ম এখানে এইরূপ মোহরূপী ফাঁদ খুব শক্ত করেই তৈরি করে রেখেছেন। এই বিচার করে পরমেশ্বর কবীর বললেন, হে ভক্ত সুদর্শন! তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমার পিতা - মাতাকে অবশ্যই শরণে নিয়ে, তাঁদের উদ্ধারও করে দেব। তুমি এখন চিন্তা ছেড়ে সত্যলোকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নাও ও সতভক্তিতে মন লাগাও। পরমাত্মা কবীর সাহেবের এই প্রকার আশ্বাসন পেয়ে, ভক্ত সুদর্শন দৃঢ় হয়ে সত্য ভক্তি করার পরে সত্যলোকে চলে গিয়েছিলেন, পূর্ণমোক্ষ প্রাপ্ত করেছিলেন।

"ভক্ত সুদর্শনের পিতা-মাতার আত্মাদের, পরবর্তী কলিযুগে অন্য মানব জন্মের প্রাপ্তির বিবরণ"

ভক্ত সুদর্শনের পিতামাতা প্রথমবার জন্ম নিয়েছিলেন, কুলপতি ব্রাহ্মণ (পিতা) এবং মহেশ্বরী (মাতা) নামে। দুজনের বিবাহ হয়েছিল কিন্তু সন্তান হয় নি। একদিন মহেশ্বরী সূর্যের পূজা করার সময় দুই হাত ফেলে পুত্রের কামনা করছিলেন। ওই সময় কবীর পরমেশ্বর (কবীর আল্লাহ) বালক শিশু রূপে তার হাতের উপরই প্রকট হলেন। হঠাৎ এই চমৎকার দেখে ভেবে নিয়েছিলেন যে, সূর্য দেব এই পুরস্কার (পুত্র রূপী উপহার) দান করেছেন। এই মনে করে তারা শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারা খুবই গরীব থাকার কারণে পরমাত্মা প্রতিদিন এক তোলা করে সোনা, বিছানার নিচে রেখে দিতেন। এই চমৎকারকেও তাঁরা সূর্যদেবের কৃপা ভাবলেন। পুত্রের বয়স যখন পাঁচ বছর হল, তখন থেকে তাঁদেরকে (মাতা-পিতাকে) সত্য ভক্তির বিষয়ে বলতেন কিন্তু তাঁকে বালক ভেবে তাঁর একটি কথাও বিশ্বাস করলেন না। ওই জন্মে তাঁরা পরমাত্মাকে অর্থাৎ কাদির আল্লাহকে চিনতে পারেননি। যার কারণে পরমেশ্বর কবীর বালক রূপেই অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুত্রের মোহে ব্যাকুল হতে লাগলেন। পূর্ব জন্মে বালক রূপী পরমাত্মার সেবা করার কারণে, পরবর্তী জনমেও ওই মাতা-পিতার পুনরায় মানব জন্ম প্রাপ্ত হল। এই দ্বিতীয় জনমে চন্দবারা নামক এক শহরে ব্রাহ্মণ কুলে ওই পিতা জন্ম নিলেন চন্দন নামে এবং মাতা জন্ম নিলেন উদ্ধা নামে। এই জনমেও দুজনে নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন উদ্ধা সরোবরে স্নান করতে গেলেন। সেখানে কবীর পরমেশ্বর অর্থাৎ কবীর আল্লাহ শিশুর রূপ ধারণ করে একটি পদ্মফুলের উপর বিরাজমান হলেন। উদ্ধা বালক কবীরকে পদ্ম ফুল থেকে তুলে বাড়িতে নিয়ে গেলেন কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে ও বংশের লোকেদের ঠাট্টার ভয়ে চন্দন তার স্ত্রীকে বললেন যে, শিশুটিকে পুনরায় ওই স্থানে রেখে এসো যেখান থেকে এনেছিলে। তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মিলে ওই সরোবরের পানিতে বালক পরমাত্মাকে ফেলতে গেলেন। এরমধ্যে হঠাৎ তাঁদের হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে দুজনেই খুব ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পরমাত্মার পুরস্কার (উপহার) গ্রহণ না করার ভয়ে, সারাজীবন অনুতপ্ত হয়ে তাঁরা কাঁদতে থাকলেন।আগামী জন্মও মানব জনম প্রাপ্ত হয়েছিল। সেটি এই প্রকার :-

ভক্ত সুদর্শন বাল্মীকের মাতা-পিতার আত্মাদের (রূহদের) কলিযুগে তৃতীয়বার মানব জন্ম প্রাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের কাশী শহরে সুদর্শনের পিতার আত্মা (রূহ) গৌরী শঙ্কর নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন এবং সুদর্শনের মাতার আত্মা কন্যা রূপে সরস্বতী নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। যুবক-যুবতী হতেই দুজনের বিবাহ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ গৌরী শঙ্কর ছিলেন ভগবান শিবের ভক্ত, তাই শিব পুরাণ থেকে শিবের মহিমার গুণগান করে সকলকে শোনাতেন। তবে গৌরীশংকর লোভী ছিলেন না। ভগবান শিবের গুণগান করে যে ধন উপার্জন করতেন, তা দিয়ে সকলকে ভাণ্ডারা (ভোজন) করিয়ে দিতেন এবং নানা ধার্মিক কাজে লাগিয়ে দিতেন। যা আয় হতো, তা কেবল ধর্ম কর্মেই বিনিয়োগ করতেন আর যারা গৌরী শঙ্করকে দিয়ে পাঠ করাতেন এবং যারা তাঁর সৎসঙ্গ শুনতেন, সকলেই গৌরী শংকরের ত্যাগের প্রশংসা করতেন।

যার কারণে গৌরী শঙ্কর, সমগ্র কাশীতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণে অন্য স্বার্থপর ব্রাহ্মণ যারা পাঠ করে শোনাতেন কেবল ধন উপার্জনের জন্য, তাদের ওই উপার্জন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। এই কারণে ওই ব্রাহ্মণরা গৌরীশঙ্করের প্রতি ঈর্ষা করতে লাগল। গৌরীশঙ্করের বিষয়ে কিছু মুসলমানরা জানতে পারল যে, গৌরীশঙ্কর নামের ব্রাহ্মণ যিনি সক্রিয়ভাবে কাশীতে হিন্দু ধর্মের প্রচার করছে। তাই এটা কিভাবে বন্ধ করা যায়? তার রাস্তা মুসলমানরা খুঁজতে লাগল। তবে এ কথাও জেনে গেল যে, কাশীর বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ গৌরীশঙ্করের প্রতি ঈর্ষা রাখে। এই কারণে মুসলমানরা তারই সুযোগ নিয়ে, একদিন গৌরীশঙ্করের বাড়ির ভিতরে ঢুকে তাঁদের মুখের এঁঠো জল ছিটিয়ে দিলো। কাপড়েও এঁঠোপানি ছিটিয়ে, চিৎকার করে সকলকে জোরে জোরে বলতে লাগল, গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতী মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে গৌরীশঙ্করের নাম নুর আলি ওরফে নীরু এবং সরস্বতীর নাম নিয়ামত ওরফে নিমা রাখা হল। যখন অন্যান্য স্বার্থপর ব্রাহ্মণরা এই বিষয়টি জানল, তখন যেন তাদের আর খুশির ঠিকানা রইল না। তারা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদের এক পঞ্চায়েত ডেকে সিদ্ধান্ত নিল যে, গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতী মুসলমান হয়ে গিয়েছে, এইজন্য এখন থেকে

তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের কোনো সম্পর্ক রইল না আর আজ থেকে এঁদেরকে গঙ্গায় স্নান করা, মন্দিরে যাওয়া এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ। এইভাবে তাঁদের উপর ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দিল।

এই কথা শুনে গৌরীশঙ্কর (নীরু) ও সরস্বতী (নিমা) দুঃখ পেয়ে কয়েক দিন যাবৎ খুবই দুশ্চিন্তায় রইলেন। পাঠ করে যে ধন উপার্জন হতো, তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ এতদিন চলছিল, তা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ঘরে অভাব এসে গেল। তাই নীরু ভাবনা চিন্তা করে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাপড় বোনার কাজ শুরু করলেন। যার কারণে সবাই তাকে তাঁতি (জুলাহ) বলে জানতে লাগল। কাপড় বুনে যে ধন প্রাপ্ত করতেন, তা দিয়ে তিনি নিজের পেট ও তার স্ত্রীর পেট চালাতে লাগলেন আর যে সময় ধন অধিক হতো, তখন সেই ধনও কোনো ধর্ম কর্মে লাগিয়ে দিতেন। বিয়ের অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সন্তান ধারণের জন্য অনেক অনুষ্ঠান করেছেন এবং সাধু মহন্তদের অনেক আশীর্বাদও নিয়েছেন কিন্তু তবুও তাদের কোনো সন্তান লাভ হয়নি। হিন্দু ব্রাহ্মণরা এঁদের দুজনকে গঙ্গা নদীতেও স্নান করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, গঙ্গা নদী তাঁদের নিবাস স্থান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ছিল। সেখানে লহর তারা নামক এক সরোবরও ছিল, সেই সরোবরে গঙ্গা নদীর জল, ঢেউয়ের মাধ্যমে এসে পড়ত, তাই এই সরোবরের নাম লহরতারা হয়। ওই সরোবরে বড় বড় পদ্মফুল ফুটত। মুসলমানরা গৌরী শঙ্করের নাম নূর অলী অর্থাৎ নীরু এবং তাঁর স্ত্রীর নাম নিয়ামত অর্থাৎ নিমা রেখে দিয়েছিল। সেই থেকে এই নামেই সকলে ডাকতে লাগল। নীরু-নিমা যদিওবা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও মন থেকে তাঁরা ভগবান শঙ্করকে ভুলতে পারেননি। তাই মনে মনে শঙ্কর ভগবানেরই সাধনা করতেন এবং প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে লহরতারা সরোবরে গিয়ে স্নান করে আসতেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বিক্রমী সংবত ১৪৫৫ (১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার ব্রহ্ম মুহূর্তে (ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় হয় সূর্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্বে), একদিন যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তখন পথে যেতে যেতে নিমা শঙ্কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছিলেন যে, হে দীননাথ! তুমি তোমার এই দাসদের কেবল একটি পুত্র সন্তান প্রদান করুন। আপনার ঘরে কি কিছু কম আছে, প্রভু! এক সন্তান প্রদান করলে আমাদের জীবন সফল হয়ে যেত। এই সংসারের মানুষের কটাক্ষ শুনতে শুনতে আমরা খুবই দুঃখী হয়ে গিয়েছি। হে দাতা! এই পাপীদের দ্বারা কি কোনো জনমে, এমন কোনো ভুল হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে সন্তানের মুখ দেখার জন্য আজ আমাদের এত ব্যাকুল হয়ে থাকতে হচ্ছে। পূর্ব জন্মে আমাদের দ্বারা কোনো পাপ যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই পাপকে ক্ষমা করে দেন প্রভু! কৃপা করে আমাদের একটি মাত্র পুত্র প্রদান করুন, প্রভু!

এই বলে নিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নিমাকে এইভাবে কাঁদতে দেখে নীরু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে নিমা! আসল কথা হল, আমাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান নেই, আমাদের ভাগ্যে যদি কোনো সন্তান থাকত, তাহলে ভগবান শিব অবশ্যই প্রদান করতেন। তুমি কেঁদে কেঁদে আর চোখ নষ্ট করো না। আমাদের ভাগ্যে মনে হয় সন্তান নেই, যে বৃদ্ধ বয়সে আমাদেরকে সাহায্য করবে। তোমার এত কান্না আর আমি দেখতে পারছি না। এই বলে নীরুর চোখও জলে ভরে গেল। এইভাবে প্রভুর চর্চা ও বালক প্রাপ্তির কথা বলতে বলতে, তাঁরা সেই লহরতারা সরোবরে পৌঁছে গেলেন। প্রথমে নিমা জলে নামলেন, তারপর নীরু পানিতে নেমে গোসল (স্নান) করতে লাগলেন। এদিকে ভোরের আলো বেরিয়ে, অন্ধকার একটু একটু করে কাটতে লাগল। নিমা যখন গোসল (স্নান) করছিলেন, ওই সময় সামান্য অন্ধকারও ছিল। যে সময় নিমা কাপড় বদল করে, ভেজা কাপড় ধুতে গেলেন, ওই সময় নীরু পুকুরের জলে প্রবেশ করে, হাত দিয়ে রগড়ে-রগড়ে শরীর পরিষ্কার করছিলেন।

এরই মধ্যে নিমার দৃষ্টি এক পদ্ম ফুলের উপর পড়ল, কারণ সেখানে তিনি কিছু নড়াচড়া করতে দেখলেন। প্রথমে নিমা ভেবে নিয়েছিলেন যে, হয়তো সাপ হবে, সাপ তো আমার স্বামীকে দংশন করতে পারে কিন্তু যখন ধ্যান পূর্বক দেখলেন, তখন দেখলেন যে, সাপ নয় এতো একটি ছোট্ট শিশু। যে শিশু পদ্ম ফুলের উপর শুয়ে নিজের একটি পায়ের বৃদ্ধ আঙুল মুখে নিয়ে চুষছিলেন আর অন্যটি নাড়াচ্ছিলেন। ওই বাচ্চা যাতে জলে ডুবে না যায়, সেই কারণে নিমা তার স্বামীর উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন, দেখো! দেখো! ওই পদ্ম ফুলের উপর এক ছোট শিশু শুয়ে রয়েছে, সে যেন পানিতে ডুবে না যায়। নীরু তখনও গোসল করছিলেন। নিরু শিশুটির দিকে না তাকিয়ে বললেন, নিমা! তুই সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করতে করতে তো পাগল হয়ে গিয়েছিস, এইজন্য তুই পানিতেও বাচ্চা দেখতে শুরু করে দিয়েছিস। নিমা উচ্চস্বরে বললেন যে, আমি সত্যি করে বলছি, ওই পদ্মফুলের উপর একটা বাচ্চা শিশু রয়েছে, তুমি একবার তাকিয়ে তো দেখো! ওই দেখো! নিমার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ও অধিক আকর্ষণ দেখে, নীরু সেইদিকে তাকালেন, যেদিকে নিমা হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন। পদ্ম ফুলের উপর সদ্য নবজাত শিশুটিকে দেখে, নীরু না এদিক দেখলেন না ওদিক দেখলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদ্মফুল সহ ওই শিশুটিকে এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন।

নিমা শিশুরূপী কবীর পরমেশ্বরকে (কাদির আল্লাহকে) প্রাপ্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন

এবং তাঁকে নিজের পুত্রের মতোই ভালোবাসতে লাগলেন। যে পরমেশ্বরের খোঁজে মুনি-ঋষিরা সাধু সন্তগণ সারা জীবন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করে, যাঁকে খুঁজে পান নি, সেই পরমেশ্বর এই ভক্তিমতী নিমার কোলে খেলছিলেন। যে শান্তিদায়ক পরমেশ্বরের আনন্দ প্রাপ্তি করার আকাঙ্ক্ষায় সাধনা করা হয়, সেই পরমেশ্বর নিমার হাত দ্বারা তাঁরই বুকে জড়িয়ে ছিলেন। ওই সময় যে শীতলতা ও আনন্দিত অনুভব ভক্তিমতী নিমা করছিলেন, হয়তো তার কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। এরপর নীরু স্নান করে জল থেকে বেরিয়ে এলেন। নীরু ভাবলেন, যদি এই শিশুটিকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে শহরের লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহ করে ভাববে যে, আমরা হয়তো অন্যের বাচ্চা চুরি করে এনেছি। এই কারণে আমাদের শহর থেকে বের করেও দিতে পারে। এই ভয়ে নীরু তার স্ত্রী নিমাকে বললেন! এই শিশুটিকে এখানে রেখে যাওয়াই আমাদের পক্ষে ভালো হবে। নিমা বললেন, হে স্বামী দেব! এটি ভগবান শঙ্করের প্রদান করা একটি খেলনা। এই শিশুটি জানিনা আমার উপর কি যাদু করে দিয়েছে যে, আমার মন এই শিশুর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। আমি এই বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। নিরু নিমাকে তার মনের কথা জানিয়ে বললেন, নগরবাসীরা আমাদের কাছ থেকে এই শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে তারা জিজ্ঞেস করবে যে, এই বাচ্চা কোথা থেকে নিয়ে এসেছো? তখন আমরা যদি বলি, লহরতারা সরোবরে পদ্ম ফুলের উপরে পেয়েছি, তাহলে আমাদের কথা তারা কেউই বিশ্বাস করবে না। এমনকি তারা আমাদের শহর থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে। নিমা বললেন, এই শিশুকে নিয়ে এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে রাজি আছি কিন্তু শিশুটিকে ত্যাগ করতে আমি রাজি নই। আমি মরতেও রাজি আছি কিন্তু এই শিশু থেকে দূরে সরে থাকতে আমি রাজি নই।

নিমাকে এইভাবে একগুঁয়েমি করতে দেখে নীরু রেগে গিয়ে, যখন থাপ্পড় মারার উদ্দেশ্যে হাত তুলতে গেলেন, তখন ক্রন্দনস্বরে চোখে জল ভরে নীরু বললেন, নীমা! আজ পর্যন্ত তোর একটি কথাও কখনও আমি প্রত্যাখ্যান করিনি, কারণ আমাদের কোনো সন্তান নেই। এই জন্য আমি তোকে স্বামী ও পিতা উভয়ের আদর ও ভালোবাসা দিয়েছি। তুই আমার নম্র স্বভাব দেখে অযথা লাভ ওঠাস না। আজ আমার স্থিতি না বুঝে তুই তোর একগুঁয়েমী স্বভাবের কারণে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস। নীরু তার দাম্পত্য জীবনে, প্রথমবার স্ত্রীকে চড় মারার জন্য হাত উঠিয়েছিলেন। নীরু বললেন, এই বাচ্চাকে এখানে রেখে দাও, নয়তো আজ আমি তোকে মারতে বাধ্য হব।

ওই সময় নিমার বুকে আঁকড়ে ধরে থাকা বালকরূপী শিশু পরমেশ্বর বললেন, হে নীরু! আপনি আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে চলুন, আপনার কোনো আপত্তি আসবে না। আমি সতলোক থেকে তোমাদের কল্যাণের জন্য দ্রুত গতিতে এখানে এসেছি। নবজাতক শিশুর মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে নীরু (নূর আলী) ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলেন যে, এই শিশু কি কোনো দেবতা বা পিতর কিংবা কোনো সিদ্ধ মহাপুরুষ তো নয়? আমার বাড়িতে না নিয়ে গেলে আমাকে অভিশাপ না দিয়ে ফেলে, এই ভয়ে নীরু কিছু না বলে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। পিছনে পিছনে তাঁর স্ত্রী পরমাত্মা অর্থাৎ কাদির আল্লাহকে আদর করতে করতে চলতে লাগলেন।

প্রতিদিনের ন্যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা বিক্রমী সংবত ১৪৫৫ (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) সোমবারে, অষ্টানন্দ নামক এক ঋষি, যিনি বিখ্যাত রামানন্দ ঋষির শিষ্য ছিলেন। তিনি কাশী শহরের বাইরে লহরতারা সরোবরের স্বচ্ছ জলে স্নান করার জন্য, প্রতি দিনের মতো গিয়েছিলেন। ব্রহ্ম মুহুর্তের সময় ছিল (ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় সূর্যোদয়ের থেকে দেড় ঘণ্টা আগে হয়ে থাকে), অষ্টানন্দ ঋষি লহরতারা সরোবরে স্নান করলেন এবং প্রতিদিনের মতো তিনি ওই সরোবরের তীরে বসে কিছু সময় পাঠ পূজা করলেন। যখন তিনি ধ্যান করার চেষ্টা করছিলেন, ওই সময় আকাশ হতে এক আলোর প্রকাশ পুঞ্জ নেমে আসতে দেখলেন। সেটি এমন তেজ উজ্জ্বল আলো ছিল যে, ঋষি চর্ম দৃষ্টিতে তা সহ্য করতে পারলেন না। যেমন সূর্যের আলো সহ্য করতে পারা যায় না। সূর্যের প্রকাশ দেখার সময় যেমন চোখ বন্ধ করার পর, সূর্যের আকার দেখা যায়, তাতে তেমন তেজ প্রকাশ থাকে না।

এইপ্রকার প্রথমবার পরমেশ্বরের প্রকাশ পুঞ্জ দেখে ঋষি অষ্টানন্দ চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ চোখে এক শিশুরূপকে দেখে চোখ খুলে দিলেন। ঋষি দেখলেন ওই প্রকাশ লহরতারা সরোবরে নেমে গেল। যার ফলে সম্পূর্ণ সরোবর আলোকিত হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আলো জলাধারের এক কোণায় গিয়ে মিলিয়ে গেল। ঋষি অষ্টানন্দ ভাবতে লাগলেন, আমি এ কী ধরনের দৃশ্য দেখলাম? এটা কি আমার ভক্তির উপলব্ধি, না কি আমার কোনো দৃষ্টিদোষ ছিল? এই বিষয়ে আমি আমার গুরুদেব রামানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করব। এই চিন্তা করে ঋষি অষ্টানন্দ বাকী সাধনা ত্যাগ করে দিলেন। তারপরে তার পূজ্য গুরুদেব রামানন্দ স্বামীর নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন যে, হে গুরুদেব! এটা কি আমার ভক্তির উপলব্ধি, না আমার কোনো ভ্রম ছিল? আমি আকাশ থেকে এক প্রকাশ নেমে আসতে যখন দেখলাম, তখন আমার চোখ সেই প্রকাশ সহ্য করতে পারিনি। আমার চোখ বন্ধ হতেই একটি নবজাতক শিশু দেখতে পেয়েছিলাম আর যখন চোখ খুললাম তখন দেখলাম, সম্পূর্ণ জলাশয় আলোকিত হয়ে ভরে গিয়েছে। পরে সেই প্রকাশ পুকুরের এক কোণায় গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি আপনার কাছে এর কারণ জানার ইচ্ছায় সাধনা

মাঝখানে ছেড়ে এসেছি। কৃপা করে আমার শঙ্কার সমাধান করুন।

ঋষি রামানন্দ স্বামী তাঁর শিষ্য অষ্টানন্দকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ! এটি তোমার ভক্তির উপলব্ধিও নয় এবং তোমার দৃষ্টির ত্রুটিও নয়। এই ধরনের ঘটনা ওই সময়ে ঘটে, যে সময়ে উপরের লোক (ধাম) থেকে কোনো দেবতা পৃথিবীতে অবতারিত হওয়ার জন্য আসেন। তিনি কোনো এক নারীর গর্ভে নিবাস করেন। অতঃপর বালক শিশু রূপ ধারণ করে মহাপুরুষের লীলা করে নিজের অসম্পূর্ণ কার্য পূর্ণ করেন। হয়তো কোনো দেবতা উপর লোক থেকে এসেছেন, তিনি কাশী নগরে কারোর ঘরে জন্ম নিয়ে, তার প্রারব্ধ কর্ম পূরণ করবেন। উপরোক্ত বচনের মাধ্যমে ঋষি রামানন্দ স্বামী তাঁর শিষ্য অষ্টানন্দের সন্দেহের সমাধান করলেন। ওই সময়ে ঋষিদের ধারণা ছিল যে, সমস্ত অবতারের জন্ম হয়তো মাতার গর্ভ দ্বারাই হয়।

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং ৩৮৫ - ৩৯১ :-**

গরীব, কোঈ কহৈ বরুণ ধর্মরায় হৈ, কোঈ কোঈ কহতে ঈশ। সোলহ কলা সুভাঁন গতি, কোঈ কহৈ জগদীশ ॥৩৮৫॥
গরীব, ভক্তি মুক্তি লে উতরে, মেটন তীনুঁ তাপ। মোমন কে ডেরা লিয়া, কহৈ কবীরা বাপ ॥৩৮৬॥
গরীব, দুধ ন পীবৈ ন অন্ন ভখৈ, নহীঁ পলনে ঝুলন্ত। অধর অমান ধিযান মেঁ, কমল কলা ফুলঁত ॥৩৮৭॥
গরীব, কোই কহৈ ছল ঈশ্বর নহীঁ, কোই কিঁনর কহলায়। কোই কহৈ গণ ঈশ কা, জ্যুঁ জ্যুঁ মাত রিসায় ॥৩৮৮॥
গরীব, কাশী মেঁ অচরজ ভয়া, গই জগত কে নীঁদ। ঐসে দুল্হে উতরে, জ্যুঁ কন্যা বর বীঁদ ॥৩৮৯॥
গরীব, খলক মূলক দেখন গয়া, রাজা প্রজা রীত। জম্বুদীপ জিহান মেঁ, উতরে শব্দ অতীত ॥৩৯০॥
গরীব, দুনি কহৈ যৌহ দেব হৈ, দেব কহত হৈঁ ঈশ। ঈশ কহৈ পারব্রহ্ম হৈ, পূর্ণ বীসবে বীস ॥৩৯১॥

❖ **সরলার্থ :-** নীরু ও নিমা শিশুটিকে নিয়ে জুলাহা মহল্লায় (কলোনীতে) নিজের ঘরে এলেন। যে কোনো পুরুষ ও নারী যারাই ওই নবজাত শিশুরূপী পরমেশ্বর কবীরকে দেখছিলেন, তারা দেখতেই রয়ে গেলেন। পরমেশ্বরেব শরীর অতি সুন্দর অর্থাৎ অপূর্ব রূপ ছিল। চোখ যেন পদ্ম ফুল, কোঁকড়ানো চুল, লম্বা লম্বা হাত, লম্বা লম্বা আঙুল ও শরীর থেকে যেন নূর (প্রকাশ) বের হচ্ছে। সারা কাশী নগরে এমন অপূর্ব শিশু দ্বিতীয় কেউ ছিল না। যে দেখতেন সেই আবার অন্যকে গিয়ে বলতেন যে, নূর আলী একটা বালক পুকুরে পেয়েছেন, শিশুটি যেন আজই জন্মগ্রহণ করেছে। কোনো না কোনো বিধবা হয়তো লোকলজ্জার ভয়ে ফেলে দিয়েছে। শিশুটিকে দেখার পর তাঁর মুখ দেখে, কেউই দৃষ্টি ফেরাতে চায় না। আত্মা আপনা আপনিই তার টানে চলে আসে। জানিনা শিশুর মুখে কি জাদু আছে? সমগ্র কাশীর লোকেরা ভিড় করেছে ওই পরমাত্মা রূপ শিশুটিকে দেখার জন্য। মহিলা ও পুরুষরা শুভ গান গাইতে গাইতে নিরুর বাড়িতে তার বাচ্চাকে দেখতে এল।

শিশুটিকে (কবীর আল্লাহকে) দেখে কেউ বলছিল মনে হয়, এই শিশুটি কোনো দেবতার অবতার, কেউ বলছিল সাক্ষাৎ বিষ্ণুই এসেছেন। কেউ বলছিল যে, ভগবান শিবই মনে হয় তাঁর কাশী শহরকে কৃতার্থ করার জন্য জন্ম নিয়েছেন। কেউ বলে এঁ হয়তো কোনো নপুংসকের অবতার হতে পারে, কেউ বলে যে, কোনো পিতর ধাম থেকে এসেছে হয়তো। এসব কথা শুনে নিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার সন্তানের বিষয়ে কেউ কিছু বলবেন না। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে সকলের নজর থেকে রক্ষা করো। একজনকে তো বলেই দিলেন যে, আপনারা কি কখনও বাচ্চা দেখেন নি? এরকম দল বেঁধে যে আমার সন্তানকে দেখতে আসছেন। আগত নারী-পুরুষেরা বললেন, হে নিমা! আমরা অনেক বাচ্চা দেখেছি কিন্তু তোমার বাচ্চার মত বাচ্চা কখনও দেখিনি। সেজন্যই আমরা দেখতে এসেছি। উপর নিজ নিজ ধাম থেকে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবও উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। কাশীর বাসিন্দাদের মুখ থেকে এই বালকের বিষয়ে যখন কেউ কেউ বলছিলেন যে, আমাদের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শিব) প্রভুদের মধ্যে থেকে কেউ একজন হতে পারে এই বালক, এই কথাগুলি শুনে বললেন যে, এই শিশুটি তো অন্য কোনো লোক (জগৎ) থেকে এসেছেন, সেই জগতের বিষয়ে আমাদের জানা নেই। তবে এই বালক অনেক শক্তিযুক্ত কোনো সিদ্ধ পুরুষও হতে পারেন।

"শিশু কবীর পরমেশ্বরের নামাঙ্কন"

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং. ৩৯২ - ৩৯৩ :-**

গরীব, কাজী গয়ে কুরআন লে, ধরি লরকে কা নাম। অক্ষর অক্ষর মেঁ ফুর্'য়া, ধন্য কবীর বলি জাবঁ মেঁ॥৩৯২॥
গরীব, সকল কুরআন কবীর হৈঁ, হরফ লিখে জো লেখ। কাশী কে কাজী কহৈঁ, গই দীন কী টেক॥৩৯৩॥

ভাবার্থ :- নীরু (নূর আলী) ও নীমা দুইজনকে মুসলমান করে দেওয়ার পূর্বে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলেন। এই কারণে লোভ বশীভূত ব্রাহ্মণ, ছেলের নাম রাখতে এলেন। ওই সময় মুসলমান কাজী নিজেদের কিতাব কুরআন শরীফও নিয়ে এসেছিলেন ছেলেটির নাম রাখার জন্য। দিল্লীর উপর ওই সময় সমস্ত ভারতবর্ষে মুঘল বাদশার শাসন

ছিল। যার কারণে হিন্দু সমাজ মুসলমানদের দ্বারা নত হয়ে থাকত। কাজীরা বললেন, আমরা মুসলিম বিধি অনুসারে ছেলেটির নাম রাখব, কারণ তোমরা এখন মুসলমান হয়ে গিয়েছো। এই বলে কাজীদের মধ্যে মুখ্য কাজী আন্দাজ মতো কুরআন শরীফের এক পৃষ্ঠা খুললেন। ওই পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে প্রথম নাম "কবিরন্" লেখা ছিল। এই "কবীর" নাম দেখে কাজীরা ভাবলেন, "কবীর" নামের অর্থ বড় হয় আর এই ছোটো ধানক জাতির (তাঁতীর /জুলাহের) ছেলের নাম কবীর রাখা শোভা পায় না এবং এই নাম তো উচ্চ পরিবারের সন্তানদের নামকণের যোগ্য নাম । শিশু রূপধারী পরমেশ্বর অর্থাৎ কাদির আল্লাহ, কাজীদের মনের দোষকে জানতেন। কাজীরা নামকরণের উদ্দেশ্যে পুনরায় পবিত্র কুরআন শরীফ খুলে দেখলেন। ওই দুই পৃষ্ঠাতেই কবীর - কবীর - কবীর অক্ষরই লেখা ছিল, অন্য কিছু লেখা ছিল না। এরপরে কাজী কুরআন শরীফের অন্য পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন। সেই পৃষ্ঠাগুলিতেও কেবল কবীর-কবীর-কবীর অক্ষরই লেখা ছিল। কাজী কুরআনের সমস্ত পৃষ্ঠা নিরীক্ষণ করে দেখলেন এবং তাদের দ্বারা আনা কুরআন শরীফের সকল অক্ষর কবীর-কবীর-কবীর- কবীর হয়ে গেল। কাজী বললেন, এই শিশু কোনো যাদুমন্ত্র করে আমাদের কুরআন শরীফকেই পরিবর্তন করে দিয়েছে। তখন কবীর পরমেশ্বর শিশু রূপে বললেন, হে কাশীর কাজীগণ! আমিই হলাম কবীর আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহু আকবর। আমার নাম "কবীর"ই রাখো। কাজীরা তাদের সাথে নিয়ে আসা কুরআনকে সেখানেই ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। তারা ছোট্ট শিশুকে একজন বড় ব্যক্তির মত কথা বলতে দেখে, বলতে লাগলেন যে, এই শিশুটির মধ্যে কোনো অশুভ প্রেতাত্মা কথা বলছে।

"শিশু কবীর দেব দ্বারা কুমারী গরুর দুধ পান করা"

❖ **পারখের অঙ্গের বাণী নং. ৩৯৪ - ৩৯৭ :-**

গরীব, শিব উতরে শিবপুরী সে, অবিগত বদন বিনোদ। মহকে কমল খুসী ভয়ে, লিয়া ঈশ কুঁ গোদ॥৩৯৪॥
গরীব, নজর নজর সে মিল গঈ, কিয়া ঈশ প্রণাম। ধন্য নীরু মোমন ধন্য, নীমা ধন্য কাশী নিঃকাম॥৩৯৫॥
গরীব, সাত বার চর্চা করী, বোলে বালক বৈন। শিব কুঁ কর মস্তক ধর্'য়া, ল্যা মোমিন এক ধৈন॥৩৯৬॥
গরীব, অন ব্যাবর কুঁ দুহত হৈ, দুধ দিয়া ততকাল। পিবৈ বালক ব্রহ্মগতি, তহাঁ শিব ভয়ে দয়াল॥৩৯৭॥

ভাবার্থ :- নীমা যখন বালক পরমেশ্বরকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন, তখন তিনি তাঁর নিজের মুখ বন্ধ করে নিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও নীমা ও নীরু ওই শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে গেলেন। ২৫ দিন শিশুটি অনাহারে কেটে যাওয়াতে, বাবা-মা অধিক চিন্তিত হয়ে গেলেন। ২৪ দিন ধরে তো নীমা কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। তিনি ভাবলেন, এই বাচ্চা কিছুই খাচ্ছে না, যদি দিনের পর দিন এইভাবে কিছু না খায়, তাহলে এই শিশু তো মারা যাবে। মনে হয়, আমার পুত্রের উপর কারোর নজর লেগেছে। অশুভ দৃষ্টি দূর করার জন্য, একটানা ২৪ দিন ধরে বিভিন্ন নারী-পুরুষের দ্বারা বলা পদ্ধতি অবলম্বন করে, একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, কোনো লাভ হয়নি। আজ পঁচিশতম দিন উদয় হল। মাতা নীমা সারা রাত কাঁদতে লাগলেন, জানি না এই শিশু কখন মারা যায়, এই শিশু মারা গেলে আমিও ফাঁসি লাগিয়ে মারা যাব। এই বাচ্চা ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। এদিকে কিন্তু বালক শিশু কবীরের শরীর ২৫ দিন কিছু না খাওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি সুস্থ ছিল এবং দেখে মনে হচ্ছিল যেন শিশুটি প্রতিদিন এক কিলোগ্রাম (এক লিটার) দুধ পান করেন কিন্তু নীমার মনে ভয় ছিল যে, কিছু না খেয়ে এই শিশু বাঁচতে পারে না, যে কোনো সময়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। এই সব ভেবে সারা দিন চিন্তিত থাকতেন। ভগবান শঙ্করের সাথে সাথে নিরাকার ভগবানদেরও উপাসনা ও প্রার্থনা করে যখন সব বৃথা হয়ে যাচ্ছে, জানতে পেরে, তিনি খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ওই সময় ভগবান শিব, এক ব্রাহ্মণের (ঋষি) রূপ ধারণ করে নীরুর কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নীমাকে হিঁচকি দিয়ে কাঁদতে দেখলেন। এরপর নিমার কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। সাধুরূপে দাঁড়িয়ে ভগবান শিবের অনুরোধে নীমা বললেন, হে ব্রাহ্মণ দেব! আমার দুঃখ জেনে আপনিও দুঃখ পাবেন। ফকির বেশধারী শিব ভগবান বললেন, হে মাতা! বলা হয় যে, নিজের মনের দুঃখ অন্যের কাছে বললে মন হালকা হয়। এটাও সম্ভব হয়তো আপনার কষ্ট নিবারণ করার কোনো উপায় বেরিয়ে আসবে। চোখে জল নিয়ে জিভ কম্পন স্বরে গভীর শ্বাস নিয়ে নীমা বললেন, হে মহাত্মা! আমরা নিঃসন্তান ছিলাম। পঁচিশ দিন আগে আমরা দুজনেই যথারীতি কাশীর লহরতারা সরোবরে স্নান করতে যাচ্ছিলাম। সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা পূর্ণিমার সকাল। পথে, আমি আমার প্রিয় ভগবান শঙ্করের কাছে একটি পুত্র সন্তানের জন্য হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। আমার ডাক শুনে দীনদয়াল ভগবান শঙ্কর, লহরতারা সরোবরে এক পদ্ম ফুলের উপর একটি সন্তান প্রকট করে দিয়েছিলেন। বাচ্চা প্রাপ্তির পরে আনন্দের কোনো ঠিকানা ছিল না। তবে এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী রইল না। এই শিশুটিকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে, আজ এই শিশুটির পঁচিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই খায়নি। এই প্রকার কিছু না খেলে তো শিশু মারা যাবেই, এর সাথে আমিও আত্মহত্যা করব। আমি এর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি আর সারারাত কেবল বসে বসে কান্না করছি, এক এক মুহূর্ত আমি কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছি আর ভগবান শঙ্করের কাছে প্রার্থনা

করছি যে, হে ভগবান! এর চেয়ে ভালো হত যদি আপনি সন্তান না দিতেন। এখন এই শিশুটির উপর এত মমতা হয়ে গিয়েছে যে, এঁকে ছাড়া আমি বাঁচতেই পারব না।

নীমার মুখ থেকে পুরো ঘটনা শোনার পর ঋষি রূপী ভগবান শঙ্কর বললেন, তোমার সন্তান আমাকে দেখাও। নীমা দোলনা থেকে শিশুটিকে তুলে ঋষির কাছে আনলেন ও ভাবলেন যে, শিশুটিকে ঋষির পায়ের কাছে রাখতে চাইলেন। এর মধ্যে শিশুটি হাওয়াতে উপরে উঠে গেল ও শঙ্করের দৃষ্টি ও শিশু রূপী পরমাত্মার দৃষ্টি, একে অপরের সাথে মিলিত হল। এর মধ্যে ভগবান শঙ্কর উপরে উঠে যাওয়া শিশু কবীরকে, তাঁর দুই হাতে ধরে কোলে নিলেন এবং মস্তিষ্কের রেখাগুলো ও হাতের রেখা দেখে বললেন, নীমা! তোমার পুত্রের আয়ু অধিক লম্বা আছে, অতএব এ শীঘ্র মরার শিশু নয়, দেখো নীমা! এ কত স্বাস্থ্যবান ও পদ্ম ফুলের মতো ফুটফুটে চেহারা। নীমা বললেন, হে বিপ্রবর! কৃত্রিম সান্ত্বনাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না। শিশু যদি দুধ পান করে, তাহলে আমি খুশি হব। পঁচিশ দিনের শিশু রূপ ধারণ করা কবীর পরমাত্মা শিবকে বললেন, হে ভগবান! আপনি এদেরকে (মাতা-পিতাকে) একটি কুমারী গরু অর্থাৎ বকনা বাছুর আনতে বলুন। সেই কুমারী গরুর পিঠের উপর আপনি আশীর্বাদ ভরা হাত রাখবেন, তাহলে সেই কুমারী গরু দুধ দেবে আর পরে সেই দুধ আমি পান করবো। সেই কুমারী গরুটি আজীবন দুধ দেবে, সেই দুধের দ্বারাই আমার লালন-পালন হবে। এই প্রকার সাতবার কবীর পরমেশ্বর ও ভগবান শঙ্করের (শিব) সহিত আলোচনা হয়েছিল।

এরপরে শিব প্রভু নীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার স্বামী কোথায়? নীমা তার স্বামীকে ডাকলেন, তিনি ভেজা চোখে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণ রূপী শিবকে প্রণাম করলেন। শিব বললেন, নীরু! তুমি একটা কুমারী গরু নিয়ে এসো, সেই গরু থেকে যে দুধ বের হবে, এই শিশু কেবল সেই দুধই পান করবে। নীরু একটি কুমারী গরু নিয়ে এলেন ও তার সাথে কুমোরের বাড়ি থেকে একটি ছোট্ট মাটির পাত্র (চার কেজি ক্ষমতার একটি মাটির পাত্র) আনলেন। বালক শিশুরূপ কবীর পরমেশ্বর অর্থাৎ কবীর আল্লাহর আদেশ অনুসারে বিপ্ররূপধারী শিব, ওই কুমারী গরুর পিঠে হালকা থাপ্পড় মারলেন। থাপ্পড় মারতেই গরুর থন (দুধের বাঁট) লম্বা লম্বা হয়ে গেল এবং সেই থন থেকে দুধ পড়তে শুরু করল। দুধ আসার পূর্বেই নীরুকে মাটির পাত্রটি গরুর থনের নিচে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুধের পাত্র ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে থন থেকে দুধ আসা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে কবীর আল্লাহ সেই দুধ পান করলেন।

নীরু নিমা ব্রাহ্মণ রূপধারী ভগবান শিবের চরণ ধরে বললেন, আপনি তো সাক্ষাৎ ভগবান শিবের রূপ । আমাদের ডাক শুনে ভগবান শিবই স্বয়ং আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমরা গরিব মানুষ আপনাকে কি বা দক্ষিণা দিতে পারি বলুন? হে বিপ্র! আমরা ২৪ দিন ধরে কোনো কাপড়ও বুনতে পারিনি। ভগবান শিব বললেন, হে ভক্ত! সাধু ভুখা ভাব কা, ধন কা নাহীঁ। জো হৈ ভুখা ধন কা, বহ তো সাধু নাহীঁ। এই বলে বিপ্র রূপধারী ভগবান শিব সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

এর প্রমাণ বেদে রয়েছে যে, পরমাত্মা বালক শিশু রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে লীলা করেন। তখন তাঁর পালন-পোষণ কুমারী গরুর দুধের দ্বারা হয়।

প্রমাণ :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ১ মন্ত্র ৯

অভী ইমম অধ্ন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে॥৯॥

অভী ইমম্- অধ্ন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্ সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে।

অনুবাদ :- (উত) বিশেষ ভাবে (ইমম্) এই (শিশুম্) শিশু রূপে আবির্ভূত (সোমম্) পূর্ণ পরমাত্মা অমর প্রভুর (ইন্দ্রায়) সুখদায়ক সুবিধার জন্য, আবশ্যক পদার্থ শরীরের (পাতবে) বৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজনীয়, সেই পূর্তি (অভী) সম্পূর্ণরূপে (অধন্য ধেনবঃ) যে কুমারী গরু ষাঁড় দ্বারা কখনও স্পর্শ হয়নি অর্থাৎ কুমারী গরুর দুধ দ্বারা (শ্রীণন্তি) পালন করা হয়।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমেশ্বর অমর পুরুষ লীলা করার সময় স্বয়ং বালক রূপ ধারণ করে প্রকট হন। তাঁর সুখ-সুবিধার ও শরীর বৃদ্ধির জন্য যে পদার্থ প্রয়োজন, তা কুমারী গরুর অর্থাৎ বকনা বাছুর দ্বারা করা হয় অর্থাৎ ওই সময়ে (অধ্নী ধেনু)) কুমারী গরু নিজের থেকেই দুধ দেয়, যার দ্বারা ওই পূর্ণ প্রভুর (কাদির আল্লাহর) পালন হয়।

"নীরুর ধন প্রাপ্তি"

বালক প্রাপ্তি করার পূর্বে উভয় (স্বামী-স্ত্রী) একসাথে কাপড় বুনতেন। পুত্রের দুশ্চিন্তায় তাঁরা ২৫ দিন পর্যন্ত কাপড় বুনতে পারেন নি। যার কারণে কিছু ঋণ নীরুর হয়ে যায়। যে ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি পঁচিশ দিনের দিনই এসে, খুবই খারাপ কথা বলে চলে যায়। কয়েকদিন ধরে ঋণ পরিশোধ না করার কারণে ওই ব্যবসায়িক হুমকি দিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন ও তাদের নিজের ভাগ্যের উপর দোষ দিতে লাগলেন। একটা দুশ্চিন্তা মিটে যেতে না যেতে অন্য দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরত। পিতা - মাতাকে চিন্তিত দেখে শিশু রূপী পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) বললেন, "হে মাতা-পিতা! আপনারা চিন্তা করবেন না। প্রতিদিন বিছানার নিচে একটি করে সোনার

মোহর (দশ গ্রাম সোনা) পাবেন। তার দ্বারা আপনারা আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে, নিজের খরচ ও গরুর খরচ বের করে বাকি টাকা ধর্মীয় কাজে লাগিয়ে দেবেন। ওই দিন থেকে প্রতিদিন কবীর পরমাত্মার দয়ায় নীরুর বাড়িতে ১০ গ্রাম করে সোনা প্রাপ্ত হতে লাগল। এই কার্যক্রম এক বছর পর্যন্ত চলতে লাগল।

পরমেশ্বর কবীর তাঁর মাতা-পিতাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির কথা গোপন রাখতে বলেছিলেন কিন্তু একদিন নীমার প্রিয় বান্ধবী নীমাদের বাড়িতে ওই সময় এসেছিল, যে সময় নীমা পুত্র কবীরকে জাগানোর চেষ্টা করছিল। নীমার বান্ধবী ওই সোনার মোহর দেখে বলল, এত সোনার মোহর তোমাদের ঘরে কিভাবে এলো? নীমা তার প্রিয় বান্ধবীকে সব থেকে গোপন কথা বলে দিলেন যে, আমরা এক বছর ধরে প্রতিদিন একটা করে দশ গ্রাম স্বর্ণ মুদ্রা বিছানার নিচে পাই। আমাদের ঘরে যখন থেকে ভাগ্যবান পুত্র কবীর এসেছে, সেদিন থেকে আমরা সুখে জীবন কাটাচ্ছি। এই কথা বান্ধবীকে বলে দেওয়ার পরের দিন থেকে স্বর্ণমুদ্রা আসা বন্ধ হয়ে গেল। নীরু ও নীমা দুজনেই তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য একসঙ্গে কাপড় বুনতে শুরু করে দিলেন। বড় হয়ে শিশু কবীরও পিতার কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যে অধিক কাপড় বুনতে লাগল।

"শিশু কবীরের সুন্নত করার ব্যর্থ চেষ্টা"

শিশু রূপধারী কবীর দেবের সুন্নত করার সময় এলে, সারা আত্মীয়-স্বজন সহ অন্যরা নীরুর বাড়িতে জড়ো হয়ে গেলেন। নাপিত যখন শিশু কবীর জীর পুরুষাঙ্গ (লিঙ্গ) সুন্নত করার জন্য কাঁচি নিয়ে গেলেন, তখন পরমেশ্বর তাঁর নিজের লিঙ্গের সাথে অন্য আরেকটি লিঙ্গ বানিয়ে নিলেন। এরইমধ্যে সুন্নত করতে আসা নাপিতের চোখের সামনে তিনটি আরও লিঙ্গ বাড়তে দেখলেন, মোট পাঁচটি লিঙ্গ একটি বালকের দেখে, ওই সুন্নত করতে আসা ব্যক্তি আশ্চর্যতে পড়ে গেলেন। তখন শিশুরূপী কবীর জী বললেন, ভাই! মুসলমানের ধর্মে কেবল একটাই লিঙ্গ সুন্নত করার বিধান আছে তাই না? বলুন বাদবাকি চার লিঙ্গ কোথায় সুন্নত করতে হবে? শীঘ্রই বলুন! শিশুটিকে এই রকম বলতে শুনে এবং পাঁচটি লিঙ্গ ওই শিশুটির দেখে, নাপিত উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের ডেকে এনে ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখালেন।

উপস্থিত সকলে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলতে লাগলেন, আল্লাহ তালার কেমন কামাল? একটা শিশুর পাঁচটা পুরুষ লিঙ্গ? এই সব দেখে সুন্নত না করেই নাপিত চলে গেলেন। নীরু ও নীমা যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন বললেন আপনারা কি বলছেন? এসব কখনও হতে পারে না, এরপর দুজনেই নিজের শিশুটির কাছে গেল, তখন তাঁর কেবল একটাই পুরুষ লিঙ্গ ছিল, পাঁচটা ছিল না, অতঃপর দুজনেই উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, তোমরা কি বলছ, দেখো কোথায় রয়েছে আমার শিশুর পাঁচটি লিঙ্গ? এই দেখো একটিই আছে। উপস্থিত সকলেই এর আগে পাঁচটি পুরুষ লিঙ্গ দেখেছিলেন কিন্তু এই সময়ে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গ (মূত্র অঙ্গ) দেখেই অবাক হয়ে গেলেন।

অতঃপর শিশু রূপে কবীর পরমেশ্বর বললেন, ভোলা মানুষ! আপনারা আপনার ছেলেদের লিঙ্গ কেন কাটান? আল্লাহ তালার দ্বারা কি কোনো ভুল হয়ে গেছে যে, আপনারা তা সংশোধন করতে লেগে গেছেন? তবে আপনারা পরমেশ্বরের থেকেও কি অনেক বড়? যদি আপনারা ছেলেটির লিঙ্গের আগের চামড়া কেটে (সুন্নত করে) মুসলমান তৈরি করেন, তাহলে মেয়েদের মুসলমানি আপনারা কি করে করবেন? যদি মুসলিম ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকেদের থেকে আলাদা হতো, তাহলে আল্লাহই সুন্নত করিয়ে ছেলেদের জন্ম দিতেন। হে সরল মানুষ! সকল প্রাণীই হল পরমেশ্বরের। বর্তমানে কেউ যদি মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করে, পরে তার মৃত্যু হলে সে হিন্দু বা খ্রীষ্টান ধর্মের ঘরেও জন্ম নিতে পারে। একইভাবে, অন্যান্য ধর্মে জন্মগ্রহণকারী লোকেরাও মুসলিম ধর্মে এবং অন্যান্য ধর্মের ঘরে জন্ম নেয়। ধর্মের এসব দেওয়াল তুলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করো না। এই সব হল কাল ব্রহ্মের সব কৌশল অর্থাৎ চতুরতার চাল। কলিযুগের পূর্বে অন্য কোনো ধর্মই ছিল না। কেবল একটাই ধর্ম ছিল, তা হল মানবধর্ম (মানবতার ধর্ম)। এখন কলিযুগে কাল ব্রহ্ম বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে মানুষের শান্তি একেবারে সমাপ্ত করে দিয়েছে।

সুন্নতের সময় উপস্থিত লোকজন শিশুটির মুখ থেকে সত উপদেশ শুনে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। মাতা নীমা বালকের মুখে কাপড় ঢেকে দিয়ে বললেন, বেশি কথা বলতে নেই! কাজী শুনলে তোকে মেরে ফেলবে ও ভীষণভাবে পেটাবে, পুত্র! পরমেশ্বর কবীর মায়ের হৃদয়ের কষ্টের সাথে পরিচিত থাকায়, ঘুমের অজুহাত তৈরি করে নাক ডাকতে শুরু করলেন, মনে হয় যেন গভীর ঘুমে চলে গিয়েছেন। তারপর নীমা একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেলে, তার সকল আত্মীয়দের অনুরোধ করলেন যে, তারা যেন তার পুত্রের কোনো কথা কাউকে না বলে। এরপরে এমন না হয়ে যায় যে, আমার পুত্রের সঙ্গে আমাদেরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

"ঋষি রামানন্দ, সেউ, সম্মন এবং নেকী ও কামালীর পূর্বজন্মের জ্ঞান"

সত্যযুগে ঋষি রামানন্দের আত্মা বিদ্যাধর নামের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বিদ্যাধর ব্রাহ্মণের সাথে পরমেশ্বর সত

সকৃত নামে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ত্রেতাযুগে এই বিদ্যাধর বেদবিজ্ঞ নামে ঋষি হয়েছিলেন এবং কবীর পরমেশ্বরকে মুনিন্দ্র নামে শিশুরূপেই প্রাপ্ত করেছিলেন আর কলিযুগের যে কামালী নামের আত্মা সত্যযুগে বিদ্যাধরের স্ত্রী দীপিকা ছিলেন। আবার ত্রেতাযুগে বেদবিজ্ঞ ঋষির স্ত্রী সূর্যা ছিলেন। ওই সময়ে তাঁরা পরমেশ্বরকে পুত্র হিসাবে লালন-পালন করেছিলেন এই পুণ্যের কারণে, এই আত্মারা পরমাত্মার অনুরাগী ও প্রিয় ছিল। কলিযুগেও পরমেশ্বরের প্রতি তাঁদের অটুট বিশ্বাস ছিল। ঋষি রামানন্দ ও কামালীর আত্মাই সত্যযুগে ব্রাহ্মণ বিদ্যাধর ও ব্রাহ্মণী দীপিকার আত্মা ছিল। যাঁরা শ্বশুর বাড়ি থেকে আসার পথে এই দুই স্বামী-স্ত্রী, কবীর পরমেশ্বরকে এক পুকুরে পদ্ম ফুলের উপরে পেয়েছিলেন। এই আত্মারা ত্রেতা যুগে (বেদবিজ্ঞ ও সুর্যা) ঋষি দম্পতি ছিলেন, এদেরকে শিশু রূপে পরমেশ্বর প্রাপ্ত হয়েছিল। সম্মন ও নেকীর আত্মা দুজন দ্বাপর যুগে কালু বাল্মীকি এবং স্ত্রী গোদাবরী ছিলেন। যারা দ্বাপর যুগে পরমেশ্বরকে শিশু রূপে পেয়ে লালন-পালন করেছিলেন। তাঁরই পুণ্য ফলের কারণে পরমেশ্বর কবীর নিজের শরণে নিয়েছিলেন। সেউয়ের (শিব) আত্মা দ্বাপর যুগেই গঙ্গেশ্বর নামে ব্রাহ্মণের পুত্র গণেশ ছিল। যে নিজের পিতার প্রচণ্ড বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও আমার (পরমাত্মা) উপদেশকে ত্যাগ করেনি আর গঙ্গেশ্বর ব্রাহ্মণের আত্মা, কলিযুগে শেখতকী হয়েছিল। এই আত্মা দ্বাপর যুগ থেকেই পরমেশ্বর বিরোধী ছিল। গঙ্গেশ্বরের আত্মা শেখতকীকে কাল ব্রহ্মই পুনরায় প্রেরিত করে দিয়েছিল। যার কারণে শেখতকী (গঙ্গেশ্বর) পরমেশ্বরের কবীর জীর শত্রু হয়েছিল। ভক্ত শ্রী কালু এবং গোদাবরীকে গণেশ পিতা-মাতার তুল্য সম্মান করতেন। এইজন্য গণেশ একদিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন যে, আমি যদি আপনাদের (বাল্মিকি) ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে খুবই আনন্দে থাকতে পারতাম। গণেশের এই পালক মাতা-পিতাও (কালু ও গোদাবরীও) গণেশকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসত। তাঁদের মোহ-মমতাও এই গণেশ নামের বালকের প্রতি অত্যধিক হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে এই গণেশের আত্মা পরের জন্মে সেউ নামে জন্ম নিলেন এবং দ্বাপর যুগের গনেশের পাতানো পিতা-মাতা ভক্ত কালু ও গোদাবরীর আত্মা নেকী ও সম্মন হয়েছিলেন, এই দুইজনের পুত্র হল সেউ। আবার এই সম্মনের আত্মাই নৌশেরখাঁ শহরে নৌশেরখাঁ রাজা হয়েছিল। আবার এই আত্মাই বলখ বুখারের বাদশাহ অব্রাহিম অধম সুলতানও হয়েছিল, এইজন্য তাকে পুনরায় ভক্তি পথে লাগানো হয়েছিল। {সুলতান ইব্রাহিম ইব্‌ন অধম অর্থাৎ অব্রাহিম অধমের সম্পূর্ণ বর্ণন এই পুস্তকের 151 পৃষ্ঠায় লেখা আছে।}

❖ সদগুরু রামপাল মহারাজের নিকট অনুরোধ এই যে, আমরা যখন মুসলিম ভাইদের সাথে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করি। তখন তাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না। নিম্নে তাদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে, তার উত্তর আমরা কিভাবে দেব? প্রশ্নগুলি এই প্রকার :-

প্রশ্ন :- কুরআনের জ্ঞান নাজিল করা আল্লাহ (প্রভু) কাদির নয়, এই কথা কি করে মানব? কেননা, কুরআন মজিদে সূরাঃ সোয়াদ - ৩৮ নং আয়াত নং ৪১-৪২ এ প্রমাণ রয়েছে যে " আল্লাহ তাঁর প্রিয় ভক্ত (বান্দা) আইয়ুবের ডাক শুনে বলেছিলেন যে, মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করো তাহলে পানীয় জলের ফোয়ারা হবে। আইয়ুব তেমনই করলেন এবং লাথি মারতেই সাথে সাথেই ঠান্ডা পানীয় জলের ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল।

(রামপাল দাসের জবাব) তোমরা উত্তর এইভাবে দাও :-

উত্তর :- আপনারা এই পুস্তকে "সৃষ্টি রচনার" অধ্যায়টি পড়ুন, তা থেকে জানতে পারবেন যে, কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা (জ্ঞান প্রদানকারী) কোন স্তরের খুদা ছিলেন?

আল্লাহর সংজ্ঞা অর্থাৎ পরিভাষা বুঝুন। 'খুদা' আরবী ভাষার শব্দ, যার অর্থ হল প্রভু, মালিক, স্বামী, কর্তা।

উদাহরণ দ্বারা বুঝব :- ভারতের এক রাজ্যে মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পদ আছে। মন্ত্রী কেবল এক বা একাধিক বিভাগের মালিক (প্রভু) হন আর মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের (প্রদেশের) প্রভু (কর্তা) হন। প্রদেশে অন্য রাজ্য অধিকারীও হন, যেমন-পুলিশ বিভাগে ডায়রেক্টর জেনারেল (D.G.) আছেন, যিনি সমস্ত রাজ্যের পুলিশের মালিক (প্রভু)।

এর নিচেও অন্যান্য পদ আছে, ইন্সপেক্টর জেনারেল (I.G.), সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (S.P.), ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (D.S.P.), এরপরে দারোগা (S.H.O.) এবং এছাড়া অন্যান্য পুলিশ কর্মীও হয়। তবে সমস্ত ভারত দেশের মালিক (প্রভু/স্বামী) হলেন রাষ্ট্রপতি। দ্বিতীয় নম্বরে প্রধানমন্ত্রী হলেন সমগ্র ভারতের মালিক (প্রভু)। এদের পরে অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীরা হলেন নিজ নিজ বিভাগের প্রভু (কর্তা/মালিক) কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলেন সমস্ত মন্ত্রীগণের ও মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও অধিক ক্ষমতাবান (Powerful) হয়ে থাকেন। সূক্ষ্মবেদে লেখা আছে যে, (কাদির আল্লাহর মুখকমল দ্বারা বলা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, তাতে বলা হয়েছে যে,) :-

কবীর, জো জা কী শরণাঁ বসৈ, তাকো তাকী লাজ।
জল সৌঁহী মছলী চঢ়ৈ, বহ জাতে গজ রাজ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে প্রভুর (সাহেবের) মিত্র আছেন, সেই সাহেব (প্রভু) তাঁর স্তরের লাভ অবিলম্বে তার বন্ধুকে

(ভক্ত) সম্মানের সাথে প্রদান করে দেন কিন্তু অন্য সাধারণ মানুষ তা পাবে না। যেমন- মনে করুন কারোর বন্ধু দারোগা সাহেব (Station Headquarter Officer) আছেন। ওই বন্ধু কোনো কর্ম উপলক্ষ্যে যখন থানায় যান, তখন তার ইন্সপেক্টর বন্ধু তাকে সম্মানের সাথে চেয়ারে বসতে দেন, চা পরিবেশন করেন এবং তার নিজের ক্ষমতার ভিতরের যে যে কাজ আছে, তা তাড়াতাড়ি করে দেন। তবে সাধারণ মানুষ থানায় প্রবেশ করতে গেলে ভয় পায়, কাজ হওয়া তো দূরের কথা।

এই প্রকার কারোর বন্ধুত্ব যদি ডি.জি.র সঙ্গে হয়ে থাকে, তাহলে তারজন্য সমস্ত রাজ্যে, পুলিশ স্তরের যে কোনো কার্য হোক না কেন, তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। যে কার্য S.P., D.S.P ও দারোগাও করতে পারেন না, সেই কার্য ওই D.G. সাহেবের বন্ধুর এই কারণে দ্রুত হয়ে যায়।

এইভাবে রাজ্যের মন্ত্রীও অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মতো সুবিধা রাজ্য মন্ত্রীরা কখনও দিতে পারেন না।

এই রকম সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সব চেয়ে বেশি সুবিধা বা লাভ দিতে পারেন। যার বন্ধুত্ব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকে, তাঁর কার্য দেশের যে কোনো স্তরের সাহেবের নিকটে থাকুক না কেন, তাঁর কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই হয়ে যায়।

বাণীর অর্থ হল এই যে, যেমন- মাছের সাথে জলের সত্যই মিত্রতার বন্ধন আছে। ঝর্ণার জলের স্রোত বইছে। সেই ঝর্ণার জল পঞ্চাশ ফুট নিচে বা যেমনই স্থানে ওই জল পড়ুক না কেন, উপরের ওই প্রবাহিত জলের সামনে যদি সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিও (গজরাজ) পড়ে যায়, তাহলে ওই জলের প্রবাহ সেই হাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু মাছ ওই পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে নীচের পড়া জলের স্থান থেকে, মাছ ওই পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে পড়া প্রবাহিত জলের সাহায্যে, সোজা সরাসরি উপরে চড়ে যেতে পারে অর্থাৎ জল তার বন্ধু, এইজন্য মাছকে তার স্তরের সুবিধা দিয়েছে, যা হাতি কিন্তু অর্জন করতে পারে না।

এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কুরআন মজিদের সূরা সোয়াদ- ৩৮ আয়াত নং ৪১-৪২ -তে বলা হয়েছে যে, পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করার কারণে আইয়ুবের আল্লাহ ভূমি থেকে পানীয় জল বের করে দিয়েছিলেন। কারণ এই যে, প্রতিটি প্রভুর নিজস্ব ক্ষমতার স্তর রয়েছে। কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) হলেন কুরআন মজিদের (শরীফের) জ্ঞানদাতা। তার ক্ষমতা কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাও আবার তার মধ্যে কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জগতের প্রাণী রয়েছে। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা রয়েছি, এটির প্রভু হলেন এই কালব্রহ্ম। তাঁর স্তরের সাধনা করলে, সে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে চমৎকার করতে পারেন আর এই কাল ব্রহ্মের দ্বারা বলা ভক্তি ক্রিয়াকর্ম করলে, কেউ সর্বদা জান্নাতে (স্বর্গে) থাকতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে চিরকাল সে চলতেই থাকবে। এছাড়া কুকুর, গাধা, শুকর, পশু-পাখি, জীব-জন্তুর ইত্যাদি শরীর প্রাপ্ত করে প্রত্যেক জীবকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাতে কেউ ভক্তি (ইবাদত) করুক বা না করুক। ইবাদত (ভক্তি) যারা না করে, তারা তো সরাসরি জাহান্নামে (নরকে) যায়। তারপর পশু-পাখি ইত্যাদির জীবন ভোগ করে। যারা ইবাদত করে তারা কিছু সময়ের জন্য জান্নাতের সুখ প্রাপ্ত করে, তবে সেই স্বর্গ সুখ ভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর, তাদেরকেও জাহান্নামে (নরকে) যেতে হয়। এরপরে অন্যান্য জীবের শরীরেও কষ্ট ভোগ করতে হয়।

একমাত্র সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা কাদির আল্লাহর {গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩- এ যে পরম অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়েছে, তাঁর বিষয়ে এই অধ্যায় শ্লোক ৮-১০ ও ২০-২২ এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৭, গীতার অধ্যায় ১৮ শ্লোক নং ৪৬ ও ৬১-৬২- তে এবং গীতার অনেক স্থানে প্রমাণ রয়েছে। কুরআন মজিদের সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং. ৫২-৫৯, সূরা বাকারা-২ আয়াত নং. ২৫৫ এবং অন্য অনেক সূরাতে রয়েছে যে, যাঁকে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, প্রভু এবং শাশ্বত (অবিনশ্বর) বলে বর্ণনা করা হয়েছে} ইবাদত করলে, ওই সাধক (বান্দা/ভক্ত) শাশ্বত অর্থাৎ অমর সুখের স্থান সতলোক প্রাপ্ত করবে। সেখানে যাওয়ার পর পুনরায় এই কালের দুঃখময় লোকে জন্ম নিতে হয় না।

যে আল্লাহর ভক্ত আইয়ুব ছিলেন, তাঁরই ভক্ত কিন্তু ভীমও ছিলেন। মহাভারত গ্রন্থের একটি পর্ব রয়েছে, ভীম তার মা এবং স্ত্রী দ্রৌপদী এবং অন্য চার ভাইকে নিয়ে হিমালয় পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে জলের সঙ্কট ছিল, সকলে তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। ভীম তাঁর পায়ের গোড়ালি (knee) দিয়ে মাটিতে আঘাত করতেই, তৎক্ষণাৎ নিচের পাথরের স্থান থেকে মিষ্টি জলের প্রবাহ হতে লাগল। সেই স্থানটিকে ভীম গোড়া বলা হয়, যা ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হরিদ্বার শহরের নিকট অবস্থিত।

কেবলমাত্র এই ধরনের চমৎকার করলেই কাদির খুদা বলে মানা যায় না।

কাদির খুদা কবীর জী তাঁর এক ভক্ত কাশীর রাজা বীরদেব সিং বাঘেলের জন্য উঁচু শুকনো এক পাহাড়ের উপরে

মিষ্টি জলের পুকুর বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার চারপাশে ফলদার বৃক্ষের বাগান বানিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা রাজা ও তার সাথে শত শত সৈন্য শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারা সকলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কাদির আল্লাহ এইভাবে তাদের জীবনরক্ষা করেছিলেন।

কবীর আল্লাহ এই প্রকার চমৎকারের সাথে সাথে তাঁর ভক্তদেরকে পূর্ণ মোক্ষও প্রদান করেন। তাঁর বান্দাদের এমন শ্রেষ্ঠ স্থানে পাঠান, যে স্থানে কখনও জন্ম-মৃত্যু হয় না ও সর্বোত্তম জান্নাতের স্থান প্রদান করেন।

যত প্রভু (খুদা) আছেন, তাঁরা নিজের সম্মান অর্থাৎ মর্যাদা রাখার জন্য, তার ভক্তকে (বান্দা) নিজের যতটা শক্তি (power) আছে অর্থাৎ তার স্তরের ততটুকুই লাভ দেন।

{কবীর আল্লাহ তালার সামর্থতার সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে হলে পড়ুন অধ্যায় "হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত" সেখানে অনেক প্রমাণ রয়েছে।}

প্রশ্ন :- কুরআন মজিদের সূরা সোয়াদ- ৩৮ আয়াত নং ৪৫-৫১-তে আমাদের (মুসলিমদের) আল্লাহ বলেছেন যে, যারা আমার বান্দা অব্রাহাম, ইসহাক, য়াকুব, ইস্মাইল, অল্'য়াসঅ ও জুলকিফলের মতো ধার্মিক ও সংযমীযুক্ত হবে, তাঁদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা থাকবে। তাঁরা সেখানে কুশন (কোল বালিশ) লাগিয়ে বসবে। তাঁদের আহারের জন্য প্রচুর বাদাম ও ফল এবং পান করার জন্য মদ থাকবে এবং তাদের পাশে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নম্র স্বভাবের (লাজুক) সমবয়সি বিবিরা (স্ত্রীগণ) থাকবে। তাহলে কি এই বান্দাগণ (ভক্তগণ) এই আল্লাহর জান্নাতে (স্বর্গ) চিরকাল সুখে থাকতে পারবেন না?

(রামপাল দাস) তাদেরকে এইভাবে উত্তর দেবে :-

উত্তর :- যেখানে মদ পান করা হয়, সেখানে কেউ সুখী কীভাবে থাকতে পারে এবং কীভাবে তা চিরস্থায়ী হতে পারে? আপনারা "মুসলমান বোঝেননি জ্ঞান কুরআন" এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং 44 এ "সর্বনাশের জন্য মদ্যপান যথেষ্ট" অধ্যায়টি পড়ুন।

পুরাণের কথা :- জান্নাতে (স্বর্গ) নল ও কুবর নামে দুই দেবতা ছিলেন। তাঁরা কুবের দেবতার পুত্র ছিল। একদিন দুজনেই মদ্যপান করে নদীর তীরে উলঙ্গ হয়ে উৎপাত করতে লাগল। সেই নদীতে ওই স্থানে দেবতাদের (ফেরেশতাগণ) স্ত্রী-কন্যারা স্নান করছিলেন, তাঁরা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নদীর গভীর জলে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবর্ষি নারদ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। নল ও কুবর এই দুইজন দেবর্ষি নারদকেও দেখেও লজ্জাবোধ করেন নি। ওইভাবে তারা নারীদের প্রতি অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাদের বুঝিয়েছিলেন কিন্তু মদের নেশায় তাদের কোনো হুঁশ ছিল না, কেননা মদ যেন তাদের মাথায় চড়ে গিয়েছিল, সেইজন্য মানেন নি। তখন তিনি তাদের অভিশাপ দিলেন যে, তোমরা স্বর্গে (জান্নাত) থাকার যোগ্য নও। পৃথিবীর উপর জড় যোনিতে বৃক্ষ রূপে উৎপন্ন হয়ে যাও। দুজনেই তখন স্বর্গে মারা গেলেন আর পারে উভয়েই পৃথিবীর উপর অর্জুন ও জুমলা নামের বৃক্ষ রূপে কালিদহ নামক ঝিলের পাশে উৎপন্ন হয়ে গেল।

যেখানে মদ পান করা হয় এবং যে আল্লাহ মদের লোভ ও অন্য লোভ দিয়ে তাঁর ইবাদতে (পূজা) নিয়োজিত করেন, তিনি কখনই তো কাদির আল্লাহ হতে পারেন না। তিনি হলেন কাল জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম)। সতলোক ব্যতীত অন্য কোনো ছোটো জান্নাতে (স্বর্গ) এবং কাল ব্রহ্মের ব্রহ্মলোকেও (বড় জান্নাত) কেউই চিরকালের জন্য থাকতে পারে না। এটি একশো শতাংশ সত্য।

বিবেচন :- কুরআন মজিদের উপরোক্ত সূরা সোয়াদ ৩৮ আয়াত নং. ৪৫-৫১ -তে এটাও লেখা আছে যে, যারা জান্নাতে (বেহেশতে) যাবে, তারা তাদের সমান বয়সের (সমবয়সি) বিবি (স্ত্রী) পাবে যারা নিম্ন দৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ খুব লাজুক স্বভাবের হবে।

এই জ্যোতি নিরঞ্জন আল্লাহ (কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ) বলেছেন যে, (মুসলিম ভাইয়েরা যেমন বলেন) সব মানুষ কিয়ামত না আসা পর্যন্ত মরতেই থাকবে আর তারা কবরের মাটিতে দাফন হতে থাকবে। যখন কিয়ামত (প্রলয়) আসবে, তখন সকল মুসলমানদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে অর্থাৎ পুনরায় জীবিত করা হবে। যে সকল মুসলমান পবিত্র আত্মারা আনুগত্যকারী (আল্লাহর হুকুমের প্রতি আজ্ঞাকারী) হবে, তাদেরকে জান্নাতে রাখা হবে এবং কাফিরদেরকে (অবজ্ঞাকারী ও এক আল্লাহ ছাড়া অন্য মান্যতাকারী) জাহান্নামে (নরকে) রাখা হবে।

বিচার করুন :- কেউ তো দুই বছর বয়সেও মারা যায়, কেউ দশ বছর বয়সে, কেউ যুবক অবস্থায়, কেউ আশি বা পচাঁশি বছর বয়সে মারা যায়। অতএব তাদের সমবয়সি স্ত্রীরাও ওই একই বয়সের আয়ু পাবে। ষাট বছরের পুরুষ ষাট বছরের স্ত্রী পাবে। সত্তর বছরের পুরুষ সত্তর বছরের স্ত্রী পাবে। এই প্রকার অন্যান্য (দুই বছরের, দশ বছরের বা অন্যান্য) বয়সীদেরও এই একই দশা হবে। তাতে তাদের নিম্ন দৃষ্টিযুক্ত হোক বা উপরে দৃষ্টি দিয়ে তাকানো স্ত্রীই হোক

না কেন? তারা জান্নাতে (স্বর্গ) কি ছাই সুখ পাবে?

এ হল কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের ফাঁসিয়ে রাখার এক ভয়ংকর ভ্রমিত করা অর্থাৎ ছলনা বা ষড়যন্ত্রের জাল। এই প্রকার ভ্রমিত অর্থাৎ বিভ্রান্তিকর জ্ঞান এই কালের দ্বারা দেওয়া হয়। যাতে সমস্ত মানুষ পাপ কর্ম করতে থাকে এবং এখানে জন্ম নিতে থাকে আর মরতে থাকে। তারা কখনো স্বর্গে, কখনো নরকে, কখনো পশু-পাখির যোনিতে ও আরো অন্য সমস্ত যোনির শরীরে আজীবন ভ্রমিত হতে থাকে।

প্রশ্ন :- কিভাবে বিশ্বাস করবেন যে, কালজ্যোতি নিরঞ্জন হলেন কুরআন মজিদের জ্ঞান দাতা?

(রামপাল দাস) উত্তর :- পবিত্র কুরআন মজিদের প্রমাণই যথেষ্ট। আপনারা এই কথা তো জানেন যে, হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত, সকলেরই খুদা অর্থাৎ আল্লাহ একই এবং হজরত মূসাকেও পবিত্র কিতাব তৌরাত, তাঁর দ্বারাই প্রদান (নাজিল) করা হয়েছিল। কুরআন মজিদ সূরা আল কাসাস ২৮ আয়াত নং. ২৯ - ৩২-তে এবং সূরা ত্বা-হা ২০ আয়াত নং. ৯ - ২৩-তে লেখা আছে যে, হজরত মূসা তুর (কাতুর) পর্বতের চূড়ায় আগুন জ্বলতে (জ্যোতি) দেখেছিলেন। তিনি তাঁর পরিবার বর্গকে বললেন, তোমরা সবাই এখানে অপেক্ষা করো! আমি তোমাদের জন্য ওখান থেকে অঙ্গার অর্থাৎ জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসছি। মূসা যখন ওই আগুনের নিকট পৌঁছলেন, তখন দেখলেন যে, সেটি কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গার (আগুন) ছিল না। সেটি তো অলৌকিক প্রকাশ ছিল। ওই প্রকাশ থেকে আওয়াজ এলো, হে মূসা! আমি হলাম তোমার রব (আল্লাহ)। তুমি তোমার জুতো খুলে খালি পায়ে এই পর্বতের উপরে চড়ো। মূসা যখন কিছুদূরে এগিয়ে গেলেন, তখন পুনরায় ওই আলোর জ্যোতি থেকে আওয়াজ এলো, মূসা! তুমি তোমার লাঠি আমার দিকে ছুঁড়ে দাও। মূসা তখন লাঠিটি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন, যেটি এক সাপ হয়ে চলতে লাগলো। তারপর বললেন, আমি তোমাকে আমার রসূল বানাচ্ছি। তোমাকে কিতাবের সংকেত দিচ্ছি, আরো অনেক কিছু বললেন।

এর দ্বারা প্রমাণ হল যে, জ্যোতি নিরঞ্জন যাঁকে কাল বলা হয়। তিনিই মূসাকে তৌরাত গ্রন্থ প্রদান (নাজিল) করেছিলেন। তিনিই হলেন হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত নবীদের রব (আল্লাহ)।

এই জ্যোতি নিরঞ্জন কাল প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (কসম খেয়েছিলেন) যে, আমি কখনও কাউকে আমার নিজের আসল রূপে দর্শন দেবো না কিন্তু সমস্ত কার্য করবো। তিনি প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলেন? এই প্রশ্নটি জানার জন্য আপনি এই পুস্তকের 181 পৃষ্ঠা থেকে 227 পর্যন্ত "সৃষ্টি রচনা" নামক অধ্যায়টি পড়ুন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞানও এই জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে অর্জুনকে বলেছিলেন। গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪-২৫ এ এই জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম) বলছিলেন যে :-

শ্লোক ২৪ :- বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ আমার অশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ খারাপ (অনুত্তম) অটল ভাবকে অর্থাৎ নিয়মকে (অব্যয়ম) জানে না, এইজন্য আমাকে (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যক্তি রূপে আসা (কৃষ্ণ) মনে করে।

শ্লোক ২৫ :- আমি নিজের যোগ মায়া (শক্তি) দ্বারা লুকিয়ে থাকি। কারোর সামনে দৃশ্যমান হয়ে আসি না। এই অজ্ঞানী জন সমুদায় কখনো এই মানবের মতো জন্ম না নেওয়াকে জানে না।

অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমার অটল নিয়ম হল যে, আমি লুকিয়ে থাকি। সকলের সামনে কখনো দৃশ্যমান (প্রত্যক্ষ) হই না। সর্ব কার্য গুপ্ত ভাবে লুকিয়ে থেকে করতে থাকি।

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২-এ এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, "আমি কাল" সকলকে নাশ করার জন্য এখন (শ্রী কৃষ্ণের মধ্যে) এসেছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করেছি। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান বলেছিলেন।

এই ভাবে চারটি কিতাবের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের) জ্ঞান গুপ্ত অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে বলেছিলেন। ইনি সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা কাদির আল্লাহ নন। কবীর খুদা তো এই জ্যোতি নিরঞ্জনকে কাল করাল (শয়তান) বলেন।

অন্য প্রমাণ :- কুরআন মজিদের সূরাঃ আল বাকারা- ২ আয়াত নং. ৩৫ থেকে ৩৮ পর্যন্ত কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ বলছেন যে :-

আয়াত নং ৩৫ :- পরে আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী দুজনেই জান্নাতে (স্বর্গে) বসবাস করো, এখানে যা ইচ্ছা তাই স্বচ্ছন্দে খাও কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যেও না, অন্যথায় তোমাদেরকে অন্যায়কারীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে।

আয়াত নং. ৩৬ :- অবশেষে শয়তান তাদের উভয়কে সেই গাছের দিকে যেতে প্ররোচিত করে, আমার আদেশ অমান্য করিয়ে দেয়। আমি হুকুম দিয়েছি, এখনই এখান থেকে তোমরা নিচে নেমে গিয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়ে যাও আর (সাপ ও মানুষ একে অপরের শত্রু হয়ে গেল) নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে হবে। সেখানেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।

আয়াত নং. ৩৭ :- ওই সময় আদম তার রবের নিকট হতে কিছু শব্দ শিখে তৌবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করে নিলেন, তার সে প্রার্থনা রব কবুল (স্বীকার) করলেন। কারণ তিনি হলেন বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

আয়াত নং. ৩৮ :- আমি বলেছিলাম যে, "তোমরা এখান থেকে নিচে নেমে যাও।" পরে আমার পক্ষ থেকে যে মার্গ দর্শন তোমাদের কাছে পৌঁছবে, সেই অনুসারে চলবে। যে আমার মার্গ দর্শন অনুসার চলবে, তাদের জন্য তো কোনো ভয় কিংবা কোনো দুঃখ থাকবে না। (কুরআন মজিদের নিবন্ধ সমাপ্ত)।

পবিত্র বাইবেলে (তৌরাত পুস্তকে) লেখা আছে যে, পরমেশ্বর ছয় দিনে সৃষ্টি করেছিলেন, তারমধ্যে ষষ্ঠ দিনে মনুষ্যকে তিনি নিজের প্রতিমুর্তিতে নিজের স্বরূপ অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আদম ও হব্বা (হেবা/হবা) অন্যদেরকে সৃষ্টি করে তিনি সপ্তম দিনে আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। তারপরে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্মা) বাগডোর অর্থাৎ দায়িত্ব সামলিয়ে নিয়েছিলেন। এরপরে তিনি তাঁর তিন পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাধ্যমে সমস্ত কার্য করাতে লাগলেন।

উপরোক্ত কুরআন মজিদের বিষয়টি বাইবেল গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে, যা এই প্রকার :-

কাল ব্রহ্মা (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের তিন পুত্রের দ্বারা, তিনি নিজের ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন পুত্র হলেন কাল ব্রহ্মের। আদম ব্রহ্মার লোক থেকে আসা এক আত্মা ছিলেন। এই জন্য ব্রহ্মা আদমকে উদ্যানে সামলে রেখেছিলেন।

প্রভু কালের পুত্র ব্রহ্মা, হজরত আদম ও হজরত হব্বাকে (আদমের স্ত্রী হেবাকে) বলেছিলেন যে, তোমরা এই উদ্যানে লাগানো সমস্ত গাছের ফল খেতে পারবে কিন্তু মধ্যবর্তী গাছের ফল খাবে না, যদি খাও তাহলে মারা যাবে, পরমেশ্বর একথা বলে চলে গিয়েছিলেন।

এরপর সাপ এসে হেবাকে (হব্বা) বলল, মধ্যবর্তী গাছের ফল তোমরা খাচ্ছ না কেন? তখন হবা বললেন যে, ভগবান (আল্লাহ) আমাদের নিষেধ করেছেন যে, তোমরা যদি ওই গাছের ফল খাও, তাহলে মারা যাবে। অতএব এই গাছের ফল তোমরা খাবে না। সাপ তখন বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ তিনি চান না যে, তোমরাও প্রভুর মতো জ্ঞানবান হয়ে যাও। যদি তোমরা এই গাছের ফল খাও, তাহলে তোমাদের ভালো-মন্দের জ্ঞান হয়ে যাবে ও তোমাদের চোখের উপর থেকে অজ্ঞানতার পর্দা সরে যাবে, যে অজ্ঞানতার পর্দা প্রভু তোমাদের জ্ঞানের উপর দিয়ে রেখেছেন। এই কথা সাপ আদমের স্ত্রী হেবাকে (হবা) বলেছিল। হব্বা (হবা) তার স্বামী হজরত আদমকে বললেন, আমরা যদি এই গাছের ফল খাই, তাহলে আমাদের ভালো-মন্দ জ্ঞান হয়ে যাবে। এরপর তারা সেই গাছের ফল খেয়ে নেয় আর ঠিক তেমনটিই হয়ে গেল। তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল এবং তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারও কেটে যায়, যে অজ্ঞানতার পর্দা ভগবান তাদের উপর দিয়ে রেখেছিলেন। জ্ঞান হওয়ার পরে যখন তারা নিজেদেরকে নির্বস্ত্র দেখলেন, তখন তাঁরা লজ্জিত হলেন আর তারপরে লজ্জা নিবারণের জন্য অঞ্জীরের পাতা ছিড়ে ন্যাপির (লঙ্গোট) মতো বস্ত্র বানিয়ে, তাদের গুপ্ত অঙ্গের উপর বেঁধে নিলেন।

এই উপরের প্রকরণ পবিত্র বাইবেলের উৎপত্তি অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা কাদির আল্লাহ তো আকাশের ঊর্ধ্বে সিংহাসনে উপর বিরাজমান আছেন এবং আদম ও হবাকে জান্নাতে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধও করে দিয়েছিলেন কিন্তু পরে শয়তানের প্রেরণায় তারা সেই ভালো মন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গাছের ফল খেয়ে নিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ এলেন ও জানতে পারলেন যে, আদম ও হবা উভয় মিলে ভালো-মন্দ জ্ঞান হওয়া গাছের ফল খেয়ে নিয়েছে, যার কারণে এই মনুষ্য আমাদের মধ্যে এক জনের সমান হয়ে গেছে। সুতরাং এমন না করে যে, এরা জীবন বৃক্ষের ফলও ছিঁড়ে খেয়ে নেয় আর চিরকাল জীবিত থেকে যায়, এইজন্য তাদের জান্নাত (Heaven) থেকে বহিষ্কার (বাহির) করে দিয়েছি।

সৃষ্টির রচয়িতা হলেন আল্লাহ তালা, তিনি তো উপরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি উপরে চলে যাওয়ার পরে আদম ও হব্বার (হেবা) সাথে সৃষ্টির রচনাকারী কাদির আল্লাহ তালা ছিলেন না, অন্য আল্লাহ ছিলেন অর্থাৎ অন্য আল্লাহ প্রামাণিত হল। ওই উপরোক্ত কুরআন মজিদের সূরা আল বাকারা- ২, আয়াত নং ৩৫-৩৮-তে কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা স্বীকার করছেন যে, আমি আদম ও হব্বাকে জান্নাতে রেখেছিলাম আর ভুল করার কারণে তাদেরকে জান্নাত (স্বর্গ) থেকে বের করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছি। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজিদের (শরীফ) জ্ঞানদাতা অর্থাৎ হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত নবীদেরকে, রব কাদির আল্লাহ রচনা করেন নি। যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা একের অধিক ছিলেন। এই সমস্ত হল জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল ব্রহ্মা) প্রপঞ্চ অর্থাৎ ষড়যন্ত্র বা চালাকি। এই জ্যোতি নিরঞ্জন কখনও কারোর সামনে সাকার রূপে আসেন না। এইজন্য এই আল্লাহ কোথাও স্বয়ং অগ্নি রূপে আবির্ভূত হয়ে মানবদেরকে বিভ্রান্ত করেন, আবার কখনো নিজের তিন পুত্রের দ্বারা সকলকে ভ্রমিত করেন। এছাড়া কখনো তার

তিন পুত্রের মধ্যে কোনো একজনের মধ্যে তিনি প্রবেশ করে কিছু সত্য জ্ঞান ও কিছু মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে, নিজের জালে সকলকে ফাঁসিয়ে রাখেন।

মিথ্যা কথনের (কথা) প্রমাণ :- পবিত্র কুরআন মজিদের সূরাঃ আল বাকারা- ২ আয়াত নং. ৩৮- তে কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা(জ্যোতি নিরঞ্জন) বলেছেন যে, হে আদম ও হব্বা! তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও। আমি তোমাদের মার্গদর্শন করাবো অর্থাৎ আমি তোমাদের কিতাব নাজিল (প্রদান) করাবো। তারমধ্যে ধর্ম কর্মের তথ্য ও নিষেধাজ্ঞার (মর্যাদার) বিষয়ে বলে দেবো। যারা আমার নির্দেশ মেনে চলবে, তাদের জন্য কোনো আশঙ্কা ও দুঃখের সুযোগ হবে না। তবে আমরা যখন হজরত মুহম্মদের জীবনী পড়ি, তখন কান্না আসে যে, এমন মহান আত্মা যিনি কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা আল্লাহর, প্রতিটি আজ্ঞা তন, মন ও ধন দিয়ে পালন করেছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি সেই মার্গদর্শনেই চলেছিলেন। তথাপি হজরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জীবন ছিল খুবই দুঃখ-কষ্টে ভরা। যাঁকে ওই (কুরআন নাজিল করা) আল্লাহ তাঁর নিজের রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

যখন নবী মুহম্মদ তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন, তখন পিতা মারা যান। যখন ছয় বছরের হলেন, তখন তাঁর মাতা মারা যান। যখন আট বছর হলেন, তখন ঠাকুরদাদাও মারা গেলেন, যে ঠাকুরদাদা বালক মুহম্মদকে লালন-পালন করছিলেন। পরে তাঁর চাচা (কাকা) পালন করেছিলেন। অতএব এতিমের (অনাথ) জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন।

যদি বিচার করা হয়, তাহলে জানতে পারবেন যে, যেসকল সন্তানদের পিতা-মাতা মারা যায়, তাদের কি দশা হয়? কেউ পিতা-মাতার মতো ভালোবাসা দেয় না, কেউ তো ধমকি দেয়। ধনীর বাচ্চারা তো সুন্দর পোশাক পরে এবং অনাথদের বাচ্চাদের ছেঁড়া ও পুরানো বস্ত্র দেওয়া হয়। এছাড়া তাদেরকে দিয়ে অধিক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। এই এতিম বাচ্চারা নিজের দুঃখের কথা কার সামনে বলবে? অন্য বাচ্চারা মেলায় টাকা-পয়সা নিয়ে যায় আর অনাথ বাচ্চারা কেবল নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকে। উৎসবের দিন সকলে ভালো খাবার খায় আর অনাথদেরকে শুকনো ও বাসি ভোজন দেওয়া হয়, এই ধরণের অনেক প্রকারের কষ্ট ভোগ (সহ্য) করতে হয়।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ হয়নি। তারপর খাদিজা নামের এক চল্লিশ বছরের বিধবা মহিলার সাথে হজরত মুহম্মদের বিবাহ হয়েছিল। খাদিজার পূর্বে দুইবার বিধবা হয়েছিল। বিবাহের পরে হজরত মুহম্মদের দ্বারা হজরত খাদিজার তিন পুত্র ও চার কন্যার জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর (নবীর) চোখের সামনেই তাঁর তিন পুত্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল। কাল অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের বলা কুরআন মজিদের জ্ঞানের প্রচার করার সময়, চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অনেক লড়াই লড়েছিলেন। এমন কি বিরোধীদের দ্বারা তিন বছর বয়কটও করে দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সমস্ত পরিবার অত্যন্ত শোকাহত ছিলেন। বাচ্চারা পাতা খেয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটিয়েছিল এবং হজরত মুহম্মদের তেষট্টি বছর বয়সের সময় মহাকষ্ট ভোগ করে মৃত্যু হয়েছিল।

কুরআনের জ্ঞানদাতা উপরোক্ত সূরা আল বাকারা ২ আয়াত নং. ৩৮ -তে বলছেন যে, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম করবে, তাদের কোনো দুঃখ হবে না। এই কথা রসূলের জীবনের সাথে মেলেনি। সর্বশক্তিমান কাদির আল্লাহ হলেন কবীর। তিনি তাঁর ভক্ত-ভক্তিমতী ও রসূলদের নিকটে কোনো কষ্ট আসতে দেন না এবং সকলকে পূর্ণমোক্ষ প্রদান করেন এবং সরাসরি সতলোকে (শাশ্বত ধামে/অমর ধামে) নিয়ে যান। সামর্থবান পরমেশ্বরকে তো কুরআনের জ্ঞান দাতা কাল জ্যোতি নিরঞ্জনও ভয় পান। এইজন্য কালব্রহ্ম নিজের রক্ষার্থে অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাবার জন্য, ওই কাদির আল্লাহ কবীরের ইবাদত (পূজা/সাধনা/উপাসনা) ছাড়া অন্যের সাথে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। আবার তিনি নিজের ইবাদতও করার উপরও অধিক জোর দিয়ে বলছেন যে ,আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শরীক (আমার সমান না মেনে) না করে আমার পূজা (ইবাদত) কর।

এইভাবে এই কাল ব্রহ্ম গীতার জ্ঞান দিয়েছেন। তাতে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১-তে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, হে ভগবান! আপনি যে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ -তে, যে তত্ ব্রহ্মের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, সেই তত্ ব্রহ্ম কে আছেন?

এর উত্তর কাল ব্রহ্ম গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩ -তে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম।

আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ -তে তিনি নিজের পূজা করতে বলছেন এবং শ্লোক ৮-৯ ও ১০- তে তিনি নিজেকে ছেড়ে, অন্য পরম অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করতে বলেছেন। এটাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, যারা আমার ইবাদত (ভক্তি) করবে, তারা তো আমার কাছে আমারই লোকে (ধাম) থাকবে আর যদি ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মের (সামর্থবান পরমেশ্বর) ভক্তি করে, তাহলে তারা তাঁকে প্রাপ্ত করবে এবং তাঁর সতলোকে চলে যাবে।

গীতার জ্ঞানদাতা নিজের বিষয়ে অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ -তে, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ এবং অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-তে অর্জুনকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জন্ম ও মৃত্যু তোরও হতে থাকবে আর আমারও হতে থাকবে।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬, ৬১ -তে ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বিষয়ে বলেছেন যে :-

পরম অক্ষর ব্রহ্ম (সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা কাদির আল্লাহ/ পালনকর্তা পরমেশ্বর) তিনিই আছেন, যিনি এই সমস্ত সংসারের রচনা করেছেন। তিনি এগুলিকে সাহারা দিয়ে, নিজের শক্তি দ্বারা স্থির করে রেখেছেন। তিনি সমস্ত জীবকে তাদের কর্ম অনুসারে অন্যান্য প্রাণীর শরীরে, স্বর্গ, নরক ও মানবদেহে পরিভ্রমণ করান অর্থাৎ সমর্থ পরমেশ্বর বিধান (নিয়ম) বানিয়ে রেখেছেন যে, যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল অবশ্যই পাবে।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ -তে বলছেন যে, হে অর্জুন! তুমি সর্ব ভাব দ্বারা ওই পরমেশ্বরের শরণে যাও। সেই পরমেশ্বরের কৃপায় তুমি পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম (অমর লোক) প্রাপ্ত করবে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -তে বলছেন যে, ওই তত্ত্বজ্ঞান তত্ত্বদর্শী সন্ত (বাখবর) থেকে প্রাপ্ত করার পরে, ওই (উপরোক্ত) পরমেশ্বরের পরমপদের (সতলোক) সন্ধান করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পরে সাধক (বান্দা) পুনরায় কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না। তাঁর পূজা করো।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ -তে বলা হয়েছে যে, ক্ষর পুরুষ (কাল ব্রহ্ম) ও অক্ষর পুরুষ (অক্ষর ব্রহ্ম) এই দুই প্রভু, এই নাশবান লোকে রয়েছেন। এই দুই পুরুষ এবং তাঁদের অন্তর্গত সমস্ত প্রাণী বিনাশ শীল কিন্তু সকলের আত্মা অবিনাশী (অমর)।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ -তে বলা হয়েছে যে, উত্তম প্রভু অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো উপরোক্ত দুই প্রভু (কাল ব্রহ্ম ও অক্ষর ব্রহ্ম) থেকে অন্য আছেন, যাঁকে বাস্তবে সর্বশক্তিমান পরমাত্মা বলা হয় এবং যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ভরণ-পোষণ করেন, তিনিই হলেন অবিনাশী পরমেশ্বর।

গীতাতে এটাও স্পষ্ট করা দিয়েছে যে, ওই পরমেশ্বরের ভক্তি অনন্য ভাবের দ্বারা করো অর্থাৎ তাঁর সাথে অন্য কোনো দেবতাদেরকে পূজা (ইবাদত) করবে না, আবার কাল জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের বিষয়েও এই কথা বলেছেন যে, আমার ভক্তিও করো, অন্য কোনো দেবতাকে আমার সমতুল্য ভেবে পূজা করো না।

এই প্রকার কুরআনের জ্ঞানদাতা সূরা আম্বিয়া - ২১ আয়াত নং. ৩০, ৩১, ৩২, ৯২ -তেও নিজের ইবাদত (পূজা) করতে বলেছেন এবং নিজের মহিমাও বলছেন। সূরা বাকারা - ২ আয়াত নং. ২৫৫ -তে নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য পরমেশ্বরের মহিমার বিষয়ে বলেছেন এবং সূরা ফাতিহা -১ আয়াত নং. ১ থেকে ৭ -তে সমর্থ রহমানের ইবাদত করতে বলেছেন।

উপরোক্ত প্রমাণে সিদ্ধ হল যে, কুরআন মজিদের (শরীফের) জ্ঞান দাতা কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন), যিনি সবাইকে ভ্রমিত করে ঠকিয়ে রাখেন। সকলকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা শুনিয়ে, তাঁর জালে ফাঁসিয়ে রাখেন। সকলকে পাপ কর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন, যুদ্ধ (লড়াই-ঝগড়া) করাতে থাকেন, যাতে সমস্ত জীব দুঃখী হয়ে ভক্তি না করতে পারে এবং যদিও বা করে তা ভুল ভক্তি।

☞ **অন্যান্য প্রমাণ :-** কুরআন মজিদ সূরাঃ সজদা - ৩২ আয়াত নং. ১৩ -তে কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা দোজখ (নরক) ভরে দেবো। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম কিন্তু আমাকে জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম ভরতে হবে। এই কারণেই অসম্পূর্ণ ও ভুল ইবাদত (ভক্তি) সবাইকে বলতে থাকে, এছাড়া পাপ কর্ম বাড়ানোর জন্য মাংস খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। যার কারণে কেবল জাহান্নামই ভরবে, জান্নাতে তো কেউ যেতেই পারবে না। কুরআনের জ্ঞান দাতা এইজন্য লড়াই করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

প্রমাণের জন্য দেখুন সূরাঃ আন্ নিসা ৪, আয়াত নং ৭১ থেকে ৮৪ পর্যন্ত :-

আয়াত নং ৭১ :- হে ইমানদার মানব! যারা ইমান এনেছো, লড়াইয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তারপর যখনই অবসর প্রাপ্ত হবে, পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে বের হও একত্রিত হয়ে।

আয়াত নং. ৭২ :- হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে এমনও কিছু কিছু ব্যক্তিরা আছে, যারা লড়াই না করার বাহানা করে।

আয়াত নং. ৭৪-৮৪ :- অতএব, হে নবী! তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো।

এই ধরনের ওহী (সংবাদ) পাঠিয়ে-পাঠিয়ে হজরত মুহম্মদকে আজীবন যুদ্ধে লাগিয়ে রেখে তাঁর জীবনকে

সম্পূর্ণ নরকে পরিণত করে দিয়েছিলেন। পরিবারের মধ্যে মৃত্যুর ভয়ংকর দশা, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ লড়িয়ে-লড়িয়ে তাঁর (নবীর) কর্মই নষ্ট করিয়েছিল এবং ওই ভক্ত আত্মাকে সঠিক জ্ঞানও বলেন নি আর না সঠিক ভক্তির বিধি বলেছেন। এর প্রমাণ এই কথনের উপর রয়েছে যে, সূরা ফুরকান - ২৫ আয়াত নং. ৫২-৫৯ -তে বলা হয়েছে যে, কাদির আল্লাহ হলেন কবীর, যিনি সমস্ত কিছুর রচনা করেছেন। তাঁর খবর অর্থাৎ তাঁর বিষয়ে জানতে হলে কোনো বাখবরের (তত্ত্বজ্ঞানী) নিকট জিজ্ঞাসা করো। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কুরআনের জ্ঞান হল অসম্পূর্ণ।

সূরাঃ আশ শূরা - ৪২ আয়াত নং. ১, ২ -তে সাঙ্কেতিক শব্দ (Code words) বলে দেওয়া হয়েছে :- (১) হা. মীম, (২) ঔন, সীন, কাফ। এ হল মোক্ষ প্রাপ্তির মন্ত্র কিন্তু এটিও অসম্পূর্ণ। এই মন্ত্রের জ্ঞান না হজরত মুহম্মদের নিকট ছিল আর না তো কোনো মুসলমান শ্রদ্ধালুদের কাছে ছিল। তাহলে তাঁরা মুক্তি পাবেন কিভাবে? যদি কেউ বলেন যে, নবী মুহম্মদের কাছে হয়তো এই জ্ঞান ছিল? উত্তর - যদি নবীজির নিকট এই জ্ঞান থাকতো, তাহলে কি তাঁর সাথীদের তিনি বলতেন না? এক একটা কথাও তিনি মুসলমানদের কাছে বলতেন।

এই আল্লাহ হজরত মূসাকে তৌরাত কিতাবের জ্ঞান দিয়েছিলেন, যেটি একবারেই নাজিল হয়েছিল। ওই "তৌরাত" কিতাবের জ্ঞানই হজরত মূসা সৎসঙ্গের মাধ্যমে বলতেন। এক সৎসঙ্গী জিজ্ঞাসা করেন যে, হে মূসা! বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম (বিদ্বান) কে? হজরত মূসা বললেন, পৃথিবীর মধ্যে আমিই হলাম সবচেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী)। এই কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লাহ মূসাকে বললেন, তোমার জ্ঞান তো অল-খিজ্রের (খিজির) জ্ঞানের সামনে কিছুই না। এই কারণে ওই জ্ঞানকে অর্জন করতে মূসা অল-খিজ্রের নিকটে গিয়েছিলেন কিন্তু জ্ঞান অর্জন না করেই ফিরে আসেন। হজরত মূসার তো এই বিশ্বাস ছিল যে, আমার কাছে যে জ্ঞান আছে, এটি তো কাদির আল্লাহরই দেওয়া জ্ঞান। এইজন্যই তিনি নিজেকে সবচেয়ে বড় বিদ্বান বলেছিলেন। পরে ওই আল্লাহ (জ্যোতি নিরঞ্জন কাল) বলেছিলেন যে, তোমার জ্ঞান কিছুই না। যদি তৌরাতের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের (যে জ্ঞান অল-খিজ্রের কাছে ছিল, সেই জ্ঞানের) সামনে কিছুই না, তাহলে সেই জ্ঞান হজরত মূসাকে কেনই বা বলেছিলেন? যখন হজরত মূসা অল-খিজ্রের নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন আর পরে খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁকে ওই যথার্থ জ্ঞান বলে দেওয়া উচিত ছিল। ওই যথার্থ জ্ঞান হজরত মুহম্মদকেও বলেননি, তাঁকেও বলে দিয়েছিলেন যে, ওই সর্বশক্তিমান সৃষ্টির উৎপত্তিকর্তা কাদির আল্লাহর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্তের) কাছে জিজ্ঞাসা করো।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত, সকল নবীদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা এবং মাংস ভক্ষণ করার প্রেরণা ও লড়াইয়ের প্রেরণা করিয়ে পাপ করানোর উদ্বুদ্ধকারী জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ছিলেন। এই কাল ব্রহ্মই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান অর্জুনকেও দিয়েছিলেন। যে সময় চাচা ও বড় চাচাতো ভাইদের অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য বিভাজন নিয়ে যুদ্ধ প্রারম্ভ হওয়ার ছিল এবং দুই পক্ষের সৈন্য বাহিনী সামনা-সামনি যুদ্ধ করার জন্য মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় পাণ্ডব যোদ্ধা অর্জুন, তার আপন চাচাতো ভাই ও ভাইপোদের দেখলেন, যারা যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন দয়াভাব উৎপন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, যে ভাইদের সন্তানদের আমি কোলে-পিঠে করে আদর করেছি, আজ তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি? তাই বিচার করলেন যে, যুদ্ধ করলে অনেক সৈন্য মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা বিধবা হবে, অনেক বাচ্চারা এতিম (অনাথ) হয়ে যাবে, আমার মহাপাপও হবে। এইকারণে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, অস্ত্র নামিয়ে রেখে, রথের পিছনে গিয়ে বসে পড়লেন। যদি অর্জুন যুদ্ধ করতে মানা করে দিতেন, তাহলে যুদ্ধ হতো না।

যখন কালব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) দেখলেন যে, যুদ্ধ হবে না। তখন নিজের পুত্র বিষ্ণু উরফ শ্রীকৃষ্ণের (যাঁকে কাল নিজের নবী বানিয়ে ওই সময় পাঠিয়েছিলেন, তাঁর) শরীরে প্রেতবত্ প্রবেশ করে, গীতা পুস্তকের জ্ঞান দিয়ে বললেন যে, অর্জুন! তুমি যুদ্ধ করো। তোমাকে তো কেবল নিমিত্ত হতে হবে, এদের সকলকে আমি মেরে রেখেছি কিন্তু অর্জুন তা মানতে রাজি ছিলেন না, তাই বললেন যে, হে কৃষ্ণ! আমার ভাইদের ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে রাজ্য প্রাপ্ত করার থেকে তো আমি ভিক্ষার অন্ন খাওয়া পছন্দ করবো। অতএব আমি যুদ্ধ করবো না।

কালব্রহ্ম গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৭ -তে অর্জুনকে প্ররোচিত করে যে, হে অর্জুন! তোমার দুই হাতে লাড্ডু। যদি যুদ্ধে নিহত হও, তো স্বর্গ (জান্নাত) প্রাপ্ত করবে আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও, তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব প্রাপ্ত করে রাজ্যের সুখ ভোগ করবে।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৮- এ বলা হয়েছে যে, জয়-পরাজয়, লাভ-হানি ও সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এই প্রকারের যুদ্ধ করলে তোমার পাপ হবে না।

যখন অর্জুন যুদ্ধের জন্য রাজি হলেন না, তখন অর্জুনকে ভয় দেখানোর জন্য কালব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন তাঁর নিজের বিরাট বিক্রাল (ভয়ংকর) রূপ দেখালেন, তাঁর ওই ভয়ংকর রূপ দেখে, অর্জুন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন আর যুদ্ধের জন্য রাজি হয়ে গেলেন। মহাভারত নামে যে যুদ্ধ হয়েছিল যা একপ্রকার বিশ্বযুদ্ধ ছিল। ওই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য মারা গেলেন। পাণ্ডবরা জয়ী হয়ে ছিলেন ও পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (বড়) ভাই যুধিষ্ঠির ছিলেন, যিনি রাজা হলেন। যুধিষ্ঠির স্বপ্নে মাথাবিহীন মানবের ধর অর্থাৎ শরীর দেখতে লাগলেন, যুদ্ধে সৈন্যদের বিধবা স্ত্রীদের শোকাহত হৃদয় বিদারক কান্নার দৃশ্য দেখতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ভয়ভীত হয়ে জেগে যেতেন, পুনরায় আর ঘুমাতে পারতেন না। খাওয়া দাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে যেতে লাগলো। যুধিষ্ঠিরের অন্য চার ভাই (অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব) বড় ভাইয়ের এই দশা দেখে, বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন যে, রাতে তিনি ঘুমাতে পারেন না। যখনই ঘুম আসত, তখনই ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে ভয়ে উঠে বসে পড়তাম। পাণ্ডবদের গুরু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, যাঁর শরীরে কালব্রহ্ম প্রবেশ করে, অর্জুনকে গীতার জ্ঞান প্রদান অর্থাৎ নাজিল করেছিলেন। অর্জুন বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, গীতা পুস্তকের জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। পাঁচ ভাই তাদের গুরু শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের সমস্যার কথা জানালেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, তোমরা যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের (ভাই, ভাইপো অন্যান্যদের) হত্যা করেছো। সেই পাপের কারণে যুধিষ্ঠির রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে, এই সব সঙ্কট আরম্ভ হয়েছে। তিনি এর সমাধানের জন্য পরামর্শ দিলেন যে, একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। সেই যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবীর সাধু, সন্ত, ঋষি-মুনি ও আত্মীয়-স্বজন এবং স্বর্গের দেবতা আদিদের ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বললেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই কথা শুনে, অর্জুনের মনে পড়ে যায় যে, "যখন উভয় পক্ষের সেনাগণ যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়েছিল, আমি যুদ্ধ না করার জন্য বলেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলেছিলেন যে, যুদ্ধ করো তোমাদের কোনো পাপ হবে না। আমি লাখ বার মানা করা সত্ত্বেও মানেন নি আর যুদ্ধ করার জন্য আমাকে প্রেরিত করলেন। সেই যুদ্ধে কত মানুষ মারা গিয়েছিল আর এখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বলছেন যে, যুদ্ধে মানব হত্যার পাপের কারণে এই সংকট এসেছে, যার সমাধান করতে ওই সময় অরব টাকা খরচ হওয়ার ছিল। এই জন্য ধৈর্য ধরেছিলাম যে, বড় ভাইয়ের জীবন সঙ্কটে ছিল। যজ্ঞ করার পরে বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল।

তারপরে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কুলের (সকল বালক, যুবক, বৃদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারের আত্মীয়স্বজন-ভাই-বন্ধু-বান্ধবদের) দুর্বাসা ঋষির দ্বারা অভিশাপ দিয়ে, জ্যোতি নিরঞ্জন কাল সর্বনাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে ৫৬ কোটি যাদব (শ্রীকৃষ্ণের যাদব বংশের ব্যক্তিরা) ছিলেন, তারা একে অপরের সাথে লড়াই করে মারা গেলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকেও একজন শিকারি মেরে ফেলেছিলেন। কাল তার নিজের নবী শ্রীকৃষ্ণকেও রেহাই দেয়নি। তাঁর চোখের সামনেই সকলের সর্বনাশ হয়েছিল। এমনকি পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ জীবন রাজত্বও করতে দেয়নি। যখন শ্রীকৃষ্ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন পাঁচ পান্ডবকে ডেকে বললেন যে, তোমাদের মাথার উপর যুদ্ধ করার পাপের শাস্তি অনেক অধিক, এই কারণে তোমরা পাঁচ পান্ডব হিমালয় পর্বতের উপর গিয়ে তপস্যা করো আর সেখানেই মৃত্যু বরণ করো। তাহলে যুদ্ধে সংঘটিত হওয়া পাপ সমাপ্ত হয়ে যাবে। পাঁচ পাণ্ডব রাজ্য ত্যাগ করে, হিমালয় পর্বতে গিয়ে বরফে গলে মারা যান। তারপর যুদ্ধের পাপের কারণ তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

নরকে পাপ ভোগ করার পর, পুণ্যের ফল স্বর্গে প্রাপ্ত করে, এই প্রকার কাল ব্রহ্মের ভয়ঙ্কর জাল রয়েছে।

কাল জ্যোতি নিরঞ্জন মিথ্যা কথা বলে, জীবকে ভ্রমিত করে নিজের জালে ফাঁসিয়ে রাখেন। এই লোকে জীবের কোনো সুখ হতে পারে না। এই প্রকার কাল জ্যোতি নিরঞ্জন, হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত সকলের দুর্গতি করেছিলেন। যাঁকে কাদির আল্লাহ কবীর কসাইয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন, যে সমস্ত জীবকে ভ্রমিত করে নিজের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। এঁর জাল অর্থাৎ বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, সকল মানবকে সমর্থ কবীর আল্লাহর আশ্রয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে ওই কবীর আল্লাহ আমাকে (রামপাল দাস) অন্তিম নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার নিকটে ওই কাদির আল্লাহর প্রদান করা যথার্থ ভক্তি বিধি ও যথার্থ জ্ঞান রয়েছে। পৃথিবীর সকল মানবগণ, আমার দ্বারা বলা ইবাদত করুন, যাঁর দ্বারা ওই কাদির আল্লাহ কবীরের সতলোকে যেতে পারবেন। সেখানে সর্বদা সুখী থাকবেন, কখনও মৃত্যু হবে না। এই কালের লোকে যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন সুখে থাকতে পারবেন। অকাল মৃত্যু হবে না। রোগ-শোক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন।

উপরোক্ত প্রমাণ থেকে সিদ্ধ হয় যে, যিনি বাইবেল, কুরআন ও গীতার জ্ঞান দিয়েছেন, তিনি হলেন কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন)। কাদির আল্লাহ হলেন কবীর, তিনি কেবল সত্য জ্ঞান বলেন।

প্রশ্ন :- চলতে-ফিরতে, রান্না ও খাওয়ার মাধ্যমে, কৃষি ও অন্যান্য কাজে অনেক জীব মারা যায়, তাহলে ভক্ত কিভাবে মুক্তি লাভ করবে? সেই ভক্তেরও পাপ হবে। পাপীরা জান্নাতে যেতে পারবে না, তাহলে তারা কিভাবে যাবে? গরু, ছাগল, মুরগি এবং মানুষ এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম জীবের মধ্যেও তো আত্মা একই রকমই আছে।

উত্তর :- কাদির আল্লাহ বিধান বানিয়েছেন এবং বলেও দিয়েছেন যে :-

কবীর, ইচ্ছা কর মারে নহীঁ, বিন ইচ্ছা মর জায়। কহ কবীর তাস কা পাপ নহীঁ লগায়॥

অর্থাৎ হাঁটার সময়, কৃষিকর্ম করার সময়, মাটি খনন করার সময়, রান্না ও খাওয়া ইত্যাদি করাতে জীব মারার উদ্দেশ্য থাকে না। কর্ম করা অবস্থায় যদি কোনো কীট-পতঙ্গ জীবের মৃত্যু হয়, তাহলে পাপ লাগে না। তবে এই পাপ অন্য ব্যক্তিদের লাগবে, তাতে তারা অন্য কোনো সন্তের বা গুরুর নিকট হতে দীক্ষা নিয়ে থাকুক না কেন। কবীর আল্লাহর ভক্তদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তারা জেনে শুনে পাপ কর্ম করতে পারেন না। অনিচ্ছাকৃত পাপের দণ্ড বা শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয় না।

উদাহরণ :- যেমন ড্রাইভিং (ড্রাইভার) লাইসেন্স (সার্টিফিকেট) ওই ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, যিনি সম্পূর্ণভাবে গাড়ি চালাতে জানেন। এরপরেও যদি কোনো কারণে তার দ্বারা দুর্ঘটনা হয় এবং কেউ মারা যান, তাহলে তাকে হত্যার জন্য দোষী বলে গণ্য করা হয় না, কেননা তার নিকট চালকের প্রমাণ পত্র (ড্রাইবর লাইসেন্স) আছে। এই প্রকার যারা এই দাস থেকে (রামপাল দাস থেকে) দীক্ষা প্রাপ্ত করে রেখেছেন, তাদের অজান্তে করা পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয় না।

প্রশ্ন :- মোক্ষের পরিভাষা কী এবং মোক্ষ কিভাবে পাওয়া সম্ভব?

উত্তর :- মোক্ষের অর্থ হল "মুক্তি"। কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াকে মোক্ষ লাভ বলা হয়। যেমন টিয়া (তোতা) পাখিকে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে, তখন বলা হবে যে বন্দী হয়ে রয়েছে। টিয়া পাখিকে যদি খাঁচা থেকে বের করে স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয়, তাহলে সে বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল।

আধ্যাত্ম মার্গে মোক্ষ এবং বন্ধন এইপ্রকার হয় :-

সকল জীব কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যার কারণে জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে ফেঁসে কষ্ট পেতে হচ্ছে, এটাই হল বন্ধন। এই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই হল মোক্ষ প্রাপ্তি। কালজ্যোতি নিরঞ্জনের লোকে যে সকল প্রাণীরা কর্মের বন্ধনে বন্দী হয়ে রয়েছে অর্থাৎ যেমন ভালো ও মন্দ কর্ম প্রাণীরা করবে, তার ফল তাকে অবশ্যই পেতে হবে। যারা কালব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন) রসুলদের (সন্দেশবাহক) দ্বারা বলা জ্ঞানের আধারে ভক্তিমূলক ক্রিয়াকর্ম করেন, তারা গুরু অতি আবশ্যক বানাবেন। গুরুর দ্বারা বলা অনুসারে ভক্তি করলে, ওই কাল ব্রহ্মের সাধক স্বর্গে (জান্নাতে) ও নরকে (জাহান্নামে) তো অবশ্যই যাবে। কারণ কাল ব্রহ্মের লোকে দুই প্রকারের কর্ম

(পাপ কর্ম ও পুণ্য কর্মকে) ভোগ করার পরই তা সমাপ্ত করতে হয়। গুরু তাঁর নিজের শিষ্য ও শিষ্যাদেরকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচানো এবং পুণ্যকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন। যার কারণে গুরুর অনুগামীরা অধিক পুণ্য লাভ করেন। এইজন্য যখন তারা সংসার ছেড়ে চলে যাবেন, তখন স্বর্গে (জান্নাতে) থাকার জন্য অধিক সময় পেয়ে যাবেন, যা তার পুণ্যের প্রতিফলে হবে। স্বর্গের সময় সমাপ্ত হওয়ার পরে, ওই সাধকরা (বান্দারা) নরকে (দোজখে) যাবে আর নরক ভোগ করার পর, পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে কর্মের দন্ডও ভোগ করতে হবে। অতঃপর পুনরায় মানব (নারী বা পুরুষ) জন্ম প্রাপ্ত করতে হবে। তারপর ওই মানবজীবনে তারা যে যেমন কর্ম করবে, তাদের উপরোক্ত কর্মফল পেতে হবে। এই প্রক্রিয়া চিরকাল চলতেই থাকবে।

এই কাল ব্রহ্মের ভক্তগণ স্বর্গের (জান্নাতের) নিবাসের সময়কে পূর্ণমোক্ষ বলে মানেন, যা ক্ষণিক সময়ের জন্য। এই মোক্ষের সময়কাল যদি চার যুগের (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ ও কলিযুগের) যত সময় অর্থাৎ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বছরেরও হয়, এই চার যুগের সময়কে চর্তুযুগও বলা হয়। এই মোক্ষের সময় এক হাজার চর্তুযুগের হয়, যা ব্রহ্মার (রজোগুণ দেবতার) একদিনের সময় হয়।

কিছু ঋষিগণ ব্রহ্মলোক (কাল লোকের মহা জান্নাত) অর্থাৎ মহাস্বর্গও লাভ করেছেন, তারা কয়েক হাজার চর্তুযুগ পর্যন্ত সেখানে নিবাস করেছেন অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য মোক্ষ লাভ করেছেন। তারাও পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসেন। পরে তারা পশু-পাখিদের জীবন ও জাহান্নামের কষ্টও ভোগ করেছেন। এই ঋষিগণ বেদে বর্ণিত অনুসারে ভক্তি করেছিলেন। গীতাতেও ওই বেদেরই জ্ঞান রয়েছে। বেদে পাঁচটা যজ্ঞ করার বিধান আছে এবং ওম্ (ওঁ) নামটি জপ করতে বলা হয়েছে। কোনো ঋষিগণ পাঁচ যজ্ঞ করেছেন, কেউ চার, কেউ দুই, কেউ তো একটা যজ্ঞ করেছেন। ওম্ (ওঁ) নামের জপ জপেছেন। ওই অনুসারে তাদের মোক্ষের সময় অল্প ও অধিক পেয়েছিলেন।

তপস্যা ও হঠযোগ করলেও স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। যে তপস্যা করেন, সে তার তপস্যার ফলে রাজপদ প্রাপ্ত করেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তপস্যা করার ফল স্বরূপ হয়। একটি যজ্ঞ করতে একশো মণ (৪০ কিলো গ্রামে এক মণ হয়) দেশী ঘি লাগে। এই প্রকার একশো যজ্ঞ করলে ইন্দ্রের পদবি প্রাপ্ত হয়, তবে এটাও সীমিত সময় আছে। এরপরে ওখানেও মৃত্যু হয়। তারপর জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকে, যা অস্থায়ী মোক্ষ। যাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই, তারা স্বর্গে (জান্নাতে) যাওয়াকেই পূর্ণমোক্ষ বলে মনে করেন কিন্তু এটা অস্থায়ী মোক্ষ।

তবে যে সতলোক স্থান সতপুরুষের (কাদির আল্লাহ) নিবাসস্থান আছে, যেখানে তাঁর সিংহাসন রয়েছে। সেটি সতলোক অমর স্থান। সতপুরুষ (পরম অক্ষর ব্রহ্ম) কবীর হলেন একমাত্র অবিনশ্বর। যারা সতপুরুষ কবীর জী সত্য সাধনা করেন, তারা ওই অমর স্থানে (সত্যলোকে) চলে যায়। পরে কখনও তারা পৃথিবীতে ফিরে আসে না। সেখানে তারা সর্বদা সুখে থাকে ও সকলে অমর শরীর প্রাপ্ত করে। এই হল পূর্ণ মোক্ষ অর্থাৎ এটি সত্যিকারের মুক্তি।

বাইবেল ও কুরআনের জ্ঞান প্রদানকারী হলেন জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম)। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে যে ভক্তি বিধি রয়েছে, তা গীতা ও বেদের ভক্তি বিধি থেকেও অসম্পূর্ণ। এর দ্বারা উল্লিখিত ইবাদত করলে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন :- কবরে মৃতদেহের মধ্যে কি জীবাত্মা থাকে?

উত্তর :- হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত সকল অনুগামীরা বলেছেন যে, মৃত্যুর পর সকলকে কবরে দাফন করা হবে। যখন কিয়ামত আসবে, তখন সকলকে পুনরুজ্জীবিত (জীবিত) করা হবে। অতঃপর সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা জান্নাতে থাকবে এবং দুষ্কর্মকারী ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। এই সিদ্ধান্তটি হজরত মুহম্মদের আকাশ যাত্রার (মেরাজ) ঘটনাতে সম্পূর্ণ ভাবে খণ্ডিত অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। যখন তিনি (নবী সাহেব) বাবা আদম থেকে হজরত ঈসা পর্যন্ত সকলকে উপরে জান্নাতে দেখেছিলেন। আসলে তাঁরা পিতরলোকে ছিলেন যা জান্নাত ও জাহান্নামে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সেখানে পৃথিবীর মতো সুখ ও দুঃখ রয়েছে।

<u>বাস্তবিকতা হল এই</u> :- শিব পুরাণে এক প্রসঙ্গ আছে যে, এক সময় ভগবান শিব তার স্ত্রী পার্বতীকে নাম দীক্ষা দেওয়ার জন্য, এক নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। একটা শুকনো বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বসলেন। নাম-দীক্ষা মন্ত্র কেবল অধিকারীকেই শোনাতে হয়। শিব তিনবার হাত তালি বাজালেন। তার ভয়ংকর শব্দ হয় যার ভয়ে আশে পাশের সমস্ত পশু-পাখি দূরে চলে গেল। ওই শুকনো বৃক্ষের কাণ্ডে বড় একটা ছিদ্র কোঠর ছিল, যা সাধারণত পুরানো বৃক্ষের কাণ্ডে হয়ে থাকে ও উইপোকা লাগলে যেমন হয়। সেই শুকনো বৃক্ষের কাণ্ডের ওই ছিদ্র কোঠরে এক মাদা টিয়াপাখি ডিম পেড়ে রেখেছিল। তারমধ্যে যে ডিমগুলি স্বাস্থ্যকর ছিল সেগুলি উড়ে যায়।

যে ডিমটি নষ্ট ছিল, সেটি সেখানেই রয়ে গেল। প্রতিটি ডিমে জীবাত্মা ছিল। নষ্ট ডিমের মধ্যেও জীবাত্মা ছিল। যখন শিব নিশ্চিত হলেন যে, আশেপাশের কোনো প্রাণীই তাঁর কথা শুনবে না, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী পার্বতীর কাছে পূর্ণ পরমাত্মার মহিমার বর্ণনা শোনাতে লাগলেন এবং মানব শরীরে অবস্থিত কমলের (যা শরীরে তৈরি কমলচক্র আছে, তার) বিষয়ে বলতে লাগলেন। প্রতিটি কমলচক্র খোলার মন্ত্র জপও বলতে লাগলেন। পার্বতী প্রতিটি মন্ত্র মন দিয়ে শুনছিল ও তার ইঙ্গিত সরূপ প্রতিবারই হ্যাঁ-হু দ্বারা সংকেত দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্বতীর চোখে ঘুম এলো। ওই সময় বৃক্ষের ছিদ্র কোঠর থেকে 'হ্যাঁ-হু আওয়াজ আসতে লাগল। কেননা পরমাত্মার মহিমা বাণী কোনো অধিকারীর নিকট হতে শুনলে অধিক প্রভাব করে। যার কারণে সেই নষ্ট টিয়াপাখির ডিমটি সুস্থ হয়ে, পূর্ণরূপে পাখিতে পরিণত হয়ে গেল। ওই টিয়া পাখিটি পার্বতীর মতো হ্যাঁ-হু সঙ্কেত করতে লাগল। শিব দেখলেন পার্বতী কোনো কথা বলছে না। তাহলে হ্যাঁ-হু শব্দটা কে করছে? কেউ আমার অমর মন্ত্র শুনে নিয়েছে। তাই তিনি পাখিটিকে মারা উচিত মনে করলেন। শিবকে উঠতে দেখে টিয়া পাখি উড়ে গেল এবং টিয়া পাখির শরীর ত্যাগ করে, বেদ ব্যাস ঋষির স্ত্রীর পেটে ঢুকে গেল। কারণ ওই সময় ব্যাসদেব ঋষির স্ত্রী হাই তোলার জন্য মুখ খুলেছিলেন। মুখ মার্গ দিয়ে ওই জীব পেটে চলে গিয়েছিল। ওই গর্ভে বারো বছর পর্যন্ত ছিল। তারপর সুখদেব ঋষিরূপে জন্মগ্রহণ করলেন, এটি দীর্ঘ ঘটনা। এবার প্রসঙ্গতে আসি। বিষয়টি হল "আত্মা কবরে থাকে কি না"? সেই আলোচনা চলছিল।

যাদের মানব (পুরুষ ও নারী) শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যদি তারা সদগুরুর শরণে গিয়ে ধর্ম-কর্ম, ভক্তি ও সৎ কর্ম করে, তাহলে শরীর ত্যাগ করার পরে তাদের কর্ম ফল অনুসারে তারা ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়। কাদির কবীর আল্লাহর ভক্ত ও ভক্তমতীগণ সতলোকে চলে যায়। অন্য যারা সত্যভক্তি করে না বা ভুলভক্তি করে, মৃত্যুর পরে তারাও তাদের কর্ম অনুসারে নরকে ও অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে চলে যায়। এছাড়া কিছু জীব এমনই কর্মহীন (খারাপ কর্ম করা ব্যক্তি) হয়, যাদের শীঘ্র মানব শরীর প্রাপ্ত হয় না, তাদের প্রেত যোনি প্রাপ্ত হয়। যে প্রাণীদের পরবর্তীতে মানব শরীর প্রাপ্ত হয়না, তারা তাদের পূর্বের নিজের পুরানো শরীরের মোহতে ফেঁসে তারই কাছে থাকে। যেমন যে শরীরে জীবআত্মা পূর্বে থাকে, মোহবশে ওই শরীর তার খুবই প্রিয় লাগে। এই মোহবশে সেই আত্মা কবরে দাফন করা তারই মৃত শরীরের সাথে জড়িয়ে ওই কবরের উপরেই থাকে। তবে যদি পিঁপড়ে কখনো কোনো সুড়ঙ্গ বা গর্ত সেই কবরে করে দেয়, তাহলে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে, সেই মৃত শরীরে সাথে আঁকড়ে থাকে, আবার কখনো বাইরে বের হয়ে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নতুন শরীর পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মোহবশে পুরানো শরীর আঁকড়ে ধরে থাকে।

হিন্দু ধর্মে মৃতদেহ দাহ করার পর, যে নাড়ী ও হাড়ের অবশিষ্ট অংশ (অস্থি) থাকে, তা তুলে নদীর গভীর জলে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। যাতে যে ঘরের সদস্য মারা গিয়েছে, সে যদি প্রেত হয়ে যায়, তাহলে ওই শরীরের টুকরোর (অস্থি বা হাড়ের) সাথে আঁকড়ে দূরে চলে যাবে। আমাদেরকে আর জ্বালাতন করবে না। আলোচনা চলছিল যে, "আত্মা কবরে থাকে কি না?" এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কবরে কেবল ওই প্রাণীরাই থাকে, যাদের ভূত বা প্রেতের যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। পরে যারা নতুন শরীর প্রাপ্ত করেনি। প্রমাণের জন্য টিয়াপাখির আত্মা নষ্ট ডিমকে আঁকড়ে ধরে ছিল। সে তাকে নিজের মনে করছিল। এই দশা হল, কবরে থাকা সমস্ত প্রাণীদের। অতএব জিন যোনিতে কবরে থাকে। তবে নতুন শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পরে, ওই আত্মা মৃতদেহের কবরে থাকে না।

(অধ্যায় নং-৩)

"হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত"

হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত এক লাখ আশি হাজার নবী (পয়গম্বর) হয়েছিলেন। হজরত আদমকে এই সমস্ত নবী এবং তাদের সন্তানদের পিতা বলে মানা হয়।

প্রমাণ :- কুরআন মজিদের সূরা ইয়াসীন ৩৬ আয়াত নং ৬০ -তে লেখা আছে যে :- হে আদমের সন্তানগণ! আমি তোমাদের কি কখনো নির্দেশ করিনি যে, ওই শয়তানের ইবাদত তোমরা করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

হজরত মুহম্মদ মক্কায় অন্তিম প্রবচন দিয়ে বলেছিলেন যে, "মুসলমানগণ একে অপরের সাথে কিভাবে বসবাস করা উচিত। তারপর তিনি বললেন যে, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলে আদমের সন্তান এবং আদম মাটি দ্বারা তৈরি হয়েছিল আর তোমাদের সকলের থেকে তিনি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। যিনি আল্লাকে সব থেকে বেশী ভয় করতেন।"

"বাবা আদমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"

"বাবা আদমের উৎপত্তি"

পবিত্র বাইবেলের উৎপত্তি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে, সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। প্রভু (কাদির আল্লাহ) পাঁচ দিন পর্যন্ত অন্যান্য রচনা করলেন ও ষষ্ঠদিনে ঈশ্বর বললেন যে, আমি মানুষকে আমার নিজের প্রতিমূর্তিতে নিজের স্বরূপ অনুসারে তৈরি করব।

অতঃপর পরমেশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের স্বরূপ অনুসারে নর-নারী রূপে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ঈশ্বর মানুষের ভোজনের জন্য কেবল ফলদার বৃক্ষ ও বীজদার উদ্ভিদ দিয়েছিলেন, যা তোমাদের ভোজনের জন্য। এরপরে ছয়দিনে সম্পূর্ণ কার্য সমাপ্ত করে, পরমেশ্বর সিংহাসনের উপর বিরাজমান হলেন অর্থাৎ বিশ্রাম করলেন।

ঈশ্বর (কাদির আল্লাহ) প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করলেন, তারপর তার পাঁজরের একটি হাড় বের করে নারী হব্বাকে তৈরি করলেন এবং উভয়কে একটি বাগানে ছাড়ার পরে সিংহাসনের উপর বসেছিলেন।

বিশেষ :- বাইবেল গ্রন্থে সৃষ্টির উৎপত্তির বিষয়ের জ্ঞান জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) দ্বারা বলা হয়েছে। সৃষ্টির রচনার এই জ্ঞান অসম্পূর্ণ তথ্য। কুরআন মজিদ সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং. ৫৯- তে এই কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ, হজরত মুহম্মদকে বলেছেন যে, যিনি ছয় দিনে সারা সংসারকে সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে যিনি সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন, তিনি সামর্থ্যবান পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) আছেন। তাঁর বিষয়ে (খবর) জানতে হলে কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্ত) কাছে জিজ্ঞাসা করো। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কুরআন মজিদের জ্ঞানদাতা সম্পূর্ণ জ্ঞান বলেন না। এই আল্লাহ জনগণকে ভ্রমিত করে রাখে এবং এই আল্লাহই বাইবেলের জ্ঞান দিয়েছেন। বাইবেল তিন কিতাবকে একত্র করে বানানো হয়েছে। এর মধ্যে তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের জ্ঞান রয়েছে। সৃষ্টির উৎপত্তির জ্ঞান তৌরাত কিতাবে লেখা আছে, যেটি বাইবেলে প্রথম দিকে রয়েছে। তৌরাতের জ্ঞান এই আল্লাহ হজরত মূসাকে দিয়েছিলেন। একদিন হজরত মূসা সৎসঙ্গ করছিলেন, তখন এক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, হজরত মূসা, আজকের দিনে সবথেকে বিদ্বান কে আছেন? মূসা বললেন, আমি হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী (ইলমী)। আল্লাহ বললেন, মূসা তুমি ভুল বলছো! তোমার জ্ঞান (তৌরাতের জ্ঞান) তো এক ব্যক্তির (অল-খিজ্র/খিজির) জ্ঞানের সামনে কিছুই নয়। মূসা পূর্ণ জ্ঞান জানার জন্য অল-খিজ্রের নিকটে গেলেন। ধৈর্য পরীক্ষায় স্থির থাকতে না পারার কারণে, খালি হাতেই ফিরে এসেছিলেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি রচনার জ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে। সৃষ্টির সম্পূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ আকবরই (কবীর পরমেশ্বর) সঠিক সঠিক রূপে বলেছেন। সেই যথার্থ জ্ঞান এই পুস্তকের শেষে "সৃষ্টি রচনা" নামক অধ্যায় পড়ে দেখুন তাতে লেখা আছে। (এখন নিজের বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।) বাবা আদম থেকে নবী মুহম্মদ পর্যন্ত সমস্ত অনুগামীরা খুদাকে নিরাকার (বেচুন) মানেন। যেহেতু এদেরই গ্রন্থে আল্লাহ তালাকে সাকার এবং মনুষ্য সদৃশ বর্ণনা করা হয়েছে। তারা নিজেদের গ্রন্থকেও ঠিকভাবে বোঝেন নি।

প্রমাণ:-

"পরমেশ্বর (আল্লাহ) মানুষের মতোই (নরাকার)"

পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) মানুষকে তাঁর নিজের স্বরূপ সমান করে উৎপন্ন করেছেন অর্থাৎ প্রভু মানুষকে তাঁর প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) সাকারে (আকারে) রয়েছেন এবং তিনি মানুষের মতো। ওই পূর্ণ পরমাত্মা তো ছয় দিন পর্যন্ত সবকিছু রচনা করে, সপ্তম দিনে নিজের সত্যলোকে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। এরপর থেকে প্রভু কালের (জ্যোতি নিরঞ্জন) গোলকধাঁধা প্রারম্ভ হয়ে যায়।

বাইবেল গ্রন্থেই অন্য প্রমাণও রয়েছে যে, পরমেশ্বর মানবের মতো স্বরূপ বিশিষ্ট এবং তিনি দর্শনও দেন। (প্রমাণের জন্য দেখুন বাইবেল পৃষ্ঠা ১৭ -তে উৎপত্তি ১৭:১-২-তে "বাচা কা চিহ্ন খতনা" ("সুন্নাতের নিয়ম স্থাপন"।)

১ - ২ :- অব্রাহামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর হয়ে যায়, তখন যহোবা (প্রভু) একদিন তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "আমি সর্বশক্তিমান প্রভু। আমার উপস্থিতিতে চল, তুমি সিদ্ধ হতে যাও।)

উৎপত্তি ২৬:১-৩ (পৃষ্ঠা ১৭) :- যহোবা (প্রভু) ইসহাককে (ঈসায়াক) দর্শন দিয়ে বললেন, "তুমি মিশরে (মিস্র) যেও না, যে দেশের কথা আমি তোমাকে বলবো, বরং তুমি সে দেশে গিয়ে থেকো, (সে দেশের প্রবাসী হয়ে থেকো) আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো।"

উপরোক্ত প্রমাণগুলি থেকে প্রমাণিত হল যে, খুদা (আল্লাহ তালা) মানুষের মতো আকারেতে অর্থাৎ সাকারে রয়েছেন। প্রসঙ্গ চলছিল হজরত আদমের বিষয়ে :-

"ব্রহ্মা, আদম ও হব্বাকে (হবা / হেবা) স্বর্গে রেখেছিলেন"

কালব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের তিন পুত্রের দ্বারা নিজের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনজন হলেন কালব্রহ্মের পুত্র। বাবা আদম ব্রহ্মার লোক থেকে আসা এক পবিত্র আত্মা ছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মা এই বাবা আদমকে উদ্যানে (বাগানে) সামলে রেখেছিলেন। (কালব্রহ্ম তাঁর পুত্র ব্রহ্মার রূপে ছিলেন।)

প্রভু হজরত আদম ও হজরত হব্বাকে (আদমের স্ত্রী) বললেন যে, তোমরা এই উদ্যানে লাগানো সমস্ত বৃক্ষের ফল খেতে পারো কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানের বৃক্ষের ফল খাবে না, যদি খাও তাহলে তোমরা মারা যাবে। এই কথা বলে পরমেশ্বর চলে গেলেন।

তারপর সাপ এসে বলল যে, তোমরা মধ্যবর্তী বৃক্ষের ফল কেন খাচ্ছ না? হব্বা বললেন, ভগবান (আল্লাহ) আমাদের নিষেধ করে বলেছেন যে, যদি তোমরা ওই মধ্যবর্তী বৃক্ষের ফল খাও, তাহলে মারা যাবে, এই ফল খাবে না। এরপর সাপ বলল যে, ভগবান তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছেন। তিনি চান না যে, তোমরা ওই প্রভুর ন্যায় জ্ঞানবান হয়ে যাও। যদি তোমরা এই ফল খেয়ে নাও, তাহলে তোমাদের ভালো ও মন্দের জ্ঞান হয়ে যাবে। তোমাদের চোখের উপর যে অজ্ঞানতার পর্দা রয়েছে তা দূর হয়ে যাবে, যা প্রভু (খুদা) তোমাদের উপর দিয়ে রেখেছেন। এই কথা সাপ আদমের স্ত্রী হব্বাকে বলেছিল। হব্বা তার স্বামী হজরত আদমকে বললেন যে, আমরা এই ফল খেলে ভালো-মন্দের জ্ঞান হয়ে যাবে, পরে ঠিক এমনটিই হল। তারা সেই ফল খেয়ে নিলেন। এরপর তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল ও অজ্ঞানের অন্ধকার সরে গেল, যে অজ্ঞানতার আবরণ পরমাত্মা তাদের উপর দিয়ে রেখেছিলেন। যখন তারা নিজেদের দিকে তাকালেন তখন নিজেদেরকে নির্বস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাই তারা লজ্জিত হয়ে অনেকগুলো অঞ্জীরের (ডুমুরের মতো) পাতা জুড়ে জুড়ে এক বস্ত্র তৈরি করে, তাদের গুপ্ত অঙ্গের উপর বেঁধে নিলেন।

{যাঁকে আদম থেকে মুহম্মদ পর্যন্ত খুদা বলে মানতেন, তিনিও মানুষের মতো সাকারে রয়েছেন।}

কিছুদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় প্রভু পরিদর্শনের জন্য যখন ওই বাগানে ঘুরতে এলেন, তখন আদম ও হব্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায়? আদম ও হব্বা বললেন যে, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমরা লুকিয়ে গিয়েছি, কারণ আমরা নির্বস্ত্র আছি। এই কথা শুনে ভগবান বললেন, তোমরা কি মধ্যবর্তী গাছের ফল খেয়েছো? আদম বললেন, হ্যাঁ! তবে ওই গাছের ফল খেয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমরা নির্বস্ত্র আছি। প্রভু বললেন যে, তোমাদের কে বলেছে যে ফল খাও? আদম বললেন যে, আমাদের সাপ খেতে বলেছিল, সেইজন্য আমরা খেয়ে নিয়েছি। আমার স্ত্রী হব্বাকে ওই সাপ প্রলুব্ধ করেছিল আর তার কথায় পড়ে, আমরা এই ফল খেয়ে নিয়েছি।

২১. তারপর যিহোবা প্রভু আদম ও তার স্ত্রীকে চামড়ার বস্ত্র পরিয়ে দিলেন।

বিশেষ :- হজরত আদমের আল্লাহ সামর্থ্যবান (কাদির আল্লাহ) নয়। তিনি এটাও জানেন না যে, আদম ও হব্বা কোথায় রয়েছে। এছাড়া তিনি এটাও জানেন না যে, তাদের কে বলেছেন মধ্যবর্তী বৃক্ষের ফল খেলে ভালো-মন্দ জ্ঞান হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ করা অনিবার্য মনে করি যে, সূরা আল্ বাকারা- ১৬ আয়াত নং ৩৫ - ৩৮ -তে কুরআনের জ্ঞান নাজিল খুদা বলেছিলেন যে, আমি আদম ও হব্বাকে জান্নাতের একটি বাটিকাতে (বাগানে) রেখেছিলাম। যখন

তারা শয়তানের প্রভাবে পড়ে ভুল করেছিল, তখন তাদেরকে জান্নাত (স্বর্গ) থেকে নিচে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

"একের অধিক প্রভুর প্রমাণ"

২২. তারপর যিহোবা প্রভু বলেছিলেন যে, মনুষ্য ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে আমাদের মধ্যে এক জনের সমান হয়ে গিয়েছে। এইজন্য এমন না হয় যে, এই জীবন বৃক্ষের ফলও ছিড়ে খেয়ে নেয় ও সর্বদা জীবিত রয়ে যায়।

২৩. এবং ২৪. এইজন্য প্রভু আদম ও তার স্ত্রীকে অদন নামক উদ্যান থেকে নির্বাসিত (বাহির) করে দিলেন। প্রভু তাদের ওই উদ্যান থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে বললেন, এখন তোমাদের এখানে থাকতে দেব না। তোমাকে পেট ভরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং স্ত্রীকে অভিশাপ দিলেন, তুমি সর্বদা পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকবে।

{**বিশেষ :-** জৈন ধর্মের পুস্তক "আও জৈন ধর্ম কো জানে" ("আসুন জৈন ধর্মকে জানুন") পৃষ্ঠা ১৫৪-তে লেখা আছে যে, শ্রীমনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ছিলেন আর এই বংশেই রাজা নাভীরাজ হয়েছিলেন। রাজা নাভীরাজের পুত্র শ্রীঋষভদেব (আদি নাথ) হয়েছিলেন। যাঁকে পবিত্র জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর বলে মানা হয়। এই শ্রীঋষভদেবের জীবাত্মাই বাবা আদম হয়েছিলেন।]

বাবা আদম ও তার স্ত্রী হব্বার মিলনে দুই পুত্রের জন্ম হয়। একজনের নাম কাইন ও অন্যজনের নাম ছিল হাবিল। কাইন কৃষিকাজ করত। হাবিল ভেড়া ও ছাগল চরাত। এই দুইজনের মধ্যে কাইন ধূর্ত (চালাক) ছিল আর হাবিল ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কাইন তার ফসলের কিছু অংশ প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিল কিন্তু সেই ফসল প্রভু স্বীকার করেন নি। পরে হাবিল তার প্রথম ভেড়ার মেষশাবকটিকে প্রভুর নিকট উৎসর্গ করেছিল, প্রভু তা গ্রহণ করেছিলেন। {যদি বাবা আদমকে কাদির আল্লাহই নির্দেশ করতেন, তাহলে বলতেন যে, হে পুত্র হাবিল! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যে ভেড়ার বাচ্চাটি আমাকে উৎসর্গ করেছ, এটি তোমার প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। এটি তুমিই নিয়ে যাও আর এটিকে বিক্রি করে ধর্ম (ভান্ডারা) কার্যে ব্যবহার কর আর তোমার ভেড়ার পশম কেটে জীবিকা নির্বাহ করো এবং পরমেশ্বরের প্রতি সর্বদা বিশ্বাস রাখো। বাবা আদমকে কোনো এক ফেরেশতা মাংস খেতে উদ্বুদ্ধ (প্রেরণা) করতেন। আল্লাহ (যিহোবা) তো সৃষ্টির সময় মানুষকে কেবল নিরামিষ ভোজন করার আদেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলে মাংস খাওয়ার প্রাবধান ছিল পিতর ও ফেরেশতাদের, তাঁরা কোনো-কোনো মানবের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এই প্রকার কর্ম করিয়েছেন। এক পুস্তকে লেখা আছে যে, হাবিল ভেড়ার প্রথম মেষশাবকটি (বাচ্চাটি) প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, প্রভু তা স্বীকার করেছিলেন। স্বীকার করা আর অস্বীকার করা এই প্রকার হতো :- যদি প্রভু দান স্বীকার করতেন, তাহলে উপর থেকে আগুন এসে, সেই নৈবেদ্যটি (ফাঁকে) আগুন দ্বারা পুড়িয়ে চলে যেতেন। হাবিলের মেষ শাবকটি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, এইভাবে নৈবেদ্যটি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হতো। তবে কাইন (কাবিল) যে ফসল দান করেছিলেন, তা আগুনে পুড়ে যায়নি, তার অর্থ নৈবেদ্যটি অস্বীকার করেছেন বলে মানা হতো। ভূত-প্রেত জীনেরাও আগুন ধরিয়ে দেয়। এই প্রকার অনেক ঘটনা শোনা যায় যে, কারও বাড়িতে বন্ধ লোহার সিন্দুকে(box) রাখা কাপড় আপনা আপনিই পুড়ে যেত। তারপর এক ভূত-প্রেতের বিষয়ে জ্ঞাত এক তান্ত্রিককে দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র করানোর পরে সেই আগুন লাগা বন্ধ হয়েছিল। এই ধরনের তামাশা ভূত এবং পিতরগণেরা করে থাকে। যদি বলেন যে, এই অগ্নি খুদার নিকট হতে আসত, তাহলে ওই অগ্নিরূপ খুদা হলেন স্বয়ং কালব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন), যিনি মূসা আলাইহি সালামকে দর্শন দিয়েছিলেন। এই সমস্ত প্রবঞ্চনা-ছলনা হল কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি স্বরূপ নিরঞ্জনের)। এই কালব্রহ্ম কাদির আল্লাহ কবীর জীর জন্য শয়তানের কাজ করে আর জ্যোতি নিরঞ্জনের (অগ্নি রূপী আল্লাহ) জন্য "ইবলিস" শয়তান কাজ করে। যে ইবলিস হজরত আদমকে সিজদা (প্রণাম) করেনি।}

একটি পুস্তকে লেখা আছে যে, হজরত হব্বার (হজরত আদমের স্ত্রীর) পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান হতো। বড় পুত্র কাইনের (কাবিলের) সাথে যে কন্যার জন্ম হয়েছিল, সে খুবই সুন্দরী ছিল আর হাবিলের সাথে যে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল, সে খুবই কুৎসিত ছিল। ওই সময় বিবাহের পরম্পরা এই প্রকার ছিল যে, একই সাথে জন্ম নেওয়া ছেলে ও মেয়ে ভাই-বোন মানা হতো। আগে জন্ম নেওয়া বোনের সাথে, পরে জন্ম নেওয়া ভাইয়ের বিবাহ হতো। এই নিয়মানুসারে কাইনের বিবাহ কুৎসিত মেয়ের সাথে হওয়া নির্ধারিত ছিল। তবে কাইন ওই কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করতে রাজি ছিল না। হাবিলকে হত্যা করলে তার বিবাহ তার সাথে জন্ম নেওয়া মেয়েটির সাথে হওয়া নিশ্চিত ছিল। এই কারণে কাইন তার ছোট ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। কাইনকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিছুসময় পরে আদম ও হব্বার দ্বারা এক পুত্র হয়েছিল, তার নাম সেত রাখেন। পরে সেতের এক পুত্র হল, তার নাম এনোস রাখেন। ওই সময় থেকেই মানুষ প্রভুর নাম নিতে শুরু করে।

পরবর্তীকালে এই বংশ পরম্পরাতেই নবী মূসা, নবী দাউদ ও নবী ঈসা মসীহের (যীশু খ্রীষ্টের) জন্ম হয়েছিল।

{ঈসার পূজ্য মাতার নাম মরিয়ম (মারিয়া/মেরী) এবং পিতার নাম যূসুফ (যোসেফ) ছিল। মরিয়মের গর্ভধারণ এক দেবতার দ্বারা হয়েছিল, এই কারণে যোসেফ মরিয়মকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তখন স্বপ্নের মাধ্যমে এক স্বর্গদূত (ফেরেশতা/দেবদূত) যোসেফকে বলেছিলেন, সে যেন মরিয়মকে ত্যাগ না করে, সেই ভয়ে মরিয়মকে ত্যাগ না করে নিজের সাথে রেখেছিলেন। দেবতা দ্বারা গর্ভবতী মরিয়ম পরে হজরত ঈসাকে (যীশু খ্রীষ্টকে) জন্ম দিয়েছিলেন।} হজরত ঈসা থেকেই পবিত্র ঈসাই (খ্রীষ্টান) ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হজরত ঈসা মসীহার নিয়ম মেনে চলা অনুসরণকারীদের ঈসাই (খ্রীষ্টান) বলা হয় এবং এখান থেকেই পবিত্র খ্রীষ্টান ধর্মের উত্থান হয়েছিল।

{প্রমাণের জন্য দেখুন, কুরআন শরীফের সূরা মরিয়ম- ১৯ এবং পবিত্র বাইবেলে মথি রচিত সুসমাচার মথি = ১:২৫ নং পৃষ্ঠা ১-২ এ।}

"ঈসা মসীহার (যীশুখ্রীষ্ট) দ্বারা কালব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) অলৌকিক কার্য করাতেন"

{কবীর সাগর অর্থাৎ কলাম-এ-কবীর (সূক্ষ্মবেদ) গ্রন্থে লেখা আছে যে, যখন কবীর প্রভু সত্যযুগে এই কাল ব্রহ্মের লোকে, জোগজিতের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন, তখন এই কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) যিনি (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু) কবীর জীর সঙ্গে বাদ-বিবাদ করেন কিন্তু কবীর পরমেশ্বরের শক্তির সামনে টিকতে না পেরে, চরণ ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। যখন ক্ষমা করে দিলেন, তখন বললেন যে, "হে জোগজিৎ! আপনি আমার লোকে (ধামে) কেন এসেছেন? জোগজিৎ রূপী পরমেশ্বর বললেন, তুই সকল জীবকে অসম্পূর্ণ (অধুরা) জ্ঞান দিয়ে ভ্রমিত করে রেখেছিস। এইজন্য আমি সঠিক আধ্যাত্ম জ্ঞান বলতে এসেছি। যখন কলিযুগ আসবে, তখন আমি আসব এবং যথার্থ কবীর পন্থ চালাবো। তখন কাল ব্রহ্ম বলেছিলেন যে, কলিযুগে আপনি আসার পূর্বেই আমি সকলকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রচার করে ভ্রমিত করে দেবো। আমার দ্বারা পাঠানো সংবাদবাহকদের (নবীদের/অবতারদের) দ্বারা অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রচার করিয়ে দেবো। ওই সময় আপনার জ্ঞান কেউ শুনবে না। এই উদ্দেশ্যেই কালব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য প্রমুখ অবতার এবং হজরত আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত নবীদের পাঠিয়েছিলেন।}

হজরত ঈসার (যীশু খীষ্ট) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু অলৌকিক কাজ তিনি করেছিলেন, সেটি পূর্ব থেকেই কালব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। এর প্রমাণ পবিত্র বাইবেলে য়োহন্না নামক অধ্যায় ৯ শ্লোক ১ থেকে ৩৪ এ লেখা আছে যে, এক ব্যক্তি জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। একদিন তিনি হজরত যীশু মসীহের কাছে এসেছিলেন এবং হজরত যীশুর আশীর্বাদেই তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। কিছু শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে মসীহা! এই ব্যক্তি ও এই ব্যক্তির পিতামাতা এমন কি পাপ করেছিলেন, যার কারণে এই ব্যক্তি অন্ধ হয়েছে এবং পিতা -মাতা অন্ধ পুত্র প্রাপ্ত হয়েছে। যীশু বললেন, এর কোনো পাপ ছিল না, যার কারণে এই ব্যক্তি অন্ধ হয়েছে এবং না এই ব্যক্তির মাতা পিতার কোনো পাপ ছিল, যার কারণে তারা অন্ধ পুত্র প্রাপ্ত করেছে। এটি এই কারণে হয়েছে, প্রভুর মহিমা প্রকাশ করার ছিল। ভাবার্থ হল, যদি পাপ হতো তাহলে যীশু চোখ ভালো করতে পারতেন না এবং কাল রূপী ব্রহ্ম যীশুর মহিমা বানানোর জন্য নিজের শক্তিতে কোনো প্রেতের দ্বারা অন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। অন্ধ ব্যক্তি যীশুর নিকট আসতেই, প্রেত শরীর থেকে বেরিয়ে গেল আর তখন ওই অন্ধ ব্যক্তি দেখতে লাগলেন। এই সব হল কাল জ্যোতি নিরঞ্জনের এক সুপরিকল্পিত জাল (ষড়যন্ত্র)। যার কারণে তাঁর দ্বারা পাঠানো অবতারদের মহিমা হয় এবং সমস্ত আশে-পাশের প্রাণী, তাঁদের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁদের দ্বারা বলা, কাল ব্রহ্মের সাধনার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়। এরপর যখন পরমেশ্বরের (কাদির আল্লাহ) দ্বারা পাঠানো কোনো দূত (অবতার/নবী) আসবেন, তখন যেন কেউ তাঁদের বিশ্বাস না করে। যেমন হজরত ঈসা মসীহের অলৌকিক ঘটনাবলীতে লেখা আছে যে, তিনি এক প্রেত আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এই কাল স্বয়ংই কোনো ভূত-প্রেত বা পিতরকে প্রেরিত করে কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেন। তারপর তাকে কারোর মাধ্যমে নিজের পাঠানো নবীর কাছে পাঠিয়ে, কোনো ফেরেশতাকে নবীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে, তাঁর দ্বারা প্রেতকে তাড়িয়ে দেন। এইভাবে সেই অবতারের (মসীহ/নবী) মহিমা হয়ে যায়। যে কোনো সাধক পূর্বের ভক্তি যুক্ত থাকে। তাঁরই পূর্বের নিজের ভক্তির উপার্জিত কামাইকে অলৌকিক কার্য দ্বারা খরচ করিয়ে দেয় এবং ওই সাধকের মহিমা করিয়ে, হাজার হাজার অনুযায়ী বানিয়ে, কালের জালে ফাঁসিয়ে দেয় এবং ওই পূর্ব ভক্তি-উপার্জন যুক্ত সাধকের কামাইকে সমাপ্ত করিয়ে, ওই সাধককে নরকে (জাহান্নাম) ফেলে দেয়।

এই প্রকারের উদাহরণ পবিত্র বাইবেলে 'শমূয়েল' নামক অধ্যায়ে ১৬:১৪-২৩-তে রয়েছে, শাউল নামক এক ব্যক্তিকে ভূত-প্রেত দুঃখী করতো। তারজন্য বালক দায়ূদকে ডাকা হয়েছিল, যার দ্বারা সে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল।

হজরত ঈসা মসীহের মৃত্যু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। যীশু নিজেই বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে এবং তোমাদের (আমার বারোজন শিষ্যের) মধ্যে একজন আমাকে আমার বিরোধীদের হাতে তুলে দেবে। সেই রাতেই যীশু সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে একটি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তার হৃদয় ভয়ে ঘাবড়াতে লাগল। তিনি তাঁর শিষ্যদের

বললেন, তোমরা জাগতে থেকো, আমার হৃদয় ঘাবড়াচ্ছে ও জীবন যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরাও আমার জীবনের রক্ষার জন্য পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। এই কথা বলে হজরত যীশু কিছুদূরে গিয়ে মুখমণ্ডল পৃথিবীর উপর নিম্নগামী করে, প্রার্থনা করলেন (৩৮, ৩৯)। পুনরায় শিষ্যদের কাছে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন তারা সকলে ঘুমাচ্ছিল তখন যীশু বললেন, তোমরা আমার জন্য এক মুহূর্তের জন্যও কি জেগে থাকতে পারো না? জাগতে থাকো ও প্রার্থনা করতে থাকো, যাতে তোমরা পরীক্ষায় অসফল না হয়ে যাও। আমার আত্মা তো মরার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমার শরীর দুর্বল। এইভাবে ঈসা মসীহ তিনবার কিছু দূর গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং তিনি ফিরে এসে তিনবারই সমস্ত শিষ্যদের ঘুমিয়ে থাকতেই দেখলেন। একদিকে ঈসা মসীহের জীবন চলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল কিন্তু চেলারাম শিষ্যরা আরাম পূর্বক ঘুমিয়ে রয়েছে। গুরুর (যীশুর) বিপদে শিষ্যদের মনে যেন কোনও দুঃখই ছিল না।

তৃতীয়বারও যখন ঘুমিয়ে থাকতে দেখলেন, তখন বললেন আমার সময় হয়ে এসেছে আর তোমরা এখনও ঘুমিয়ে রয়েছ? এরমধ্যে বিশাল জনতা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে এলো এবং তাদের সাথে ঈসা মসীহার এক প্রিয় শিষ্য ছিল, যে কেবল ত্রিশ টাকার লোভে পড়ে, তাঁর গুরুকে বিরোধীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। (মথি ২৬:২৪-৫৫, পৃষ্ঠা নং ৪২ - ৪৪।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, পুণ্য আত্মা ঈসা মসীহাকে কেবল তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত জীবনকালই প্রাপ্ত হয়েছিল, যা তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই ধর্ম শাস্ত্রে লেখা ছিল।

"মথি রচিত সমাচার" পৃষ্ঠা নং ১ -এর মধ্যে লেখা আছে যে, যাকোবের পুত্র যোসেফ ছিলেন। সমাজের দৃষ্টিতে যোসেফই ছিলেন ঈসা মসীহের (যীশু খ্রীষ্ট) পিতা কিন্তু মরিয়মের গর্ভধারণ এক ফেরেশতার (দেবদূত) দ্বারা হয়েছিল। (মথি ১:১ -১৮)

"ফেরেশতাগণ ঈসা মসীহের মধ্যে প্রবেশ করে চমৎকার করতেন"

এক স্থানে হজরত ঈসা (যীশু) বলেছিলেন যে, আমি যাকোবের পূর্বেও ছিলাম। সমাজের দৃষ্টিতে যীশু খ্রীষ্টের পিতামহ যাকোব ছিলেন। যদি যীশুর (ঈসা) আত্মাই কথা বলতেন, তাহলে যীশু বলতেন না যে, আমি যাকোবের পূর্বেও ছিলাম অর্থাৎ ঈসা তাঁর ঠাকুরদাদার আগেও ছিলেন। যদি এই উক্তি সত্য বলে মানা হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, বারংবার জন্ম-মৃত্যুও হয় কিন্তু হজরত আদমের সন্তানরা এটা মানেন না যে, বারবার জন্ম-মৃত্যু হয়। হজরত ঈসার মধ্যে অন্য কোনো ফেরেশতা কথা বলতেন প্রেতবত প্রবেশ করে, ভবিষ্যৎ বাণীও করে যেতেন ও অন্যান্য অলৌকিক কাজও করতেন। বাইবেলে লেখা আছে যে, যীশুকে পরমাত্মা নিজের নিকট হতে পাঠিয়েছিলেন। যীশু প্রভুর পুত্র ছিলেন।

অন্য আরেকটি আশ্চর্য্য উদাহরণ বাইবেলে, ২ করিন্থীয় অধ্যায় ২:১২-১৮ ,পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০ তে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এক আত্মা কোনো একজনের মধ্যে প্রবেশ করে, চিঠি লিখে বার্তা (খবর) পাঠিয়েছিল। বলেছেন যে ২:১৪ = অতএব পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হোক, যিনি মসীহের মধ্যে সর্বদা আমাদের জয় উৎসবের জন্য ঘুরে বেড়ান আর নিজের জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের দ্বারা সর্বত্র ছড়ান। ২:১৭ = আমরা ওই লোকেদের মতো নই, যারা পরমেশ্বরের বাণীতে ভেজাল করি। আমরা তো মনের সত্যতা ও পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে, পরমেশ্বরের উপস্থিতি জেনে মসীহের মধ্যে থেকে কথা বলি।

(উপরোক্ত বিবরণে পবিত্র বাইবেলের ২ করিন্থীয় অধ্যায় ২:১২-১৮, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০ এর লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।) এর দ্বারা দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, (১) মসীহার (নবীর/অবতারের) শরীরের মধ্যে অন্য ফেরেশতা বলেই পুস্তক লেখাতেন। যারা প্রভুর পাঠানো হতেন। তাঁরা তো প্রভুর সংবাদ পরিবর্তন না করেই সঠিক রূপেই শোনাতেন। (২) অন্য কথা এটাও প্রমাণিত হল যে, হজরত ঈসা মসীহের (নবী) মধ্যে অন্য কোনো আত্মাও বলতেন। যারা নিজেদের পক্ষ থেকে ভেজাল করেও বলতেন। এর কারণ হল যে, কুরান মজিদ ও বাইবেল ইত্যাদিতে মাংস খাওয়ার আদেশ অন্য আত্মাদের ছিল, পরমেশ্বরের (কাদির আল্লাহ) আদেশ ছিল না।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা এটাও স্পষ্ট হল যে, ফেরেশতাগণ বলেছেন যে, প্রভু মহিমা রূপী সৌরভ ছড়ানোর জন্য, প্রেতের মতো প্রবেশ করে, প্রভু আমাদেরই প্রয়োগ মসীহের (অবতার/নবী) রূপে করেন। চমৎকার করেন ফেরেশগণ আর নাম হয় নবীদের এবং সরল আত্মারা ওই নবীদেরকে পূর্ণ শক্তিযুক্ত মনে করে, তাঁদের অনুগামী হয়ে যান এবং তাঁদেরই দ্বারা বলা ভক্তি মার্গের উপর দৃঢ় হয়ে যেতেন। যে সময় পূর্ণ পরমাত্মা সংবাদবাহক (নবী) আসেন, তখন তারা তাঁর কথা অবিশ্বাস করে। এই সবই হল কালব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের জাল।

ঈসা মসীহের মৃত্যু :-

এক পর্বতের উপর ঈসা মসীহা (যীশু) ৩০ বছর বয়সে প্রভুর নিকট তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে কাতর হয়ে বারবার প্রার্থনা

করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যও ছিলেন। ওই সময়ে তাঁরই এক শিষ্য ৩০ টাকার লোভে, নিজের গুরুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে ওই পর্বতে এসেছিল, তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে। বিরোধী ভীড়দের দল ঈসা মসীহাকে ওই গুপ্ত স্থান থেকে ধরলেন, যে স্থানে যীশু লুকিয়ে রাত কাটিয়েছিলেন। কেননা হজরত মূসার অনুগামী ইহুদিরা, ঈসা মসীহার ঘোর শত্রু হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় সন্তদের, মহন্তদের ও মন্দিরের পুরোহিতদেরও ভয় হয়ে গিয়েছিল যে, যদি আমাদের অনুগামীরা হজরত ঈসার কাছে চলে যায়, তাহলে আমাদের পূজার উৎসর্গীকৃত ধন কম হয়ে যাবে। তাই ঈসা মসীহাকে ধরে রাজ্যপালের কাছে নিয়ে গিয়ে সকলে বললেন, এঁ একজন প্রতারক, মিথ্যা নবী সেজে দুনিয়াকে প্রবঞ্চনা করছে, এঁ অনেকের সংসার নষ্ট করে দিয়েছে। এঁকে ক্রুশে দেওয়া হোক। পিলাতুস (পিলাত) নামের গভর্নর প্রথমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, সাধু সন্তকে দুঃখী করলে পাপ হয় কিন্তু ভিড় অধিক ছিল। তারা স্লোগান দিতে শুরু করলো যে, এঁকে ক্রশ বিদ্ধ করা হোক। তখন গভর্নর বললেন, তোমরা যেটা উচিত মনে করো, সেটাই করো। ত্রিশ বছর বয়সে ঈসা মসীহাকে ইংরেজি অক্ষর T (টি) আকৃতির কাঠের উপর শুইয়ে, হাতে ও পায়ে পেরেক মেরে ওই ক্রুশেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ঈসা মসীহার মৃত্যু অসহনীয় ভয়ংকর যন্ত্রণা দ্বারা হয়েছিল।

মৃত্যুর পূর্বে হজরত ঈসা উচ্চস্বরে বললেন, হে প্রভু! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করে দিলে? কয়েকদিন পর হজরত ঈসা মসীহা (যীশু খ্রীষ্ট) পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন (পুনরুত্থান করলেন)। (পবিত্র বাইবেল মথি অধ্যায় ২৭ ও ২৮/২০ পৃষ্ঠা ৪৫ থেকে ৪৮)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, এই ব্রহ্ম (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জন) তাঁর নিজের অবতার বা নবীকেও সময় সময়ে ঠকায় অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে। পূর্ণ পরমাত্মাই কেবল ভক্তির আস্থা বজায় রাখার জন্য স্বয়ং প্রকট হন। যীশুর মৃত্যুর পরে, পূর্ণ পরমাত্মাই যীশু খ্রীষ্টের রূপ ধারণ করে প্রকট হয়ে খ্রীষ্টান ভক্তদের বিশ্বাসকে প্রভুর প্রতি দৃঢ় রেখেছেন, তা না হলে হজরত ঈসার পূর্বের অলৌকিক ঘটনা দেখে ও যীশুর ভয়ংকর দশা রূপ মৃত্যু দেখে, কোনো ব্যক্তি ভক্তি সাধনা করতেন না আর তারা নাস্তিক হয়ে যেতেন। (প্রমাণ পবিত্র বাইবেলের য়হন্না অধ্যায় ১৬ শ্লোক ৪ থেকে ১৫)-তে ব্রহ্ম (কাল) তো এটাই চান। কাল ব্রহ্ম পুণ্যাত্মাদেরকে তার নিজের অবতার (রসূল) বানিয়ে পাঠান। পরে চমৎকার দ্বারা তার পূর্ব জন্মের ভক্তির কামাই (পুণ্যের উপার্জন) সমাপ্ত করিয়ে দেয়। তাঁর মধ্যে কিছু ফেরেশতাগণদেরও (দেবতাগণও) প্রবেশ করিয়ে, কিছু চমৎকার ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁদের পূর্বের ভক্তি ধন দ্বারা করিয়ে দেয়। এইভাবে তাদেরকে শক্তিহীন করে দেয়। এইপ্রকার কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন) দ্বারা পাঠানো ওই নবীদের মহিমা হয়ে যায়। অজ্ঞাত সাধক তাঁদের উপর প্রভাবিত হয়ে, ওই ভুল সাধনার উপর দৃঢ় হয়ে যায়।

যখন পূর্ণ পরমাত্মা কিংবা তাঁর সন্দেশবাহক যথার্থ ভক্তির জ্ঞান ও ইবাদত বোঝানোর চেষ্টা করেন, তখন কেউ শোনেন না এবং অবিশ্বাস ব্যক্ত করেন। এই জাল হল কালব্রহ্মের (প্রভু)। এই কাল প্রভুর বিষয়ে কেবল পূর্ণ পরমাত্মাই (কাদির আল্লাহ) বলতে পারেন এবং সৎ ভক্তি প্রদান করে সাধককে আজীবন রক্ষা করেন, তারপরে সাধক সত্যভক্তি করে পূর্ণ মোক্ষকে প্রাপ্ত করেন।

অধ্যায় "মোহম্মদ বোধ"-এর সারাংশ (মুসলমান ধর্মের পরিচয়)

কবীর সাগরের "মোহম্মদ বোধ" অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ৬- তে রয়েছে।

ধর্মদাস পরমেশ্বর কবীর সাহেবকে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদকে জ্ঞান বোঝানোর বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে, হে বন্দীছোড়! আপনি নবী মোহম্মদের সাথে কখনো সাক্ষাৎকার করেছিলেন কি? তিনি আপনার শরণ নিয়েছিলেন কি না? এই কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে, কারণ আপনি হলেন সকলের মালিক ও সর্বজ্ঞাতা।

পরমেশ্বর কবীর তখন ধর্মদাসকে মোহম্মদের ধর্মের বিষয়ে এই প্রকার উত্তর দিয়েছিলেন :- (লেখক রামপাল দাসের শব্দ দ্বারা।)

কবীর পরমেশ্বর তাঁর প্রিয় শিষ্য ধর্মদাসকে মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, যা এইপ্রকার, {পাঠকদের নিকট আমার নিবেদন হল যে, কবীর সাগর থেকে অনেক প্রকরণ কবীর পন্থীরা বের করে দিয়েছে। কারণ, তারা তার বিবরণ বুঝতে পারেননি। তারা তাদের বুদ্ধির অভাবের কারণে ভুল মনে করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তবে আমার কাছে এক অনেক পুরানো কবীর সাগর গ্রন্থ রয়েছে। সেই আধারে এবং পরমেশ্বর কবীর নিজের জ্ঞানকে, পরে সন্ত গরীবদাসকে ১৭২৭ সালে (বিক্রমী সংবত ১৭৮৪) প্রদান করেছিলেন। সন্ত গরীবদাস তখন মাত্র ১০ বছরের বালক ছিল। ওই সময় কবীর পরমেশ্বর তাঁকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সমস্ত দৃশ্য দেখিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। তারপর গরীব দাস তাঁর নিজ চোখে দেখা দৃশ্য বর্ণনা করেছিলেন। এরপরে আমি (রামপাল দাস) সমস্ত ধর্ম গ্রন্থগুলি এমন দৃষ্টিকোণ দ্বারা অধ্যয়ন করেছি যে, এই প্রকরণ পুরানো ধর্মগ্রন্থগুলিতেও রয়েছে কি? যদি পুরানো ধর্ম গ্রন্থগুলিতে (পবিত্র বেদ, পবিত্র গীতা, পবিত্র পুরাণ, পবিত্র কুরআন ও পবিত্র বাইবেলে, যা তিন পুস্তকের সহযোগ- তৌরাত,

জবুর, ইঞ্জিল গ্রন্থ গুলির) মধ্যে পবিত্র কবীর সাগরের প্রকরণ থাকে, তাহলে সমাজের সরল-সোজা প্রভু প্রেমীগণ, ধর্মের নামে যে বিভিন্ন পন্থ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়া ওই জনতাকে এক সূত্রে বাঁধা যেতে পারে। অধ্যয়ন করে জানা গেল যে, সকল ধর্মগ্রন্থ এমনকি যে পর্যায়ের জ্ঞান ওরমধ্যে রয়েছে, তা কবীর সাগরের সাথে মিলছে। ওই গ্রন্থগুলির থেকে পূর্বের বা আদি জ্ঞান হল, কবীর সাগরের জ্ঞান।

কবীর পরমেশ্বর ধর্মদাসকে বলেছিলেন যে, হে ধর্মদাস! মুসলমানরা মানেন যে, বাবা আদম থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, তবে এটা হল তাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান। বাবা আদমের আত্মা পূর্বজন্মে ঋষভদেব নামক রাজা ছিলেন, যাঁকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম তীর্থঙ্কর মানা হয়। আমি (পরমেশ্বর কবীর) নবী মোহম্মদকে এটাই বুঝিয়েছিলাম যে, আপনি বাবা আদমকে আপনাদের প্রথম পুরুষ বলে মানেন এবং আপনি নিজেকে তাঁরই সন্তান বলে মনে করেন। যে সময় বাবা আদম ছিলেন না, সেই সময় পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ) তো ছিলেন। এই জ্ঞান পবিত্র বাইবেলে উৎপত্তি গ্রন্থে লেখা রয়েছে। নবী মোহম্মদের পূর্বে বাবা আদমের সন্তানদের মধ্যে লাখ পয়গম্বর হয়েছিলেন বলে মানা হয়, যার মধ্যে **(১). হজরত দাউদ (২). হজরত মুসা (৩). হজরত ঈসা**। হজরত দাউদকে জবুর গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল, মুসাকে তৌরাত এবং ঈসাকে (যীশু) ইঞ্জিল গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেককে কেবল একবারই উপরোক্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু নবী মোহম্মদকে কুরআন শরীফ গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছিল যা বিভিন্ন পর্যায়ে ও অনেক প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিল।

যখন কোনো পন্থের প্রারম্ভ হয়, তখন সেই সম্প্রদায়েরই কোনো এক ব্যক্তির দ্বারাই শুরু হয়। কারণ এই হল যে, পরমেশ্বর কোনো মহাপুরুষকে এই উদ্দেশ্যে সংসারে পাঠান, যাতে তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা কুকর্ম, কুপ্রথা, শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনাকে ছাড়িয়ে, স্বচ্ছ ও শাস্ত্র বিধি অনুসার ভক্তি করা ভক্তদের তৈরি করেন। যার কারণে তাঁকে নিজের সম্প্রদায় থেকে শুরু করতে হয়। রুঢ়িবাদী ও স্বার্থপর পন্থী গুরুরা জনগণকে ভ্রমিত করে ওই সত্য সন্তকে অনেক বিরোধিতা করেন। তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে কিন্তু তিনি প্রভুর পাঠানো একটি অংশ হন। এই সংসারে দুটি শক্তি তাঁদের নিজ নিজ কাজ করছে। এক হল কাল ব্রহ্ম, যাকে জ্যোতি নিরঞ্জনও বলা হয়। বেদান্তবাদীরা তাঁকে ব্রহ্ম বলেন ও নিরাকার মানেন। মুসলমানরা তাঁকে বেচুন (নিরাকার) আল্লাহ বলেন। দ্বিতীয় শক্তি হলেন সত্য পুরুষ (কাদির আল্লাহ) যাঁকে গীতাতে পরম অক্ষর পুরুষ, সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম, দিব্য পরমপুরুষ, তৎ ব্রহ্মও বলেন। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯, অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩, অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০)

কাল ব্রহ্মের রাজ্য একুশ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রস্থান পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে রয়েছে, যাকে কাল লোক বা ব্রহ্মলোক বলা হয়। কাল ব্রহ্মকে প্রতিদিন এক লক্ষ মানব শরীরধারী প্রাণীকে খাওয়ার অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিল। যার কারণে এই কাল অসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর তার সাথে খারাপ কর্ম যেমন- মদ, মাংস, তামাক সেবন করা এছাড়া তীর্থ-ধাম প্রভৃতি স্থানে পূজা করার জ্ঞানও দেন। যার কারণে সাধকগণ সাধনা করতে করতে অন্য বিষয়-বিকার এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে নিজেদের দুর্লভ মানব জীবনকে নষ্ট করে, তাই তারা কাল ব্রহ্মের জালেই রয়ে যায়। কাল ব্রহ্ম সর্বদা এই প্রচেষ্টাই করতে থাকেন। দ্বিতীয় শক্তি হল সত্য পুরুষ। যিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ও সর্বশক্তিমান এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী আছে, এই সমস্ত হল সত্য পুরুষেরই আত্মা, যারা পূর্বে সত্যলোকে থাকতো। ওই স্থান থেকে নিজেদের অল্পবুদ্ধি ও ভুলের কারণে, কাল ব্রহ্মের সাথে এখানে চলে এসেছে। সেই কাদির আল্লাহর সত্যলোকে প্রত্যেক জীবের নিজের ঘর পরিবার ও সর্ব বস্তু উপলব্ধ ছিল। কাল ব্রহ্মের দেবতাদের থেকেও, প্রত্যেকের সুখ সুবিধা অধিক ছিল। কেউ বৃদ্ধ হতেন না, কেউ মরতেনও না, সেখানে এইরূপই সৃষ্টি রয়েছে। এখানে তো শরীর পাঁচ তত্ত্বের দ্বারা তৈরি করা কিন্তু সেখানে এক নূর তত্ত্ব দ্বারা বানানো সৃষ্টি। এখানের প্রাণীর শরীর মাটির তৈরি মনে করুন আর সেখানে সোনার বানানো জানো। এখানে সব কিছু নষ্ট হয়। ওই স্থান হল অবিনাশী বা অমর। সত্যপুরুষই হলেন স্বয়ং কবীর সাহেব। তাঁর শরীরের নাম হল কবীর। বেদে কবির্দেব বলা হয়। কুরআনে আল্লাহ আকবর ও আল্লাহ কবীর বলা হয়। কবীর পরমেশ্বর চান, সমস্ত জীব যেন আমার জ্ঞানকে বোঝে এবং আমার দ্বারা বলা ভক্তি সাধনা করে। এছাড়া সমস্ত বিকার ত্যাগ করে, পবিত্র হয়ে সত্যলোকে যেতে পারে। সেখানে তাদের কোনো কষ্ট নেই, না মৃত্যু হয় এবং না বৃদ্ধা অবস্থা। সমস্ত খাদ্য পদার্থ সর্বদা উপলব্ধ থাকে। কোনো ডাকাত, বদমাশ ও চোর নেই। নারী, শিশু, পুরুষ সব এই রকমই সৃষ্টি রয়েছে। কাল ব্রহ্ম চায় যে, সমস্ত জীব আমার জালে ফেঁসে থাকুক এবং জন্ম নিতে থাকুক ও মরতে থাকুক। খারাপ কাজ করে পাপগ্রস্থ হয়ে জন্ম - মৃত্যু হতে থাকুক। কারোর যেন সত্যলোকের ও সত্য পুরুষের জ্ঞান না হয়। আমার জ্ঞানকেই যেন অন্তিম মানে। এই জন্য কালব্রহ্ম, পরমেশ্বর কবীরের প্রিয় আত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে নিজের পয়গম্বর অর্থাৎ সংবাদ বাহক বানিয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞান দেওয়ার জন্য ভক্তি দূত হিসাবে পাঠান। নিজের কাল জালে ফাঁসিয়ে রাখার জ্ঞান দেন। এই কাল ব্রহ্মই, বাবা আদম, হজরত দাউদ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত মুহম্মদকে এবং অন্যান্য অবতার রাম, কৃষ্ণ, আদি শঙ্করাচার্য, ঋষি-মুনিদের দ্বারাই নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রচার করিয়ে রাখেন। সত্য পুরুষ স্বয়ং প্রত্যেক যুগের প্রারম্ভে আসেন এবং নিজের লীলা নিজেই করেন। নিজের সত্য জ্ঞান

স্বয়ং প্রচার করেন, পরে তা পুস্তক হয়ে যায়। তারপর পরমেশ্বর তাঁর নিজের পয়গম্বর অর্থাৎ ভক্তি প্রচারক দূত পাঠান। সত্য পুরুষের পয়গম্বর আসার পূর্বে, কাল ব্রহ্ম তাঁর নিজের পয়গম্বরকে পাঠিয়ে দেয়। তাঁর দ্বারা জনতাকে অসত্য জ্ঞানের উপর ও অন্যান্য খারাপ কর্মের প্রতি দৃঢ় করিয়ে দেয়। সমস্ত মানব সমাজ নিজের-নিজের সাধনা ও আধ্যাত্ম জ্ঞান আর পরম্পরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে অটল হয়ে যায়।

সত্যপুরুষ যখন স্বয়ং আসেন কিংবা নিজের অংশকে (অবতার) পাঠান, তখন সমস্ত মানব তাঁদের বলা সত্য জ্ঞানকে অসত্য মনে করে তাঁদের সাথে ঘোর বিরোধিতা করেন। এরপরে কাদির খুদা কবীর বললেন, হে ধর্মদাস! তুমি এটি প্রত্যক্ষভাবেই দেখতে পাচ্ছ। কারণ তুমিও তো পূর্বে কালের জ্ঞান ও সাধনার উপর অটল ছিলে। এইভাবেই অনেক শ্রদ্ধালুগণ কাল প্রভুকেই সর্বশক্তিমান দয়ালু, করুণাময় প্রভু মনে করে পূজা করছে। কাল প্রভুও পরমাত্মার সত্য-নিষ্ঠাবান আত্মাদের নিজের পয়গম্বর (অবতার) বানান। যেমন- বাবা আদমের সন্তানের মধ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার পয়গম্বর এবং হিন্দু ধর্মে ৮৮ হাজার ঋষি এবং অন্যান্য প্রচারক, এঁরা ভালো ও সত্য নিষ্ঠাবানযুক্ত ছিলেন, যাদের কালব্রহ্ম তাঁর নিজের প্রচারক বানিয়েছিলেন। ঋষিরা পবিত্র বেদ, পবিত্র শ্রীমদভগবত গীতা এবং পুরাণের আধারে স্বয়ং সাধনা করেছেন এবং তাদের অনুগামীদেরও এই সব করতে বলেছেন। বেদ ও গীতার জ্ঞান তো শ্রেষ্ঠ কিন্তু সেটিও অসম্পূর্ণ রয়েছে আর যে আঠারো (১৮) পুরাণ আছে, সেটি হল ঋষিদের নিজের নিজের অনুভব বা বিচার। তবে এর মধ্যে কিছু বেদের জ্ঞানও রয়েছে এবং কিছু কিছু দেবী-দেবতাদের জীবনী লেখা রয়েছে। চার বেদের জ্ঞান কাল ব্রহ্ম দিয়েছেন এবং এই চার বেদের সারাংশ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপ হল শ্রীমদভগবত গীতা। কাল ব্রহ্ম সর্বপ্রথম এই চার বেদের জ্ঞান দিয়েছিলেন। তারপরে কালব্রহ্ম, চার কিতাবের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরান শরীফের) জ্ঞান দিয়েছেন। ভক্তির মার্গের জ্ঞান, বেদ ও গীতাতে বলা হয়েছে। এরপরে হজরত দাউদকে জবুর কিতাবের জ্ঞান দেওয়া হয়। এতে সৃষ্টি রচনার আংশিক জ্ঞান আছে। অতঃপর মূসাকে তৌরাত কিতাবের জ্ঞান দান করেছিলেন আর ঈসা মসীহাকে ইঞ্জিল কিতাবের জ্ঞান দেওয়া হয়। এরপরে মোহম্মদকে কুরান শরীফের জ্ঞান দিয়েছিলেন। তবে বেদের মধ্যে ভক্তি ও ভগবানের জ্ঞান বলা হয়েছে। এই কারণে, ওই জ্ঞান অন্যান্য কিতাবে যেমন- জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরান শরীফে পুনরাবৃত্ত করাকে (পুনরায় বলা) সঠিক নয় জেনে, সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বেদের জ্ঞানও আছে। তবে কুরান শরীফের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ জ্ঞানই বাইবেল (বাইবেল গ্রন্থে তিন কিতাব একত্র রূপে আছে, জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল) থেকে নেওয়া হয়েছে। মূসার অনুগামীদের ইহুদি বলা হয়। ঈসার অনুগামীদের খ্রীষ্টান আর মোহম্মদের অনুগামীদের মুসলমান বলা হয়। এই সব লোকই বাবা আদমকে তাদের প্রথম পুরুষ অর্থাৎ সকল মানবের পিতা বলে মানেন। এই সকল ব্যক্তিরা আজও মানেন যে, যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টি চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত মানুষ মরতে থাকবে আর তাদেরকে কবরে দাফন করতে থাকবে আর যে সময় কিয়ামত আসবে, ওই সময় সকল মানুষকে (নারী-পুরুষ) কবর থেকে বের করে জীবিত করা হবে। পরে তাদের কর্ম অনুসারে বিচার হবে আর যারা চার কিতাবে লেখা আল্লাহর আদেশ অনুসারে কর্ম করেছে, তারা জান্নাতে বাস করবে। যারা চার কিতাবের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফের) আদেশ পালন করেনি। তারা চিরকাল দোজখের (নরক) আগুনে জ্বলতে থাকবে। এরপর এখানকার সৃষ্টি চিরতরের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের আগে কেবল নিরাকার প্রভুই ছিলেন। বর্তমানে জান্নাতে কেউ নেই এবং জাহান্নামেও কেউ নেই। মুসলমানরা এ কথাও বিশ্বাস করে না যে, কখনো পুনর্জন্ম হয়। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের একবারই জন্ম হবে আর পরে মৃত্যু হবে, তারপর কবরে আর যখন কিয়ামত হবে, তখন কবর থেকে বের করে তাদের কর্ম অনুসারে জান্নাতে ও জাহান্নামে, এরপরেই Full stop অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রমের পূর্ণ বিরাম থাকবে। যদি উপরোক্ত কথাগুলো সত্য হয়, তাহলে মেরাজ যাত্রায় হজরত মুহম্মদ জান্নাতে বাবা আদমকে, হজরত মূসাকে, হজরত ঈসাকে, হজরত দাউদকে ও অন্যান্য প্রমুখ মন্ডলীদের কিভাবে দেখতে পেলেন? তাঁদেরও তো কবরে থাকা উচিত ছিল। এই কারণে আপনাদের মুসলমানদের বিধান ভুল প্রমাণিত হল।

পরমেশ্বর কবীর ধর্মদাসকে বললেন, হে ধর্মদাস! মুসলমানদের এই বিচার ও জ্ঞান ভুল। বাস্তবিকতা হল এটা যে, জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সকল আত্মা আমার (কবীর খুদা) শরণে আসবে। কবীর পরমেশ্বর ধর্মদাসকে মুহম্মদের জীবনী এই প্রকার বলেছিলেন যে, হে ধর্মদাস! ঈসার (যীশু খ্রীষ্টের) প্রায় ৬০০ বছর পরে, হজরত মুহম্মদের জন্ম ইহুদি সম্প্রদায়েতে হয়েছিল। ওই সময় আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতা সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি মূর্তি পূজক ছিল। মুহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লা ছিল এবং পিতামহের (ঠাকুরদাদা) নাম আবদুল মুত্তলিব ছিল। মুহম্মদের জন্ম এক বিল্লা রহমান নামক ফকিরের (সাধুর) সূক্ষ্ম মিলনে গর্ভ দ্বারা হয়েছিল। এই ঘটনাকে মোহম্মদের মা এক স্বপ্ন দোষ বলে মেনে নিয়েছিলেন। {এই প্রকার ঈসার মাতা মরিয়মও (মেরী/মারিয়াও) এক ফেরেশতার (দেবতা) দ্বারা গর্ভে এসেছিলেন। মরিয়ম এই ঘটনাকেও স্বপ্নদোষ

বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু ঈসার পিতা যোসেফ এটিকে ভুল কর্ম মনে করে মরিয়মকে তালাক দিতে (ত্যাগ করতে) চেয়েছিলেন। ওই সময় এক ফেরেশতা (দেবতা) প্রকট হয়ে বলেছিলেন যে, মরিয়ম গর্ভবতী আমার দ্বারা হয়েছে, এই মরিয়ম কিছুই জানে না। এঁ একজন প্রভুর নিকট হতে পাঠানো নবী। সংসারে ভক্তির বার্তা দেওয়ার জন্য জন্ম নেবেন। এই কথা শুনে যোসেফ (ইউসুফ) তাঁকে দেবতা মেনে, পরে মরিয়মকে (মেরীকে/মারিয়াকে) আদর ও সম্মানের সাথে রেখেছিলেন। মহাভারতেও প্রমাণ আছে যে, রাজা শান্তনুর পুত্র ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্র বড় ও পাণ্ডব ছোটো, এঁরা দুই ভাই ছিলেন। পাণ্ডব অসুস্থ থাকতেন এবং সন্তান উৎপত্তি করতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর দুইজন স্ত্রী ছিল। একজনের নাম ছিল কুন্তী ও অন্যজনের নাম মাদ্রী। কুন্তী তিন পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন, যা তিন ফেরেশতার (দেবতা) দ্বারাই তার গর্ভ হয়েছিল। ধর্মরাজ ও কুন্তীর মিলনেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিল আর অর্জুনের জন্ম ইন্দ্র দেবতা ও কুন্তী এই দুইজনের ভোগ-বিলাসের কারণে হয়েছিল এবং ভীমের জন্ম পবন দেবতার দ্বারা কুন্তীর সাথে মিলন করার মাধ্যমে হয়েছিল এবং পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর সাথে স্রত দেবতার মিলনে নকুলের জন্ম এবং মাদ্রীর দ্বিতীয় পুত্র সহদেবের জন্ম নাসত্য দেবতার মিলনে হয়েছিল। পুরাণে এক ঘটনা আছে যে, এক সময় সূর্যদেবের স্ত্রী গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। কারণ এই ছিল যে, সূর্যদেবের অধিক ভোগ-বিলাস (sex) করার কারণে বিরক্ত হয়ে নিজের দাসীকে তার নিজের মতো স্বরূপ হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে দাসীকে বলেছিলেন, তুমি এই ভেদের কথা কাউকে বলবে না। আমি আমার পিতা বিশ্বকর্মার ঘরে যাচ্ছি। এই বলে ঊষা (সূর্য দেবের স্ত্রী) চলে গেলেন। এরপরে দাসীর রূপ ঊষার রূপের মতো হয়ে গিয়েছিল। এই কথা যখন সূর্যদেব জেনে গেলেন, তখন তিনি বিশ্বকর্মার ঘরে চলে গেলেন। বিশ্বকর্মা তার মেয়েকে পুনরায় তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য জোর করতে লাগলেন, ঊষা তখন ঘোড়ার রূপ ধারণ করে জঙ্গলে তপস্যা করতে লাগলেন আর ভাবলেন যে, যদি আমি নারী রূপে তপস্যা করি, তাহলে কেউ না কেউ ইজ্জতের শত্রু হয়ে যাবে। সূর্যদেব জেনে গেলেন যে, ঊষা তো এখান থেকেও চলে গিয়েছে। তখন তিনি ধ্যান দ্বারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে, ঊষা মেয়ে ঘোড়ার রূপ ধারণ করে তপস্যা করছে। সূর্যদেব তখন পুরুষ ঘোড়ার রূপ ধারণ করে ঊষাকে ভোগ করার জন্য আকুল হয়ে গেলেন। ঘোড়া রূপী ঊষা পুরুষ ঘোড়াটিকে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তার দিকে আসতে দেখে, তার পিছনের অংশকে (ইন্দ্রিয়) বাঁচাবার জন্য ঘোড়ার দিকে মুখ করে, সাথে সাথে ঘুরতে লাগলেন। বাসনাবশ সূর্য রূপী ঘোড়া মুখেতেই ভোগ করতে লাগলেন আর তার বীজ (বীর্য) শক্তি পৃথিবীতে পড়ে গেল। সেই মাটিতে পড়া বীর্য থেকে দুই পুত্র উৎপন্ন হল। তাঁদেরই অশ্বনী (ঘোড়া) কুমার বলা হয়। তাদের নাম স্রত ও নাসত্য রাখা হয়েছিল। তাদেরকে অশ্বনী কুমার দেবতা বলা হয়।} আবদুল্লা তার স্ত্রীকে নিজের শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন।

{সূক্ষ্মবেদে লেখা আছে যে :-

"বিলৈমান বিস্তার বিলাকা, নৌজ উদর ঘর সংগম তাকা।
জাকে ভোগ মুহম্মদ আয়া, নৌজ উদর ঘর মুহম্মদ জায়া॥"

কয়েক মাস পরে আবদুল্লা কিছু ব্যবসায়ীদের সাথে অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, সেখানে অসুস্থ হয়ে মারা যান। ওই সময় মুহম্মদ তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন। কয়েক মাস পরেই তাঁর জন্ম হয় এবং যখন তাঁর বয়স ছয় বছর হল তখন তাঁর মা গ্রামের কয়েকজন নারী-পুরুষকে নিয়ে, তার স্বামীর (আবদুল্লা) কবর দেখতে গেলেন এবং পথে চলাকালীনই তাঁর মায়েরও মৃত্যু হয়ে গেল। এরপর নবী মুহম্মদ এতিম (অনাথ) হয়ে গেলেন। ঠাকুরদাদা লালন-পালন করতে লাগলেন। যখন আট বছর বয়স হল, তখন ঠাকুরদাদাও মারা গেলেন। এই সময় তিনি সম্পূর্ণ রূপে অনাথ হয়ে গেলেন। যেমন-তেমন করে যখন ২৫ বছর বয়সের হয়ে গেলেন। তখন খাদিজা নামের এক ৪০ বছর বয়সী বিধবা মহিলার সঙ্গে তার বিবাহ হল। {খাদিজার দুইবারই খুব ধনী পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। উভয় স্বামীর মৃত্যু হওয়ার কারণে তাদের সমস্ত সম্পত্তি খাদিজার কাছেই ছিল। তিনি খুব ধনী ছিলেন।}

খাদিজার দ্বারা মুহম্মদের তিন পুত্র (কাসিম, তয়ব, তাহির) ও চার কন্যা হয়। হজরত মুহম্মদ যখন ৪০ বছরের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক জিব্রাইল নামের ফেরেশতা দেখা করলেন আর কুরআন শরীফের জ্ঞান দিতে শুরু করলেন, তারপর তিনি নবী হলেন। মুসলমানরা মানেন যে, কুরআন শরীফের জ্ঞান হজরত মুহম্মদের নিকটে সরাসরি বেচুন (নিরাকার) আল্লাহর দ্বারা পাঠানো হয়েছে। কুরআন শরিফের মধ্যে নিরাকার আল্লাহর জ্ঞান ছাড়া, অন্য কারোর জ্ঞান অর্থাৎ ভেজাল না করেই জিব্রাইল ফেরেশতা এই জ্ঞান মুহম্মদকে বলেছেন। কখনো কখনো ফেরেশতা মুহম্মদের শরীরে প্রবেশ করে কথা বলতেন, তখন মুহম্মদ চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়তেন। উপর থেকে আল্লাহর দিক থেকে যে ওহী (সন্দেশ) আসতো, সেই জ্ঞানের কথা মোহম্মদ মুখ ঢেকেই বলতেন আর অন্য দিকে লেখা হয়ে যেতো। এই প্রকার খবর আসা সংবাদ খুবই দুঃখজনক হতো, ওই সময় মুহম্মদের সর্ব শরীর ভীষণ কাঁপতে লাগতো। কারণ ওই সময় ফেরেশতা তাঁর শরীরে প্রবেশ করে বলতেন, কখনো কখনো তো স্বয়ং কাল ব্রহ্মাও প্রবেশ করে বলতেন। (এই

কালব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে গীতার জ্ঞান বলেছিলেন)। একদিন হজরত মুহম্মদ উপরে আকাশ (জান্নাত) যাত্রার এক ঘটনা বর্ণন করে বলেছিলেন যে, "এক গাধার মতো পশু (যাকে বুরাক নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ে জিব্রাইল নামের এক দেবতা এসেছিলেন আর মুহম্মদকে সেই বুরাকের পিঠের উপর বসিয়ে, সপ্তম আকাশের উপর ঘোরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপরে গিয়ে এক মেরাজ অর্থাৎ উপর থেকে নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে এসে খুলে গেল, তার উপর বুরাক (পশু) চড়ে গেল। মুহম্মদ সেই বুরাকের পিঠে বসে ছিলেন আর জিব্রাইল নিচে রইলেন। তারপর একটা পাখি এলো, তার উপর বসে মুহম্মদ আল্লাহর কাছে গেলেন। এরপর পাখিটি চলে গেল। মুহম্মদ সরাসরি আল্লাহর সাথে বার্তা তো করলেন কিন্তু সেই বার্তা আল্লাহ পর্দার আড়াল থেকে বলেছিলেন, তিনি মুহম্মদজীকে প্রতিদিন ৫০ বার নামাজ পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। পরে হজরত মূসার বলার কারণে, পুনরায় কয়েকবার যখন আল্লাহর নিকট গেলেন, তখন কেবল ৫ বার নামাজ পড়ার আদেশ পেলেন, সেই খবর নিয়ে নিচে এলেন, যা বর্তমানে মুসলমানরা করছেন। হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন যে, আমি জান্নাতে (স্বর্গে) গিয়ে সকল মানবদের পিতা বাবা আদমকে দেখেছি ও তাঁর ডান দিকে স্বর্গ ছিল। ওই স্বর্গে তাঁর পবিত্র সন্তানরা ছিলেন, যারা আল্লাহর আদেশ অনুসারে ভক্তি করেছিলেন, সেইজন্য স্বর্গে (জান্নাত) সুখী ছিলেন আর বাবা আদমের বাম পাশে দোজখ (নরক) ছিল। সেখানে বাবা আদমের অযোগ্য সন্তানরা কষ্ট ভোগ করছিল, যারা আল্লাহর পুস্তকের আদেশ অনুসারে ভক্তি (ইবাদত) না করার কারণে, নিজেদের জীবন ব্যর্থ করেছিল। হজরত মুহম্মদ এ কথাও বললেন যে, বাবা আদম যখন বাম দিকে নরকে তাঁর সন্তানদের কষ্ট পেতে দেখছিলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন আর যখন তিনি ডানে স্বর্গে তাঁর পবিত্র সন্তানদের আনন্দ ভোগ করতে দেখছিলেন, তখন তিনি হাসছিলেন। জিব্রাইল দেবতা মুহম্মদজিকে জানালেন যে, ইনি হলেন বাবা আদম। হজরত মুহম্মদ আরো বললেন যে, উপর লোকে (ধাম) আমি হজরত দাউদ, হজরত মূসা ও হজরত ঈসা ও অন্যান্য প্রমুখ নবী মন্ডলীদের (জামাত) সঙ্গেও দেখা করেছি এবং তাঁদের নামাজও পড়িয়েছি। এরপরে বুরাক (পশু) তাঁকে নিচে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।"

হজরত মুহম্মদের চোখে দেখা এই ঘটনাকে সকল মুসলমানরা সত্য বলে মানেন। এই জন্য আপনাদের (বলা ওই সিদ্ধান্তগুলো ভুল প্রমাণিত হচ্ছে যে, মৃত্যুর পরে প্রলয় (কিয়ামত) পর্যন্ত বাবা আদম, হজরত দাউদ, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবী মণ্ডলীদেরকে জান্নাতে না থেকে তো কবরে থাকা উচিত ছিল, যাদেরকে হজরত মুহম্মদ জান্নাতে দেখেছিলেন। এছাড়া বাবা আদমের সন্তানদেরও তো কবরে থাকা উচিত ছিল, যাদেরকে হজরত মুহম্মদ উপরের স্বর্গে ও নরকে দেখেছিলেন। অতএব আপনাদের এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে ভুল। হজরত মুহম্মদের খাদিজার দ্বারা তিন পুত্র এবং চার কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিল আর সেই তিন পুত্র সবাই মুহম্মদের চোখের সামনেই আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছিলেন অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

"কাদির (সমর্থবান) আল্লাহ কবীর"

{আল্লাহ কবীর বলতেন যে, "হিন্দু, মুসলমান, ঈহুদি ও খ্রীষ্টান সবাই এক প্রভুরই সন্তান। কাল শয়তান তোমাদেরকে ভ্রমিত করে পৃথক করে রেখেছে"।}

একবার দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধী যিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এক সময় তাঁর জ্বলন রোগ হয়েছিল, এই জ্বলন রোগ এমন হয় যেমন কোনো ব্যক্তির শরীর যদি আগুনে পুড়ে গেলে যেমন পীড়া অধিক হয়। তবে এই জ্বলন রোগটি শরীরের কোথাও দেখা যায় না, তবে জ্বলে যাওয়ার মতোই ভয়ংকর যন্ত্রণা হয়। একেই জ্বলন রোগ বলা হয়। যখন জীবের পাপ বেড়ে যায়, তখন ওষুধও অকার্যকর হয়ে যায়। দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধীর ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। তিনি সব ধরনের ওষুধ সেবন করেছিলেন। বড় বড় বৈদ্য ডেকে পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, আমাকে যে সুস্থ করে দেবে, সে যা চাইবে আমি তাই দেব। দুঃখের কারণে না জানি মানুষ কত প্রকারের না প্রতিজ্ঞা করে ফেলে? তার এ সমস্ত উপায় নিষ্ফল হয়ে যায়। এরপর নিজেদের ধার্মিক কাজী, মোল্লা, সাধু-সন্ত, ফকিরদের দ্বারা ও আধ্যাত্মিক উপায়ে অন্যদের দ্বারাও চিকিৎসা করিয়েছিলেন, কিন্তু তা সব ব্যর্থ হয়ে যায়। (যখন আমরা দুঃখী হই, তখন হিন্দু-মুসলমান বা জাত-পাত দেখি না। তারপর যে কোনো স্থানে রোগ নিরাময় উদ্দেশ্য চলে যায়। কখনো তো হিন্দুরা বলে যে, মুসলমান খারাপ আর কখনো মুসলমানরা বলে, হিন্দুরা খারাপ। তবে যখন তারা অসুস্থ হয়, তখন তারা না হিন্দু দেখে আর না মুসলমান দেখে। যখন কষ্ট আসে তখন কেউ খারাপ হয় না। তবে যে মুসলমান খারাপ হয়, সে আসলেই খারাপ হয় আর যে হিন্দু খারাপ হয়, সে আসলেই সর্বদাই খারাপ হয়। এছাড়া উভয়ের মধ্যে ভালও আছে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ভাল-মন্দ মানুষ অবশ্যই থাকে। কিন্তু আমরা হলাম জীব, আমাদের একই ধর্ম আছে, তা হল মানবধর্ম এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মাকে (কাদির আল্লাকে) প্রাপ্তি করা।} এরপর হিন্দু বৈদ্য ও আধ্যাত্মিক সাধু-সন্তদেরও তিনি ডেকেছিলেন, নিজেও গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ ও তন্ত্র-মন্ত্র করিয়েছিলেন কিন্তু

সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে গিয়েছিল। কোনো এক ব্যক্তি বাদশাকে বললেন, কাশী নগরে কবীর নামে একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি যদি কৃপা করেন তাহলে অবশ্যই আপনার দুঃখ দূর হবে।

যখন বাদশা সিকন্দর এই কথা শুনলেন যে, কাশীর নগরে একজন মহাপুরুষ থাকেন আর তিনি কৃপা করলে দুঃখ দূর হতে পারে। তখন তাঁর পূর্বের কিছু কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যে, তিনি ওই ব্যক্তি নন তো, যিনি একদিন মৃত গরুকে জীবিত করে দিয়েছিলেন? এই বিচার করে তিনি হাজার হাজার দেহরক্ষী নিয়ে দিল্লি থেকে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বীরসিংহ বাঘেল নামে কাশীতে এক নরেশ (রাজা) ছিলেন। তিনি পরমাত্মা কবীর জীর মহিমা ও জ্ঞান শুনে, খুব শীঘ্রই কবীর সাহেবের শিষ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর গুরুদেবের প্রতি পূর্ণরূপে আস্থা রাখতেন। তিনি কবীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার সম্পর্কে জানতেন। কারণ কবীর পরমেশ্বর তার রাজ্যেও অনেক লীলা করেছিলেন।

সিকন্দর লোধী যখন বেনারসে (কাশী) গিয়ে বীরসিংহকে বললেন যে, আমি অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনাতে খুবই দুঃখিত, এখন শুধু মরতে বাকি আছে। তবে শুনেছি যে, এই কাশীতে কবীর নামে কি কোনো সন্ত আছেন? আপনি হয়তো জানেন, তিনি কেমন? এই কথা সিকন্দর বাদশার মুখ থেকে শুনতেই কাশীর রাজা বীরসিংহের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল, তখন তিনি বললেন, এখন আপনি সঠিক স্থানে এসেছেন। এখন আপনার দুঃখের অবসান এখানেই হবে। বাদশা সিকন্দর জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমনই বা কী কথা? বীরসিংহ বললেন, কবীর সাহেব স্বয়ং ভগবান, যিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি পরমেশ্বর স্বরূপ। যদি তাঁর দয়াদৃষ্টি হয়, তাহলে আপনার রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে। বাদশা সিকন্দর বললেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনুন। কাশীর রাজা বীরদেব সিং বাঘেল বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করে বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য! আদেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে শুনেছি যে, সন্ত বা মহাপুরুষকে আদেশ দ্বারা ডাকা উচিত নয়। যদি তিনি এসেও যান আর কৃপা যদি না করেন, তাহলে আপনার এখানে এসে কোনো লাভ প্রাপ্ত হবে না, বাকি আপনার ইচ্ছা। বাদশাহ সিকন্দর বললেন ঠিক আছে, আমি স্বয়ংই যাব। যখন এতটা দূর আসতে পেরেছি, তখন ওই স্থানেও অবশ্য যাব।

"বাদশাহ সিকন্দর লোধীর অসাধ্যরোগ নিরাময় করা"

সেখানে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রাজা বীরসিংহ জানতেন যে, কবীর সাহেব (কবীর আল্লাহ) আনুষ্ঠানিক গুরুদেব স্বামী রামানন্দের আশ্রমেই থাকেন। এই সময় পরমেশ্বর কবীর ওই আশ্রমেই সকলের সাথে দেখা করেন। কাশীর রাজা বীর সিং বাঘেল ও বাদশা সিকন্দর লোধী দুইজনেই স্বামী রামানন্দের আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে, কবীর সাহেব এখনো পর্যন্ত আসেন নি, তবে আসার সময় হয়ে গিয়েছে, এই ভেবে রাজা বীরসিং ভিতরে যাননি। তবে বাইরে যে সেবক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার কাছেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাদশাহ সিকন্দর বললেন, "ততক্ষণ আশ্রমেই বিশ্রাম করে নেওয়া হোক।" এরপর রাজা বীরসিংহ স্বামী রামানন্দের দ্বাররক্ষী সেবককে বললেন যে ,স্বামী রামানন্দের নিকট গিয়ে প্রার্থনা করে বলো, দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধী আপনার দর্শনও করতে চান এবং আপনার আশ্রমে কবীর সাহেবের জন্য অপেক্ষাও করতে চাইছেন। দ্বাররক্ষী ভিতরে গিয়ে রামানন্দকে বললেন যে, দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধী এসেছেন। তবে স্বামী রামানন্দ মুসলমানদের খুবই ঘৃণা করতেন। সেবকের কথা শুনে স্বামী রামানন্দ বললেন, আমি এই মলেচ্ছোর মুখও দেখতে চাই না, বলে দাও যে, বাইরে বসতে। যখন সিকন্দর লোধী এই কথা শুনলেন, তখন অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে (কারণ রাজার মধ্যে অহংকার অধিক হয় এবং তিনি তো দিল্লির সম্রাট ছিলেন) বললেন, এই দুই কড়ির (পয়সার) মহাত্মা যদি দিল্লির সম্রাটকে অসম্মান করতে পারে, তাহলে সাধারণ মুসলমানদের সাথে কেমন ব্যবহার করে? এই স্বামীকে এক্ষুনি মজা দেখাচ্ছি। স্বামী রামানন্দ আলাদা এক আসনে বসে ছিলেন। সিকন্দর লোধী ক্রোধিত হয়ে তরবারি দিয়ে রামানন্দের গলা কেটে দিলেন, পুনরায় ফিরে চলে যেতে লাগলেন। এরমধ্যে তার মনে পড়ে গেল যে, তিনি কোন কার্যের জন্য এসেছিলেন? তিনি ভাবলেন ওই কার্য তো আর পূর্ণ হবে না। তাই বললেন, বীরসিং! দেখো আমি কি অন্যায় করে বসেছি? আমার খুব খারাপ দিন চলছে, করতে চাই ভালো কাজ আর হয়ে যায় খারাপ। আমি কবীর সাহেবের গুরুদেবকে হত্যা করে দিয়েছি, এখন তিনি আর কখনও আমার প্রতি দয়াদৃষ্টির কৃপা করবেন না। আমাকে এই দুঃখ জীবন ভর ভোগ করেই মরতে হবে, আমি খুবই পাপী প্রাণী। এই বলে আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বীরসিংহ তার বাদশাহের সামনে আর কি বা বলতে পারেন?

যখনই আশ্রম থেকে বাইরে এলেন, তখন কবীর সাহেবকে আশ্রমে আসতে দেখলেন। বীরসিং বললেন, হে রাজন! আমার গুরুদেব কবীর সাহেব এসে গেছেন। কবীর সাহেব যখন কিছুটা দূর রয়ে গেলেন, তখন বীর সিং কবীর সাহেবকে অষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ অর্থাৎ মাটিতে নত হয়ে প্রণাম করলেন। তবে সিকন্দর খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। {যদি তিনি এই অপরাধ না করতেন, তাহলে কখনও দণ্ডবৎ প্রণাম করতেন না আর যদি দণ্ডবৎ প্রণাম না করতেন, তাহলে কবীর

সাহেব তাঁর প্রতি কৃপা করতে পারতেন না, কেননা এটাই নিয়ম বা বিধি আছে।

"অতি আধীন দীন হো প্রাণী, তাতে কহিএ য়ে অকথ কহানী।"

উচ্চে পাত্র জল না জাঈ, তাতে নীচা হুজৈ ভাঈ।

আধীনী কে পাস হৈঁ, পূর্ণ ব্রহ্ম দয়াল। মান বড়াঈ মারিএ বে অদবী সির কাল॥

কবীর পরমেশ্বর এখানে এক তীরে দুটি শিকার করছিলেন। স্বামী রামানন্দ মুসলমানদেরকে হিন্দুদের থেকে যে ভিন্ন এবং তুচ্ছ মনে করতেন ও রামানন্দের মনে ধর্ম ভেদ-ভাবের যে ভাবনা ছিল, এই উভয়ই দূর করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাদশা সিকন্দরেরও মনে যে অহঙ্কার ভাবনা ছিল, তিনি যদি নম্র না হতেন, তাহলে কবীর পরমাত্মাও কৃপা করতেন না এবং সিকন্দরের সুস্থ্যও ঠিক হতো না।} বীরসিংকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে দেখে এবং ভয়ের কারণে সিকন্দর লোধীও দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। {মুসলমানরা বলেন যে, আমাদের মাথা কেবল আল্লাহর সামনে নত হয়, অন্যের সামনে মুসলমানরা মাথা নত করে না। সামনে আল্লাহ আকবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই অনায়াসেই মাথা নত হয়ে গিয়েছিল।} কবীর পরমেশ্বর উভয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, আজ দুই দুই নরেশ (রাজা ও মহারাজা) এই গরীবের কাছে কি উদ্দেশ্যে এলেন? আমার মতো গরীবকে কিরূপে দর্শন দিলেন? পরমেশ্বর কবীর নিজের হাত না উঠাতেই, বাদশা সিকন্দরের জ্বলনের রোগ সমাপ্ত হয়ে গেল, এই দেখে সিকন্দর লোধীর চোখে জল চলে এলো। (সন্তের সামনে এলে দুষ্ট মন পালিয়ে যায় আর আত্মা উপরে জেগে ওঠে। কেননা পরমাত্মা হল আত্মার সাথী। এইজন্য বাণীতে বলা হয়েছে যে, "অন্তর্যামি এক তু আত্ম কে আধার।" আত্মার আধার হলেন কবীর ভগবান।) সিকন্দর লোধী পরমাত্মার শ্রীচরণ (পা) ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং চরণ ছাড়তেই চাইছিলেন না, কেবল কেঁদেই চলেছিলেন। অন্তর্যামী হওয়া সত্ত্বেও পরমাত্মা কবীর সাহেব দিল্লীর সম্রাট সিকন্দর লোধীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি হয়েছে? সিকন্দর বললেন, "হে আল্লাহর জাত! আমি এমন গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। যে কার্যের জন্য আমি এসেছিলাম সেই দুরারোগ্য ব্যাধি তো আপনার আশীর্বাদ মাত্রই ঠিক হয়ে গেছে। এই পাপীকে ক্ষমা করে দেন মালিক। কবীর সাহেব বললেন ক্ষমা করে দিয়েছি, এবার তো বলো কি হয়েছে? সিকন্দর বললেন, আপনি ক্ষমা করতে পারবেন না, মালিক! আমি এমন পাপ করে ফেলেছি। কবীর সাহেব বললেন, ক্ষমা করে দিয়েছি। সিকন্দর পুনরায় বললেন, সত্যিই কি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কবীর সাহেব বললেন, হ্যাঁ! ক্ষমা করে দিয়েছি, এখন বলো কি কষ্ট হয়েছে? সিকন্দর বললেন, হে দাতা! এই পাপী ক্রোধিত হয়ে আপনার গুরুদেবকে হত্যা করে দিয়েছে, তারপর সম্পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বললেন। কবীর সাহেব বললেন, কোনো সমস্যা নেই, যা হয়েছে তা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। আপনি স্বামী রামানন্দের অন্তিম সংস্কার না করিয়ে যাবেন না, অন্যথায় আপনি নিন্দার পাত্র হবেন। কবীর পরমেশ্বরকে ক্রোধিত না হতে দেখে সিকন্দর লোধী বীরসিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বীরসিংহ ইনি তো বাস্তবে আল্লাহ আছেন। দেখো! আমি তাঁর গুরুদেবের মাথা কেটে ফেলেছি, এর পরেও মালিক কবীর ক্রোধিত হলেন না। বীরসিংহ চুপ রইলেন আর বাদশার কথায় সায় দিলেন ও মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এখন আর কি দেখলেন? এখন তো আরো অনেক কিছু দেখার বাকি আছে। এটা তো কেবল শুরু।

"স্বামী রামানন্দকে পুনরুজ্জীবিত করলেন"

পরমেশ্বর কবীর আশ্রমের ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে, স্বামী রামানন্দের ধড় এক স্থানে পড়ে আর মাথা অন্য স্থানে পড়ে ছিল। শরীরটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। কবীর সাহেব তাঁর গুরুদেবের মৃত শরীরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং তাঁর পা ছুঁয়ে বললেন, গুরুদেব উঠুন! দিল্লির সম্রাট আপনার দর্শন করতে এসেছেন। প্রথমবার উঠতে বললেন এবং দ্বিতীয়বার বলতেই, মাথা নিজে নিজে উঠে ধড়ের সঙ্গে লেগে গেল আর স্বামী রামানন্দ পুনরুজ্জীবিত হয়ে গেলেন। "বলো, সদগুরু দেব কি জয়!"

"সমস্ত মানুষ এক প্রভুরই সন্তান, যারা একের অধিক মানেন তারা অজ্ঞানী"

রামানন্দের শরীর থেকে অর্ধেক রক্ত ও অর্ধেক দুধ বের হয়েছিল। পরমাত্মা কবীর সাহেবের নিকট যখন স্বামী রামানন্দ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে কবীর প্রভু! আমার শরীর থেকে অর্ধেক রক্ত ও অর্ধেক দুধ কেন বের হল? কবীর প্রভু তখন বললেন, হে স্বামীজী! আপনার মধ্যে কিছুটা ভেদাভেদের ত্রুটি রয়েছে, যার কারণে এখনও পর্যন্ত আপনি হিন্দু-মুসলিমকে এক প্রভুর সন্তান মানেন না, দুই মনে করেন। তাই অর্ধেক রক্ত আর অর্ধেক দুধ বের হয়েছে। আপনি কেবল হিন্দুদের আপন সাথী মনে করেন কিন্তু অন্য মুসলমান লোকদের আপনার সঙ্গী হিসাবে বিবেচনা করেন না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান একই প্রভুর সন্তান এবং সকল জীবও এক। স্বামী রামানন্দ বললেন, প্রভু! আপনি তো সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। আপনি তো লীলা করছেন অর্থাৎ আপনি এদিক ওদিকের কথা বলে সর্ববিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

কবীর- অলখ ইলাহী এক হৈ, নাম ধরায়া দোয়। কহৈ কবীর দো নাম সুনি, ভরম পরো মতি কোয়॥১॥

কবীর- রাম রহীমা এক হৈ, নাম ধরয়া দোয়। কহৈ কবীর দো নাম সুনি, ভরম পরো মতি কোয় ॥২॥
কবীর- কৃষ্ণ করীমা এক হৈ, নাম ধরায়া দোয়। কহৈ কবীর দো নাম সুনি, ভরম পরো মতি কোয় ॥৩॥
কবীর- কাশী কাবা এক হৈ, একৈ রাম রহীম। মৈদা এক পকবান বহু, বৈঠি কবীরা জীম ॥৪॥
কবীর- এক বস্তু কে নাম বহু, লীজৈ বস্তু পহিচান। নাম পক্ষ নহী কীজিয়ে, সার তত্ত্ব লে জান ॥৫॥
কবীর- সব কাহুকা লীজিয়ে, সাঁচা শব্দ নিহার। পক্ষপাত না কীজিয়ে, কহৈ কবীর বিচার ॥৬॥
কবীর- রাম কবীরা এক হৈ, দুজা কবহু না হোয়। অন্তর টাটী কপট কী, তাতৈ দীখে দোয় ॥৭॥
কবীর- রাম কবীর এক হৈ, কহন সুনন কো দোয়। দো করি সোঈ জানঈ, সতগুরু মিলা না হোয়॥৮॥

এরপর স্বামী রামানন্দ মুসলিম বাদশাহ সিকন্দরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর থেকে হিন্দু ও মুসলমানকে এবং সকল জাতি ও ধর্মের ব্যক্তিদের এক প্রভুর সন্তান মনে করে ভালবাসতে লাগলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিষ্য কবীর সাহেবকে ধন্যবাদ জানালেন যে, আপনি আমার অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছেন। এখন বুঝতে পারলাম যে, সত্যিকরে আমরা সকলেই এক প্রভুরই সন্তান। এই কথা দৃঢ়ভাবে এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেল। {দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধীর সঙ্গে তাঁর ধর্মগুরু শেখতকীও বেনারসে গিয়েছিলেন। সে রেস্ট হাউজেই (বিশ্রাম গৃহতেই) থেকে গিয়েছিলেন। কারণ শেখতকী হিন্দু সাধু-সন্তদের প্রতি খুবই ঈর্ষা করতেন এবং তাদের শিষ্যদের কাফির বলতেন। এইজন্য সিকন্দর লোধীর সঙ্গে স্বামী রামানন্দের আশ্রমে যাননি।

শেখতকী আল্লাহকে চিনতে পারেনি :- ভারতের সম্রাট সিকন্দর লোধী বিশ্রামস্থলে এসে পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী দ্বারা তার অসাধ্য রোগ নিরাময় কেবল আশীর্বাদ দ্বারা হয়েছে এবং স্বামী রামানন্দকে পুনরুজ্জীবিত করার অলৌকিক ঘটনার কথাও খুশির সাথে তার ধার্মিক পীর শেখতকীকে জানালেন। এছাড়া জানালেন যে, তিনি এখন সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ আছে। শরীরের কোনো অঙ্গে তাঁর এখন পীড়া নেই। {যে সময় শেখতকীকে এই ঘটনার কথা বাদশা শোনাচ্ছিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তাই কাদির খুদা কবীর সিকন্দর বাদশাকে সকালে দেখা করতে বলে, তিনি তাঁর কুটিরে চলে গেলেন।}

শেখতকী বাদশাহের মুখ থেকে, অন্য পীরের ভুরি ভুরি প্রশংসার কথা শুনে ভিতর থেকে জ্বলে উঠল। তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেনি, কেবল এপাশ-ওপাশ করতে লাগল ও মনে মনে বিচার করতে লাগল, কিভাবে পরমেশ্বর কবীরকে অপদস্থ করা যায়, তারই পরিকল্পনা করতে লাগল।

"পবিত্র মুসলিম ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়"

পরবর্তী দিন পূজ্য কবীর পরমেশ্বর রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। কাশী রাজা বীরসিং বাঘেল এবং দিল্লির সম্রাট সিকন্দর লোধী উভয়ই দণ্ডবৎ (মাটিতে লম্বা শুয়ে নতো হয়ে) প্রণাম করলেন এবং কবির্দেবকে সিংহাসনে বসালেন এবং উভয় রাজা স্বয়ং মাটিতে কার্পেটের উপর বিরাজমান হয়ে গেলেন। এরপর বাদশা সিকন্দর প্রার্থনা করলেন যে, হে পালনকর্তা! আমার রোগ নিরাময় না তো হিন্দু সাধু-সন্তদের দ্বারা শান্ত হয়েছিল, না মুসলমান পীরদের দ্বারা আর না কাজী ও মোল্লারা ঠিক করতে পেরেছিল। তবে এর কি কারণ ছিল দীনদয়াল যে, আপনার এক আশীর্বাদেই আমার প্রাণঘাতী রোগ দেখতে না দেখতেই ছুমন্ত্র হয়ে গেল? এতদিন পরে কেবল গতকাল রাত্রে আমি পেট ভরে ভোজন করতে পেরেছি। এই কষ্টদায়ক পীড়া কয়েক বছর ধরে আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে গিয়েছি।

পরমেশ্বর কবীর সাহেব বললেন, হে রাজন! পূর্ণ পরমাত্মা অল্লাহু আকবরই (অল্লাহু কবীরু) সর্ব পাপ নষ্ট (ক্ষমা) করতে পারেন। অন্য প্রভু তো কেবল কর্মের ফলই দিতে পারেন। যেমন জীবের দুঃখ তো পাপের কারণেই হয় আর পুণ্যের কারণে সুখ প্রাপ্ত হয়। পাপ কর্মের কারণেই আপনার কষ্ট ছিল, এটি পূর্বের কৃতকর্ম বা প্রারব্ধতে লেখা ছিল। এটি অন্য কোনো দেবতা বা ভগবানের দ্বারা ঠিক হতে পারে না, কেননা পাপ নাশক (ক্ষমা যিনি করেন সেই) পূর্ণ পরমাত্মার (অল্লাহু কবীরুর) যথার্থ ভক্তি ও জ্ঞান বিধি না তো হিন্দুদের সাধু-সন্ত, গুরুজন জানেন আর না মুসলমানদের পীরেরা বা কাজী-মোল্লারা জানেন। ওই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা বিধি ও পূর্ণ জ্ঞান কেবল এই দাস (কবীর পরমেশ্বর) সম্পূর্ণ জানেন। এটি না শ্রীরামচন্দ্র জানেন, না শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীবিষ্ণু জানেন, না শ্রীব্রহ্মা, না শ্রীশিব, না ব্রহ্ম (যাকে আপনারা নিরাকার প্রভু বলেন) জানেন। না হজরত মুহম্মদ, না অন্য মুসলমান পীর ও কাজী-মোল্লারা জানেন। ওই কাদির আল্লাহর ইবাদত (পূজা) না করলে কারো ভাগ্যে লেখা দুঃখ-কষ্ট সমাপ্ত হতে পারে না। এই কারণেই কোনো হিন্দু অথবা কোনো মুসলিম পীরেরা আপনাকে সুস্থ করতে পারে নি।

"শেখতকি নামক মুসলিম পীরের সাথে কথোপকথন"

পরমেশ্বর কবীর জীর মুখকমল থেকে উপরোক্ত বচন শুনে, শেখতকী ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলল, একমাত্র তুই সমস্ত

জ্ঞান জানিস? আর আমাদের হজরত মুহম্মদ সাহেবকে অজ্ঞানী বলছিস। কবীর সাহেবের সঙ্গে এই রূপ অসম্মানজনক ব্যঙ্গাত্মক ভাষা প্রয়োগ করতে দেখে, কাশীর রাজা বীরসিং বাঘেল বললেন, পীর সাহেব! এই কথায় উত্তেজিত হওয়ার বা কি হল? প্রেম পূর্বক শঙ্কার সমাধান তো করতে পারেন। কাশীর রাজা জানতেন যে, পূজ্য কবীর সাহেব সর্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ, এইজন্য তিনি জ্ঞান গোষ্ঠী করে শেখতকীর ভ্রম দূর করতে চান। কাশীর রাজা তখন শেখতকীকে বললেন, কবীর সাহেব কোন কারণে হজরত মুহম্মদের বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি পূর্ণ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, আপনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করুন। শেখতকী বললেন, প্রশ্নই তো জিজ্ঞাসা করছি। কবীর জী কারণ বলুন, কোন আধারে আপনি হজরত মুহম্মদকে অজ্ঞানী বলেছেন?

"পবিত্র কুরান মজিদে আল্লাহর (প্রভুর) সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?"

পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর বলতে শুরু করলেন যে, পবিত্র কুরান শরীফে (সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং. ৫২, ৫৮, ৫৯), যে কবীর আল্লাহর বিবরণ রয়েছে, তিনি হলেন কাদির খুদা। যাকে আল্লাহু আকবরও (অকবীরু) বলা হয়। কুরান শরীফের জ্ঞানদাতা নিজেকে ছেড়ে অন্য কবীর নামক আল্লাহর মহিমার গুণগান করেছেন। (আয়ত সংখ্যা ৫২ থেকে ৫৮ ও ৫৯ -তে) হজরত মুহম্মদকে কুরান শরিফের জ্ঞান নাজিল করা খুদা বলেছিলেন যে, হে নবী মুহম্মদ! যে কবীর নামক আল্লাহ্ আছেন, তিনিই সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকল পাপ বিনাশকারী এবং সকলের পূজার যোগ্য। তিনিই পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে আকাশে সিংহাসনের উপরে বিরাজমান হয়েছেন। ওই সর্বশক্তিমান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনাহার এবং সমস্ত পাপের বিনাশকারী পরমাত্মা কবীরের (আল্লাহু আকবরের) ভক্তি পদ্ধতি ও তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানকে কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী সন্তের) নিকটে জিজ্ঞাসা করো। এরপরে কবীর পরমেশ্বর শেখতকীকে বলেছিলেন যে, আপনার কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহরই জ্ঞান নেই, তাহলে আপনার হজরত মুহম্মদের কিভাবে সম্পূর্ণ জ্ঞান হতে পারে? এছাড়া অন্যান্য কাজী, মোল্লা ও পীরেরাও সত্য ইবাদত ও তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। যার কারণে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের আধারে ইবাদত করা বান্দাদের (সাধকদের) দুঃখ-কষ্ট নিবারণ হয় না। অন্য সাধনা (ইবাদত) যেমন, পাঁচ সময়ের নামাজ করা, রোজা (ব্রত) ও বংগ (আজান) দেওয়া ইত্যাদি পূজা বিধি দ্বারা মোক্ষ ও দুঃখ নিবারণ হয় না। স্বর্গে নির্মিত করা পিতরলোকে, নরকে ও জন্ম-মৃত্যু নিয়ম অনুসারে অন্য প্রাণীর শরীরে কর্মের আধারে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

উপরোক্ত কথা শোনার পর শেখতকী তৎক্ষণাৎ কুরান শরীফ খুললেন এবং সূরা ফুরকান- ২৫ আয়ত নং ৫২-৫৯ পড়লেন, যার মধ্যে উপরের বিবরণ সত্য দেখতে পেলেন কিন্তু সম্মানহানির আশঙ্কায় বলে দিলেন যে, এইসব কিছুই লেখা নেই, এই কাফির মিথ্যা বলছে। ওই সময় শিক্ষার খুব অভাব ছিল, এই কারণে শেখতকীর কথা শুনে বাদশাহ সিকন্দরেরও সন্দেহ হয়ে যায় যে, পরমেশ্বর কবীর সাহেব যদিও বা তিনি শক্তিতে পরিপূর্ণ কিন্তু অশিক্ষিত হওয়ার কারণে হয়তো কুরান সম্পর্কে না ও জানতে পারেন।

শেখতকী বিদ্বেষপূর্ণ বচন দ্বারা বলল, তাহলে কি তুই সেই বাখবর (তত্ত্বদর্শী সন্ত/তত্ত্বজ্ঞানী)? তাহলে বলে দে, সেই আল্লাহু আকবর কেমন? যদি পরমাত্মাকে (কাদির আল্লাহ) সাকার বলছিস, তাহলে তিনি কে? কোথায় থাকেন?

পরমেশ্বর কবীর সাহেব বললেন :- ওই কবীর আল্লাহ যাঁকে আপনারা আল্লাহু আকবর বলেন, সেই আল্লাহ কবীর আমিই। উপরে সতলোকে আমিই থাকি। আমিই সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছি। আমিই জিন্দা সন্ত রূপ ধারণ করে হজরত মুহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং ওই প্রিয় আত্মাকে (নবী) সতলোকের দর্শন করিয়ে পৃথিবীতে পুনরায় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম আর তাঁকে (হজরত মুহম্মদ) বলেছিলাম যে, এখন আপনি আমার মহিমা আপনার সকল অনুগামীদের শোনান। এছাড়া আমার দেওয়া অন্য কিতাব "কলামে-এ-কবীর" এটি আপনার অনুগামীদের দেন কিন্তু মুহম্মদ আমার দেওয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার করেননি এবং না তিনি আমার কথার উপর বিশ্বাস করেছিলেন।

হজরত মুহম্মদ যে সাধনা (ইবাদত) করছিলেন, সেই ইবাদত অন্য মুসলমান সমাজ আজও করছেন। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান শ্রদ্ধালুরা মাংসও খাচ্ছেন। তবে নবী মুহম্মদ কখনও মাংস আহার করেননি এবং না তাঁর যে সকল লক্ষাধিক অনুগামীরা ছিলেন, তাঁরা কখনো আহার করেছিলেন। এছাড়া অন্য আরও যে এক লাখ আশি হাজার নবীগণ ছিলেন, তাঁরাও কখনও মাংস আহার করেননি। তাঁরা কেবল রোজা ও বংগ (আজান) এবং নামাজ করতেন। গরু ও অন্যান্য পশুকে কখনও বিসমিল (হত্যা) করতেন না।

নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া। এক লাখ আস্সি কূঁ সৌগঁধ, জিন নহীঁ করদ চলায়া॥

অরস কুরস পর অল্লহ তখ্ত হৈ, খালিক বিন নহীঁ খালী। বৈ পৈগম্বর পাখ পুরুষ থে, সাহিব কে অবদালী॥

ভাবার্থ :- নবী মুহম্মদ তো আদরণীয় ছিলেন যাঁকে প্রভুর অবতার বলা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তাঁর এক লাখ আশি হাজার যে সকল অনুগামীরা ছিলেন, তাঁরাও কখনো গরু, ছাগল, মুরগি, ইত্যাদি পশুদের উপর করদ (ছুরি)

চালাননি অর্থাৎ কখনও জীব হিংসা করেননি এবং মাংস আহারও করেননি। ওই হজরত মুহম্মদ, হজরত মূসা, হজরত ঈসা ও অন্য সকল পয়গম্বরগণ (সংবাদবাহক) তো পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন/কুরআনের জ্ঞানদাতা কালের) কৃপাপাত্র ছিলেন কিন্তু যিনি আকাশের অন্তিম সীমানার উপর (সতলোকে) পূর্ণ পরমাত্মা (আল্লাহু আকবর/আল্লাহ কবীর) আছেন, সেই সৃষ্টির মালিকের দৃষ্টি থেকে কেউ এড়াতে পারেন না।

ঐসা জান মুহম্মদ পীরম, জিন মারী গউ শব্দ কে তীরম।
শব্দে ফের জিবাঈ, জিন গোসত নহীঁ ভাখ্যা । হংসা রাখ্যা, ঐসে পীর মুহম্মদ ভাঈ॥

ভাবার্থ :- এক সময় নবী মুহম্মদ একটি গরুকে শব্দ শক্তির (বচন সিদ্ধি) দ্বারা মেরে দিয়ে সকলের সামনে জীবিত করে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি গরুর মাংস ভোজন করেননি। এখনকার মুসলমান সমাজ বাস্তবের সাথে পরিচিত নয়। যেদিন নবী মুহম্মদ গরুকে জীবিত করেছিলেন, সেই দিনটিকে মনে রাখার জন্য, আজও গরু হত্যা করছেন। যখন কোনো প্রাণীকে জীবন দিতে পারবেন না, তাহলে মারার অধিকারও আপনার নেই। আপনারা মাংসকে প্রসাদ রূপে মেনে ভোজন করেন ও সকলকে ভোজন করান। আপনি নিজেও পাপের অংশীদার হচ্ছেন এবং অনুগামীদের ভ্রমিত করছেন। আপনারা দোজখের (নরকের) পাত্র হচ্ছেন।

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন :-

হম মুহম্মদ কো সতলোক লে গয়ো। ইচ্ছা রূপ বহাঁ নহীঁ রহয়ো।
উল্ট মুহম্মদ মহল পঠায়া। গুঝ বীরজ এক কলমা লায়া॥
রোজা বংগ নমাজ দঈ রে। বিসমিল কী নহীঁ বাত কহী রে॥

ভাবার্থ :- নবী মুহম্মদকে আমি (কবীর পরমেশ্বর) সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে তিনি না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাই আমি মুহম্মদকে তাঁর শরীরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এর পূর্বে জিব্রাইল ফেরেশতা হজরত মুহম্মদকে কাল ব্রহ্মের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নবী মুহম্মদকে রোজা (ব্রত), বংগ (উচ্চ স্বরে প্রভুর স্তুতি করা) এবং পাঁচবার নামাজ পড়তে বলেছিলেন কিন্তু গরু ইত্যাদি প্রাণীদেরকে বিসমিল (হত্যা) করতে বলেননি।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত শুনে শেখতকী ক্রোধিত হয়ে বললেন, তুই কি জানিস আমাদের কুরান শরীফের বিষয়ে ও নবীর সম্পর্কে? তুই তো অশিক্ষিত। আমাদের ধর্মের বিষয়ে মিথ্যা প্রচার করে ভ্রম ছড়াচ্ছিস। আমি অবগত করাচ্ছি যে, পবিত্র কুরান মজিদের (শরীফ) অমৃত বাণী কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। শেখতকী (যিনি দিল্লির বাদশাহ সিকন্দর লোধীর ধার্মিক গুরু এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা শেখতকীর প্রতিটি আদেশ পালন করতেন) বললেন, শোনো, হে কবীর! আমাদের মুহম্মদ নবীর জীবন কাহিনী।

"হজরত মুহম্মদজির জীবন চরিত্র"

হজরত মুহম্মদের বিষয়ে মুহম্মদ ইনায়তুল্লাহ সুবহানীর বিচার
জীবনী হজরত মুহম্মদ (সল্লাহু অলৈহী বসল্লম)
লেখক - মুহম্মদ ইনায়তুল্লাহ সুবহানী,
মূল কিতাব - মুহম্মদে (অর্বি) থেকে,
অনুবাদক - নসীম গাজী ফলাহী,

প্রকাশক - ইসলামী সাহিত্য ট্রস্ট প্রকাশন নং. ৮১- এর আদেশ দ্বারা প্রকাশন কার্য করা হয়েছে। মর্কজী মক্তবা ইসলামী পব্লিশর্স (পাবলিশার্স), ডী-৩০৭, দাবত নগর, অবুল ফজল ইনক্লেব জামিয়া নগর, নিউ দিল্লী- ১১১০০২৫,

(নিম্নলিখিত প্রকরণটি উপরোক্ত লেখক ও প্রকাশক কর্তার পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে।)

শ্রী হাশিমের পুত্র শৌবা (শাইবা) ছিলেন এবং এই শৌবাই পরে আব্দুল মুত্তলিব নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যখন মুত্তলিব (শৌবার চাচা) নিজের ভাইপো শৌবাকে নিজের গ্রামে নিয়ে এলেন, তখন লোকেরা মনে করে নিয়েছিল যে, মুত্তলিব হয়তো একজন ক্রীতদাসকে (গোলাম) নিয়ে এসেছেন। এইজন্য শ্রী শৌবাকেই সকলে ওরফে শ্রী আব্দুল মুত্তলিব নামেই অধিক জানতে লাগলেন। শ্রী আব্দুল মুত্তলিব দশ পুত্র প্রাপ্ত করেছিলেন। কোনো কারণে আব্দুল মুত্তলিব তার দশ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রকে আল্লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানি দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

এই দশ পুত্রের মধ্যে কোন পুত্রকে দেবতা পছন্দ করবেন, এইজন্য এক মন্দিরে (কাবা) অনেক দেবতার মূর্তির মধ্যে, যেটি বড় দেবতার মূর্তি ছিল, তার সামনে দশটি তীর রেখে দিলেন এবং প্রতিটি তীরের উপর একটি পুত্রের নাম লিখে দিলেন। যে তীরের উপর ছোট পুত্র আব্দুল্লার নাম লেখা ছিল, সেই তীরটি মূর্তির দিকে ঘুরে গেল। মেনে নেওয়া হল যে, দেবতা এই পুত্রকেই বলিদানের জন্য স্বীকার করেছেন। শ্রী আব্দুল্লাকে (নবী মুহম্মদের পিতার) কুরবানি

দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলছিল। সমস্ত অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষ আব্দুল মুত্তলিবকে মানা করে বলেছিলেন যে, এমনটি করবেন না, চারিদিকে হা-হা-কার শুরু হয়ে গেল। এক পূজারীর শরীরে অন্য এক আত্মা (রূহ) প্রবেশ করে বলল যে, উট কুরবানি দিলেও কাজ হবে। এরপর সকলে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস নিলেন। ওই শক্তিই (আত্মা) তারজন্য অন্য গ্রামের এক মহিলা, যিনি অন্য এক মন্দিরের পূজারীদের দালাল ছিল, সে ওই বিষয়ে ঠিক করবেন কতগুলি উট কুরবানি দিলে, আবদুল্লার জীবন আল্লাহ ক্ষমা করবেন। ওই মহিলা বললেন, যতগুলি উট একটা জীবন বাঁচানোর জন্য দেবে, তার সঙ্গে আরও দশটা যোগ করতে থাকবে এবং আব্দুল্লার নামের স্লিপ এবং দশটা উটের স্লিপ লাগিয়ে পরীক্ষা করতে থাকো আর যতক্ষণ না উটের স্লিপ বেরিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকো। এই ভাবে দশ দশটা উটের সংখ্যা বাড়াতে লাগল, তারপরে একশো উটের পরে উটের স্লিপ বেরিয়ে এলো। এর পূর্বে আব্দুল্লার স্লিপ বের হচ্ছিল। এইভাবে একশো উটের কুরবানি দিয়ে (হত্যা করে) পুত্র আব্দুল্লার জীবন বেঁচেছিল। যুবক হওয়ার পরে শ্রী আব্দুল্লার বিবাহ ভক্তিমতী আমিনী দেবীর সাথে হয়েছিল। যখন হজরত মুহম্মদ তাঁর মাতা আমিনীর গর্ভে ছিলেন, তখন পিতা শ্রী আব্দুল্লার মৃত্যু দূরবর্তী স্থানে হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই তাঁর কবর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর যখন বালক মুহম্মদের বয়স ছয় বছর হয়েছিল, তখন মা আমিনী দেবী তার স্বামীর কবর দেখতে গিয়ে মাঝ রাস্তাতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। ছয় বছর বয়সে বালক মুহম্মদ এতিম (অনাথ) হয়ে গিয়েছিলেন। (উপরোক্ত উল্লেখিত বিবরণ পূর্বোক্ত পুস্তক "জীবনী হজরত মুহম্মদ" -এর পৃষ্ঠা নং ২১ থেকে ২৯ এবং ৩৩-৩৪ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত ভাবে লেখা রয়েছে)।

হজরত মুহম্মদের বয়স যখন ২৫ বছর, তখন খাদিজা নামক চল্লিশ বছরের এক বিধবার সাথে বিবাহ হয়। খাদিজা পূর্বে দুইবার বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন। উভয় পূর্বের স্বামীদের প্রচুর সম্পদ ছিল, যে সম্পত্তি খাদিজার নিকটেই ছিল। তৃতীয় বার হজরত মুহম্মদের সঙ্গে বিবাহ হয়। খাদিজা অনেক ধনী পরিবারের মহিলা ছিলেন। (এই বিবরণ পূর্বোক্ত পুস্তকের ৪৬, ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে।)

হজরত মুহম্মদ খাদিজার দ্বারা সন্তান রূপে তিন পুত্র ও চার কন্যা প্রাপ্ত হয়। তবে এই শুভ সময় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। চোখের তারার সমান তিন পুত্র (১) কাসিম, (২) তয়্যব (৩) তাহির তাঁর (হজরত মুহম্মদের) চোখের সামনে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল, কেবল চার কন্যা (জৈনব, রুকয়্যা, উম্মে কুসুম এবং ফাতিমা) অবশিষ্ট ছিলেন। (পূর্বোক্ত পুস্তকের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বিবরণটি লেখা রয়েছে)।

এক সময় হজরত মুহম্মদ প্রভু প্রাপ্তির আকাঙ্খায় নগরের বাইরে এক গুহার ভিতরে সাধনা করছিলেন। ওই সময় জিব্রাইল নামক এক ফেরেশতা হজরত মুহম্মদকে শ্বাসরোধ করে (গলা চেপে) জোরপূর্বক কুরআন শরিফের জ্ঞান বুঝিয়েছিলেন, (হজরত মুহম্মদকে ভয় দেখিয়ে এবং ধমক দিয়ে, ওই নিরাকার বলা কাল প্রভুর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল)। ওই জিব্রাইল দেবতার ভয়ে হজরত মুহম্মদ সেই জ্ঞান মনে রেখেছিলেন। এই প্রকার হজরত মুহম্মদকে ফেরেশতা কুরান মজিদের জ্ঞান দিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদ তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে বলেছিলেন যে, আমি যখন গুহায় বসেছিলাম, তখন এক ফেরেশতা এসেছিলেন, তাঁর হাতে এক রেশমের রুমাল ছিল এবং তার উপর কিছু লেখা ছিল। ফেরেশতা আমার গলা চেপে বলেছিলেন যে, এটা পড়ো! ওই সময় আমার এমন মনে হয়েছিল যেন আত্মা এখনই বেরিয়ে যাবে। সারা শরীর টেনে-খিঁচে জোরপূর্বক আমাকে পড়াতে চেয়েছিলেন, এই রকম দুইবার করেছিলেন। তৃতীয়বার আবার বললেন যে, পড়ো! আমি অশিক্ষিত ছিলাম, তাই পড়তে পারিনি, পুনরায় মনে হচ্ছিল যে, এঁ তো আরো কষ্ট দেবে। এই কারণে আমি বললাম যে, কি পড়বো? তখন তিনি আমাকে কুরআনের এক আয়ত পড়ালেন। (এই বিবরণটি পূর্বোক্ত পুস্তকের ৬৭ থেকে ৭৫ পৃষ্ঠা এবং ১৫৭ থেকে ১৬৫ পৃষ্ঠাতে লেখা রয়েছে)।

এরপর ফেরেশতা জিব্রাইল নবী মুহম্মদের বুক চিরে তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে, পুনরায় সেলাই করে দিলেন এবং পরে খচ্চরের মতো এক জানোয়ারের (বুরাকের) পিঠে বসিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন। ওই স্থানে নবীদের জামাত (জনগোষ্ঠী) এলেন, তারমধ্যে হজরত মূসা, হজরত ঈসা, হজরত ইব্রাহিম প্রমুখও ছিলেন। তাঁদেরকে হজরত মুহম্মদ নামাজও পড়িয়েছিলেন।

ওইস্থানে হজরত আদমও ছিলেন, তিনি কখনো হাসছিলেন ও কখনো কাঁদছিলেন। ফেরেশতা জিব্রাইল হজরত আদমকে দেখিয়ে বললেন যে, ইনি হলেন পিতা আদম। তাঁর কান্না ও হাসির কারণ ছিল যে, ডান দিকে স্বর্গে তাঁর আদর্শবান সন্তানরা, যারা সুখী ছিলেন, যা দেখে হজরত আদম হাসছিলেন আর বাঁ দিকে তাঁর খারাপ সন্তানরা নরকে কষ্ট ভোগ করছিল, তাই দেখে কাঁদছিলেন।

{এখানে লেখক কিছু তথ্য লুকিয়েছেন। লেখা আছে যে, হজরত আদম ডান দিকে তাকিয়ে এইজন্য হাসছিলেন, কেননা ডান দিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কর্ম ছিল, এইজন্য তাই দেখে হাসছিলেন আর বাঁ দিকে তার কুকর্ম করা সন্তানদের কর্ম ছিল, তাঁর কারণে তিনি কাঁদছিলেন। তবে বিচার করুন পাঠকগণ! ,তাহলে কি ওই কর্ম কোনো দেওয়ালে লেখা ছিল? কিন্তু বাবা আদম তো নিরক্ষর (অশিক্ষিত) ছিলেন। তবে যে কথা সত্য, তা উপরে লেখা রয়েছে।}

তারপর সপ্তম আকাশের উপরে গেলেন। সেখানে পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এলো যে, প্রতিদিন পঞ্চাশবার নামাজ করবে। নবী মুসা বলার পরে পঞ্চাশবারের নামাজ থেকে কম করিয়ে, কেবল পাঁচবারের নামাজেরই আদেশ আল্লাহর থেকে প্রাপ্ত করে, নবী মুহম্মদ পুনরায় ফিরে এলেন। {(পৃষ্ঠা নং ৩০৭ থেকে ৩১৫) হজরত মুহম্মদের দ্বারা মুসলমানদের বলা হয়েছিল যে, রক্তপাত করবে না, এমনকি সুদও নেবে না। এরপরে ৬৩ বছর বয়সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে, কষ্ট প্রাপ্ত করেও নামাজ পড়েছিলেন এবং ঘরে এসে অসহনীয় যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন।}

(পৃষ্ঠা নং ৩১৯) পরবর্তীতে উত্তরাধিকারী পদ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। এই কারণে হজরত আবু বক্রকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

শেখতকীর উপরোক্ত বর্ণন শুনে পরমেশ্বর কবীর জী এই যুক্তি দিয়ে বললেন :- শেখতকী পীর! আপনি বললেন যে, আল্লাহ্ তালা সপ্তম আকাশের উপরে থাকেন এবং তিনি তো নিরাকার আছেন। কবীর জী আরো বললেন, একদিকে তো আপনি আল্লাহকে (ভগবান) নিরাকার বলছেন। অন্যদিকে আল্লাকে সপ্তম আকাশের উপরে এক দেশীয় রূপে বিদ্যমান রয়েছেন বলে প্রমাণ করছেন। যখন পরমাত্মা সপ্তম আকাশের উর্দ্ধে থাকেন, তাহলে তো তিনি সাকার হলেন।

পরমেশ্বর কবীর সাহেব বললেন, শেখতকী পীর! আপনি বলেছিলেন যে, হজরত মুহম্মদ যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর পিতা শ্রীআব্দুল্লার মৃত্যু হয়ে যায়। যখন ছয় বছর বয়স হল, তখন তাঁর মা মারা যান আর আট বছর বয়সে ঠাকুরদাদা আব্দুল মুত্তলিব দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। অতএব এইপ্রকার এতিমের (অনাথ) মতো জীবন যাপন করার পরে তাঁর বয়স যখন ২৫ বছর হল, তখন ৪০ বছর বয়সী দুইবার বিধবা হওয়া খাদিজা নামের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের তিন পুত্র ও চার কন্যা প্রাপ্ত হয়। হজরত মুহম্মদকে জিব্রাইল নামক ফেরেশতা গলা চেপে ধরে বলপূর্বক ধমক দিয়ে কুরান শরীফের (মজিদ) জ্ঞান ও ভক্তি বিধি (নামাজ ইত্যাদি) বলেছিলেন, যা তোমাদের আল্লাহ দ্বারা বলা হয়েছিল। হজরত মুহম্মদ মন প্রাণ দিয়ে ওই সাধনা করেও ছিলেন। এরপরে তাঁর চোখের সামনে তিন পুত্র (কাসিম, তৈয়ব ও তাহির) যারা মুহম্মদের চোখের মণি ছিল, তারা চলে গেল অর্থাৎ মারা গেল। এবার বিচার করুন যে! আল্লাহর পাঠানো রসুলের (নবীর) জীবনে যদি দুঃখই দুঃখ (মহাকষ্ট) ভোগ করতে হবে, তাহলে অন্য অনুগামীদের কুরান শরীফের (মজিদ) বর্ণিত বিধি অনুসারে সাধনা করলে আর কি লাভ হতে পারে? হজরত মুহম্মদের ৬৩ বছর আয়ুতে, দু'দিন অসহনীয় যন্ত্রণায় বেহাল হয়েই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল। যে পিতার সামনে তিন পুত্র মারা যায়, সেই পিতা আজীবন সুখী হতে পারে না। পরমাত্মার (প্রভুর) ভক্তি এইজন্য করি, যাতে পরিবারের সকলে সুখে থাকে এবং যদি কোনো পাপের কারণে শাস্তির ভোগ লেখা থাকে, তা যেন কেটে যায়। অতএব আপনাদের আল্লাহর দ্বারা দেওয়া ভক্তির জ্ঞান অসম্পূর্ণ রয়েছে। এইজন্যই সূরা ফুরকান ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৯ তে বলা হয়েছে যে, সমস্ত পাপ নাশকারী যে কবীর নামক আল্লাহ আছেন, তাঁর ইবাদতের (পূজার) বিধি কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী গুরু) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখো। কবীর পরমেশ্বর বললেন, শেখতকী! আমিই হলাম স্বয়ং কবীর আল্লাহ। আমার কাছে সম্পূর্ণ মোক্ষদায়ক ও পূর্ণ পাপনাশক ভক্তি বিধি রয়েছে। সেই কারণে আপনার সামনে রাজা সিকন্দর লোধী পাপের কারণে যে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তার থেকে মুক্ত হয়ে, এখন সুখের নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। যা আপনার ভক্তি বিধি দ্বারা হতে পারেনি।

শেখতকী পীর! আপনি যেমন বলছিলেন যে, সমস্ত মানবকুলের পিতা হজরত আদম, আকাশের উপরে (যে লোকে বা ধামে জিব্রাঈল ফেরেশতা হজরত মুহম্মদকে নিয়ে গিয়েছিলেন) যেখানে তিনি কখনো কাঁদছিলেন ও কখনো হাসছিলেন। কেননা তাঁর অযোগ্য পাপী সন্তান যারা নরকে কষ্ট পাচ্ছিল, তাদের দেখে কাঁদছিলেন এবং স্বর্গে সুখী সন্তানদের দেখে তিনি জোরে জোরে হাসছিলেন।

বিচারের বিষয় হল, খ্রীষ্টান ও মুসলিম ধর্মের প্রমুখ বাবা আদম, যে ইবাদত (পূজা /সাধনা) করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিফলে যে লোকে (ধামে) তিনি পৌঁছে গিয়েছেন, সেখানেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারছেন না। এই লোকেও বাবা আদমের মতো পবিত্র নবীর দুই পুত্রের মধ্যে রাগ-বিদ্বেষ পরিপূর্ণ ছিল, যার কারণে বড় ভাই ছোট ভাইকে হত্যা করে দিয়েছিল। অতএব এই পৃথিবীতেও বাবা আদম মহাদুঃখী ছিলেন। কারণ তাঁর বড় পুত্র ছোট পুত্রকে হত্যা করে দিয়েছিলেন আর সেই কারণে বড় পুত্রও ঘর ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তারপরে কয়েকশো বছর পর বাবা আদমের সেত নামক এক পুত্র হয়েছিল আর সেতের যে পুত্র হয়েছিল, তার নাম ছিল এনোশ। এই এনোশের দ্বারাই ভক্তির

মার্গ চালু হয়েছিল। যে পিতার দুই সন্তান হয়েছিল আর সেই সন্তান যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই পিতা কখনো সুখী হতে পারেন না। এই দশা হয়েছিল বাবা আদমের। কয়েকশত বছর দুঃখ ভোগ করার পরে, এক ধার্মিক পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিল। এরপরেও বাবা আদম ওই লোকেও গিয়ে, এই কষ্ট ভোগ করছেন।

পূর্বে পৃথিবীতে আল্লাহর পাঠানো যে সকল নবী (হজরত ঈসা, হজরত অব্রাহিম, হজরত মূসা অন্যান্য সব) এসেছিলেন, তাঁরাও ওই স্থানে (ধামে/লোকে) নিজের সাধনাতে পৌঁছে ছিলেন। বাস্তবে সেটি হল পিতরলোক। সকলে নিজের-নিজের পূর্বপুরুষদের নিকটে চলে যান। এইপ্রকার হিন্দুদেরও উপরে ওই একই প্রকার পিতরলোক আছে। যাদের সংস্কার হয় পিতর হওয়া। ওই পিতর যোনি ধারণ করে, ওই পিতর লোকে থাকেন। তারপর পিতরওয়ালা যোনি ভোগ করার পরে, পুনরায় ভূত-প্রেত ও অন্যান্য পশু-পাখির যোনিও ভোগ করে। এটা তো পূর্ণ মোক্ষ ও সুখ প্রাপ্তি তো হল না। সেই প্রকার ভক্তি করা সাধকদের, কী উপলব্ধি হবে?

"পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থ থেকে হজরত মুহম্মদের বিষয়ে উল্লেখ"

কৃপা করে পড়ুন কবীর সাগরের অধ্যায় "মুহম্মদ বোধ" থেকে বাণী :-

(ধর্মদাস বচন)

সাখী- ধর্মদাস বীনতী করে, কৃপা করো গুরুদেব।
নবী মুহম্মদ জস ভয়ে, সোসব কহিয়োঁ ভেব॥

(কবীর বচন)

ধর্মদাস, তুম পুছো ভল বানী। সো সব কথা কহুঁ সহিদানী॥
মিলে হম মুহম্মদ কুঁ জাঈ। সলাম বালেকম কহ সুনাঈ ॥
মুহম্মদ বোলে বালেকম সলামা। হমেঁ বতাও গাম রূনামা ॥
সাখী- কহাঁ তে আয়ে পীর তুম, ক্যোঁ কর কিয়া পয়ান ॥
কৌন শক্সকা হুক্ম হৈ, কিসকা হৈ ফরমান ॥

মুহম্মদ বচন

রমৈনী

পীর মুহম্মদ সখুন জো খোলা। অল্লা হমসে পরদৈ বোলা॥
হম অহদী অল্লা ফরমানা। বতন লাহুত মোর অস্থানা॥
উন ভেজে রূহ বারহ হজারা। উম্মত কে হম হৈঁ সরদার ॥
তিস কারণ জো হম চলি আয়ে। সোবত থে সব জীব জগায়ে ॥
জীব খ্বাব মেঁ পরো ভুলায়ে। তিস কারন ফরমান লে আয়ে ॥
তমু বুঝো সো কৌন হো ভাঈ। অপনো ইস্ম কহো সমুঝাঈ ॥
সাখী- দূর কী বাতে জো করৌ, করতে রোজা নমাজ ॥
সো পহুঁচে লাহুত কো, খোবে কুল কী লাজ ॥

(কবীর বচন)

কহৈঁ কবীর সুনো হো পীর। তুম লাহুত করো তাগীরা ॥
তুম ভূলে সো মরম ন পায়া। দে ফরমান তুম্হেঁ ভরমায়া ॥
ফির ফির আব ফির ফির জাঈ। বদ অমলী কিসনে ফরমাঈ ॥
লাহুত মুকাম বীচ কো ভাঈ। বিন তহকীক অসল ঠহরাঈ ॥
তুম জৈসে উনকে বহুতেরে। লৈ ফরমান জাব তুম ডেরে ॥
সাখী - খোজত খোজত খোজিয়াঁ, হুবা সো গূনা গূন ॥
খোজত খোজত না মিলা, তব হার কহা বেচূন ॥
বেচূঁন জগ রাঁচিয়া, সাঈ নূর নিনার ॥
আখির করে বক্ত মেঁ, কিসকী করো দিদার ॥

(রমৈনী)

তুম লাহুঁত রচে হো ভাঈ। অগম গম্য তুম কৈসে পাঈ ॥
যহ তো এক আদি বিসরামা। আগে পাঁচ আদি নিজ ধামা ॥
তহাঁ তে হম ফরমান লে আয়ে। সব বদফেল কো অমল মিটায়ে ॥
উন ফরমান জো হমকো দীনা। তিনঁকা নাম বেচূন তুম লীনা ॥
সাখী- সাহব কা ঘর দূর হৈ, জাসু অসল ফরমান ॥
উনকো কহো জো পীর তুম, সোই অমর অস্থান ॥
(মুহম্মদ বচন)
কহৈ মুহম্মদ সুনো কবীরা, তুম কৈসে পায়ো অস্থীরা ॥
লাহূত মেটি জো অগম বতায়ো। খুদ খুদায় হমহুঁ নহিঁ পায়ো ॥
হম জানৈঁ খুদ আপৈ আহী। তুম কুদরত কর থাপো তাহী ॥
হম তো অর্শ হাজিরী আয়ো। তুম তো কুদরত সে ঠহরায়ে ॥
তুমহরে কহে ভরম মোহি আয়ো। খুদ খুদায় তুম দূর বতায়ো ॥
আপ সুনাও খুদকী বাণী। আলম দুনিয়াঁ কহো বখানী ॥
লাহূত মুকাম হম নিজকর জানা। সো তো তুম কুদরত কর ঠানা ॥
হলকী মুলকী বাসরী ভাঈ। তীন হুক্ম অল্লা ফরমাঈ ॥
সাখী- সাঈ মুরশিদ পীর হৈ, সাঁচা জিস ফরমান ॥
হলকী মুলকী বাসরী, তীন হুকুম কর মান ॥
(কবীর বচন)
সুন মুহম্মদ কহুঁ খুদবাণী। খুদ খোদায় কী কহুঁ নিশানী ॥
কাদির থে তব কুদরত নাহীঁ। কুদরত থী কাদির কে মাহীঁ ॥
খ্বার সভী কো চীন্হো ভাঈ। অসল রূহ কো দেউঁ বতাঈ ॥
অসল রূহ কী দীদার জো পাবে। পাবে নিজ মুসলমান কহাবে ॥
হো আবাজ জহাঁ পর্দা পোশী। হৈ বহ মর্দ কি হৈ বহ জোশী ॥
জব লগ তখ্ত নজর নহীঁ আবে। দিল বিশ্বাস কৌন বিধি পাবে॥
জব খুদ কী খবর ন পাবে। তব লগ কুদরত ভ্রম ঠহরাবে ॥
হাল মাশূক নজর জো আবৈ। এক নিগাহ দীদার জো পাবৈ ॥
জো তুম কহা হমারা মানো। তো হম তুমতে নির্ণয় ঠানো ॥
সাখী- যহ প্রপঞ্চ বেচুন কা, তুমতে কহা ন ভেব ॥
আপ গুপ্ত হোই বৈঠা, তুম চার করত হো সেব ॥
(মুহম্মদ বোধ)
কহৈঁ মুহম্মদ সুন খুদ অহদী। ইলম লদদুনী কহু বুনিয়াদী ॥
জব নহিঁ পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অস্থুলা। তব না হতো সৃষ্টি কো মূলা ॥
তাদিন কী কহিয় উপতানী। আদি অন্ত ঔর র মধ্য নিশানী ॥
সাখী - বুজরুগ হকীকত সব কহো, কিস বিধি ভয়া প্রকাশ।
জব হম জানে আদি কো, তো হমহুঁ বাঁধে আশ ॥
(কবীর বচন)
সুনো মুহম্মদ সাচেঁ পীরা। সমরথ হুকুম খুদ আদি কবীরা ॥
অব হম কহেঁ সুনো চিতলায়ী। আদি অন্ত সব কহোঁ বুঝায়ী ॥
প্রথম সমরথ আদি অকেলা। উনকে সঙ্গ হতা নহীঁ চেলা ॥
সাখী- বাহিদন থে তব আপ মেঁ, সকল হতো তেহি মাঁহ।
জ্যৌ তরুবর কে বীজ মে, পুষ্প পাত ফল ছাঁহ ॥
(চৌপাই)

নিরঞ্জন ভয়ে রাজ অধিকারী, তিনকে চার অংশ সেবকারী ॥
চার জ্ঞানতে চারো বেদা। তিনতে চারো ভয়ে কতেবা ॥
মূল কুরান বেদ কী বানী। সো কুরান তুম জগ মেঁ আনী ॥
হক্ক কুরান জো তুমকো দীনা। হদ হুকুম তুম আপন কীনা ॥
চার কতেব কে চারোঁ অংশা। তিনতে কহো ভিন্ন-ভিন্ন বংশা ॥
বেদ পঢাঁবত ব্রহ্মা আয়ে। ঋগ বেদ কো নাম লখায়ে।
দূসর যজুরবেদ কী বাণী। ভক্তি জ্ঞান সো কীন বখানী ॥
তীসর সামবেদ কী বাণী। যজ্ঞ হোম তিন কীন বখানী ॥
চৌথ অথর্বন গুপ্ত ছপায়ে। তৌন হুকম তুম জগমেঁ আয়ে ॥
ঐকৈ মূল কুরান মেঁ চারী। চার বীর তুম হো সরদারী ॥
জব্বুর কিতাব দাউদ নে পাঈ। নাসুত মোকাম রহৈ ঠহরাঈ ॥
তৌরেত কীতাব মুসানে পাঈ। মলকুত মোকাম রহৈ ঠহরাঈ ॥
ইঞ্জীল কিতাব ঈসা নে পাঈ। জবরুত মোকাম রহৈ ঠহরাঈ ॥
ফুরকান কিতাব নবী তুম পাঈ। লাহুত মোকাম রহৈ লৌলাঈ ॥
কুরান বেহদ কো মরম ন পাবৈ। বিন দেখে বিশ্বাস ক্যা আবৈ ॥
চার মোকাম কিতাব হৈ চারী। পঞ্চয়ে নাম অচিন্ত সঁবারী ॥
তহঁতে আই রূহ বারহ হজারী। তহাঁ অচিন্ত গুপ্ত তো ব্যোহারী ॥
সাখী- পীর ঔলিয়া থাকিয়া, যহ সব উরলে পীর ॥
সমরথ কা ঘর দূর হৈ, তিনকো খোজো বীর॥

মারফত

চৌপাই

ওবল মোকাম নাসূত ঠেকানা। দূজা মোকাম মলকূত জো জানা ॥
সেউম মোকাম জবরুত ঠেকানা। চহারুম মোকাম লাহূত বখানা ॥
পাঁচয়ে মোকাম হাহূত অস্থানা। ছঠে মোকাম সোহম্ জো মানা ॥
হফতুম মোকাম বানী অস্থানা। অঠয়েঁ মোকাম অঙ্কুর ঠেকানা ॥
নবয়েঁ মোকাম আহূত নিশানী। দসয়েঁ মোকাম পুরুষ রজধানী ॥

(বেতুক)

ঔবল শরী অত্ (১) তরীকত্ (২) হকীকত্ (৩) মরফত্ (৪) মরৌবত্ (৫) ধ্যান দোরহিঅত্ (৬) জুলফকার চন্দ্র গেটা (৭) হুকুমমুরতদ (৮) দেয়না কাসো য়হী অনত্ (৯) সচ পাবে সমরথ কায় (১০) ওঁকার ঔকার কলিমা নবী সচুপাবৈ দেখা হদ বৈহদ।

(মুহম্মদ বচন)

তুম কবীর ভেদ অধিকায়ে। খুদ সমরথ কী খবরি জো ল্যায়ে ॥
অব তুমকো হম বুঝৈঁ অনতূ। সো কহিয়ে খুদ অহদী সনতূ ॥
কো তুম আহু কহাঁন্তে আয়ে। ক্যোঁ তুম অপনা বর্ণ ছিপায়ে ॥
সাত সুরতি সমরথ নিমাঈ। য়হ অস্থান রহ কী জাঈ ॥
য়তী মারফত কহু দূরবেশা। হম মানৈঁ তুমরো উপদেশা ॥
সাত সুরতি কেহি মাহি সমাঈ। জিব বোধে সো কহ চলি জাঈ ॥
সমরথ গম তুমু সাঁচ কবীরা। সমরথ ভেদ কহো মতি ধীরা ॥
সাখী- মেরে শঙ্কা বাঢিয়া, থাকে বেদ কুরান।
বাহিদ কৈসে পাইয়ে, সমরথ কো মক্কান ॥

(সত্য কবীর বচন)

সুনো মুহম্মদ কহোঁ বুঝাঈ। জো খুদ আদি অস্থান হৈ ভাঈ ॥

জো জো হুকুম সমরথ ফরমাঈ। সো সো হুকুম হম আনি চলাঈ ॥
সুর নর মুনি কো টেরি সুনায়ে। তুমকো বহুত বার সমুঝায়ে ॥
তুম পর মোহ ক্ষর নে ডারা। তেহি কারণ আয়ে সংসারা ॥
সোলহ অসংখ যুগ জবৈ সিরাঈ। সোলহ অসংখ উৎপত্তি মিটি জাঈ ॥
সাত সুরতি তব লোকহি জাঈ। জিব বোধো তেহি মাহ সমাঈ ॥
সাত সুন্য তজি তে অস্থানা। তে সব মিটে হোয় ঘমসানা ॥
বেদ কতেব কি ছোড়ো আশা। বেদ কতেব মেঁ ক্ষর প্রকাশা ॥
তীন বার তুম জগ মেঁ আয়ে। ফির ফির ক্ষর নে ভরমায়ে ॥
ক্ষর চীহ্নিকে ছোড়ো ভাঈ। তীন অংশ ক্ষর নিরমাঈ ॥
ব্রহ্মাদিকা সৃষ্টি আপকো কীনা। জীব বৃষ্টি তীরথ ব্রত দীনা ॥
মায়া বৃষ্টি ঈশ্বরী জানো। সবমেঁ আতম এক সমানো ॥
সাখী- খোজো খুদ সমরথকো, জিন কিয়া সব ফরমান ॥
পীর মুহম্মদ তহঁ চলো, সোঈ অমর অস্থান ॥

(মুহম্মদ বচন)

পীর মুহম্মদ মুখ তব মোরা। কছু নহিঁ চলৈ তুমহারী জোরা ॥
ক্ষর হুকম কো মেটনহারা। চার বেদ জিন কীন পসারা ॥

(কবীর বচন)

সুনিয়ে সখুন মুহম্মদ পীরা। হম খুদ অহদী আদি কবীরা ॥
মেটোঁ ক্ষরকো বিস্তারা। মেটো নিরঞ্জন সকল পসারা ॥
মেটো অচিন্তকী রজধানী। মেটো ব্রহ্মা বেদ নিশানী ॥
চৌদহ জমকো বান্ধি নচাবোঁ। মৃতু অন্ধা মগহর লে আবোঁ ॥
ধর্মরায়তে ঝগর পসারা। নিরঞ্জন বান্ধি রসাতল ডারা ॥
বেদ কতেব কো অমল মিটাবোঁ। ঘর ঘর সার শব্দ ফৈলাবোঁ ॥
সমরথ হুকম চলৈ সব মাহী। ব্যাপৈ সত্য-অসত্য উঠি জাহী ॥

(মুহম্মদ বচন)

পীর মুহম্মদ বোলে বানী। অগম ভেদ কাহু নহিঁ জানী ॥
সুনাকান নহিঁ আখিন দেখা। বিন দেখে কো করে বিবেখা ॥
জো নহী দেখো আপনে নৈনা। কেইসে মানো গুরুকো বৈনা ॥
জো তুম খুদ অহদী হৈঁ আয়ে। হুকম হজুর ফরমান লে আয়ে ॥
জৌন রাহ সে তুম চলি আবো। সোই রাহ মোকহঁ বতলাবো ॥
হঁসন কো অস্থান চিনহাবো। সমরথ কো মোহি লোক দেখাবো ॥
সাখী - হঁসন কো অস্থান লখি, তব মানুঁ ফরমান ॥
জো সমরথ কো হুকম হৈ, সো মেরে পরবান ॥

(কবীর বচন)

সুনো মুহম্মদ কহোঁ বুঝাঈ। সাহেব তুমকো দেউঁ বতাঈ ॥
চলৈ সৈল কো দোনোঁ পীরা। এক মুহম্মদ এক কবীরা ॥

(নাসুত) মোকাম (১)

ভূমি সে চলে জহাঁ পহুঁচে জাঈ। মানসরোবর তহাঁ কহাঈ ॥
তহঁ নাসূত আহি মোকামা। নবী কবীর পহুঁচ তেহি ধামা ॥
তহঁ দাউদ পয়ম্বর হোঈ। জব্বুর কিতাব পড়ে তহঁ সোঈ ॥
তহাঁ সলামালেক সোঈ কীনা। দস্তাবোস উনহু উঠি লীনা ॥

(মলকুত) মোকাম (২)

তহবাঁতে পুনি কীন পয়ানা। দুসরা মুকাম বৈকুণ্ঠ প্রমানা ॥
তহবাঁ পহুঁচ বৈঠে ঋষি দুর্বাসা। দেব সবৈ বৈঠে তেহি পাসা॥
বহ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র অস্থানা। মলকূত মোকাম মুসাকো জানা ॥
মূসা পৈগম্বর পঢ়ে কিতাবা। উসকা নাম তৌরেত কিতাবা ॥
সলামালেক তহাঁ হম কীনা। দস্তাবোস উনহু উঠি লীনা ॥

(জবরূত) মোকাম (৩)

বৈকুণ্ঠ তে আগে লায়ো ডোরী। সুমেরতে সুন্য অঠারহ করোরী ॥
য়েতো অধর সুন্য অস্থানা। জবরুত মোকাম ঈসাকো জানা ॥
ঈসা পৈগম্বর পঢ়ে কিতাবা। উসকা নাম ঈঞ্জীল কিতাবা ॥
সলামালেক তহাঁ হম কীনা। দস্তা বোস উনহু উঠি লীনা ॥
তহঁবা বৈঠি বিস্বম্ভর রাঈ। বহী পীর তো বহী খুদাঈ॥
য়হ বিষ্ণুপুরী হৈ ভাঈ। যামেঁ ভী এক বৈকুণ্ঠ বনাঈ ॥
বিষ্ণু হৈ য়হাঁ কা প্রধানা। সুন মুহম্মদ জ্ঞান বিজ্ঞানা ॥
উহঁতে অধর সূন্য হৈ ভাঈ। তাকী শোভা কহী ন জাঈ ॥

(লাহূত) মোকাম (৪)

মহাশূন্যকো লাগী ডোরী। গ্যারহ পালঁগ তহাঁ তে সোরী ॥
লাহূত মোকাম কহাবৈ সোঈ। জো দেখে বহুতৈ সুখ হোঈ॥
রহ মহাদেব পার্বতী সঙ্গা। লাহুত মুকাম দেখ মন চংগা ॥
য়হ মুহম্মদ তুম্হরো ডেরা। গণ গন্ধর্ব সব য়হাঁ চেরা ॥
মুস্তফা পৈগম্বর বৈঠে তহাঁ। ফুরকান কিতাব পড়ত থে জহাঁ ॥
সলামালেক তহাঁ হম কীনা। দস্তাবোস উনহু উঠি লীনা ॥
দেখত হো মুহম্মদ অস্থানা। তুম বেচূন কহো য়হী ঠেকানা ॥
সব ফিরিশ্তে সলামালেক কীনা। তব হম আগে কা পগ দীনা ॥

(হাহূত) মোকাম (৫)

তহঁতে চলে অচিন্ত ঠেকানা। এক অসংখ্য সুন্য পরমানা ॥
ব্রহ্মাপুরী হৈ হাহূত মোকামা। আদম কা য়হাঁ বিশ্রামা ॥
হাহূত মোকাম কো বহী ঠেকানা। আগে হৈ সোহম বন্ধানা ॥

(বাহূত) মোকাম (৬)

তীন অসংখ্য শূন্য পরমানী। বাহূত মোকাম সো কহো বখানী ॥
য়হ দেবী কা অস্থানা। গুপ্তভেদ কোঈ না জানা ॥
নবী কবীর চলে তেহি আগে। মূল সুরতি বৈঠে অনুরাগে ॥

(ফাহূত) মোকাম ৭

পাঁচ অসংখ সুন্ন বিচআহী। সপ্তম মোকাম কহত হৈ তাহী ॥
সঙ্গম ধাম দুর্গা কে আগে। য়কো তুম ফাহূত অনুরাগে ॥
ফাহূত মোকাম তোহে বতায়া। ভিন্ন ভেদ কহ সমঝায়া ॥

(রাহূত) মোকাম ৮

ইছা সুরতি কে পহুঁচে দ্বীপা। চার অসংখ হৈ লোক সমীপা॥
সতগুরু রূপ কাল দয়ালা। এক বুগা ঔর এক কালা ॥
তাকো নাম রাহূত মোকামা। নবী কবীর পহুঁচে তেহি ঠামা ॥

(আহূত) মোকাম (৯)

তহাঁতে সহজ দ্বীপ পরমনা। দোয় অসংখ তহাঁতে জানা ॥
আহূত মুকাম নিরঞ্জন ধামা। আপ গুপ্ত জ্যোতি প্রগটানা ॥

তাহি মোকাম নাম আহুতা। সোভা তাকী দেখ বহুতা ॥
(জাহুত) মোকাম (১০)
সাখী- পহুঁচে জায়কে লোক জহঁ, সন্ত অসংখ দস লাখ ॥
অক্ষর ধাম জাহুত মুকামা। সপ্ত শঙ্খ লোক অকানা ॥
সো মোকাম জাহুত কা, দস মোকাম য়হ ভাখ॥
(চৌপাই)
সলামওয়ালেকম তহাঁ হম কীনা। দস্তাবোস উনহু উঠিলীনা ॥
তহঁতে অমরলোককো ছোরা। নবী কবীর পহুঁচ তেহ ঠৌরা ॥
অমরলোক কে হংস সব আয়ে। তিনকী সোভা কহী ন জায়ে ॥
ভরি ভরি অংক মিলে তহঁ আয়ে। দেখি মুহম্মদ রহে ভুলায়ে ॥
সব মিলি হংস গয়ে পুনি তহঁবা। সাহেব তখ্‌ত পৈ বৈঠে জহঁবা ॥
জগর মগর ছতর উজিয়ারা। আম ধনী কা কহো বিহারা ॥
অসংখ ভানু পুরুষ উজিয়ারা। অমরলোক কো কহো বিস্তারা ॥
সকল হংস তহঁ দর্শন পাঈ। তিনকী শোভা বরনি ন জাঈ ॥
তহঁবা জায় বন্দগী কীনা। নবী ভয়ে জো বহুত অধীনা ॥
(মুহম্মদ বচন)
চুক হমার বকস কর দীজৈ। জো তুম কহো সোঈ হম কীজৈ ॥

"হজরত মুহম্মদ কিভাবে কুরআনের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন"

কুরআন শরীফ অর্থাৎ কুরান মজীদ কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল? (কুরআন শরীফে যেমনটি লেখা আছে, কুরআন মজিদেও ঠিক তেমনই বিবরণ রয়েছে)।

কুরআন মজিদ- **তর্জুমা, ফতেহ মুহম্মদ খান সাহেব জালন্ধরী, প্রকাশক: মহমুদ এন্ড কোম্পানি, মরোল পাইপ লাইন, মুম্বাই -৫৯ , সোল এজেন্ট, ফরীদ বুক ডিপো, দেহলী - ৬।**

উপরোক্ত পুস্তকের মুকদমা পৃষ্ঠা নং ৬-৭ এ লেখা আছে :-

"কুরআন মজিদ নাজিল এবং এর সংগ্রহ ও সংকলন করার বিষয়ে বিবরণ"

উপরোক্ত পুস্তকের কুরান মজীদের মুকদমা পৃষ্ঠা নং ৬-৭ এ লেখকের নিষ্কর্ষ :-

কুরআন মজিদ (শরীফ) সম্পূর্ণ হতে ২৩ বছর সময় লেগেছিল। যখন হজরত মুহম্মদের বয়স ৪০ বছর ছিল, ওই সময় থেকে শুরু হয়েছিল এবং অন্তিম সময় ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ বছর ধরে একটানা কখনও এক আয়ত, কখনও অর্ধেক, কখনও দুই আয়ত, কখনও ১০ আয়ত, কখনও সম্পূর্ণ সূরাহ নাজিল হয়েছিল। একে শরীয়তে "ওহী" বলা হয়েছে।

বিদ্বানগণ লিখেছেন যে, "ওহী (ওহি)" নাজিলের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হাদিসে প্রকাশ করা হয়েছে।

১. যখন ফেরেশতা "ওহী (ওহি)" নিয়ে আসতেন, তখন ঘণ্টার মতো বেজে উঠতো। ওই সময় নবী মুহম্মদের প্রাণ বেড়িয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যেতো। এই পদ্ধতি নবী মুহম্মদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক হতো।

এটাও লেখা আছে যে, হজরত মুহম্মদ নবুয়তের পর (চল্লিশ বছর বয়স থেকে নবী হওয়ার পর) রমজানের দিনে সম্পূর্ণ কুরান মজিদ (শরীফ) আল্লাহর নিকট হতে ওই আসমান থেকে এসেছিল, যা আমরা দেখতে পারব না। আল্লাহর হুকুমে (আদেশে) নাজিল হয়েছে অর্থাৎ ওই আল্লাহর দ্বারা বলা হয়েছে। এরপর হজরত জিব্রাইলকে যে সময়ে যেভাবে আজ্ঞা হতো, তিনি কোনো পরিবর্তন না করেই পবিত্র কলামকে নবী মুহম্মদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন।

২. কখনো ফেরেশতা (দেবদূত) হৃদয়ে কোনো কথা প্রবেশ করিয়ে দিতেন।

৩. ফেরেশতা একজন মানুষের রূপ ধারণ করে এসে কথা বলতেন।

{**দ্রষ্টব্য :-** হজরত মুহম্মদের জীবনীতে লেখা আছে, যে সময় জিব্রাইল ফেরেশতা প্রথমবার "ওহী (ওহি)" নিয়ে এসে মানবরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। তখন তিনি মুহম্মদের গলা চেপে বলতেন, এটা পড়ো। হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন যে, ওই সময় আমার মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমার গলা ও শরীরকে দাবাচ্ছেন। এভাবে দুই বার করার পরে তৃতীয়বার বললেন পড়ো! আমার তখন এমন মনে হচ্ছিল যে, আবারও মনে হয় গলা চেপে ধরবেন আর এইবার তো আরও

জোর লাগিয়ে আমার শরীরকে খিঁচবেন, তাই আমি বললাম, কি পড়বো? তারপর তিনি আমাকে কুরআনের প্রথম আয়াত পড়ালেন এবং সেটি আমার স্মৃতিতে রয়ে গেল। এরপর ফেরেশতা চলে গেলেন কিন্তু আমি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। হৃদস্পন্দন যেন বসে যাচ্ছিল ও সর্ব শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। গুহার বাইরে এসে ভাবলাম, ইনি কে ছিলেন? পুনরায় সেই ফেরেশতা মানুষের রূপে দেখা দিলেন, আমি যেদিকে তাকাচ্ছিলাম এবং ওই সময় কেবল চারিদিকে তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, যেমন- উপরে, নিচে, ডানে, বামে এবং সর্ব স্থানে তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপরে ঘরে এসে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সর্ব শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল আর তখন খাদিজাকে বললাম যে, খাদিজা! তোমাকে কি আর বলবো, আমার ভয় হচ্ছে, আমি মরে না যাই ,তাই ভাবছি। হজরত মুহম্মদ তার স্ত্রী খাদিজাকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি খুলে বললেন। হজরত মুহম্মদের নিকট হতে এই সব কথা শুনে, 'বরকা' নামক এক ব্যক্তি বললেন, আপনি 'নবী' হবেন। এই ফেরেশতা কিন্তু মূসার কাছেও যেতেন। উপরোক্ত বিবরণ থেকে এই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফেরেশতা যখন মানব রূপে "ওহী" নিয়ে আসতেন, তখন হজরত মুহম্মদের অনেকই কষ্ট হতো।}

৪. আল্লাহ তালা জাগ্রত অবস্থায় নবী মুহম্মদকে (সা.) কলাম ফরমান করেছিলেন। ভাবার্থ হল যে, আকাশবাণীর (ওহীর) মাধ্যমে ব্রহ্মা (জোতি নিরঞ্জন কাল) স্বয়ং বলতেন।

৫. আল্লাহ স্বপ্ন অবস্থাতে কলাম ফরমান করেছিলেন।

৬. ফেরেশতা স্বপ্ন অবস্থাতে এসে কলাম ফরমান করতেন (এই ষষ্ঠ ও পঞ্চম নং এর উপর বিতর্ক রয়েছে, বাকি উপরোক্ত কুরআন মজিদের (শরীফ) নাজিলের ৪ নং টি ঠিক আছে।) পৃষ্ঠা নং ২৯- তে লেখা আছে যে, কখনো "ওহী (ওহি)" স্বয়ং আসতো। ভাবার্থ হল যে, যেমন কোনো প্রেত প্রবেশ করে কথা বলতো। কখনো নবী মুহম্মদ চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়তেন, তারপর চাদরের ভিতর থেকে বলতেন।

পবিত্র কুরান মজিদের (শরীফ) মুকদমা পৃষ্ঠা নং ৬-৭- তে লেখা প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, কুরআনের জ্ঞান পর্দার আড়ালে থাকা আল্লাহ দিয়েছিলেন। জিব্রাইল নামক ফেরেশতা তো কেবল সন্দেশ বাহক হয়ে কার্য করেছেন। কুরআনের জ্ঞানদাতা স্বয়ং নিজের থেকে আলাদা বা অন্য এক কাদির আল্লাহর মহিমার কথা বলেছেন, যিনি সৃষ্টি রচনা করেছেন এবং তিনি তাঁর নিজের কথাও বলেন।

"পবিত্র ঈসাই (খ্রীষ্টান) ও মুসলমান ধর্মের অনুগামীদের কর্ম আধারে লাভ-হানি করার অধিকারী হলেন তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)"

হজরত আদমকে, তাঁর স্ত্রী হব্বাকে, অন্যান্য প্রাণীদেরকে ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি করার পর কুরআন ও বাইবেলের জ্ঞানদাতা প্রভুকে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছিল। বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থেও প্রমাণিত হয়েছে যে, পরমাত্মা মানুষের সদৃশ্যে আছেন, কেননা পরমাত্মা মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে তৈরী করেছেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনে উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। সপ্তম দিনের পরের বর্ণন কুরআন শরীফ ও বাইবেলের জ্ঞানদাতার (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জন) লীলা। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে, 'তারপর যহোবা পরমেশ্বর বললেন, মানুষ ভালো-মন্দের জ্ঞান পেয়ে, আমাদের মধ্যে একজনের সমান হয়ে গেছে। অতএব এমন না হয় যায় যে, তারা হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষেরই ফল ছিঁড়ে খেয়ে অমর হয়ে যায়। পরমেশ্বর পরে তাঁদেরকে অদন উদ্যান (বাগান) থেকে বের করে দিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এই কথাও প্রমাণিত হল যে, আদমের যিনি প্রভু অছেন, তাঁর থেকে অন্য একজন আছেন যিনি সাকারে রয়েছেন। এইজন্য তো বলা হয়েছে যে, মানব ভালো-মন্দের জ্ঞান হওয়া বৃক্ষের ফল খেয়ে, আমাদের মধ্য থেকে একজনের সমান হয়ে গিয়েছে। কেননা বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থেই লেখা আছে যে, আদম ভালো-মন্দ জ্ঞান হওয়া ফল ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছিল, তাই সে জানতে পারল যে, সে নগ্ন আছে। যহোবা পরমেশ্বর ঘুরতে-ঘুরতে এলেন এবং তিনি আদমকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, তুমি কোথায় আছো? আদম তখন বললেন, আমি আপনার আওয়াজ শুনে লুকিয়ে পড়েছি, কারণ আমি নগ্ন আছি। পরে যহোবা পরমেশ্বর আদম ও তাঁর স্ত্রী হব্বার জন্য চামড়ার বস্ত্র (পোশাক) বানিয়ে দিলেন।

বিচার করুন উপরোক্ত বিবরণ স্বয়ং প্রমাণ করছে যে, পূর্ণ পরমাত্মাও (Complete God) সশরীর মানুষের মতো আকারে রয়েছেন এবং অন্যান্য ছোট প্রভুরাও (Small God) মানুষের মতো আকারে রয়েছেন। যাঁদের পবিত্র খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিরা নিরাকার মানেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাগণ মানুষের মতো সাকারে রয়েছেন এবং একের অধিক প্রভুও রয়েছেন। এই কথা বাইবেলও প্রমাণিত হয়ে গেল।

কেননা কাল ব্রহ্ম স্বয়ং সামনে আসেন না। তিনি তাঁর তিন পুত্রের (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) দ্বারা কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডের কার্য সঞ্চালন করছেন। হজরত আদম ছিলেন ভগবান ব্রহ্মার অবতার। হজরত আদমকে শ্রী ব্রহ্মা ভ্রমিত করে রেখেছিলেন, তিনিই (ব্রহ্মা) তাদেরকে উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এইজন্য বলেছিলেন

যে, ভালো-মন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে আদম আমাদের এক জনের সমান হয়ে গিয়েছে। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ হলেন তিন দেবতা। হজরত ঈসার অবতার ধারণ করার বিষয়ে, পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে, প্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বাড়তে থাকা পাপকে সমাপ্ত করার জন্যই নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন, কেননা হজরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) ভগবান বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। বিষ্ণুলোক থেকে কোনো দেব আত্মার জন্ম মরিয়মের গর্ভে ফেরেশতার (দেবতা) দ্বারাই হয়েছিল।

"মামরে তিন দেবতাকে দেখার প্রমাণ"

(ইসহাকের জন্মের প্রতিশ্রুতি)

ইসহাকের জন্মের প্রতিজ্ঞা নামক অধ্যায় নং. ১৮ শ্লোক নং. ১-৫ -তে লেখা আছে যে, অব্রাহিম মামরের (মম্রে) এলোন বনে ওক গাছের নিকট প্রখর রৌদ্রের সময় তাঁবুর প্রবেশদ্বারে (দরজায়) বসে ছিলেন। তখন যহোবা প্রভু তাঁকে দর্শন দিলেন। তিনি যখন মাথা উপরে তুলে চোখ দিয়ে দেখলেন, তিনজন পুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। অব্রাহম ওই তিনজনের নিকট জল ও ভোজনের জন্য প্রার্থনা করাতে, তাঁরা ভোজন করলেন এবং বৃদ্ধ অবস্থায় অব্রাহামকে পুত্র হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে চলে গেলেন আর যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে, আমরা সদোম ও অন্যান্য নগরগুলিকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি।কেননা সেখানকার মানুষ অধার্মিক হয়ে গিয়েছে। অব্রাহিম তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি আপনারা অধার্মিক ব্যক্তিদের সাথে ধার্মিক ব্যক্তিদেরও মেরে ফেলবেন? প্রভু বললেন, যদি ১০০ জন লোকও ধার্মিক হয়, তাহলে আর ওই নগরকে আমরা ধ্বংস করবো না। "সদোম ও অন্যান্য নগরের বিনাশ" নামক বিষয়েতে লেখা আছে যে, তাঁদের মধ্যে দু'জন দূত (দেবতা) "সদোম" নগরে গিয়েছিলেন। লুত (লোট) নামের এক ব্যক্তি ওই সদোম নগরে থাকতেন। ওই গ্রামের ব্যক্তিরা খুবই দুষ্টু প্রকৃতির ছিল। লুত ওই দুই দূতকে (দেবতাদের) আদর সম্মান সহিত রাখলেন। গ্রামবাসীরা ওই ফেরেশতাদের সাধারণ মানুষ ভেবে, তাঁদের সাথে কুকর্ম (পুরুষ দ্বারা পুরুষের সাথে বলাৎকার) করার জন্য, ঘরের বাইরে আসতে বললো। লোট (লুত) তখন বললেন, তারা আমার অতিথি, আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না, তাদের বদলে আমার দুই মেয়ে আছে, তোমরা তাদেরকে নিয়ে যাও। এই কথাতে প্রসন্ন হয়ে, দুই ফেরেশতা (দেবতা) সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিলেন এবং লুত(লোট) ও তার পরিবার সহিত ওই গ্রাম থেকে বের করে সম্পূর্ণ গ্রামটাকে ধ্বংস করে দিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, তিন দেবতা আছেন এবং তাঁরা ব্রহ্মের (কাল প্রভুর) আদেশেই সকলকে তাদের কর্মের ফল দেন।

অতএব উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণ সিদ্ধ হল যে, তিন দেবতা আছেন। তাঁদের মধ্যে কখনো দু'জন, আবার কখনো একজন তাঁদের নিজের-নিজের ভক্তদের কাছে যান। যদি কেউ তিনজনকে সাধনা করেন, তাহলে তিনজনই একসঙ্গে যান, যদি কেউ দুইজনের সাধনা করেন, তাহলে দুইজন দর্শন দেন। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ হল যে, তিন দেবতাই (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ) তাঁদের নিজের পিতা ব্রহ্মের আদেশ অনুসারে, এক ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কার্য করেন। ভক্তি করা ব্যক্তিদের কর্ম অনুসারে তাদেরকে রক্ষা করেন এবং দুষ্কর্ম করা ব্যক্তিদের কর্ম অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করেন। এই ব্রহ্ম (কখনো কারোর সামনে এসে দর্শন না দেওয়া অব্যক্ত) উপরোক্ত তিন ফেরেশতার (দেবতাদের) দ্বারা নিজের আদেশগুলো, নবীদের কাছে পাঠিয়ে দেন। কখনো আকাশবাণীর মাধ্যমে বা কখনো ভূত-প্রেত হয়ে স্বয়ং কাল ব্রহ্মাও কারোর শরীরে প্রবেশ করে আদেশ দেন। ফেরেশতাগণ তো যেমন তিনি আদেশ দেন, ঠিক তেমনই আদেশ শোনান। আদেশে কোনো পরিবর্তন করেন না। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরান সহিত চার কতেবের জ্ঞানদাতা প্রভু, কোনো অন্য কবীর নামক প্রভুর দিকে সংকেত করছেন।

দ্রষ্টব্য :- কুরআন শরীফ (মজিদ) সূরা অল্-বাকারা ২ আয়ত নং ২১ থেকে ৩৩ পর্যন্ত ওই পূর্ণ পরমাত্মার মহিমার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আয়ত ৩৪- থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআনের জ্ঞানদাতা নিজের মহিমাও বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর জ্ঞান অনুসারে ইবাদতের বিধি বলেছেন। এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আমিই (কুরআনের জ্ঞানদাতা) আদম ও তাঁর স্ত্রী হব্বাকে স্বর্গের উদ্যানে রেখেছিলাম এবং তাঁদেরকে উদ্যানের মাঝখানের বৃক্ষের ফল ছেড়ে, বাদবাকি অন্য বৃক্ষের ফল খেতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা সাপের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে, ওই মাঝখানের বৃক্ষের ফল খেয়ে নিয়েছিল। আমি তাদের পৃথিবীর ভূমিতে কষ্ট পাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। (সূরা অল-বাকারা ২ আয়ত নং ৩৫ থেকে ৩৯ পর্যন্ত)।

কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আমিই হজরত মূসাকে 'তৌরাত' কিতাব নাজিল করেছিলাম এবং হজরত মূসার জন্য পাথর থেকে ঝর্ণার জল প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম। (সূরা অল-বাকারা ২ আয়ত ৪১, ৫৩, ৬০)। আমিই মূসার পশ্চাৎ একের পর এক পয়গম্বর পাঠিয়েছি এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি এবং রুহুল কুদস (জিব্রীল/জিব্রাইল) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি (সূরা আল বাকারা -২ আয়ত ৮৭)।

সার বিচার :- উপরোক্ত পবিত্র কুরআন শরীফের বর্ণন দ্বারা এটি স্পষ্ট হল যে, বাবা আদম থেকে হজরত ঈসা,

হজরত অব্রাহম, হজরত দাউদ, হজরত মূসা, হজরত মুহম্মদ সাহেব পর্যন্ত পয়গম্বর বানিয়ে পাঠানো খুদা (আল্লাহ/প্রভু) একই আছেন। তিনিই নিজেই কুরআন শরীফের (মজিদ) জ্ঞান, ওহী দ্বারা স্বয়ং প্রেত রূপে (ভূতের মত) প্রবেশ করে বা আকাশবাণীর মাধ্যমে বলেছেন কিংবা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন। ওই খুদা সূরা ফুরকান- ২৫ আয়াত নং ৫২ থেকে ৫৮ ও ৫৯ তে বলছেন যে, হে পয়গম্বর (হজরত মুহম্মদ)! পূর্ণ পরমাত্মা কবীর আছেন কিন্তু কাফির ব্যক্তিরা আমার এই কথার উপর বিশ্বাস করে না। তুমি তাদের কথা মানবে না এবং আমার দ্বারা দেওয়া এই কুরআন শরীফের জ্ঞানের যুক্তির উপর বিশ্বাস করবে যে, যিনি কবীর আল্লাহ আছেন, তাঁকেই আল্লাহ অকবরু বলা হয়। এই জ্ঞানের সমর্থনে কাফিরদের সাথে সংঘর্ষ করবে, এর ভাবার্থ হল, কাফিররা বলে যে, কবীর আল্লাহ নন। অতএব তুমি (হজরত মহম্মদ) বলবে যে, কবীরই হলেন আল্লাহ, লড়াই করবে না আর তাদের (কাফিরদের) কথায় ফাঁসবে না। (আয়ত নং ৫২) ওই কবীর আল্লাহ তিনিই আছেন, যিনি ছয় দিনে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, সপ্তম দিনে সিংহাসনের (তখত) উপর বিরাজমান হয়েছিলেন। বাস্তবে ওই আল্লাহ কবীর রহমান (ক্ষমাশীল)। তাঁর বিষয়ে আমি (কুরআন শরীফের জ্ঞানদাতা) জানি না। তাঁর বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভক্তির বিধি, কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শী গুরু) নিকট জিজ্ঞাসা করো। (আয়াত নং ৫৯)

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটাও প্রমাণিত হল যে, প্রভু একজন নয়, অনেক আছেন এবং তিন দেবতাই (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবজী) হলেন সকল প্রাণীদের সংস্কারবশ লাভ ও হানি করান, এছাড়া তাঁরা উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশেরও কারণ আছেন আর ব্রহ্ম (কাল) সকলকে এই প্রকার ভ্রমিত করে ফাঁসিয়ে রাখেন।

পূর্ণ পরমাত্মা কবীরই হলেন সর্ব সুখদায়ক, তিনিই কেবল সকলের ইবাদতের যোগ্য এবং পূর্ণ মুক্তিদাতা পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) বলেছিলেন যে, আমি ওই মুল্লাকে বলেছিলাম, যে বাখবর (তত্ত্বদর্শী) সন্তের জন্য আপনার আল্লাহ সংকেত করছেন, ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত দ্বারা দেওয়া জ্ঞানই পূর্ণ মোক্ষ দায়ক। সেই যথার্থ ভক্তি মার্গের সন্ধান না তো হজরত মুহম্মদ জী প্রাপ্ত করতে পেরেছেন আর না তো মোল্লা, কাজী ও পীরেরা জানেন। এইজন্য আজ পর্যন্ত যে সাধনা আপনারা করছেন, তা অসম্পূর্ণ। এসব কেবল কাল ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জন) দ্বারা বিস্তার করা বিশাল ষড়যন্ত্র ভ্রমজালের ফাঁদ। এই কাল চান না যে, কোনো সাধক তার ভ্রমের এই জাল থেকে বেরিয়ে যাক। পূজ্য কবীর পরমেশ্বর বললেন যে, সেই বাখবর (তত্ত্বদর্শী সন্ত) আমিই আছি 1 অতএব আপনি আমার কাছ থেকে উপদেশ নিন এবং আমি যে তত্ত্বজ্ঞান আপনাকে বলবো, তা অন্যান্য ভক্তি করা ব্যক্তিদের বোঝাবেন, এঁ তো কাল আছে, যাকে বেদে ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল জ্যোতি নিরঞ্জন) বলা হয়। পূর্ণ পরমেশ্বর তো অন্য কেউ আছেন, যাঁকে বেদে কবির্দেব বলা হয় আর কুরআন শরীফে (মজিদ) তাঁকে কবীরন্, কবীরা ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং যাঁকে হজরত মুহম্মদ আল্লাহু আকবর বলেছেন, সেই কবীর আল্লাহ আমিই আছি। আপনারা সবাই আমার আত্মা, কাল (ব্রহ্ম) আপনাদের ভ্রমিত করে রেখেছে।

বন্দিছোড় কবীর পরমেশ্বর আরও বললেন যে, এই কথা শুনে সেই মোল্লা আমার উপর খুবই ক্রোধিত হয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, এখন থেকে আমার কথা শুনতে আসবেন না। পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের কাছ থেকে উপরোক্ত বিবরণ শোনার পর মুসলিম বাদশাহ সিকন্দর লোধী, নিজের ধার্মিক গুরু শেখতকীকে বললেন, "পীর সাহেব! কুরআন শরীফে মহারাজ কবীর সাহেবের দ্বারা বলা এইসব বিবরণ লেখা আছে কি?" শেখতকী কুরআন শরীফের সূরা ফুরকান ২৫ আয়ত নং ৫২ থেকে ৫৯ খুলে ধ্যান দিয়ে পড়ে সত্যকে জানলেন, কিন্তু মান বশ ও লজ্জিত হওয়ার কারণে বলে দিলেন যে, কবীর তো মিথ্যাবাদী। ইনি পবিত্র কুরআন শরীফের গভীর রহস্যের সম্পর্কে কি জানেন? ইনি তো অশিক্ষিত। এই কথা বলে অধিক বিরক্তিভাব প্রকাশ করে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। সম্রাট সিকন্দর লোধীও কুরআন শরীফকে শুনতে থাকতেন, তাই তার মনে পড়ে যায় যে, এইপ্রকার বর্ণন অবশ্যই রয়েছে। তবুও ভক্তি মার্গ এবং আরবী ভাষার জ্ঞান না জানার কারণে পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। তবে হজরত মুহম্মদের জীবন চরিত্রের বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। যার কারণে বাদশা অধিক প্রভাবিত হয়ে বললেন, সত্যিই হজরত মুহম্মদের জীবন খুবই কষ্টময় ছিল।

"বাদশাহ সিকন্দরের শঙ্কার সমাধান"

প্রশ্ন :- বাদশাহ সিকন্দর লোধী কবীর আল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পরবরদিগার! (ক.) এই ব্রহ্ম (কাল / জ্যোতি নিরঞ্জন) শক্তি কে আছেন? (খ.) তিনি সকলের সামনে প্রকট কেন হন না?

উত্তর :- পরমেশ্বর কবীর সাহেব সিকন্দর লোধী বাদশার 'ক-খ' এর প্রশ্নের উত্তরে সৃষ্টি রচনা বর্ণনা করে শোনালেন। (কৃপা করে দেখুন এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং 181 থেকে 227)

(গ.) তাহলে বাবা আদমের মতো মহাপুরুষও কি এই কালের জালে ফেঁসে ছিলেন?

উত্তর :- তিনি বললেন যে, পবিত্র বাইবেলে উৎপত্তি বিষয়ে লেখা আছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা মনুষ্যদের ও অন্যান্য প্রাণীদের রচনা ছয় দিনে করে, সপ্তম দিনে তখ্তের অর্থাৎ সিংহাসনের উপর বিরাজমানের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে ব্রহ্মা (কাল) এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। এই কাল ব্রহ্মা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি (কাল) সকলের সামনে কখনও আসবো না। এইজন্য সকল কার্য তিনি তাঁর তিন পুত্রদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) দ্বারা করান, আবার কখনো স্বয়ং কারোর শরীরে প্রেতের মতো প্রবেশ করে কথা বলেন অথবা আকাশবাণীর মাধ্যমে আদেশ দেন। প্রেত, পিতর ও অন্যান্য দেবতাদের (ফেরেশতা) আত্মারাও কখনো কারোর শরীরে প্রবেশ করে, নিজের আদেশ করে। তবে শ্রদ্ধালুরা জানেন না যে, এই কথা কোন শক্তি বলছে। পূর্ণ পরমাত্মা মাংস খাওয়ার আদেশ দেননি। পবিত্র বাইবেল উৎপত্তি বিষয়ে, সমস্ত প্রাণীর খাদ্য সম্পর্কে পূর্ণ পরমাত্মা প্রথম ও অন্তিম আদেশ দিয়েছিলেন যে, মানুষের ভোজনের জন্য ফলদার বৃক্ষ এবং বীজযুক্ত উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীদের যাদের প্রাণ আছে, তাদের আহারের জন্য ছোট- ছোট উদ্ভিদ যেমন ঘাস, লতা, ঝোপ ঝাড় ইত্যাদি দিয়েছেন। এরপর পূর্ণ প্রভুর আদেশ না পবিত্র বাইবেলে আছে আর না কোনো কতেবগুলিতে (তৌরাত, ইঞ্জিল, জবুর ও কুরান মজিদে /শরীফে) রয়েছে। এই কতেবগুলোতে কাল ব্রহ্মা ও তাঁর ফেরেশতাগণ, পিতরদের ও ভূতদের মেলানো-মেশানো (মিশ্রিত) আদেশ রূপ জ্ঞান আছে।

(ঘ) প্রশ্ন :- তাহলে কি বাবা আদমের পূর্বেও সৃষ্টি ছিল?

উত্তর :- সূর্যবংশের রাজা নাভিরাজ ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন রাজা ঋষভদেব, যাকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রথম তীর্থঙ্কর বলে মানা হয়। এই ঋষভদেবের আত্মাই পরে বাবা আদম হয়েছিলেন। (এই বিবরণটি জৈন ধর্মের পুস্তক "আও জৈন ধর্ম কো জানে" অর্থাৎ "আসুন জৈন ধর্মকে জানি" এর ১৫৪ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে।)

এ থেকে স্পষ্ট হল যে, বাবা আদমের পূর্বেও সৃষ্টি ছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জনবসতিহীন অর্থাৎ নির্জন ছিল। এক স্থানের ব্যক্তি অন্য স্থানের ব্যক্তিদের জানতেন না যে, কে কোথায় রয়েছে। এমন স্থানের উপর ব্রহ্মা পুনরায় মানুষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছিলেন। উৎপত্তি এমন স্থানে করেছিলেন, যারা অন্য মানুষের থেকে বিচ্ছেদ হয়ে থাকত। কালের পুত্র ব্রহ্মার লোক থেকে এই পুন্য আত্মা (বাবা আদম) তাঁর কর্ম সংস্কার ভোগ করার জন্য এসেছিলেন। তারপর শাস্ত্র অনুকূল সাধনা প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে পিতর যোনি প্রাপ্ত হয়ে, পিতর লোকে চলে গিয়েছিলেন। বাবা আদম হওয়ার পূর্বে তিনি ফেরেশতা ছিলেন। এটা পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে।

(ঙ). প্রশ্ন :- মানুষের জন্য মাংস খাওয়ার আদেশ যদি আল্লাহর না থাকে, তাহলে বাইবেল ও কুরান শরীফে কিভাবে লেখা হয়েছে?

উত্তর :- পবিত্র বাইবেলে উৎপত্তি বিষয়ে লেখা আছে যে, পূর্ণ পরমেশ্বর ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে, সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। তারপরে বাবা আদম ও অন্যান্য নবীদেরকে এই নিরাকার (অব্যক্ত) আল্লাহর (কাল) ফেরেশতারা এবং পিতররা তাদের নিজেদের আদেশ দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে কুরান শরীফ ও বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(চ). প্রশ্ন :- অব্যক্ত প্রভু (কাল) এই সমস্ত সত্য জ্ঞান লুকিয়েছিলেন, তাহলে পূর্ণ পরমেশ্বরের সঙ্কেত কিসের জন্য করলেন?

উত্তর :- জ্যোতি নিরঞ্জন (অব্যক্ত বা লুকিয়ে থাকা নিরাকার প্রভু) তিনি পূর্ণ পরমাত্মার ভয়ের কারণে এই কথা লুকিয়ে রাখতে পারে নি যে, পূর্ণ পরমাত্মা তো কেউ অন্যই আছেন। পূর্ণ পরমাত্মার যথার্থ পূজা বিধি থেকে এই কাল (ব্রহ্ম আল্লাহ) অপরিচিত রয়েছেন। এইজন্য সে কেবল তাঁর নিজের সাধনার জ্ঞান প্রদান করেন আর তার সাথে কিছু পূর্ণ পরমাত্মারও মহিমা করেন।

দিল্লির সম্রাট সিকন্দর ভাবলেন যে, এমন ভগবানকে যদি দিল্লিতে নিয়ে যাই, তাহলে এমন হতে পারে, সেখানকার মানুষও এই পরমাত্মার চরণে এসে, সকলে ধন্য হয়ে একাকার হয়ে যাবে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ঝগড়াগুলিও সমাপ্ত হয়ে যাবে। একবার কেউ যদি কবীর প্রভুর বিচার শোনে, তাহলে তারাও উদ্ধার হয়ে যাবে। এই ভেবে সম্রাট সিকন্দর লোধি প্রার্থনা করে বললেন যে "হে আল্লাহর জাত! হে পরবরদিগার! একবার আমার সাথে দিল্লিতে যাওয়ার জন্য কৃপা করুন।" কবীর সাহেব বললেন, প্রথমে আমার নিকট উপদেশ (মন্ত্রদীক্ষা) নিতে হবে, তারপরে আপনার সাথে যেতে পারি, এমনভাবে আমি যাবো না। সিকন্দর লোধি বললেন, ঠিক আছে দাতা! আপনি যেমন বলবেন, আমি তেমনই করবো। এরপর কবীর সাহেব বললেন, আজ থেকে কোনো হিন্দুকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাবেন না। সম্রাট সিকন্দর বললেন, ঠিক আছে বানাবো না প্রভু! কবীর পরমাত্মা আরও বললেন, কোনো জীবও হিংসা করবেন না। সম্রাট সিকন্দর বললেন প্রভু! আমি তো জীব হিংসা করবো না আর না কাউকে জীব হিংসা করতে বলবো। তবে হে পরবরদিগার! এই সকল মোল্লা ও কাজী তো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছেন। কবীর সাহেব বললেন ঠিক আছে, আপনি আপনার মুখে জীব হিংসা করতে বলবেন না। সিকন্দর বাদশা বললেন, ঠিক আছে দাতা! এই প্রকার সকল

নিয়ম বলে দিলেন আর সিকন্দরও সমস্ত কিছু স্বীকার করে নিলেন। পরে পরমেশ্বর কবীর সাহেবের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন ও সকল নিয়ম অন্তিম জীবন পর্যন্ত পালন করার শপথও গ্রহণ করলেন।

এরপর সদগুরুদেবজী সিকন্দর লোধীকে প্রথম মন্ত্র প্রদান করে, সেখান থেকে তাঁরই সাথে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। বাদশাহ সিকন্দর, কবীর আল্লাহকে নিজের সাথে হাতির উপরে হাওদায় (অম্বারী) বসালেন অর্থাৎ যে আসনে বাদশা ছাড়া অন্য কেউ বসেন না। সম্রাট সিকন্দর কিন্তু কবীর সাহেবকে আল্লাহ রূপে দেখতে পেয়েছিলেন, যিনি তার অসাধ্য রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সামনে মৃত স্বামী রামানন্দকেও জীবিত করে দিয়েছিলেন।

যখন সিকন্দর লোধীর ধর্মগুরু শেখতকী জানতে পারলেন যে, রাজা সুস্থ হয়ে গিয়েছেন আর তার সম্মুখেই স্বামী রামানন্দের কাটা মাথা কবীর সাহেব জোড়া লাগিয়ে জীবিত করে দিয়েছেন, তখন তিনি ভাবলেন, এখন থেকে তো আমার নম্বর কেটে যাবে অর্থাৎ আমার মহিমা কম হয়ে যাবে। এছাড়া আমার কামাই এবং আধিপত্য হয়তো চলে যাবে, এইসব ভেবে শেখতকী কবীর সাহেবের প্রতি হিংসা করতে লাগলেন আর বিচার করতে লাগলেন যে, কোন উপায়ে এই কবীরকে (প্রভুকে) নিচু দেখাব? যাতে সিকন্দরের হৃদয় থেকে উনি বের হয়ে যান আর আমার প্রভুতা বজায় থাকে। তারপর রাজার সাথে সকলে সেখান থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং রাত হয়ে যাওয়ার কারণে ভাবলেন, এক নদীর তীরে বিশ্রাম নিয়ে সকালে রওনা দিলে ঠিক হবে, এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

"কামাল নামক মৃত বালককে জীবিত করা"

শেখতকী বাদশা সিকন্দরের প্রতি ক্রোধে মুখ ফুলিয়ে রইলেন। সিকন্দর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার পীর সাহেব? শেখতকী বললেন, তুই কি কিছুই জানিস না? সিকন্দর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার পীর সাহেব? শেখতকী বললেন, তোমার সাথে ইনি কে? সিকন্দর বললেন যে, ইনি তো আল্লাহ (ভগবান)। শেখতকী বললেন, আচ্ছা! আল্লাহ আজকাল আকার রূপে পৃথিবীতে আসতে লেগেছে, আল্লাহ কেমন? সিকন্দর বললেন, তিনি এমনই আল্লাহ আছেন, প্রথম তো তিনি আমার এমন অসাধ্য যে রোগ ছিল, যে রোগ কারোর দ্বারা ঠিক হচ্ছিল না, সেই রোগ তিনি কেবল আমার শরীরে হাত স্পর্শ করা মাত্রই ঠিক করে দিয়েছেন। শেখতকী বললেন, এমন তো জাদুকররা করেন। সিকন্দর বললেন, এছাড়া এই আল্লাহ এমন আছেন যে, আমি তার গুরুদেবের মাথা কেটে দিয়েছিলাম আর ইনি আমার চোখের সামনে তাকে তৎক্ষণিক জীবিত করে দিয়েছিলেন।

শেখতকী বললেন, যদি কবীর আল্লাহই হন, তাহলে আমি তার পরীক্ষা নেবো। যদি তিনি আমার সামনে এক মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতে পারেন। তাহলেই আমি তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে নেবো, অন্যথায় দিল্লিতে গিয়ে আমি সমস্ত মুসলমান সমাজকে বলে দেবো যে, এই রাজা কাফির হয়ে গিয়েছে।

সিকন্দর লোধী ভয় পেয়ে গেলেন যে, তাহলে সত্যি করে এমন না হয়ে যায় যে, এই শেখতকি সত্যি সত্যিই দিল্লিতে পৌঁছে, আমার রাজপাট পাল্টে না দেন? (রাজপাট দেওয়ার মালিক আল্লাহ তালা তো স্বয়ং বাদশার পাশেই বসে রয়েছেন আর এদিকে বাদশা ওই মূর্খের কথাতে ভয় পাচ্ছে।) বাদশা শেখতকীকে বললেন, আপনি কিভাবে প্রসন্ন হবেন? শেখতকী বলল, আমি তখনই প্রসন্ন হব, যখন এই কবীর আমার সামনে কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেবেন। এই সব কথা বাদশা, কবীর সাহেবকে বললেন, আমাকে পীর সাহেব এই সব কথা বলেছেন যে, কবীর যদি আমার সামনে কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখাতে পারে, তাহলে আমি তাঁর সব কথা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি, অন্যথায় সকল মুসলমানদেরকে তিনি আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবেন আর আমার শাসনের উপরও সংকট সৃষ্টি করে দেবেন।

কবীর সাহেব বললেন, ঠিক আছে (কবীর সাহেব ভাবলেন, এই শেকতকী অজ্ঞানী আত্মা। যদি এঁ আমার কথা মেনে নেয়, তাহলে অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান এঁর কথা মানে, কারণ তিনি হলেন দিল্লির বাদশা সিকন্দরের পীর। তবে এই পীর যদি সত্য ঘটনা মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে বলে দেন, তাহলে সরল-সোজা মুসলমান আত্মারা সত্য সাধনা করে নিজেদের মানব জীবনের কল্যাণ করিয়ে নেবে। কারণ তারা তাদের পীরের কথা খুব দ্রুত বিশ্বাস করে নেয়।

এইজন্য বললেন, শেকতকী! মৃতদেহের সন্ধান করে এনে দাও। সকালে ১০-১২ বছর বয়সী একটি বালকের মৃতদেহ জলে ভেসে ভেসে আসছিল। শেখতকী বলল, ওই যে একটি মৃতদেহ ভেসে আসছে, একে জীবিত করে দাও। কবীর সাহেব বললেন, প্রথমে আপনি চেষ্টা করুন, তারপর আমার নম্বর আসবে। উপস্থিত মন্ত্রী ও সৈন্যরা বললেন, হ্যাঁ! পীর সাহেব, প্রথমে আপনি চেষ্টা করে দেখুন।

শেকতকী যন্ত্র-মন্ত্র করতে লাগলেন। এরমধ্যে ওই ভাসমান মৃতদেহ তিন ছলাং পা আগে চলে গেল। এই দেখে শেখতকী বললেন, কবীর সাহেব চান যে, এই ঝামেলা মাথা থেকে সরে যাক। মৃত ব্যক্তি কি কখনো জীবিত হয় নাকি? মৃতব্যক্তি তো কিয়ামতের সময়ই জীবিত হয়। কবীর সাহেব বললেন, শেখতকী! আপনি শান্ত হয়ে বসুন। এরপরে

কবীর সাহেব সেই ভাসমান মৃতদেহটিকে হাত দিয়ে ফিরে আসার ইঙ্গিত করলেন। বারো বছরের মৃত বালকের মৃতদেহ নদীর জলের স্রোতের উল্টো দিকে চলতে চলতে কবীর সাহেবের নিকটে এসে থেমে গেল। জলের ঢেউ মৃত শরীরের নিচে নিচে দিয়ে যাচ্ছিল আর মৃতদেহ জলের উপরে এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কবীর সাহেব বললেন, হে জীবাত্মা! যেখানেই থাকো না কেন, কবীরের হুকুমে মৃতদেহে প্রবেশ কর ও আমার সামনে প্রকট হও। কবীর সাহেব এই বচন বলা মাত্রই মৃতদেহে কম্পন হল এবং জীবিত হয়ে জল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সেই বালক কবীর আল্লাহর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। "বলো কবীর পরমেশ্বরের জয়"।

উপস্থিত সকলেই বলে উঠলো, কবীর সাহেব তো কামাল (চমৎকার) করে দিয়েছেন। এর পর থেকে সেই বালকটির নাম কামাল রাখলেন। কবীর জী বালকটিকে নিজের কাছে রাখলেন এবং সন্তানের মতো পালন পোষণ করতে লাগলেন ও নাম দীক্ষাও দিয়ে দিলেন। তারপর দিল্লিতে এলেন এবং সকলে জানতে পারলেন যে, কবীর জীর সাথে যে বালকটি রয়েছে, তাকে পরমেশ্বর কবীরই জীবিত করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি বহু দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কবীর সাহেবের জয় জয়কার হতে দেখে শেখতকী বেশি করে ঈর্ষা করতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো, এই কবীর তো আমার বড় শত্রু হয়ে গেল। এঁর তো অধিক মহিমা হয়ে গেল দেখছি।

শেখতকীর ঈর্ষা ধীরে ধীরে বাড়তেই লাগল। শেখতকীর তেরো বছরের এক কন্যার মৃত্যুর পরে তাকে কবরে রাখা হয়েছিল। শেখতকীর বলল, কবীর যদি আমার কবরে থাকা মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেন, তাহলে আমি তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে নেব।

"শেখতকীর দ্বারা পরমেশ্বর কবীরের অন্যান্য পরীক্ষা"

"কামালীর পূর্ব জন্মের বিষয়ে"

(পূর্ণ মুক্তি পূর্ণ সন্ত (গুরু) বিনা অসম্ভব)

সত্যযুগে এই কামালী জীবের আত্মা বিদ্যাধর নামক পণ্ডিতের স্ত্রী দীপিকা ছিল এবং পরে ত্রেতাযুগে ঋষি বেদবিজ্ঞের (যিনি বিদ্যাধরের আত্মা ছিল তার) স্ত্রী সূর্য ছিল। সত্যযুগে ও ত্রেতাযুগে পরমাত্মা কবীর সাহেবকে শিশুরূপে এই দুইজন প্রাপ্ত করেছিলেন। তারপর আরও অন্য জীবনও ধারণ করে আর কলিযুগে মুসলমান ধর্মে রাবী (রাবিয়া) নামের কন্যা রূপে জন্ম হয়েছিল। এরপর এক জীবন বেশ্যা রূপে জীবন যাপন করেছে। তারপর অন্য জীবন বাঁসুরী নামক এক কন্যা রূপে জন্ম হয়। তারপর শেখতকীর ঘরে এক কন্যা রূপে জন্ম হয়, পরে তারই নাম কামালী রাখা হয়। রাবিয়ার প্রমাণে সাখিগুলিতে সন্ত গরীবদাস সাহেব দ্বারা রচিত গ্রন্থ সাহেবে পারখের অঙ্গ বাণী নং. ৫৬ থেকে ৫৯ :-

গরীব, সুলতানী মক্কে গয়া, মক্কা নহী মুকাম। গয়া রাণ্ড কে লেন কুঁ, কহে অধম সুলতান॥৫৬॥
গরীব, রাবিয়া পরসী রব্ব স্যোঁ, মক্কে কী অসবার। তীন মঞ্জিল মক্কা গয়া, বীবী কে দীদার॥৫৭॥
গরীব, ফির রাবিয়া বন্সরী বনী, মক্কে চঢায়া শীশ। পূর্বলে সংস্কার কুছ, ধন্য সতগুরু জগদীশ॥৫৮॥
গরীব, বন্সরী সে বেশ্যা বনী, শব্দ সুনায়া রাগ। বহুর কমালী পুত্রী, যুগ যুগ ত্যাগ বৈরাগ॥৫৯॥

প্রমাণের জন্য সন্ত গরীবদাস সাহেব দ্বারা রচিত গ্রন্থ সাহেব থেকে অচলার অঙ্গের বাণী নং ৩৬৩ থেকে ৩৬৮ পর্যন্ত :-

গরীব, রাবী কুঁ সতগুরু মিলে, দীনা অপনা তেজ। ব্যাহী এক সহাব সৈ, বীবী চঢ়ী ন সেজ॥৩৬৩॥
গরীব, রাবী মক্কে কুঁ চলি, ধরয়া অলহ কা ধ্যান। কুত্তী এক প্যাসী খড়ী, ছুটে জাত হৈঁ প্রাণ॥৩৬৪॥
গরীব, কেশ উপারে শীশ কে, বাটী রস্সি বীন। জাকৈ বস্ত্র বান্ধি কর, জল কাঢ়্'য়া প্রবীণ॥৩৬৫॥
গরীব, সুনহী কুঁ পানী পীয়া, উতরী অর্শ আবাজ। তীন মঞ্জিল মক্কা গয়া, বীবী তুম্হরে কাজ॥৩৬৬॥
গরীব, বীবী মক্কে পর চঢ়ী, রাবী রংগ অপার। এক লাখ অস্সী জহাঁ, দেখো সব সংসার॥৩৬৭॥
গরীব, রাবী পাটড়া ঘাল কর, কিয়া জহাঁ অস্নান। এক লাখ অস্সী বহে, মগর মল্যা সুলতান॥৩৬৮॥

(উপরোক্ত বাণীগুলিতে নিম্ন কথার সংক্ষিপ্ত বর্ণন রয়েছে।)

রাবিয়া (রাবী) নামের এক মেয়ের জন্ম মুসলমানের ঘরে হয়েছিল। মেয়েটির বয়স যখন ১৬ বছর, তখন পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রভুর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল। পরম্পরাগত ধর্ম অনুসারে ইবাদত যেমন রোজা রাখা, নামাজ পড়া, ঈদ উদযাপন করা, এই সব সে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করতেন।

কবীর সাহেব তখন বললেন, হে পুত্রী! তুমি যে সাধনা করছো, এই সাধনা প্রভু (আল্লাহ) প্রাপ্তির নয়। পরমাত্মা সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা শোনালেন ও সত্য ভক্তির মার্গের বিষয়ে বললেন। এরপর মেয়েটি পরমাত্মার নিকট হতে নাম উপদেশ নিলেন। চার বছর পর্যন্ত এই সত্য সাধনা করার পর, সমাজের চাপে এবং লোকলজ্জায় ভয়ে, সত্য মার্গের ভক্তি ত্যাগ করে দিয়ে পুনরায় পূর্বের প্রথাগত সাধনা শুরু করে দিলো। মেয়েটির প্রভুর প্রতি এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে বিবাহ পর্যন্ত করতে অস্বীকার করে দিয়েছিল। মাতা-পিতা কান্না করতেন যে, যুবতী মেয়েকে ঘরে কী করে

রাখবো? মেয়েটি তার মাতা-পিতাকে অধিক চিন্তিত হতে দেখে, বিবাহ করার জন্য সম্মতি দিয়ে দিলো। ওই রাবিয়ার বিবাহ এক বড় অধিকারী সাহেবের (কর্মকর্তার) সাথে হয়েছিল। সে তার স্বামীকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল, আমি সন্তান জন্ম দেবো না। আমার বাবা-মায়ের অধিক চাপ ও সামাজিক লজ্জার কারণেই আমি বিবাহ করেছি, যদি আপনি আমার কথা না মানেন, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। এটা আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রইল জেনে রাখুন। আমি কেবল প্রভুর আরাধনা করে আত্মকল্যাণ করতে চাই।

রাবিয়ার স্বামী ভাবলেন, কেনই বা আমি এই ভক্ত আত্মাকে দুঃখ দিয়ে পাপের ভাগীদার হবো? এই চিন্তা ভাবনা করে বলল, রাবিয়া! তুমি যেভাবে সমাজের ভয় পেয়ে বিবাহ করেছো, তেমনি আমারও এক নিজের সমাজ আছে। সেইজন্য সমাজের চোখে তুমি কেবল আমার স্ত্রী রূপেই থাকবে, তবে আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার বোন হয়ে থাকবে। তোমাকে ঘরের বাইরে যেতে দেবো না, ঘরের মধ্যে থেকেই তুমি ইবাদত (ভক্তি) করবে। তুমি যদি বলো, তাহলে তোমার জন্য দুইজন দাসী রেখে দেবো। রাবিয়া অত্যন্ত খুশি হয়ে বললো, হে প্রভু! আপনি আমার কথা শুনেছেন। সেদিন থেকে রাবিয়া মুসলিম ধর্মে প্রচলিত সাধনা করতে লাগল।

রাবিয়া মুসলিম ধর্মে জন্মগ্রহণ করার কারণে ঈদ, বকরীদ ও রোজা ইত্যাদি নিষ্ঠার সাথে পালন করতো। যখন তার বয়স পঞ্চাশের উপরে হয়ে যায়, তখন সে তার স্বামীকে বলল শুনেছি যে, মক্কায় যাওয়া নাকি অতি আবশ্যক, জানিনা কখন আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়, তাই একবার হজ করতে যেতে ইচ্ছুক। তার স্বামী বলল, অবশ্যই যেতে পারো। তবে তুমি যদি বলো, তাহলে তোমার জন্য আমি উটের বন্দোবস্ত করে দেবো। রাবিয়া বলল, আমি পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতে চাই আরও অনেক যাত্রীরাও যাচ্ছে। তার স্বামী বলল, ঠিক আছে তুমি যেতে পারো।

রাবিয়া হজ করার জন্য মক্কায় রওনা দিলেন, তখন পথের মধ্যে সে দেখল, একটা কুকুর খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। সেই কুকুরটি একবার রাবিয়ার পায়ের কাছে ছুটে আসছিল আর কখনো কুঁয়ার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। রাবিয়া বুঝতে পারলেন, কুকুরটির জল পিপাসা লেগেছে, তার সাথে ছোট ছোট বাচ্চাদেরও দেখতে পেল। ভাবল, এই কুকুর যদি আজ জল পান না করতে পারে, তাহলে মারা যাবে আর সাথে তার বাচ্চাগুলোও মারা যাবে। ভক্তের মধ্যে অধিক দয়া হয়। রাবিয়া কুঁয়ার কাছে গেল। সেখানে না কোনো বালতি আর না কোনো দড়ি ছিল। আশেপাশে কোনো গ্রামও চোখের নজরে দেখতে পায়নি।

রাবিয়া এদিক ওদিক না তাকিয়ে, সে তার নিজের মাথার চুল ছিড়ে একটা লম্বা দড়ি বানালেন এবং নিজের কাপড় খুলে (কারণ ওই সময় খাদির মোটা সূতোর কাপড় পড়া হতো) চুলের দড়ির সঙ্গে বেঁধে, কুঁয়ার জলে ভিজিয়ে, বাইরে অর্ধেক ভাঙা মাটির একটা পাত্র ছিল, সেই পাত্রে জল ভরে দিল।

কুকুরগুলি খুব শীঘ্রই জল পান করল এবং রাবিয়ার সারা শরীর রক্তময় হয়ে গিয়েছিল, তাই সে কাপড় দিয়ে সারা শরীর মুছে ও কোনো প্রকারে কাপড় ধুয়ে, পুনরায় সেই কাপড় পড়ে নিল আর যখনই সে মক্কাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল, এরমধ্যেই মক্কার ওই পবিত্র ঘরটি (পবিত্র মসজিদটি) সেখান থেকে বিমানের মতো উড়ে এসে রাবিয়ার জন্য সেই কুঁয়োর কাছেই চলে এলো। এরপর আকাশবাণী হল যে, "হে ভক্তিমতী! তোমার জন্য মক্কার ওই তিনতলা (মঞ্জিল) ৬০ মাইল দূর থেকে উড়ে এসেছে। তুমি এর মধ্যে প্রবেশ করো। রাবিয়া তার মধ্যে প্রবেশ করলো। তারপর মক্কা সেখান থেকে বিমানের মতো উড়ে, পুনরায় নিজের স্থানে ফিরে গেল। এই লীলা দেখে সমাজে বিশেষ আলোচনা হতে লাগল যে, ভক্তি করো তো রাবিয়ার মতো করো। মুসলমান সমাজে রাবিয়ার (মীরা বাঈয়ের মতো) নাম শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া হয় এবং সকলে তাকে বিশেষ সৎকার করতে লাগলো।

কিছু সময় পরে রাবিয়া প্রাণ ত্যাগ করল। দ্বিতীয়বার রাবিয়ার জন্ম হল এক মুসলিম পরিবারের বাঁসুরি নামের মেয়ের রূপে। কেননা যেখানে জীবের (মানুষের) সংস্কার থাকে, সেখানেই তার জন্ম হতে থাকে। সে খুবই ধার্মিক প্রকৃতির মেয়ে ছিল এবং খুবই মধুর সুরে প্রভুর গুণগান করতো। এই মেয়েটি মুসলিম ধর্ম অনুসারে তার ধর্মীয় ইবাদত অন্তিম আয়ু পর্যন্ত করেছিল। তবে এই মেয়েটি লোকবেদের (ভুল সাধনার) অনুসারে শুনে রেখেছিল যে, কেউ যদি মক্কাতে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে যায়, অর্থাৎ সেই আত্মা সরাসরি স্বর্গে (বেহেশতে) চলে যায়।

বৃদ্ধ হওয়ার পরে সে হজ করতে মক্কায় গিয়েছিল। ভাবল যে, এর থেকে ভালো অবসর আর কি হতে পারে? যদি আমি এই মক্কায় মারা যাই তাহলে আমি স্বর্গ লাভ করতে পারবো। তাই মেয়েটি নিজের মাথা কেটে মক্কায় উৎসর্গ করে দিলেন। এ নিয়ে সমস্ত মুসলমান সমাজে বিশেষ আলোচনা হয়ে গেল যে, আল্লাহর নামে কুরবানি এমনভাবেই দেওয়া উচিৎ। বাঁসুরী তো অবশ্যই স্বর্গে (জান্নাতে) চলে যাবে।

(এখন এখানকার নির্বোধ ব্যক্তিদের ভাবা উচিত যে, প্রভুর (আল্লাহ) নামে কুর্বানী দেওয়ার ইচ্ছা হলে, প্রথমে

তো স্বয়ং নিজের কুর্বানী দেওয়া উচিৎ, প্রভুর (আল্লাহ) নামে ছাগল, গরু বা মুরগি নয়। বাস্তবে কুরবানির অর্থ হল যে, প্রভুর (কাদির আল্লাহ) চরণে সমর্পণ করা এবং কেবল তাঁরই সত্যভক্তি করা। মাথা কেটে দিয়ে অনুচিত বিধিসম্মত সাধনা করলে, মোক্ষ লাভ হয় না। এসব তো হল কেবল কালের গোলক - ধাঁধা। কুর্বানী কারোর গলা কেটে হয় না, নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করলেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। প্রভুর উদ্দেশ্যে হৃদয় দ্বারা সমর্পণ করো যে, হে প্রভু! এই তনও (শরীরও) তোমার, ধনও তোমার, এই দাস বা দাসীও তোমার, এই প্রকারের কুর্বানী প্রভু পছন্দ করেন। হিংসা, হত্যা প্রভু কখনই পছন্দ করেন না।)

এরপর ওই রাবিয়া মেয়েটির তৃতীয়বার জন্ম হয়েছিল অন্য সমাজে আর তার কর্ম আধারে সে বেশ্যা হয়েছিল। একমাত্র পূর্ণ পরমেশ্বরই (সৎপুরুষ/কাদির আল্লাহ), সকল মানবের পাপ কাটাতে পারেন, অন্য কোনো প্রভু পাপ কাটাতে পারেন না। যেমন ভারতের রাষ্ট্রপতিই একমাত্র মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসির শাস্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, অন্যান্য শাস্তির কথা আর কি বলব? রাষ্ট্রপতি ছাড়া অন্য কেউ ফাঁসির সাজা ক্ষমা করতে পারেন না। এইপ্রকার একমাত্র পরম শক্তিযুক্ত কবীর সাহেবই (সর্বশক্তিমান কবীর পরমেশ্বর/আল্লাহ আকবর) আমাদের সকল দুঃখ দূর করতে পারেন। অন্য কোনো খুদা (আল্লাহ/প্রভু) কিসমতের অর্থাৎ ভাগ্যের লেখা কষ্টকে সমাপ্ত করতে পারেন না।

(শেষ কথা)

রাবিয়ার আত্মা বেশ্যার জীবন সমাপ্ত করে প্রাণ ত্যাগ দিয়েছিল। ওই রাবিয়ার চতুর্থবার যখন মানব জন্ম হয়েছিল, তখন এই শেখতকী পীরের কন্যা রূপে হয়। যিনি দিল্লির বাদশা সিকন্দর লোধীর ধর্মগুরু ছিলেন। এই শেখতকীর কন্যা বারো বছর বয়সে মারা গিয়েছিল, তাই তাকে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়েছিল। কবীর সাহেব তাই বলেছিলেন :-

গরীব, জো জন মেরি শরণ হৈ, তাকা হুঁ মৈ দাস। গৈল-গৈল লাগ্যা ফিরুঁ, জব তক ধরণী আকাশ॥

গরীব, জ্যোঁ বচ্ছা গউ কী নজর মেঁ, য়োঁ সাঈঁ কো সন্ত। ভক্তোঁ কে পীছৈ ফীরৈ, ভক্ত বৎসল ভগবন্ত॥

ওই পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি অর্থাৎ কবির্দেব (আল্লাহু আকবর) নিজের ভক্তি যিনি স্বয়ং নিজে সন্ত রূপে এসে বলে থাকেন। ওই সদগুরু রূপে প্রকট কবীর সাহেবের নির্দেশ অনুসারে, তাঁর সৎভক্তি এই মেয়েটি (রাবিয়া রূপে) কেবল চার-পাঁচ বছরই করেছিল। তারপরে প্রাণ ত্যাগ করে আর ওই সত্যভক্তির প্রতিফল স্বরূপ, এই রাবিয়ার আত্মা পরপর তিনবার মানব শরীর প্রাপ্ত হয়েছিল। রাবিয়ার আত্মার মৃত্যুর পরে মানব জীবনের সংস্কার বাকী ছিল না, এই আত্মা পূর্বে যদি কাদির আল্লাহর সত্য ভক্তি না করতো, তাহলে ৮৪ লাখ যোনির কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করতে হতো। কবীর পরমাত্মা দয়ালু, সেইজন্য কারণ বানিয়ে তাঁর ভক্ত রাবিয়া আত্মাকে কবর থেকে জীবিত করে নিজের শরণে নিয়ে, তার নাম কামালী রেখেছিলেন এবং পরে প্রিয় মেয়েটিকে উপদেশ দিয়ে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। এই প্রকার আমাদের এটা ভাবতে হবে যে, আমরা শিকড়ে জল ঢাললে, তাহলে গাছ সবুজ পাতা ও শাখা প্রশাখা ফলে ফুলে ভরে যাবে। তবে আমরা পাতা ও শাখা প্রশাখার (কাদির আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে অন্য প্রভুর ইবাদত করা) ইবাদত করছি, এটা ভুল।

কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ, নিরঞ্জন বাকী ডার। তিনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥

এই সংসার হল উল্টোরূপী ঝুলে থাকা বৃক্ষ। এর ঊর্ধ্বমুখী (উপর দিকে) হয়ে রয়েছে শিকড় অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ (সতপুরুষ/পূর্ণ ব্রহ্ম) এবং শিকরের উপরে অর্থাৎ মাটির বাইরে যে কাণ্ড দেখা যায়, তাঁকে অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) জানবেন। এরপর কান্ড থেকে যে মোটা ডাল বের হয়, তাকে জ্যোতি নিরঞ্জন কাল (ব্রহ্ম) জানবেন, আবার সেই মোটা ডাল থেকে যে তিনটে শাখা বের হয়, সেই তিন শাখা হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ জানবেন আর এর থেকে যে ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা তা হল দেবী-দেবতা এবং পাতাগুলোকে সংসার জানবেন। এইভাবে কবীর সাহেব সমস্ত সৃষ্টি রচনার বর্ণন একটিমাত্র ছন্দে বা দোহাতে শুনিয়ে দিয়েছেন।

"শেখতকীর মৃত কন্যা কামালীকে জীবিত করা"

শেখতকী দেখল যে, এই কবীর তো কোনো প্রকারেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসছেন না। সেই কারণে জনতাকে বোঝাতে লাগল যে, এই কবীর তো একজন জাদুকর, এমনি করে যন্ত্র-মন্ত্র দেখিয়ে, ইনি সম্রাট সিকন্দরের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে রেখেছেন। সকল মুসলমানকে বলল, তোমরা আমাকে সমর্থন করো, তা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে। সরল সোজা মুসলমানেরা বললেন, পীর সাহেব! আমরা আপনার সাথে আছি, আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব। শেখতকী বলল, এই কবীরকে ওই সময় আল্লাহ মানবো, যখন তিনি কবরে দাফন করা আমার মৃত কন্যাকে জীবিত করবেন।

পূজ্য কবীর সাহেবের কাছে এই বিষয়ে প্রার্থনা করা হল। কবীর সাহেব ভাবলেন, এই অবুঝ আত্মারা এমনিতেই যদি মেনে নেয় ভালো {কারণ এই সকল জীবই তো কবীর সাহেবের সন্তান। এই কাল তো ধর্মের (মজহবের) নামে আমাদের উপর আবরণ চড়িয়ে রেখেছে ও একের সঙ্গে অপরের শত্রু বানিয়ে রেখেছে।} শেখতকীর কন্যার মৃতদেহ

কবরে দাফন করে রাখা হয়েছিল। শেখতকি বলল, আমার মেয়েকে যদি জীবিত করে দেন, তাহলে আমি এই কবীরকে, আল্লাহ বলে স্বীকার করে নেবো আর সর্বস্থানে ঢেরা পিটিয়ে (ঢোল বাজিয়ে) বলে দেবো যে, কবীরই আল্লাহ (ভগবান) আছেন। কবীর সাহেব বললেন, ঠিক আছে আর একটা নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করে দেওয়া হল। এবার কবীর সাহেব বললেন, সব জায়গায় খবর দিয়ে দাও, যাতে কারোর মনে কোনো শঙ্কা না রয়ে যায়। হাজার হাজার সংখ্যায় ভক্ত দর্শনের জন্য ওই স্থানে একত্রিত হয়ে গেল। কবীর সাহেব কবর খনন করতে বলল। সেই কবরে বারো-তেরো বছরের শেখতকী পীরের মেয়ের মৃতদেহ রাখা ছিল। কবীর সাহেব শেখতকীকে বললেন, প্রথমে আপনি এই মেয়েকে জীবিত করে দেন। উপস্থিত সকলে বলল যে, মহারাজ! এমন শক্তি যদি এই পীর সাহেবের কাছে থাকত, তাহলে নিজের সন্তানকে কে মরতে দিত? নিজের সন্তানের জীবনের জন্য যে কোনো ব্যক্তি তার তন, মন, ধন পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়। হে দীনদয়াল! আপনিই কৃপা করেন। পূজ্য কবীর পরমেশ্বর তিনবার বললেন, হে শেখতকীর মেয়ে জীবিত হয়ে যাও কিন্তু মেয়েটি জীবিত হল না। এই দেখে শেখতকী এমন করল যেন ভাং খেয়ে রেখেছে, নেচে কুদে বলতে লাগল যে, দেখে নাও সবাই, আজ এই ভণ্ডামির ভণ্ড ধরা পড়ে গিয়েছে। আসল কথা হল, কবীর সাহেব তাকে একটু নাচাতে চেয়েছিলেন, একে একটু নাচতে দেওয়া হোক।

কবীর, রাজ তজনা সহজ হৈ, সহজ ত্রিয়া কা নেহ। মান বড়াই ঈর্ষা, দুর্লভ তজনা য়ে।

মান-বড়াই ঈর্ষা রোগ খুবই ভয়ংকর হয়। নিজের কন্যা জীবিত না হওয়ার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু কবীর সাহেবের পরাজয়ের জন্য উল্লাস মানাচ্ছিলেন। কবীর সাহেব বললেন যে, বসে পড়ুন পীরসাহেব! শান্তি রাখুন। এইবার কবীর সাহেব হুকুম দিলেন, হে জীবাত্মা! যেখানে তুমি রয়েছো, এই কবীর আদেশে মৃতদেহে প্রবেশ করো ও বাইরে এসো। এই কথা বলতেই মৃত দেহে কম্পন হতে লাগলো আর তখনই ওই মেয়েটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে এসে, কবীর আল্লাহর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। (বলো সদগুরু দেবের জয়।)

ওই সময় ওই মেয়েটি কবীর পরমাত্মার কৃপায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে প্রবচন দিলেন এবং সকলের সামনে বললেন যে, হে সরল সোজা মানবগণ! আপনাদের সামনে স্বয়ং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ব্রহ্ম (পরমেশ্বর/কাদির আল্লাহ) এসেছেন। আপনারা কি এঁনাকে এক সাধারণ তাঁতি (ধানক/জুলাহা) হিসাবে বিবেচনা করছেন? হে দিশাহীন মানবগণ! আপনাদের সামনে স্বয়ং কাদির আল্লাহ (পরমেশ্বর) এসেছেন, এই প্রভুর চরণে পড়ে, দীর্ঘ কালের এই জন্ম-মৃত্যুর ব্যাধি দূর করো এবং সত্যলোকে চলো। যেখানে যাওয়ার পর জীবাত্মারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেঁচে যায়। কামালী একথাও বলল যে, মানবদের এই কালের জাল থেকে বন্দীছোড় কবীর সাহেব ছাড়া কেউ মুক্ত করতে পারবে না, তাতে হিন্দু পদ্ধতি দ্বারা তীর্থযাত্রা-উপবাস, গীতা-ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, বেদ পাঠ, রাম, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উপাসনা, শেরাওয়ালী (আদি মায়া, আদি ভবানী, প্রকৃতি দেবী) আর জ্যোতি নিরঞ্জন কালের উপাসনাও করো না, কেন, জীবাত্মা চুরাশি লক্ষ প্রাণীর শরীরের কষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না। এছাড়া মুসলমানদের বিধিতেও ভক্তি করলে এই জীবাত্মারা কালের ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারবে না। মুসলমানের ইবাদত যেমন - রোজা রাখা, ঈদ-বকরীদ উদযাপন, পাঁচ সময়ে নামাজ পড়া, মক্কা-মদিনায় যাওয়া ও মসজিদে বংগ (আজান) ইত্যাদি সবই বৃথা। কামালী উপস্থিত সকল জনতাকে সম্বোধন করে তার পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করে শোনালো, যেসব কথা কবীর সাহেবের কৃপায় মনে পড়ে গিয়েছিল। যা আপনারা পূর্বে পড়ে নিয়েছেন।

এরপর কবীর সাহেব কামালীকে বললেন, পুত্রী! তোমার পিতার সাথে যাও। মেয়েটি বলল, আপনিই তো আমার আসল পিতা । ইনি তো নকল পিতা। ইনি তো আমাকে মাটিতে দাফন করে দিয়েছিলেন। আমার ও তাঁর হিসাব বরাবর হয়ে গিয়েছে। উপস্থিত সকলে বলতে লাগল যে, কবীর পরমেশ্বর তো কামাল (চমৎকার) করে দিয়েছেন। তাই কবীর সাহেব মেয়েটির নাম কামালী রেখেছিলেন। এই মেয়েটিকে তিনি নিজের মেয়ের মতো রাখতে লাগলেন। উপস্থিত হাজার হাজার ব্যক্তিরা, পরমেশ্বর কবীর সাহেবের নিকট থেকে নাম উপদেশ গ্রহণ করলেন। এই দেখে শেখতকী ভাবতে লাগলেন যে, এখন তো ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে গেল। আমার তো সমস্ত প্রভুত্ব হারিয়ে গেল।

"কবীর সাহেবকে গরম সরিষার তেলের কড়াইতে ফেলা"

এখন শেখতকী দেখল, এবার তো কবীর সাহেবের মহিমা আরও বেড়ে গেল। সে আবার কোনো না কোনোভাবে সাহেবকে নিচু দেখানোর পরিকল্পনা করতে লাগল। এত লীলা দেখেও শেখতকীর নির্লজ্জের চোখ খুলল না। ভগবান তার সামনে ছিলেন, এর পরও অভিমানবশে সত্যকে স্বীকার করলেন না।

কয়েকদিন পর শেখতকী আবার মুসলমানদের একত্র করে বলল, এই কবীর হলেন একজন জাদুকর। আমরা এর আরেকটি পরীক্ষা নেব। হাজার হাজার মুসলমান সঙ্গে নিয়ে শেখতকী বাদশাহ সিকন্দরের কাছে

গিয়ে বলল, এই কবীরকে আমরা ফুটন্ত সরিষার তেলের কড়াইয়ে ফেলব। যদি তিনি না মরেন, তাহলে আমরা তাকে আল্লাহ বলে মেনে নেব। সিকন্দর লোধী ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন, এই শেখতকী পীর আমার শাসনকে উল্টে না দেয়। এইজন্য কবীর সাহেবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে মহারাজ! আপনার সেবা করার জন্য আমি আপনাকে এখানে এনেছিলাম কিন্তু আমি আপনাকে খুব দুঃখী করে দিয়েছি, দাতা! কবীর সাহেব বললেন, কি হয়েছে রাজন্? সিকন্দর লোধী বললেন, সাহেব! আপনি তো অন্তর্যামী আছেন, শেখতকী এই ধরনের এই-এই কথা বলছে। কবীর সাহেব বললেন, রাজন! কোনো সমস্যা নেই, শেখতকী তো আমাকে সমাপ্ত করেই দেবে, আজ না হলে কাল তো করবে। তার থেকে ভাল আজই বিবাদ সমাপ্ত হয়ে যাক। কবীর সাহেব বলেন, আপনি ওনাকে গিয়ে বলুন তেল গরম করতে। কবীর সাহেব ভাবতে লাগলেন, এই অবুঝ এমন সরলভাবে মেনে গেলে তো ভালো। সিকন্দর লোধী শেখতকীকে বললেন, তেল গরম করুন।

শেখতকী খুব মোটা মোটা কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে, সরষে তেলের কড়াই খুব করে গরম করে বললেন, এবার কবীরকে উঠিয়ে এনে এই গরম তেলে ফেলে দাও। কবীর সাহেব বললেন, শেখ সাহেব! এতো কষ্টই বা করবেন কেন? আমি স্বয়ং নিজেই গরম তেলে বসে যাব। পরম পূজ্য কবীর সাহেব সেই ফুটন্ত তেলের কড়াইতে প্রবেশ করলেন। বাইরে থেকে কেবল কবীর সাহেবের গলাটাই দেখা যাচ্ছিল। শরীরের বাকি অংশ সেই ফুটন্ত তেলের মধ্যেই ছিল, ঠান্ডা পানিতে বসার মতো তিনি আরাম করে বসে ছিলেন। শেখতকী বলল, ইনি যন্ত্র-মন্ত্র জানেন, এইজন্য তেলকে তিনি ঠান্ডা করে দিয়েছেন। উপর থেকে মনে হচ্ছে যে তেল ফুটছে। সিকন্দর লোধী ভাবলেন, সত্যি করে তেল ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তাই বাদশা সিকন্দর ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কবীর সাহেব বললেন, হে রাজন! এই তেলে আঙুল দিও না, নইলে এই পাগল কসাইয়ের চক্করে পড়ে হাতের আঙ্গুল নষ্ট করে ফেলবে। এই তেল এতো গরম যে, আঙুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিকন্দর ভাবলেন, কবীর সাহেব যখন তেলের উপর বসে রয়েছেন, তাহলে আমার আর কী হবে? নিষেধ করা সত্ত্বেও ওই ফুটন্ত তেলের পাত্রে আঙুল ঢুকিয়ে দেখতে গেলেন গরম কি না? আঙুলের যতটুকু অংশ তেলে ডুবিয়েছিলেন তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কবীর সাহেব ভাবলেন, এই অবুঝ বাদশা এই ঈর্ষান্বিত শেখতকীর চক্করে পড়ে মরবে। এইজন্য তিনি গরম তেলের কড়াই থেকে বেরিয়ে এসে সিকন্দরের জ্ঞান ফিরিয়ে দিলেন এবং এত যন্ত্রণা ছিল যে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তার সেই আঙুলকে ধরে পূর্ণ আঙ্গুল করে দিলেন। বাদশা সিকন্দরের জ্ঞান ফিরতেই তিনি সচেত হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, হে দাতা! আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমার দ্বারা অনেক ভুল হয়ে গিয়েছে। কবীর সাহেব বললেন, রাজন! আপনার কোনো দোষ নেই। কাল চায় না যে আমার সন্তানরা আমাকে চিনুক।

"শেখতকীর দ্বারা কবীর সাহেবকে গভীর কূপে ফেলা"

শেখতকী দেখলেন, এ তো এইভাবেও মরল না। সেইজন্য আবার মুসলমানদের জড়ো করে বললেন, এবার এই কবীরকে গভীর কুয়াঁর মধ্যে ফেলে, তার উপরে মাটি, ইট, পাথর চাপা দিয়ে দেবে। তারপর দেখব কিভাবে ইনি বাঁচেন? সরল সোজা জনতাদের তো যেমন পীর নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই রকম কাজ করতে প্রস্তুত ছিল।

শেখতকী সিকন্দর লোধীকে বলল যে, আমি তার আরও একটি পরীক্ষা নেব। সিকন্দর জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি পরীক্ষা নেবেন? শেখতকী বলল, কবীর সাহেবকে এই গভীর কুঁয়াতে ফেলবো, তারপর দেখবো সেখান থেকে কিভাবে জীবিত হয়?

{এত লীলা এখনও পর্যন্ত দেখার পরেও রাজা মালিক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস আনতে পারলেন না। অন্যথায় তিনি ধমক দিয়ে বলতে পারতেন যে, যা তোর যা ইচ্ছা হয় তা করে নে, আমি কিন্তু আমার আল্লাহকে (ভগবানকে) দুঃখী করতে পারবো না। তারপর দেখতে পারতো, তার রাজত্ব চলে যেতো, না কি সে রাজত্ব ভোগ করে আনন্দ পেতেন?} রাজা ভাবলেন, আমার রাজ্য চলে না যায়। বাদশা সিকন্দর পুনরায় কবীর সাহেবের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, শেখতকী আপনাকে বিশ্বাস করছেন না, তাই আজ তিনি এমন এমন জেদ করেছেন। পূজ্য কবীর সাহেব (কাদির আল্লাহ) বললেন, ঠিক আছে করতে দাও, সে যা করতে চায়, আমারও সমস্যা কেটে যাবে আর আমিও ওর কথা শুনে শুনে দুঃখী হয়ে গিয়েছি। ওকে বলে দাও যে, তার যা করার ইচ্ছা, সে তা করতে পারে।

এরপর শেখতকী কবীর সাহেবকে বেঁধে, তাঁকে নিয়ে এক গভীর কুয়ায় ফেলে দিলো। সেখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ওই কুয়াঁটি খুব গভীর ও অন্ধকারময় ছিল, তার মধ্যে সামান্য নোংরা জলও ছিল। কুয়াঁর উপর থেকে দেড় ফুট উচ্চতা পর্যন্ত মাটি, কাঁটা, লাঠি, গোবর, ইট ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করে দেওয়া হল। তারপর

শেখতকী হাত-মুখ ধুয়ে সিকন্দর লোধীর কাছে গিয়ে বলল, হে রাজন! তোমার সিংহকে সমাপ্ত করে এসেছি। তার উপরে এত এত কাদা মাটি দিয়ে এসেছি যে, সে কোনো ভাবেই ওই কুয়া থেকে বের হতে পারবে না। সিকন্দর লোধী জিজ্ঞাসা করলেন, পীর সাহেব! কার কথা বলছেন? শেখতকী বলল, তোর গুরুদেব কবীরের কথা। তাঁকে আজ আমরা সমাপ্ত করে দিয়ে এসেছি। সিকন্দর বললেন, পীর সাহেব! পূজ্য কবীর পরমেশ্বর তো ভিতরে ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন, তিনি তো কোথাও যাননি। শেখতকী ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখল যে, পূজ্য কবীর সাহেব ঘরের ভিতরে আসনে আরাম পূর্বক বসে রয়েছেন। শেখতকীর ঈর্ষা আরও অধিক বেড়ে গেল আর ভাবতে লাগল, এই কবীরকে মারলেও মরছে না, এখন কি উপায় করা যায়? অন্যান্য বিবেকবান ব্যক্তিরা তো কবীর আল্লাহর কথা মেনে নিয়েছেন এবং হাজার হাজার ব্যক্তিরা তাঁর থেকে নাম উপদেশ নিয়ে পরমাত্মা কবীর সাহেবের শিষ্য হয়ে গিয়েছেন কিন্তু এই দুষ্ট শেখতকী মানেনি।

"শেখতকী নহীঁ লখী, নিরঞ্জন চাল রে। ইস পরচে তৈ আগে মাঁগে জবাল রে॥"

শেখতকী বন্দিছোড় কবীর আল্লাহর মহিমা মোটেই বুঝতে পারেনি। তার উচিৎ ছিল কবীর ভগবানের পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের আত্ম কল্যাণ করা, কিন্তু আত্ম-অভিমানে ও অহংকার বশে প্রভাবিত হয়ে, আল্লাহর শত্রু হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া শেখতকী আরও অনেক অন্যায় করেছে। এরপরে কবীর সাহেব কাশীতে ফিরে গিয়েছিলেন।

"শেখতকীর গুণ্ডাদের দ্বারা কবীর সাহেবকে খুন করার নিষ্ফল কুচেষ্টা"

কবীর সাহেব কাশীতে আসার পর শেকতকী ভাবল, কবীর কোনোভাবেই মরছে না। তাই কবীর সাহেবকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক রাতে কিছু গুন্ডা নিয়ে শেখতকী তাঁর কুঁড়েঘরে গেল। কবীর সাহেব তখন ঘুমাচ্ছিলেন। শেখতকী গুণ্ডাদের বলল যে, তাঁকে টুকরো টুকরো করে এসো। গুন্ডারা তরবারি দিয়ে পূজ্য কবীর সাহেবকে টুকরো টুকরো করে দিলেন এবং গুণ্ডারা ও শেখতকী ভেবে নিল যে কবীর সাহেব মারা গিয়েছে, তাই তারা রওনা দিলো আর যখনই তারা কুঁড়েঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন কবীর সাহেব উঠে পিছন থেকে ডেকে বললেন, পীর সাহেব! দুধ তো পান করে যান, এই ভাবে কি কেউ যায় নাকি? শেখতকী আর তার গুণ্ডারা ভেবে নিল যে, এটা ভূত, তাই সবাই সেখান থেকে দ্রুত গতিতে পালিয়ে গেল। ওই গুণ্ডারা বাড়িতে পৌঁছতেই তাদের জ্বর এসে গেল, কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বর ঠিক হচ্ছিল না। পরে কবীর সাহেব তাদের কাছে গিয়ে, তাদেরকে সুস্থ করে দিলেন আর বললেন যে, এই পীর তোমাদের মেরেই ছাড়বে আর এঁ তোমাদেরকে ভ্রমিত করছে। তারপর গুণ্ডারা কবীর সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইল।

(সূক্ষ্মবেদে হজরত মুহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিচয়)

হজরত মুহম্মদের সম্পর্কে সন্ত গরীবদাস মহারাজের বিচার :-

{সন্ত গরীবদাস জী মহারাজ রচিত 'সদগ্রন্থ সাহেব' থেকে কিছু বাণী (মুহম্মদ বোধ) }

ঐসা জান মুহম্মদ পীরম্, জিন মারী গউ শব্দ কৈ তীরম্॥১॥
শব্দে ফের জিবাঈ, জিন গোসত নহীঁ ভাখ্যা হংসা রাখ্যা ঐসা পীর মুহম্মদ ভাঈ॥২॥
পীর মুহম্মদ নহীঁ বহিশত সিধানা, পীছে-ভুল্যা হৈ তুরকানা॥৩॥
গোসত খাঁহি নমাজ গুজারৈ, সো কহো ক্যুঁ কর বহিশ্ত সিধারৈঁ॥৪॥
এক হী গূদ, এক হী গোস্ত । সূর গউ কী একৈ জাতী, একৈ জীব সাহিব কুঁ ভেজ্যা, দোহুঁ মৈঁ একৈ রাতী॥৫॥
একৈ চাম এক হী চোলা, গূদ হাড কী কায়া। ভুল্যা কাজী কর্দ চলাবৈ, কদ রব্ব কুঁ ফুরমায়া॥৬॥
কাজী কৌন কতেব তুমহারী, না তুঁ কাজী না তুঁ মুল্লাঁ, ঝুঠা হৈ ব্যাপারী॥৭॥
কাজী সো জো কজা নবেড়ৈ, হক্ক হলাল পিছানে। ন্যায় করৈ দরহাল দুনি কা, নীর ক্ষীর কুঁ ছানৈঁ॥৮॥
মুল্লা সো জো মূল মিলাবৈ, দিল মহরম দিল বীচ দিখাবৈ॥৯॥
সো মুল্লা মসতাখী, সো তো মুল্লা বহিশ্ত সিধারে। ওর মুল্লাঁ সব খাখী॥১০॥
মুসলিম কহৈঁ হিন্দু কাফির, পূজে আন অনীত। উনকো কহো ক্যা কহিএ, জো পূজেঁ ঘোর মসীত॥১১॥
কলমা রোজা বংগ নমাজা, আপ অল্লাহ ফরমায়া। রোজে রহ কর মুরগী মারী, য়ৌহ ক্যা পন্থ চলায়া॥১২॥
হৈ রোজে সে রাহ নিরালা, কলমাঁ কাল গিরাসা। কূকৈ বংগী বুদ্ধি ভ্রিষ্ট হৈ, করো নমাজ অকাসা॥১৩॥

চল্লিশ বছর বয়সে যে সময় হজরত মুহম্মদ নবুবত প্রাপ্ত হয়েছিল, ওই সময় মূসার ইহুদি ধর্মে ও খ্রীষ্টান ধর্মে ত্রুটি উৎপন্ন হতে লাগল। মূর্তি পূজাও অধিক প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। হজরত মুহম্মদ মূর্তি পূজার খণ্ডন করেছিলেন। মানবদেরকে এক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদ আলাদা ভাবে অন্য

এক ভক্তির মার্গ বললেন এবং সেই ভক্তি মার্গকে যারা মানতেন তাদেরকে মুসলমান বলতে লাগল। তারপর থেকে তা ধর্মের রূপ ধারণ করে নিল।

মুসলমানের অর্থ হল আজ্ঞাকারী অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যারা কাউকে দুঃখ দেয় না। তামাক, মদ ও মাংস খাওয়া ও পান করা তো দূরের কথা, তারা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না ও সুদও নেন না। সতমার্গ দর্শন করেন এবং প্রতিটি মানুষকে এক পরমাত্মার উপর আধারিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। এইজন্য তিনি আলাদা ভাবে প্রচার শুরু করেছিলেন। হজরত মুহম্মদ ছিলেন শিবের অবতার। তিনি শিবের ধাম থেকে আসা শক্তিযুক্ত সংস্কারী পাক আত্মা নবী ছিলেন। তাঁর শব্দে শক্তি ছিল। যারা তাঁর বিচার শুনতেন, তারা তার অনুগামী হয়ে যেতেন।

হজরত মুহম্মদ সাহেব সকলকে বলতেন যে, যারা কাউকে মারে-কাটে ও দুঃখী করে, তারা মুসলমান নয়। যারা তামাক ও মাংস খায়, মদ পান করে, তারা দুষ্ট আত্মা। যারা এই আদেশ পালন করেন, তাদেরকে মুসলমান বলা হয়। চার কিতাবে (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে) জ্যোতি নিরঞ্জনের অর্থাৎ কাল ব্রহ্মের পক্ষ থেকে, তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং নবী মুহম্মদ কুরাআনকে ধার্মিকতার আধারে নিজের অনুগামীদের দিয়েছিলেন।

একদিন পূর্ণ পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) সঙ্গে হজরত মুহম্মদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। পূর্ণ পরমাত্মা তাঁকে স্বসম (সূক্ষ্ম) বেদ (পঞ্চম বেদ) দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, পূর্ণব্রহ্ম হলেন কবীর, সেই কবীর আল্লাহ স্বয়ং আমিই। যে ইবাদত আপনি করছেন ও সকলকে করাচ্ছেন, তা কাল আল্লাহ পর্যন্ত ইবাদত আছে। যার কারণে সকলকে এই জন্ম-মৃত্যুতে থাকতে হচ্ছে। আপনি ও সকল জীব আমারই আত্মা। আমি আপনাদের সকলের পিতা, কূলের মালিক। আমার জ্ঞান সকলকে বলুন! আমিই কবীর আল্লাহ। আপনি আপনার অনুগামীদের এই স্বসম (সূক্ষ্ম) বেদের জ্ঞান বলুন এবং কালের ফাঁদ (জাল) থেকে মুক্ত করুন। তাহলে আপনার অনেক পুণ্য হবে। এই কথা বলেই পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেব অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন। ওই সময় মুহম্মদ সাহেব কুরআন কিতাবের রঙে নিজের অনুগামীদের রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, নিরাকার আল্লাহই হলেন পরম শক্তি, যিনি কুরআনের জ্ঞান বলেছেন। এঁর উপরে কোনো ঈশ্বর নেই। তিনিই এক আল্লাহ এবং কূলের মালিক। মুহম্মদ সাহেব পঞ্চম কুরআন অর্থাৎ পঞ্চম স্বসম বেদও পড়েছিলেন কিন্তু ওই সময় তিনি কিভাবে বলবেন যে, আমাদের নিকট পূর্বের দেওয়া জ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) পূর্ণ নয়। এই লজ্জার কারণে কোনো মুসলমানকে সূক্ষ্ম বেদের জ্ঞান বলেননি।

যখন স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা তাঁর সাথে পুনরায় এসে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে মুহম্মদ! আপনি একজন খুবই ভাল আত্মা। তবে যে ভক্তি আপনি ভক্ত সমাজকে দিয়েছেন তা পূর্ণ ভক্তি নয়। এক পঞ্চম কুরআন অর্থাৎ কতেব (সূক্ষ্ম বেদ) আপনাকে আমি দিয়েছিলাম, তার উপর ভিত্তি করে আপনি কি বিচার করলেন? মুহম্মদ সাহেব বললেন, আমি আপনার উপর কিভাবে বিশ্বাস করবো যে, আপনিই আল্লাহ আছেন এবং ওই অব্যক্ত (বেচুন/ নিরাকার আল্লাহর) থেকেও আপনি বড়? চোখে দেখবো তারপরে বিশ্বাস করবো। পূর্ণ পরমাত্মা বললেন, বিশ্বাস তো আমি করাতে পারি, যদি আপনি আমার বিচার শোনেন ও আমাকে সহযোগ দেন। মুহম্মদ সাহেব বললেন, আমি সহযোগ দিতে প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) মুহম্মদকে বললেন, আপনি আমার সাথে সত্যলোকে চলুন। পূর্ণ পরমেশ্বর (আল্লাহ কবীর) মুহম্মদ সাহেবের আত্মাকে সত্যলোকে নিয়ে গেলেন, যেখানে যাওয়ার পর এই জীবাত্মাদের পুনরায় জন্ম নিতে হয় না, তাকেই সতলোক বলা হয়। মুহম্মদ সাহেব এটা জানতে পারলেন যে, এখানে আসার পর জীবাত্মাদের আর জন্ম হয় না। তথাপি তাঁর পুরাতন জ্ঞানের আধারে পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামী হয়ে যাওয়ার কারণে, তার প্রভুত্ব এবং তার মহিমা অধিক হয়ে গিয়েছিল। এই নিজের মহিমার কারণেই তিনি কাদির আল্লাহর সতলোকে থাকলেন না অর্থাৎ তিনি পূর্ণ আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেননি। সেখানে থাকতে রাজি হননি এবং পৃথিবীতে পরে ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহ কবীর তাঁকে পাঁচটি কলেমা জপ করতে বলেছিলেন। তার মধ্যে থেকে কেবল একটাই কলেমা অনুগামীদেরকে বলেছিলেন তা হল, "আল্লাহু আকবর" আর অন্যগুলো বলেননি, যা কুরআনে সাংকেতিক (Code Words) শব্দে লেখা আছে।

গরীবদাস জী মহারাজের বাণীর আধারের উপর :-

হম মুহম্মদ কো বহাঁ (সতলোক) লে গয়ো, ইচ্ছা রূপী বহাঁ নহীঁ রহো।
উল্ট মুহম্মদ মহল (শরীর মে) পঠায়া, গুঝ বীরজ এক কলমা লায়া।
রোজা বংগ নিমাজ দঙ্গ রে, বিসমল কী নহীঁ বাত কহী রে॥
মুহম্মদ নে নহীঁ ঈদ মনাঈ, গউ ন বিসমল কিতী।
এক বার কহা মোমিন মুহম্মদ, তাপর ঐসী বীতী।

পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের কৃপায় মুহম্মদ কিছু সিদ্ধি শক্তিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন নবী মুহম্মদের সামনে হঠাৎ একটি ছাগল মারা যায়। হজরত মুহম্মদ সহানুভূতি দেখালেন ও কলেমা পড়ে যখনই নিজের হাত ওই মৃত ছাগলের শরীরে স্পর্শ করলেন, তৎক্ষণাৎ সেই ছাগলটি জীবিত হয়ে গেল। নবী মুহম্মদ তখন বিস্মিত হয়ে গেলেন ও বুঝে গেলেন যে, ওই আল্লাহর কৃপাতে তিনি শক্তিযুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

একদিন তাঁর কিছু অনুগামী হজরত মুহম্মদের কাছে বসেছিল এবং তার ভেড়া ও ছাগল মাঠে চরছিল। এক বলিষ্ঠ ছাগল অন্য একটি দুর্বল ছাগলকে মারছিল। ওই সময় নবী মুহম্মদ নিজের মুখ থেকে ওই কলেমা (মন্ত্র) পাঠ করলেন, যার কারণে ওই বলিষ্ঠ ছাগলটি মারা গেল। সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমানেরা দেখল যে, নবী মুহম্মদ নিজের শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা বলিষ্ঠ ছাগলটিকে মেরে দিয়েছেন। তারপরে যে গরীব ব্যক্তির ওই বলিষ্ঠ ছাগল ছিল সে কাঁদতে লাগল যে, এই নির্ধনের কাছে কেবলমাত্র দুটিই ছাগল ছিল আর যার মধ্যে এই একটিই পুরুষ ছাগল ছিল। তখন হজরত মুহম্মদ বললেন যে, হে খুদার বান্দা মুসলমান কেঁদো না, এখনই আমি তোমার ছাগলকে জীবিত করে দিচ্ছি। মহম্মদ সাহেব উঠে ছাগলের কাছে গিয়ে কলেমা পড়লেন এবং সেই মৃত ছাগলের শরীর হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই তৎক্ষণাৎ সেই মৃত ছাগল জীবিত হয়ে গেল।

সমস্ত মুসলমান ওই দিনটিকে ও ওই সময়কে নোট করে রাখলেন এবং সমগ্র মুসলিম সমাজের মধ্যে হজরত মুহম্মদের মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, এটা তো মিথ্যা। মৃত প্রাণী কি কখনো জীবিত হয় নাকি? এই বিষয়টির কথা যখন মুহম্মদ জানতে পারলেন, তখন নবী মুহম্মদ বললেন, এবার আমি শব্দ (বচন) দ্বারা গরুকে মেরে জীবিত করে দেব। যদি কারোর অবিশ্বাস হয়, তাহলে তারা যেন দেখে নেয়। এই ঘটনা দেখানোর জন্য একটি দিন নির্ধারিতও করা হল। বিপুল পরিমাণ দর্শক একত্রিত হয়ে গেল। হজরত মুহম্মদ একটি গাই গরুকে শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা মেরে দিলেন। {এক পুস্তকে লেখা আছে, যে সকল বিরোধীরা বিশ্বাস করেনি, তারা বলেছিল যে, আমরা গরুটিকে মারবো, যদি জীবিত করে, তবেই তো মানবো। বাণীঃ- "চার চার মিল মসলিত ভীনী। গউ পকড় কর বিসমিল কীন্হী" অর্থাৎ কিছু ব্যক্তিরা সভা করে নির্ণয় নিয়ে গরুটিকে হত্যা করে দেন এবং বলল যে, নবী জী এই গরুটিকে জীবিত করুন।} সর্ব উপস্থিত দর্শকরা দেখল যে, গরুটি সত্যিই মারা গিয়েছে। তখন নবী মুহম্মদ গরুটিকে জীবিত করার জন্য কলেমা পড়লেন এবং হাত দিয়ে স্পর্শও করলেন কিন্তু গরুটি জীবিত হল না। তারপর তিনি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য নিরাকার আল্লাহ ও জিব্রাইল, অন্যান্য ফেরেশতাদের নিকট প্রার্থনা করলেন কিন্তু তারপরেও গরুটি জীবিত হয়নি।

অন্তিম সময় পূর্ণ পরমেশ্বর কবীরের নিকট (হে আল্লাহ-আল্লাহু কবীর) এই বলে কখনো উপরে মুখ করে, কখনও মাটিতে মাথা রেখে বার বার প্রার্থনা করতে লাগলেন, তারপরে ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে হৃদয় দিয়ে ডেকে বললেন যে, হে মালিক আল্লাহ কবীর (এই কবীর আল্লাকেই আল্লাহু অকবরু বলা হয়)! আমার সম্মান রক্ষা করুন। ওই সময় পূর্ণ পরমেশ্বর গুপ্ত রূপে (শব্দ রূপে) এসে, মুহম্মদ সাহেবকে একা দর্শন দিয়েছিলেন কিন্তু অন্য কেউ তাঁকে দেখতে পাননি। কবীর আল্লাহই নিজের শক্তি দ্বারা ওই গরুটিকে জীবিত করে দিয়েছিলেন, এরপরে সেই মৃত গরুটি জীবিত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা ভেবে নিয়েছিলেন যে, গরুকে মুহম্মদ সাহেবই মনে হয় জীবিত করে দিয়েছিলেন কিন্তু যদিও বা মুহম্মদ সাহেব জেনে গিয়েছিলেন যে, এমন কর্ম তাঁর দ্বারা করা সম্ভব ছিল না কিন্তু তিনি এই গোপন রহস্যের কথা কাউকে কোনোদিনই বলেননি, এছাড়া তিনি নিজেই অধিক প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। হজরতের মৃত গরুকে জীবিত করেই পূর্ণ পরমেশ্বর (হক্কা কবীর) অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর মুহম্মদ সাহেব, অনেকবার পূর্ণ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে পরমাত্মা আরেকবার আমাকে পুনরায় দর্শন দিন কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মা তাঁকে আর কোনোদিন দর্শন দেননি। কারণ তিনি প্রভুর (কবীর আল্লাহ) আদেশ অমান্য করেছিলেন এবং তাঁর নিকট একথাও কখনো স্বীকার করেননি যে, তিনি ভক্ত সমাজের কাছে তাঁর (কবীর আল্লাহর) নাজিল (প্রদান) করা, পঞ্চম কুরআনের (স্বসম/সূক্ষ্ম বেদের) প্রচার, তিনি তাঁর অনুগামীদের (বান্দাদের) অবশ্যই বলবেন। নবী মুহম্মদ এই দুর্লভ জ্ঞান নিজের কাছেই গোপন রেখে দিয়েছিলেন।

এমনই হজরত মুহম্মদের জীবন পরিচয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁর বাড়ির (মসজিদে) ভিতরেই অনেকদিন যাবৎ আবদ্ধ হয়েছিলেন। নামাজের জন্যও তিনি বাইরেও আসতেন না। যখন অনুগামীরা নবী মুহম্মদকে ডাকতেন, তখন মুহম্মদ সাহেব বলতেন, তোমরা নামাজ করো। আমি তোমাদের উপর পঞ্চম কলাম (কাদির আল্লাহর নাজিল করা পঞ্চম কুরআনের জ্ঞান) চাপিয়ে দিতে চাই না, এটিকে আমি আমার নিজের কাছেই রাখবো। আমাকে আল্লাহর আদেশ হয়েছে। আরো অন্য একটি পঞ্চম কিতাব (সূক্ষ্ম জ্ঞানের পঞ্চম কুরআন) পেয়েছি কিন্তু এটি তোমাদের দেবো না। এই জ্ঞান আমি তোমাদেরকে দিয়ে, তোমাদের উপর বোঝা রূপে চাপাতে চাই না। এ কথা বলে সূক্ষ্ম বেদের জ্ঞান তিনি কখনও তাঁর অনুগামীদের বলেননি।

এরপরে মুহম্মদ সাহেব শরীর ত্যাগ দেওয়ার পরে, তার অনুগামীরা বকরী জীবিত করার ওই দিনটিকে হজরত মুহম্মদের সমর্থতার প্রতীক হিসেবে, উদযাপন করতে শুরু করে দিলেন আর যেদিন মুহম্মদ সাহেব, শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা গরুকে মেরে জীবিত করে দিয়েছিলেন এবং যেদিন তিনি শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা গরুকে মেরেছিলেন, যে গাভীটি পূর্ণ পরমাত্মা (সত কবীর/ আল্লাহু কবীর) স্বয়ং এসে জীবিত করে দিয়েছিলেন কিন্তু হজরত মুহম্মদের অনুগামীরা ভেবে নিয়েছিলেন যে, এই গরুটিকে হজরত মুহম্মদ সাহেবই জীবিত করে দিয়েছিলেন। ওই বকরি ও গাভীকে জীবিত করার তিথির দিনটিকে, মুসলমানেরা মনে রেখেছিলেন এবং সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য, এই প্রকার গরু ও ছাগলকে হত্যা (বিসমিল) করার এক প্রথা চালু করে দিয়েছিলেন। হত্যা (বিসমিল) তো তারা করেন কিন্তু ওই প্রাণীদের কেউ জীবিত করতে পারেন না।

গরীবদাসের বাণী থেকে উদ্ধৃত :-

ঐসা জান মুহম্মদ পীরম, জিন মারী গউ শব্দ কে তীরম।
শব্দে ফের জীবাঈ, জিন গোসত নহীঁ ভাখ্যা। হংসা রাখ্যা, ঐসা পীর মুহম্মদ ভাঈ।

মুসলমানরা মেনে নিয়েছিলেন যে, মুহম্মদ সাহেব গরুকে শব্দ শক্তি দ্বারা মেরে পড়ে জীবিত করে দিয়েছিলেন। এইজন্য বোঝালেন যে, মুসলমানদের পীর মুহম্মদ তো এরকম মহান ছিলেন। তিনি তো গরুকে তো শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা মেরে জীবিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যদি মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি জীবিতই করতেন না কিন্তু হজরত মুহম্মদ (হংসাত্মা) গাই গরুর জীবন রক্ষা করে, তাকে জীবন দান দিয়েছিলেন। তিনি মাংস খাননি। হে ভাই মুসলমান! হজরত মুহম্মদ এমনই মহান পীর ছিলেন। যখন আপনারা কাউকে জীবন দান দিতে পারেন না, তাহলে তাদের জীবনও কেড়ে নেওয়ার কারোর অধিকার নেই। এটি মহাপাপ কিন্তু উপরোক্ত পরম্পরা চলতে লাগলো। ওই সময় সমস্ত নগরে এই শুভ দিনটি উদযাপনের জন্য এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নির্দিষ্ট দিনে ছাগল ও গরু কাটতে লাগলো। পরে ছাগল ও গরুর কাটা লাশগুলো, শহর থেকে দূরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হতো আর সেই মৃতশরীর শকুন বা অন্যান্য জঙ্গলের মাংসাশী পশু খেয়ে নিতো। ওই সময় মুসলমানরা সেই মাংস খেতেন না। এই ভাবেই পরম্পরা কয়েক বছর পর্যন্ত চলতে লাগলো। যেমন আজকাল সর্বত্র স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়ে রয়েছে আর সেখানে মোল্লারা থাকেন ও তারা ধার্মিক শিক্ষা দেন। এই প্রকার ওই সময় বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। যেখানে এই কাজী ও মোল্লা ধার্মিক জ্ঞান দেওয়া ব্যক্তিরা থাকতেন। তাদেরকে সাময়িক আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে এই আনন্দ উৎসব মানাও আর নিজেদের অনুযায়ীদের বিধিবত সাধনা করতে বলুন। একসময় অকাল দুর্ভিক্ষ পড়েছিল, দুর্ভিক্ষের কারণে ক্ষুধায় সমস্ত লোক মারা যাচ্ছিল।

কলেমা পড়ে গরুকে হালাল করা হতো অর্থাৎ গলা কাটা হতো আর পরে সেই মাংস জঙ্গলে এইজন্য ফেলে দিয়ে আসতেন যে, বনের পশু-পাখিরা তা খেয়ে নেবে কিন্তু আমরা মুসলমানরা খাবো না। কেননা যারা মাংস খেতেন, তাদেরকে পাপী প্রাণী বলে গণ্য করা হতো এবং তাদেরকে খুব কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। মুসলমান ধর্মে মদ, মাংস, তামাক এগুলির সেবন কখনো ছিল না। ওই সময় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ক্ষুধার জ্বালায় বিশ্বের লোক মারা যাচ্ছিল। ওই সময় প্রত্যেক গ্রামে ওই উৎসব পালিত হচ্ছিল আর গরু হালাল করে জঙ্গলে ফেলে দেয়। কিছু মুসলমান ক্ষুধার কারণে সেই মরা গরুর মাংস খেয়ে নিয়েছিল। সেই দৃশ্য অন্য কেউ দেখে নেয় এবং সেই মাংস ভক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ (নালিশ) করা হল। গ্রামে তখন হৈ চৈ পড়ে গেল যে, এমন কাণ্ড হয়ে গিয়েছে যে, কিছু মুসলমান মাংস খেয়ে নিয়েছে। কেউ বলছেন অবাক কান্ড, কেউ বলছেন ধিক্কার, কেউ বললেন এদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক, কেউ বললেন গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হোক এবং কেউ বললেন হত্যা করে দেওয়া হোক ইত্যাদি। সব লোক একত্রিত হয়ে অপরাধীদের ধরে মোল্লা ও কাজীদের কাছে নিয়ে গেল। অনাহারের কারণে এই ধরনের ঘটনা প্রতিটি শহরে এবং গ্রামে ঘটতে লাগল। তাদের বিচারের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দেওয়া হল। যাতে আরও অন্যান্য শহরের প্রধান যে মোল্লা (কাজী, পীর) তাদের কাছ থেকে এর সমাধানের জন্য পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

{তৌরাত কিতাবে লেখা আছে যে, ওই সব লোক (যাদের মধ্যে হজরত মূসা ও তাঁর অনুগামীদের পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন, কেননা ওই সমুদায় থেকে মূসার অনুগামী হয়েছিল} গাই গরুকে বিশেষ সম্মান করতেন। গাইয়ের বাছুর ও বলদ গরুর মাংস খেতেন না, তার পূজা করতেন। হজরত মুহম্মদের সময় প্রতিটি গ্রামে ইহুদির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। (প্রমাণ :- কুরআন সূরাঃ আল বাকারা- ২ আয়ত নং ৬৭-৭১)

দ্রষ্টব্য :- অনুবাদকর্তারা এই আয়তগুলিতে মন্তব্য করেছেন যে, ইস্রাইলের (ইজরায়েল) বংশধরগণকে, মিশরের নিবাসীরা ও নিজের প্রতিবেশী জাতিগণদের দ্বারা গাই গরুর মহানতা, পবিত্রতা এবং গরুর পূজা করার রোগ লেগে যায়। সেই কারণে তারা মিশর থেকে বের হতেই বাছুরকে পূজ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। এইজন্য যখন মূসার মধ্যে প্রবেশ

হওয়া কালের দূত, নিজের অনুগামীদের অর্থাৎ মূসার ভক্তদের (কেননা সকলে দেখতেন যে, মূসা বলছেন কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশ করা ফেরেশতা বলতেন) এই ফেরেশতাই পরে মূসার শরীরে প্রবেশ করে গরু কুরবানি করতে বলতেন আর বলতেন যে এটি আল্লাহর আদেশ আছে। তখন তারা বললেন যে, মূসা কেন ঠাট্টা করছেন? আল্লাহ গাই গরুকে হত্যা করার কথা বলতে পারেন না।}

ওই সময় যেসব প্রধান প্রধান মুল্লা ও কাজীরা ছিলেন, তাদের কাছে চারদিক থেকে অভিযোগ আসতে লাগলো। এই প্রকার হাজার হাজার সংখ্যায় মানুষ মাংস খাওয়ার কারণে দোষী সাব্যস্ত হতে লাগলো। এই দেখে ওই সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এই সকলকে আর শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত হবে না। (পূর্বে মাংস ভোজনকারীর শাস্তির বিধান ছিল মৃত্যুদণ্ড)। পরে পরামর্শ করে বলে দেওয়া হল যে, যাও আর সবাইকে আদেশ শোনাও যে, যারা ওই গরুর মাংস খেয়েছিল, সেগুলো কলেমা পড়ার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গিয়েছে। এইজন্য ওই মাংস খাওয়াতে তারা দোষী হয়নি। কেননা ওটা প্রসাদ হয়ে গিয়েছে, তাই ওদেরকে ক্ষমা করা হোক এবং এদেরকে শাস্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত হবে না। যদি তেমন কেউ কোনো প্রাণীকে স্বয়ং হত্যা করে মাংস খায়, তাহলে সে দোষী হবে। যে গরু বিসমিল করা হয়েছিল, ওটির উপর কলেমা পড়া হয়েছিল, যার কারণে ওই মাংস পবিত্র হয়ে প্রসাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য ওটা খাওয়াতে কোনো পাপ হয়নি। ওই সময় সেখানে এই বিষয়ে রক্ষা করা খুবই আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে তখনকার মহাপুরুষরা (মুসলমানদের প্রমুখরা) ভেবেছিলেন তো ভালোই কিন্তু পরবর্তীতে তা এখন মন্দের কারণ হয়ে গিয়েছে। এরপরে এই কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, যদি কেউ গরু বা ছাগলের মাংস হালাল (বিসমিল) করে খায়, তাহলে তা প্রসাদ রূপে খাওয়া হবে এবং তারজন্য কোনো পাপ লাগবে না। এখন এই পাপ কর্মই, ধর্মের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। এমনকি এই পাপ কর্মকে মৌলবী লোকেরাও মানা করতে পারেননি। এইপ্রকার দুর্ভিক্ষের সময়ই ওই ছাগল হালাল করার দিনও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যে দিনটিকে বর্তমানের বকরি ঈদ নামে মানা হয়। ওই সময়ও এই ঘটনা হয়েছিল এবং সে সময়ও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দোষীদের দোষমুক্ত করা হয়েছিল।

বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এমন পবিত্র ধর্মে এই ভয়ানক অশুভ কার্য শুরু হয়ে গেল। {হজরত মুহম্মদ ও তাঁর এক লাখ আশি হাজার অনুগামীরা কখনও মাংস-মদ, তামাক সেবন করেননি বা এমন করার আদেশও কাউকে কখনও দেওয়া হয়নি।} এখন এর অন্ত (সমাপ্ত) করতে হলে বিশেষ বিবেক অর্থাৎ বিশেষ বিচার বিবেচনার মাধ্যমে এর অবসান করা সম্ভব হতে পারে। মদের বিষয়ে তো আজও মুসলমানরা বলেন যে, যদি এক ফোঁটা মদ শরীরের কোনো অংশে পরে যায়, তাহলে মদ পরা শরীরের ওই মাংসটুকুও কেটে ফেলে দাও, এতই অপবিত্র বস্তু। এইভাবে এই তিনটি খারাপ বস্তু (মাংস, মদ, তামাক) এতটাই খারাপ বলা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে তামাকের ব্যবহারও খুব জোর কদমে শুরু হয়েছে এবং মুসলমান সমাজ মাংসও আজকাল প্রসাদ রূপে ভক্ষণ করছেন। কিন্তু মদ থেকে এখনও বিরত রয়েছেন অর্থাৎ বর্তমানের মুসলমানরা মদ প্রয়োগ করেন না।

কুরবানির বাস্তবিক পরিভাষা (সংজ্ঞা)

এটি একটি বিশেষ প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে যে, প্রভুর উদ্দেশ্যেই ছাগল ও গরুর কুরবানি দেওয়া হয়। (এখন এখানে মানুষের বিচার করা উচিৎ যে, কুরবানি নিজেকে দেওয়া উচিত, প্রভুর নামে ছাগল-গরু বা মুরগীদের নয়। প্রকৃতপক্ষে কুরবানি হল, প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করা এবং সত্যিকারের ভক্তি করা। মাথা কেটে দিয়ে এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে সাধনা করে কখনও মুক্তিলাভ হয় না। এসব তো হল কালের গোলক-ধাঁধা। গলা কেটে কুরবানি হয় না, প্রভুর উদ্দেশ্য হৃদয় দিয়ে সমর্পণ হয়ে যাবে যে, হে আল্লাহ! তন, মন, ধন, এই দাস ও দাসীও তোমার এইপ্রকার কুরবানি কাদির আল্লাহ (পরমেশ্বর) পছন্দ করেন। হিংসা, হত্যা খুদা কখনই পছন্দ করেন না।}

সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান কে বলেছেন?

'কলাম-এ-কবীর' (সূক্ষ্ম বেদে)- এতে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান না তো চার বেদে (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদে) আছে, না শ্রীমদভগবত গীতাতে, না পুরাণে, না উপনিষদে, না শ্রীমদভগবতে (সুধাসাগরে) আর না চার পুস্তকের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন মজিদে) মধ্যে আছে। এই চার পুস্তক একত্রে আবদ্ধ করে, বাইবেল নাম দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ জ্ঞান বাইবেলেও নেই। প্রমাণের জন্য প্রথমে পড়ুন:-

অল-খিজ্রের (অল কবীরের) বিষয়ে বিশেষ তথ্য

Quaran Sharif Sura-Kafh 18:60-82 (কুরআন শরীফ সূরা-কাহ্ফ ১৮ আয়ত ৬০-৮২)- তে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ মূসাকে তার থেকে অধিক ইলম (তত্ত্বজ্ঞান) জানা এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। (এই বিষয়টি হাদিসের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই কাহিনীটি ৫৫ হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।)

একদিন হজরত মূসা সৎসঙ্গ শোনাচ্ছিলেন, তাদের মধ্য হতে এক সৎসঙ্গী (ভক্ত) জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে মূসা জী! বর্তমানে এই পৃথিবীতে সব থেকে অধিক জ্ঞান (ইলম) জানা ব্যক্তি কে আছেন?

হজরত মূসা গর্বের সাথে উত্তর দিলেন যে, "আমি"।

মূসার এই কথা আল্লাহর মোটেই পছন্দ হয়নি। তাই তিনি মূসাকে বললেন, হে মূসা! তোমার এই কথা শুনে, আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। তুমি নিজেকে সব থেকে বড় জ্ঞানী (শ্রেষ্ঠ ইলমওয়ালা) কিভাবে মনে করলে?

হাঁটু গেড়ে বসে মূসা বললেন, আমি আপনার পাঠানো রসূল আর আপনার নিকট হতেই আমি সমস্ত ইলম (জ্ঞান) প্রাপ্ত করেছি। এইজন্য আমি এই কথা বলেছিলাম যে, আজ এই পৃথিবীতে আমার থেকে অধিক ইলম (জ্ঞান) কারোর কাছে নেই।

আল্লাহ্ বললেন, মূসা! তোমার থেকে অধিক ইলম (জ্ঞান) রাখা ব্যক্তি পৃথিবীতে উপস্থিত রয়েছে এবং তোমার জ্ঞান তো তাঁর জ্ঞানের সামনে কিছুই নয়।

মূসা বললেন, হে আল্লাহ! আমি ওই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, যাতে আমি ওই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারি, যে জ্ঞান আমার কাছে নেই এবং ওই জ্ঞানী ব্যক্তি কোথায় থাকেন এবং তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে? কৃপা করে আমাকে বলুন।

আল্লাহ্ বললেন যে, তিনি "মজমা-এ-বাহরেন" - তে থাকেন অর্থাৎ যেখানে মিষ্টি জল ও নোনা জলের দুটি নদী একত্রে মিলিত হয়েছে।

মূসা বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাঁকে চিনব কিভাবে?

আল্লাহ্ বললেন, তুমি নিজের সাথে একটি পাত্রতে একটা মৃত মাছ নিয়ে যাবে। যেখানে ওই মৃত মাছ জীবিত হয়ে পানিতে সাঁতার দিতে লাগবে, তখন বুঝবে যে, তিনি তোমার নিকটবর্তীই রয়েছেন।

(হাদিস প্রমাণ করে যে, এ ব্যক্তি যিনি মূসার থেকেও অধিক জ্ঞানী (ইলমি//Intelligent) আছেন এবং যার বিষয়ে আল্লাহ্ মূসাকে 'কুরআন শরীফ সূরা কাহ্ফ ১৮ আয়ত নং ৬০-৮২'-তে সাক্ষাৎ করার জন্য বলেছিলেন। তাঁর নাম হল অল-খিজ্র এবং সমস্ত মুসলমান সমাজ এই বিষয়ে একমত আছেন।)

মূসা তার শার্গীদকে (সেবক) সাথে নিয়ে অল-খিজ্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাকে বছরের পর বছরও যদি পায়ে হেঁটে চলতে হয়, তবুও আমি অল-খিজ্রের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেই বিশ্রাম নেবো।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মূসা ও তাঁর সেবক 'মজমা-এ-বাহরেন' নামক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন। মূসা দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি দূর করার জন্য, মাথার নিচে একটা পাথর রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এর মধ্যে সেবকটি দেখলেন, যে মৃত মাছটি পাত্রে নিয়ে সে যাত্রা করেছিলেন, সেই মাছটি ছটফট করতে করতে জীবিত হয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

সেবক মূসাকে সেই মাছের জীবিত হওয়ার বিষয়টি বলতে ভুলে যান। এরপরে মূসা অল-খিজ্রের সন্ধানে যাত্রা করতে করতে এগিয়ে গেলেন।

সারা দিন ও রাত চলার পর, পরের দিন সকালে মূসা সেবককে বললেন, যাত্রা করতে করতে আমি একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছি, তাই আমাকে কিছু খেতে দাও। তখন সেবকের মনে পরে গেল, যে মাছটি আমরা আমাদের সাথে নিয়ে এসেছিলাম, সেই মাছটি গতকাল যে স্থানে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, ওই স্থানে জীবিত হয়ে জলে লাফিয়ে পড়েছিল আর শয়তানের প্রভাবে আমি গতকাল আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। একথা শুনে মূসা বলল, ওটাই তো ওই স্থান ছিল, যে স্থানের সন্ধানে আমরা এসেছি এবং যেখানে আমাদের অপেক্ষা করার ছিল। এরপর মূসা ও তাঁর শিষ্য, নিজেদের পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে সেই স্থানে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে সাদা রঙের চাদর গায়ে দেওয়া এক সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন।

মূসা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে আপনার নিকট হতে জ্ঞান শেখার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনি আমাকে ওই পবিত্র ইলম কৃপা করে শিখিয়ে দেন, যা আপনার কাছে রয়েছে।

উত্তরে অল-খিজ্র বললেন, মূসা! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবেন না, কেননা যে বস্তুর সত্যের জ্ঞান আপনার নেই , তার উপর আপনি ধৈর্য ধরবেন বা কি করে?

মূসা বললেন, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন এবং আমি আপনার কোনো কথা অমান্য করব না।

অল-খিজ্র বললেন, ঠিক আছে! যখন আপনি আমার সাথে চলতেই চান, তাহলে মনে রাখবেন যে, আপনি কোনো কিছুর বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি স্বয়ং নিজে সেই বিষয়ে বলবো।

এই স্থান থেকে মূসা নিজের সেবককে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি অল-খিজ্রের সাথে নিজের যাত্রা শুরু করলেন।

পথে কিছু মস্কিন ব্যক্তিদের এক নৌকা দেখতে পেলেন। তারা পরিশ্রম করেন ও ভাড়া নিয়ে লোকদের নদী পার করতেন। অল-খিজ্র ও মূসা সেই নৌকায় উঠলেন। যাত্রার সময় অল-খিজ্র সেই নৌকার এক তক্তা ভেঙ্গে দিলেন আর নৌকায় পানি ভরতে লাগল। লোকজন জল বাইরে ফেলতে লাগল এবং যেমন তেমন ভাবে নৌকা ডোবার হাত থেকে রক্ষা পেল। এই দেখে মূসা অখুশী হয়ে অল-খিজ্রকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার কি মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল? এই কথার উপর অল-খিজ্র জবাব দিলেন, আমি আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না। মূসা বললেন, আমার বুদ্ধি কাজ করেনি, আমাকে ক্ষমা করুন, এইপ্রকার ভুল এরপরে আর হবে না।

এরপর দু'জনে পুনরায় এগিয়ে চলতে চলতে একটি ছেলের সাথে দেখা হয়। অল-খিজ্র সেই ছেলেটিকে মেরে ফেললেন। এই দেখে মূসা বললেন, আপনি কেন একজন নির্দোষ ছেলেকে হত্যা করলেন? আর তাও আবার কাউকে হত্যা করার বদলে নয়। এ তো আপনি বড় খারাপ ও খুবই গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। এরপর অল-খিজ্র বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে থেকে কখনই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। মূসা এবার জবাব দিয়ে বললেন, এরপর যদি আপনাকে আর কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি অবশ্যই আমাকে আপনার সাথে আর রাখবেন না, নিশ্চয়ই আমি আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছি।

পুনরায় একবার যাত্রা শুরু করলেন। তারপর দু'জনেই একটি গ্রামে পৌঁছলেন আর মূসা খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। গ্রামবাসীরা তাদেরকে আপ্যায়ন করতে অস্বীকার করে। ওই গ্রামে দুজনেই এক প্রাচীর দেখতে পেলেন, যেটি ভেঙ্গে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিল। অল-খিজ্র সেটিকে ঠিক করে দিলেন। এই দেখে মূসা বলে ফেললেন যে, আপনি চাইলে এই কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, সেই পারিশ্রমিকের ধন দিয়ে আমরা খাবার খেতে পারতাম। এরপর অল-খিজ্র মূসাকে বললেন, ব্যাস! এখন আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ (সাক্ষাৎকার সমাপ্ত) হবে, তবে বিদায় হওয়ার পূর্বে আমি আপনাকে ওই সব কথাগুলির বাস্তবিক ঘটনা বলবো, যার উপর আপনি ধৈর্য্য রাখতে পারেননি।

১. প্রথম ঘটনা হল, ওই নৌকাটি ছিল কিছু গরীব মস্কিন ব্যক্তিদের, যারা এই নদীতে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমি সেটি কিছু ভাঙাচোরা এইজন্য করেছিলাম, কেননা সামনে আগে গিয়ে এক বাদশা ছিল, সে প্রতিটি লোকের ভালো নৌকা জোর পূর্বক কেড়ে নিত, নৌকাটি ছিদ্র হওয়ার কারণে ওই বাদশাহ নৌকাটি কেড়ে নেবে না এবং পরে ওই গরিব মাঝি কিছু পয়সা খরচ করে নৌকাটি মেরামত করিয়ে নিতে পারবে।

২. দ্বিতীয় ঘটনা হল যে, ওই ছেলেটির পিতা-মাতা আল্লাহ প্রাপ্তি করার ইচ্ছা রাখতেন, আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, এই ছেলেটি পর্রবর্তীকালে তার নাফরমানি ও বিদ্রোহারক আচরণের কারণে তাদেরকে কষ্ট না দেয়, এই কারণেই আমি চাইলাম যে, তাকে তার পরবরদিগার ওই সন্তানের থেকে আরও পবিত্র ধার্মিক সৎ চরিত্র দয়াযুক্ত পুত্র দান করুক।

৩. দেওয়ালের ঘটনা হল যে, ওই গ্রামে দুটি অনাথ বাচ্চা আছে, তাদের গুপ্তধন ওই দেওয়ালের নিচে মাটিতে পোঁতা রয়েছে। তার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাই রব এই চাইছেন যে, এই দুটি অনাথ বাচ্চা নিজেরা যখন যুবক হবে, তখন নিজেদের এই গুপ্তধন ওই রবের মেহরবানী ও রহমতে বের করে নিতে পারবে।

এই তিনটি কাহিনী মুহমলত (বর্ণনা) করার পর অল-খিজ্র, আজিম অমল (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় সম্পর্কে বললেন যে, হে মূসা! এটি ছিল আসল ঘটনা, যার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি।

"সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রমাণ"

সূক্ষ্মবেদ (কলাম-এ-কবীর=কবীর বাণী) ছাড়া অতিরিক্ত আর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই।

প্রমাণ :- হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল চার বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ)। এর সারাংশ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত জ্ঞান হল শ্রীমদ্ভগবত গীতা। এই গীতার জ্ঞানও ওই কুরআনের জ্ঞানদাতা আল্লাহ (প্রভু) দিয়েছেন। যিনি চার কিতাবের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের) জ্ঞানও দিয়েছেন।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ -তে বেদের জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, কেউ তো পরমেশ্বরকে বলেন তিনি কখনই জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ নিরাকার। কেউ বলেন জন্ম গ্রহন করেন অর্থাৎ সাকার মানেন। যেমন রাম ও কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, তাদেরকে প্রভু মানেন। পরমাত্মা নিরাকার না সাকার ? জন্মগ্রহন করেন কি না? অবতার রূপে আসেন কি না? এই বিষয়ে তত্ত্বদর্শী গুরু (ধীরাণাম্) সঠিক বলতে পারেন, তাঁর কাছে শুনুন।

বিশেষ :- প্রমাণিত হল যে, বেদে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই এবং শ্রীমদভগবত গীতাতেও সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই।

প্রমাণ :- হিন্দু সমাজের জন্য এই চার বেদই মহত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ। বেদের থেকে অধিক গীতা পড়া হয়। গীতার জ্ঞান ওই একই প্রভু (আল্লাহ) দিয়েছেন, যিনি চার বেদ ও চার কিতাবের (জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন) জ্ঞান

দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মাচার্যরা মানেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা চার বেদের সারাংশ। এই গীতার অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ -তে বলা হয়েছে যে, পূর্ণ ব্রহ্ম (ব্রহ্মণঃ) নিজের মুখ কমল (মুখের) দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের প্রচার করেন। তাঁর ওই বাণীতে বলা জ্ঞানকেই 'তত্ত্বজ্ঞান' বলা হয়। তারপর গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ তে বলা হয়েছে যে, "হে অর্জুন! ওই তত্ত্বজ্ঞানকে (যিনি সামর্থ্যবান সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন, তিনি তাঁর মুখকমল হতে বাণী উচ্চারণ করেই তত্ত্বজ্ঞান বলেন) তুমি কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের (পূর্ণ গুরুর) নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, সেবা দ্বারা, নম্রতাপূর্বক প্রশ্ন করলে, সেই তত্ত্বজ্ঞান জানা জ্ঞানী মহাত্মা, তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। "{কেননা ওই সত্য জ্ঞান ওই সর্বশক্তিমান প্রভু (কাদির আল্লাহ) কখনো-কখনো এই পৃথিবীতে এসে, নিষ্ঠাবান ভালো আত্মাদের ও ধার্মিক পবিত্র বান্দাদেরকে বলতে থাকেন। এইজন্য এখানে এই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে। বর্তমানে সেই তত্ত্বজ্ঞান এই দাসের (রামপাল দাসের) নিকট রয়েছে, সারা বিশ্বে এই তত্ত্বজ্ঞান অন্য কারোর কাছে নেই।}

বিশেষ :- এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও নেই। বাইবেলে (যা জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল এই তিন সংযুক্ত কিতাব, যে বাইবেল) ও কুরআনেও সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই।

প্রমাণ :- উপরোক্ত "অল-খিজ্রের (অল-কবীরের) পরিচয়" বিষয়ক শিরোনামে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ পবিত্র কিতাব "জবুর", পবিত্র কিতাব "তৌরাত" এবং পবিত্র কিতাব "ইঞ্জিল" -এর জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি হজরত মুহম্মদকেও বলেছিলেন (যা পবিত্র কিতাব কুরআনের সূরাঃ কাহ্ফ - ১৮, আয়ত নং ৬০-৮২ -তে লিপিবদ্ধ আছে), আমি মূসাকে ওই জ্ঞান জানার জন্য এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলাম, যে জ্ঞান মূসার কাছে ছিল না। সেই জ্ঞানের সামনে মূসার প্রাপ্ত করা জ্ঞান (তৌরাতের কিতাবের জ্ঞান) তো কিছুই মূল্য রাখে না। এদিকে মূসা সেই জ্ঞান প্রাপ্ত না করেই খালি হাতে ফিরে এসেছিলেন। এই প্রকরণ হতে বেশ কিছু বিষয় সামনে উঠে আসেঃ-

নং. (১) :- ওই জ্ঞান তৌরাত কিতাবে নেই। যদি থাকতো তাহলে জ্ঞান অর্জনের জন্য অল-খিজ্রের নিকট পাঠানোর কোনো আবশ্যকতাই ছিল না।

নং. (২) :- একই আল্লাহ পবিত্র জবুর, পবিত্র তৌরাত ও পবিত্র ইঞ্জিলের জ্ঞান, এই যর্থাক্রমে হজরত দাউদ, হজরত মূসা ও হজরত ঈসাকে একবারেই নাজিল করেছিলেন, অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানের মতো একটু একটু করে নাজিল করেন নি।

তৌরাতের জ্ঞান হজরত মূসা প্রচার করছিলেন আর সেই তৌরাতের জ্ঞানের সৎসঙ্গই তিনি করতেন। সৎসঙ্গ করার সময় কোনো এক সৎসঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে মূসা জি! বর্তমানে এই সংসারে সর্ব অধিক বিদ্বান কে? মূসা নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। যার কারণে মূসাকে তাঁর আল্লাহ বলেছিলেন যে, তোমার জ্ঞান অল-খিজ্রের জ্ঞানের সামনে কোনো মূল্যই রাখে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তৌরাতের জ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে।

নং. (৩) :- যদি জবুর কিতাবের মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান থাকতো, তাহলে আল্লাহ বলে দিতেন যে, জবুরের জ্ঞান তোমার জ্ঞান থেকেও উত্তম। তা ওই অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। তবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জবুরের জ্ঞানও অল-খিজ্রের জ্ঞানের সমান নয়।

নং. (৪) :- যদি ইঞ্জিলে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান হতো, তাহলে হজরত মুহম্মদকে আল্লাহ বলে দিতেন যে, অল-খিজ্রের জ্ঞান মরিয়মের পুত্র ঈসাকে "ইঞ্জিল" -কিতাবে দিয়ে রেখেছি কিন্তু এর প্রমাণ কোথাও নেই। এটিতে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কিতাব "ইঞ্জিল"- এর মধ্যেও অল-খিজ্রের (অল-কবীর) মতো জ্ঞান নেই।

বিশেষ :- উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পবিত্র বাইবেলেও নেই। {পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে কেবল তিন কিতাবের জ্ঞান একত্রে আবদ্ধ করা হয়েছে :- ১. জবুর, ২. তৌরাত, ৩. ইঞ্জিল। এই তিন পুস্তকের বা কিতাবের সমষ্টিই বাইবেল নামে পরিচিত।

"কুরআন শরীফেও (মজিদেও) সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই"

প্রমাণ :- সুরাহ ফুরকান ২৫ আয়ত নং ৫২-৫৯ -তে, পবিত্র কুরআন মজিদের (শরীফের) জ্ঞানদাতা আল্লাহ, নিজের পাঠানো নবী মুহম্মদকে (আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এই আয়তগুলিতে বলেছেন যে, কবীর নামের আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ আকবর (কাদির) হলেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। এই কথার উপর কাফিররা ইমান (বিশ্বাস) আনতে পারে না। আপনি তাদের কথা শুনবেন না। আমার দেওয়া কুরআনের প্রমাণ দ্বারা ওই কবীর আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করবেন।

তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই মানবকে শ্বশুরালয়, কন্যা, পুত্রবধূ অন্যান্য সম্বন্ধ বানিয়েছেন। তিনিই নোনা জল ও মিষ্টি জলের দুটি নদী প্রবাহিত করে, তার মাঝখানে শক্ত স্থিরতা বানিয়ে রেখেছেন। আমি তোমাকে (হজরত মুহম্মদ) কেবল তাদেরকে বোঝানোর জন্য ও অজাব (পাপের দণ্ড) থেকে বাঁচানোর জন্য পাঠিয়েছি। তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান হিসাবে কোনো টাকা পয়সা চাই না আর এই কথা ভেবে নিও না যে, আমি কোনো স্বার্থের জন্য এসব করছি। আর হে নবী! ওই কবীর আল্লাহ তাঁর নিজের বান্দাদের (ভক্তদের) পাপ (গুনাহ) ক্ষমা করে দেন, তিনি বড় রহমান (দয়াবান) আছেন।

আয়ত নং. ৫৯ :- এবং তিনিই আল্লাহু আকবর, যিনি ছয় দিনে সৃষ্টির উৎপত্তি করেছেন এবং পরে তখতের (সিংহাসনের) উপরে বিরাজমান হয়েছেন। তাঁর খবর (সম্পূর্ণ তথ্য) জানতে হলে কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শীর) কাছে জিজ্ঞাসা করো।

বিশেষ :- এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন কিতাবেও সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান নেই। তবে লেখকের বলার তাৎপর্য মোটেই এটা নয় যে, উপরোক্ত সমস্ত শাস্ত্রগুলির (পবিত্র বেদ, পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, পবিত্র বাইবেল এবং পবিত্র কুরানের) জ্ঞান ভুল। উপরোক্ত শাস্ত্রের জ্ঞান ভুল নয়, তবে অসম্পূর্ণ (Incomplete) আছে।

উদাহরণ :- যে রকম দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম (syllabus) ভুল নয়। তবে এর থেকে উপরের জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হলে, বি. এ., বি. এস.সি., পী.এইচ.ডি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারী ইত্যাদির জন্য উপরের পড়াশোনা করতে হয়। ওই পাঠ্যক্রম দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ করার পরে হয়, যার কারণে পড়াশোনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। ঠিক এইপ্রকার, ওই সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান দেওয়ার জন্য কাদির আল্লাহ কবীর (পরমাত্মা) স্বয়ংই পৃথিবীতে প্রকট হয়ে বলেন। কবীর পরমেশ্বের মায়ের গর্ভ হতে জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি উপরে সতলোকে নিজের সিংহাসন (তখ্ত) থেকে নেমে সশরীরে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে আসেন।

যেমন বাইবেল গ্রন্থেও প্রমাণ আছে যে, সর্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের (কাদির আল্লার)। তিনি নিজের উপরের ধামে (লোকে) আছেন, যা আকাশের সর্বোচ্চ উপরে। পরমেশ্বর সেখান থেকে এসে ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা সম্পন্ন করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে ঊর্ধ্বে ওই সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সপ্তম দিনেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

পবিত্র বেদেও প্রমাণ রয়েছে যে, পরমেশ্বর সবচেয়ে উপরের লোকে বসে আছেন। সেখান থেকে সশরীরে চলে পৃথিবীতে নেমে আসেন। যে সব পবিত্র সরল আত্মা, যারা পরমাত্মার সন্ধানে লেগে রয়েছেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কোনো সন্ত (সাধু) কিংবা জিন্দা বাবার রূপে এসে তিনি ভক্তদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে কথা বলেন। পৃথিবীতে তাঁকে চেনা খুবই কঠিন হয়। ওই পূর্ণব্রহ্ম (কাদির আল্লাহ কবীর) কুরান, বাইবেল, বেদ ও গীতার জ্ঞানদাতার মতো লুকিয়ে কার্য করেন না। যে প্রভু পর্দার আড়াল থেকে লুকিয়ে থেকে কথা বলেন কিংবা কারোর শরীরে (প্রেতের মতো) প্রবেশ করে কথা বলেন। তিনি হলেন জ্যোতি নিরঞ্জন কাল (শয়তান)। ইনি কখনো কারোর সামনে প্রকট না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন। তবে পূর্ণব্রহ্ম রূপ পরিবর্তন করে প্রত্যক্ষ হয়ে, জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য, পবিত্র আত্মাকে (ভক্তকে) উপরের লোকে নিয়ে গিয়ে সব কিছু দেখিয়ে, তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীর উপর শরীরে ছেড়ে দেন। তারপর তারা ওই প্রত্যক্ষদর্শী (eye witness) অর্থাৎ নিজেদের চোখে দেখা, সেই কাদির আল্লাহ কবীরের বর্ণনা করেন। তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রচার তারা করেন, যার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

☞ এখন পড়ুন বেদমন্ত্রতে যে, কাদির আল্লাহ (পরমেশ্বর) পৃথিবীর উপরে আসেন এবং যথার্থ জ্ঞান ভক্তদের বলেন এবং সাধনা (ইবাদত) করার সত্য নামের জ্ঞানও বলেন :-

দেখুন ফটোকপি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৫৪ মন্ত্র নং ৩ এর :-

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि ।
सोमो देवो न सूर्यः ॥३॥

पदार्थः—(सूर्यः, न) सूर्य के समान जगत्प्रेरक (अयम्) यह परमात्मा (सोमः, देवः) सौम्य स्वभाव वाला और प्रकाशकारक है और (विश्वानि, पुनानः) सब लोकों को पवित्र करता हुआ (भुवनोपरि, तिष्ठति) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के ऊपर भाग में भी वर्तमान है ॥३॥

বিশ্লেষণ :- আপনারা দেখুন, ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ -এর ফটোকপি, যার অনুবাদ আর্য সমাজের বিদ্বান দ্বারা করা হয়েছে। তাদের অনুবাদে এটাও স্পষ্ট রয়েছে যে, পরমাত্মা (ভুবনোপরী) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উপরে (তিষ্ঠতি) বিরাজমান (উপরে বসে) আছেন।

এর সঠিক অনুবাদ এইপ্রকার :-

(অয়ং) এই (সোমঃ দেব) অমর পরমেশ্বর (সূর্যঃ ন) সূর্যের সমান (বিশ্বানি) সকলকে (পুনানঃ) পবিত্র করে (ভুবনোপরি) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ উপরে (তিষ্ঠতী) বিরাজমান আছেন।

ভাবার্থ :- যেমন সূর্য উপরে রয়েছে আর তার নিজের আলো ও উষ্ণতা দিয়ে সকলকে উপকৃত করছে। এইপ্রকার এই অমর পরমেশ্বর যাঁর সম্বন্ধে বেদ মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বসে নিজের নিরাকার শক্তি দ্বারা, সমস্ত প্রাণীকে লাভ দিচ্ছেন এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করছেন।

☞ এছাড়াও বেদে প্রমাণ রয়েছে যে, পরমেশ্বর ঊর্ধ্ব লোক থেকে বিদ্যুতের মতো দ্রুত গতিতে আসেন ও ভালো আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদেরকে বাণীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের মুখ কমল হতে স্বয়ং বলেন এবং ভক্তি করার জন্য প্রেরণাও করেন। সাধনা করার জন্য যথার্থ মন্ত্রের আবিষ্কার তিনি নিজেই করেন। পৃথিবীর উপরে কবির মতো আচরণ করে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচরণ করেন। ভক্তিতে মগ্ন যে সকল পবিত্র আত্মারা আছেন, তাদেরকে তিনি সঠিক ভক্তি মার্গের কথা বলেন।

এখন দেখুন বেদের ফটোকপিগুলো ও লেখক দ্বারা করা বিশ্লেষণ :-

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭)

इन्दुः पुनानो अर्षति गाहते मृष्टो विश्वानि कृण्वन्त्सुपथानि यज्यवे ।
गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यतः कविरत्यो न क्रीळन्परि वारमर्षति ॥२६॥

पदार्थः—(यज्यवे) यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा (विश्वानि सुपथानि) सब रास्तों को (कृण्वन्) सुगम करता हुआ (मृष्टः) उनके विघ्नों को (अतिगाहते) नष्ट करता है और (पुनानः) उनको पवित्र करता हुआ और (निर्णिजं) अपने रूप को (गाः कृण्वानः) सरल करता हुआ (हर्यतः) बहु कान्तिमय परमात्मा (कविः) सर्वज्ञ (अत्यो न) विद्युत् के समान (क्रीळन्) क्रीड़ा करता हुआ (वारं) वरणीय पुरुष को (पर्य्यर्षति) प्राप्त होता है ॥२६॥

বিশ্লেষণ :- এই ফটোকপি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬ এর আছে, যা আর্য সমাজের আচার্য ও মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যদের দ্বারা অনুবাদিত। যেখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, যজ্ঞ করা ব্যক্তি অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান করা ব্যক্তিদের কিংবা ভক্তদের জন্য পরমাত্মা, সমস্ত পথকে সরল করে অর্থাৎ জীবন রূপী চলার পথকে দুঃখ রহিত করে সুবিধাজনক বানান। তাদের বাঁধা-বিঘ্নযুক্ত বিপদকে নাশ করেন অর্থাৎ সমাপ্ত করেন। ভক্তগণকে পবিত্র অর্থাৎ পাপ ও বিকার রহিত করেন। যেমন পরবর্তী মন্ত্র ২৭ -তে বলা হয়েছে, "যে পরমাত্মা ধ্যুলোক অর্থাৎ সত্যলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠের উপরে বিরাজমান আছেন। ওই স্থানে এই পরমাত্মার (কাদির আল্লাহ) শরীরের প্রকাশ অধিক হয়।" উদাহরণের জন্য - ওই পরমাত্মার এক লোম কূপের প্রকাশ কোটি কোটি সূর্য ও চন্দ্রমার প্রকাশ যদি একত্রে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তবুও সেই প্রকাশের থেকেও অধিক। যদি পরমাত্মা ওই প্রকাশ যুক্ত শরীরে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তাহলে আমাদের এই চর্ম চক্ষু দৃষ্টি দ্বারা তাকে দেখতে পারবো না। যেমন পেঁচা পাখি দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে কিছুই দেখতে পায় না। ঠিক তেমন দশা মানবের হয়ে যায়। এইজন্য ওই পরমাত্মা তাঁর নিজের রূপ অর্থাৎ তেজপুঞ্জযুক্ত শরীরের ওই প্রকাশকে সরল করে, ওই স্থান থেকে (উপরে যে স্থানে পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন) দ্রুতবেগে বিদ্যুতের সমান ক্রীড়া বা লীলা করে অর্থাৎ বিদ্যুতের সমান গতিতে দ্রুতগামী হয়ে, উপরের লোক থেকে নীচে এসে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আপনি কবিঃ অর্থাৎ কবির্দেব আছেন। তবে আমরা তাঁকে কবীর সাহেব বলি আর মুসলমানরা তাঁকে আল্লাহু আকবর বলেন।

असश्चतः शतधारा अभिक्षिपो हरिं नवन्ते अप्स्वा तदुन्यवः ।
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥२७॥

पदार्थः—(उदन्यवः) मेघ की (ताः) वे (शतधाराः) सैकड़ों धाराएं (असश्चतः) जो नानारूपों में (अभिक्षिपः) स्थिति को लाभ कर रही हैं । वे (हरिं) परमात्मा को (अवनन्ते) प्राप्त होती हैं । (गोभिरावृतं) प्रकाशयुक्त परमात्मा को (क्षिपः) बुद्धिवृत्तियां (मृजन्ति) विषय करती हैं । जो परमात्मा (दिवस्तृतीये पृष्ठे) द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और (रोचने) प्रकाशस्वरूप है उसको बुद्धिवृत्तियां प्रकाशित करती हैं ॥२७॥

বিশ্লেষণ :- এই ফটোকপি ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯, সুক্ত ৮৬, মন্ত্র ২৭- এর আছে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "পরমাত্মা ধ্যুলোক অর্থাৎ অমর লোকের তৃতীয় পৃষ্ঠের অর্থাৎ ভাগের উপরে বিরাজমান আছেন। সত্যলোক স্থান অর্থাৎ শাশ্বত্ স্থানের তিনটি ভাগ রয়েছে। এক ভাগে বন-পাহাড়-ঝর্ণা, বাগ- বাগিচা বা উদ্যান ইত্যাদি রয়েছে, এটি বাহ্যিক ভাগ অর্থাৎ বাইরের ভাগ। (যেমন ভারতের রাজধানী দিল্লী তিন ভাগে বিভক্ত আছে। বাইরের দিল্লি, যার মধ্যে গ্রাম, ক্ষেত-খামার ও নালা রয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে বাজার রয়েছে আর তৃতীয় ভাগে সংসদ ভবন ও কার্যালয় আছে।)

এরপরে সতলোকের দ্বিতীয় ভাগে, ধ্যুলোকে বস্তিগুলো আছে। যেখানে সপরিবার মোক্ষ প্রাপ্ত করা হংসাত্মারা থাকেন। (পৃথিবীতে যেমন ভক্তকে ভক্তাত্মা বলা হয়, তেমন সতলোকের নিবাসী আত্মাদেরকে হংসাত্মা বলা হয়)। সর্বোপরি তৃতীয় ভাগে পরমাত্মার সিংহাসন আছে। আশে-পাশে কেবল নর (পুরুষ) হংসাত্মারা থাকেন। এই স্থানে স্ত্রী-পুরুষের জোড়া থাকে না। এই স্থানে কেউ যদি তার নিজের পরিবার বানাতে চান, তাহলে সে বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা কেবল পুত্র সন্তান উৎপন্ন করেন। এইভাবে শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সতলোককে তিন ভাগে বিভক্ত করে রেখেছেন। ওই সতলোকের প্রতিটি স্থানে বসবাসকারী আত্মাদের বৃদ্ধ অবস্থা হয় না অর্থাৎ সেখানে মৃত্যু হয় না। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৯ -তে বলা হয়েছে, যারা বার্ধক্য অর্থাৎ বৃদ্ধ অবস্থা, মরণ অর্থাৎ মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, তারা তত্ ব্রহ্মকে অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে জানতে পারেন। তাদের এটাও জ্ঞান হয়ে যায় যে, সতলোকে সতপুরুষ পরমেশ্বর থাকেন। সেখানে বার্ধক্য-মরণ (বৃদ্ধ ও মৃত্যু) হয় না, বাচ্চারা যুবক হওয়ার পরে সর্বদা যুবকই থাকে।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ৯ সূক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২)

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत् ।
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदम् ॥१॥

पदार्थः—(सोमः) जो सर्वोत्पादक प्रभु(अरुषः) प्रकाशस्वरूप (वृषा) सद्गुणों की वृष्टि करने वाला (हरिः) पापों के हरण करने वाला है, वह (राजेव) राजा के समान (दस्मः) दर्शनीय है । और वह (गाः) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों के चारों ओर (अभि अचिक्रदत्) शब्दायमान हो रहा है । वह (वारं) वरणीय पुरुष को जो (अव्ययं) दृढ़मवत है उसको (पुनानः) पवित्र करता हुआ (पर्येति) प्राप्त होता है । (न) जिस प्रकार (श्येनः) विद्युत् (घृतवन्तं) स्नेहवाले (आसदं) स्थानों को (योनिं) आधार बनाकर प्राप्त होता है । इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने (असावि) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया ॥१॥

कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न सृष्टो अभि वाजमर्षसि ।
अपसेधन्दुरिता सोम मृळय घृतं वसानः परि यासि निष्णिजम् ॥२॥

पदार्थ—हे परमात्मन् ! (वेधस्या) उपदेश करने की इच्छा से आप (माहिनं) महापुरुषों को (पर्येषि) प्राप्त होते हैं और आप (अत्यः) अत्यन्त गतिशील पदार्थ के (न) समान (अभिवाजं) हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को(अभ्यर्षसि) प्राप्त होते हैं । आप (कविः) सर्वज्ञ हैं (सृष्टः) शुद्ध स्वरूप हैं (दुरितं) हमारे पापों को (अपसेधन्) दूर करके (सोम) हे सोम ! (मृळय) आप हमको सुख दें और (घृतं वसानः) प्रेमभाव को उत्पन्न करते हुए (निष्णिजं) पवित्रता को (परियासि) उत्पन्न करें ॥२॥

বিশ্লেষণ :- উপরোক্ত ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২ এর ফটোকপি, যার অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দ জীর দিশা-নির্দেশনায় তারই শিষ্যগণ করেছেন এবং সর্বজনীন আর্য প্রতিনিধি সভা, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
এর মধ্যে স্পষ্ট আছে যে:- মন্ত্র ১ - এ বলা হয়েছে যে, সর্ব কিছুর উৎপত্তি কর্তা প্রভু তেজময় শরীরযুক্ত, তিনি পাপের নাশ করেন,

সুখের বর্ষা করেন অর্থাৎ সুখের ফুলঝুরি লাগিয়ে দেন, তিনি উপরে সত্যলোকে সিংহাসনের (তখ্‌ত) উপর বিরাজমান আছেন, যিনি দেখতে রাজার সমান।

এই প্রমাণ সূক্ষ্মবেদে (কলাম-এ-কবীর) - তে রয়েছে যে :-

অর্শ কুর্শ পর সফেদ গুমট হৈ, জহাঁ পরমেশ্বর কা ডেরা। শ্বেত ছত্র সির মুকুট বিরাজে, দেখত ন ওস চেহরে নূঁ॥

এই প্রমাণ বাইবেল ও কুরআন শরীফেও লেখা আছে যে, পরমাত্মা ছয় দিনে সৃষ্টি রচনা করে, সপ্তম দিনে ঊর্ধ্ব আকাশে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছেন। (বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থ ২/২৬-৩০ এবং কুরআন শরীফের সুরাহ ফুরকান ২৫ আয়াত নং- ৫২ থেকে ৫৯ -তে আছে।)

ওই পরমাত্মা নিজের অমরধাম থেকে এই পৃথিবীর উপরে স্বয়ং চলে আসেন এবং শব্দ বাণীর মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান শোনান। তাকে বরণীয় অর্থাৎ আদরণীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগনেরা প্রাপ্ত করেন, তিনি তাদেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, {যেমন (১) সন্ত ধর্মদাস, বান্ধব গড় (মধ্যপ্রদেশ নিবাসী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (২) সন্ত মলূক দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (৩) সন্ত দাদূ দাস, আমের (রাজস্থান নিবাসী) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (৪) সন্ত নানক দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (৫) সন্ত গরীব দাস জী, গ্রাম -ছুড়ানী জেলা- ঝজ্জর (হরিয়ানা নিবাসী), তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (৬) সন্ত ঘীসা দাস, গ্রাম- খেখড়া, জেলা- বাগপত (উত্তর প্রদেশ নিবাসী) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, (৭) সন্ত জম্ভেশ্বর (বিষ্ণোই ধর্মের প্রবর্তক) গ্রাম- সমরাথল (রাজস্থান নিবাসী), তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং হজরত মুহম্মদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই প্রকার ওই পরমেশ্বর (কাদির আল্লাহ) অন্যান্য পবিত্র আত্মাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।}

ওই পরমাত্মা তাঁর প্রিয় আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যারা পরমাত্মার দৃঢ় ভক্ত হন, তাঁদের প্রতি পরমাত্মার বিশেষ আকর্ষণ থাকে। উদাহরণও স্বরূপ বলা হয়েছে, যেমন আকাশীয় বিদ্যুতের সাথে যে বস্তুর আকর্ষণ থাকে, ওই বাজ তারই উপর পড়ে, যেমন কাঁসার ধাতুর উপর বাজ বেশি পড়ে। পূর্ব সময়ে বেশির ভাগ লোকের ঘরে কাঁসা ও পিতলের থালা, গ্লাস ঘটি, বাটি ইত্যাদি থাকত। বর্ষার সময় ওই কাঁসার বস্তু বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে রাখতেন। প্রবীনরা বলতেন যে, কাঁসার জিনিসে উপর বাজ অধিক পড়ে। ঠিক তেমন, পরমাত্মাও তাঁর দৃঢ় ভক্তদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৮২ মন্ত্র ২ - এ তো এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা তাঁর ওই প্রিয় আত্মাদের উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছাতে স্বয়ং পৃথিবী লোকে এসে, মহাপুরুষদের সাথে দেখা করেন। উপদেশের ভাবার্থ হল, পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান বোঝানোর পরে দীক্ষাও দেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞান ও দীক্ষা দেন, ওই সদগুরু স্বয়ং আল্লাহই (পরমাত্মাই) হন ! এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পরমাত্মা অত্যন্ত গতিশীল পদার্থ সমান অর্থাৎ বিদ্যুতের সমান তীব্রগতিতে আমাদের ধার্মিক অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিতও হন। সন্ত ধর্মদাসকে পরমাত্মা এই কথাই বলেছিলেন যে, আমি সেখানে অবশ্যই যাই, যে স্থানে ধার্মিক অনুষ্ঠান হয়। কারণ আমার অনুপস্থিতিতে কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) যে কোনো উপদ্রব করে দেন। যার কারণে সাধকের আস্থা পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি থাকাকালীন ওই কাল জ্যোতি নিরঞ্জন এইপ্রকার গড়বড় করতে পারে না। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৫ -তে বলা হয়েছে যে, ওই অবিনাশী পরমাত্মা যিনি ব্রহ্মকেও (কাল জ্যোতি নিরঞ্জন) উৎপন্ন করেছেন। পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানে তাঁকেই ইষ্ট রূপে মেনে আরতি স্তুতি করা উচিত।

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৮২ মন্ত্র ২ তে এই কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আপনি (কবির্বেধস্য) কবির্দেব এবং সকলকে যিনি উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছাতেই আসেন, অতএব আপনিই পবিত্র পরমাত্মা। অতএব আপনি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ পাপ নাশ করে, হে অমর পরমাত্মা! আপনি আমাদের সুখ দেন এবং (ধুতম্ বসানঃ নির্নিজম্ পরিয়সি) আমরা আপনারই সন্তান। আমাদের প্রতি ওই বাৎসল্যযুক্ত প্রেম ভাব উৎপন্ন করে, ওই (নির্নিজম্) সুন্দর রূপকে (পরিয়াসি) ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদেরকে আপনার সন্তান মনে করে যেমন পূর্বে যখন ইচ্ছা তখন আপনি আপনার প্রিয় আত্মাদের সামনে প্রকট হয়ে দর্শন দিতেন, ওই প্রকার আমাদেরও দর্শন দিন।

এখন ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭-এর অনুবাদ :-

অনুবাদ :- (শিশুম্ জজ্ঞানম্ হর্যন্তম্) পরমেশ্বর জেনে-বুঝে অর্থাৎ পরিস্থিতিকে বুঝে তত্ত্বজ্ঞান বলার উদ্দেশ্যে শিশু রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন। আপনার জ্ঞানকে শ্রবণ করে (মরুতো গণেন) ভক্তদের এক বিশাল দলসমূহ, ওই পরমাত্মার অনুগামী হয়ে যায়।

(মৃজন্তি শুম্যন্তি বহিন্) আপনার গূঢ় (গুপ্ত) জ্ঞান বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা বুঝে যায়। তারা ওই পরমেশ্বরের স্তুতি-ভক্তি তত্ত্বজ্ঞানের আধারে করে, ওই ভক্তি (বহিন্) শীঘ্র লাভ দিয়ে থাকে এবং পরমাত্মা নিজের তত্ত্বজ্ঞানকে, (কাব্যেনা) কবিত্ব দ্বারা অর্থাৎ কবিদের মতো দোহা, শব্দ, লোকোক্তি, ছন্দের মাধ্যমে (কবির গীর্ভিঃ) কবির্ বাণী দ্বারা অর্থাৎ কবীর বাণীর মাধ্যমে (পবিত্রম্ অতিরেভন্) শুদ্ধ জ্ঞানকে উচ্চস্বরে গর্জনের সাথে বলেন। তিনি (কবিঃ) কবির মতো আচরণ করা কর্বিদেব, (সন্ত) সাধু বা ঋষি রূপে আবির্ভাব হওয়া (সোম) অমর পরমাত্মা হন। (ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭)

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৮ :-

অনুবাদ :- মন্ত্র ১৭ তে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা ঋষি বা সন্ত রূপে প্রকট হয়ে অমৃত বাণী নিজের মুখ কমল দ্বারা বলেন এবং ওই জ্ঞানকে বুঝে অনেক অনুগামীর জনসমূহ তৈরি হয়ে যায়। (য) যে বাণী পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে শোনান, তা (ঋষিকৃত) ঋষি রূপে আবির্ভাব পরমাত্মা কথিত (সহস্রশীথঃ) হাজার হাজার বাণী অর্থাৎ কবীর বাণী (ঋষিমনা) ঋষি স্বভাবযুক্ত ভক্তদের জন্য (স্বর্ষাঃ) আনন্দদায়ক হয়। (কবিনাম পদবীঃ) কবিতা দ্বারা দোহা, ছন্দের মাধ্যমে বাণী বলার কারণে, ওই পরমাত্মা কবিদের মধ্যে এক প্রসিদ্ধ কবির উপাধিও প্রাপ্ত করেন। সেই (সোম) অমর পরমাত্মা (সিষাসন্) সকলকে পালন করার ইচ্ছাতে, প্রথম স্থিতিতে (মহিষঃ) বড় পৃথিবী অর্থাৎ উপরের ধামগুলির মধ্যে (তৃতিয়ম্ ধাম) তৃতীয় ধাম অর্থাৎ সতলোকের তৃতীয় পৃষ্ঠের উপর (অনুরাজতি) তেজোময় শরীর যুক্ত (স্তূপ) সাদা গুম্বুজে (বিরাজন) বিরাজমান আছেন অর্থাৎ সেখানে বসে আছেন। এই প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩ -তে লেখা আছে যে, পরমাত্মা সর্ব লোকের উপরের লোকে (তিষ্ঠতি) বসে (বিরাজমান) আছেন।

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯ থেকে পুস্তক বিস্তারের কারণে আমরা কেবল গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্ত করব।

এই ফটোকপি ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৯ - এর, যার অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্য আর্য সমাজীরা করেছেন। যেখানে "তুরীয়ম্"- এর অর্থ চতুর্থ করে দিয়েছেন এবং "ধাম"-এর অর্থ পরমপদ পরমাত্মা করে রেখেছেন। আবার অনুবাদক স্পষ্ট করেছেন যে, তুরীয়ম্ পরমাত্মা অর্থাৎ চতুর্থ পরমাত্মার মহাপুরুষ বর্ণনা করছেন।

বিচার করুন :- তুরীয়ম্- এর অর্থ চতুর্থ ঠিক আছে কিন্তু ধাম-এর অর্থ পরমাত্মা করাটাই ভুল হয়েছে। ধামের অর্থ স্থান হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি চতুর্থ ধাম (অনামী লোক) -এর বিষয়ে বলা হয়েছে। সেটিকে উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন সমুদ্র থেকে বৃষ্টির জল অন্য স্থানে পড়ে কিন্তু ওই সমস্ত জলের উৎস হলো সমুদ্র। এইপ্রকার চতুর্থ অনামীলোকে বিরাজমান হয়ে কবীর পরমেশ্বর (কবীর আল্লাহ) অন্যান্য সর্ব ব্রহ্মাণ্ডগুলো, ধামগুলো ও আত্মাদের রচনা করেছেন। এইজন্য সমুদ্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই মন্ত্রে চতুর্থ ধামের কথা বর্ণিত রয়েছে। আপনি যখন সৃষ্টি রচনা পড়বেন, তখন তাতে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবেন যে, নীচ থেকে চতুর্থ ধাম হলো অকহ্ লোক (অনামী লোক)। যে ধামে বিরাজমান হয়ে পরমেশ্বর নীচের সমস্ত ধামগুলোর (লোকগুলো) উৎপন্ন করেছিলেন। এর বর্ণনা এই বেদ মন্ত্রে রয়েছে।

পরমাত্মা উপরের চারটি ধামকে (লোক) অজর-অমর রচনা করেছেন। সব থেকে শীর্ষে হলো (১) অনামী লোক। (২) অগম লোক। (৩) অলখ লোক (৪) সত্য লোক (সতলোক)।

আমরা পৃথিবী লোকের উপর রয়েছি, এখান থেকে উপরের লোক গণনা করলে পরে, (১) সত্যলোক (২) অলখ লোক, (৩) অগম লোক, (৪) অনামী লোক, অতএব ওই চতুর্থ ধামে বসে, পরমাত্মা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছিলেন। বাদবাকি রচনা সত্যলোকে বসে করেছিলেন, এই চতুর্থ (তুরিয়া) ধাম আছে। তার মধ্যে মূল পাঠ মন্ত্র ১৯ -এর ভাবার্থ হলো, তত্ত্বদর্শী সন্ত চতুর্থ ধাম এবং চতুর্থ পরমাত্মার (বিবক্তি) ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণনা করেন। পাঠকগণ! কৃপা করে পড়ুন, এই পুস্তকের 181 পৃষ্ঠাতে "সৃষ্টি রচনা" অধ্যায়, যার মাধ্যমে আপনার জ্ঞান হয়ে যাবে যে, এই লেখক (সন্ত রামপাল দাসই) হলেন ওই তত্ত্বদর্শী সন্ত যিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে পরিচিত আছেন।

বিবেচনা :- ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ২০ :-

মর্য ন শুভ্রঃ তন্বা মৃজানঃ অত্যঃ ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।
বৃর্ষেব যূথা পরি কোশম্ অর্ষন্ কনিক্রদত্ চম্বোঃ আবিবেশ॥ (৯:৯৬:২০)

অনুবাদ :- (মর্যঃ ন) মনুষ্যের সমান অর্থাৎ যেমন মানুষ সুন্দর বস্ত্র ধারণ করে, তেমন পরমাত্মা (শুভ্রঃ তন্ব) সুন্দর শরীর (মৃজানঃ) ধারণ করে (অত্যঃ) অত্যন্ত (সৃত্বা) দ্রুতগতিতে এসে (ধনানাম্) ভক্তি ধনের ধনীদেরকে অর্থাৎ পুণ্য আত্মাদেরকে (সনয়ে) প্রাপ্তির জন্য আসেন। (যুথা বৃর্ষেব) যেমন এক সমুদয়কে তাদের সেনাপতি মিলে যায়, তেমন ওই পরমাত্মা যখন সাধু বা ঋষি রূপে আবির্ভাব হন, তখন বহু সংখ্যায় তাঁর অনুগামী হয়ে যায় আর পরমাত্মা তাদের (শিষ্যদের) গুরু রূপে প্রধান হন। ওই পরমাত্মা (পরি কোশম্) প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে (অর্ষন্) প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ এসে (কনিক্রদত্) উচ্চস্বরে সত্যজ্ঞান উচ্চারণ করতে করতে (চম্বোঃ) পৃথিবী খণ্ডে (আবিবেশ) প্রবিষ্ট হন।

ভাবার্থ :- যেমন পূর্বে বেদ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা উপরের লোকে থাকেন। সেখান থেকে দ্রুত গতিবেগে পৃথিবীর উপরে আসেন। নিজের রূপকে অর্থাৎ শরীরের তেজময় প্রকাশকে কমিয়ে আসেন। এই ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সূক্ত ৯৬ মন্ত্র ২০ তে, তারই প্রমাণ দিয়ে বলেছে যে, পরমাত্মা এইরকম অন্য শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। মনুষ্য যেমন বস্ত্র ধারণ করে আর তেমন (ধনানাম্) ভক্তির ধনী দৃঢ় ভক্তগণ (পুণ্য আত্মাগণ) প্রাপ্ত করেন, তাদেরকে বাণী উচ্চারণ করে তত্ত্বজ্ঞান শোনান।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল নং ৯ সূক্ত ৯৫ মন্ত্র ২)

हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयर्ति वाचमरितेव नावम् ।
देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे ॥२॥

पदार्थः—(हरिः) वह पूर्वोक्त परमात्मा (सृजानः) साक्षात्कार को प्राप्त हुआ (ऋतस्य पथ्यां) वाक् द्वारा मुक्ति मार्ग की (इयर्ति) प्रेरणा करता है। (अरितेव नावम्) जैसा कि नौका को पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और (देवानां देवः) सब देवों का देव (गुह्यानि) गुप्त (नामाविष्कृणोति) संज्ञाओं को प्रकट करता है (बर्हिषि प्रवाचे) वाणीरूप यज्ञ के लिए ॥२॥

ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৫ মন্ত্র ২ -এর অনুবাদ মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্যরা করেছেন, যেটি খুবই সঠিক করেছেন। এর ভাবার্থ হলো যে, পূর্বোক্ত পরমাত্মা অর্থাৎ যে পরমাত্মার বিষয়ে পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলি উপরে বলা হয়েছে, তিনি (সৃজানঃ) নিজের সরল শরীর ধারণ করে (ঋতস্য পথ্যাং) সত্যভক্তির মার্গ অর্থাৎ যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের অমৃতময় বাক্য অর্থাৎ বাণীর দ্বারা মুক্তির মার্গের প্রেরণা করেন। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২- এর সমর্থন, এই বেদ মন্ত্রে রয়েছে।)

ওই মন্ত্র এমন আছে, যেমন- (অরিতেব নাবম্) মাঝি নৌকায় যাত্রীকে বসিয়ে নদী পার করিয়ে দেন, ঠিক তেমনই পরমাত্মাও সত ভক্তিমার্গে নাম রূপী নৌকার দ্বারা ভক্তকে, সংসার রূপী নদীকে পার করিয়ে দেন। তিনি (দেবানাম্ দেবঃ) সর্ব দেবতাদেরও দেবতা অর্থাৎ সমস্ত প্রভুদেরও প্রভু পরমেশ্বর (বহিরষি প্রবাচে) বাণী রূপী জ্ঞান যজ্ঞের জন্য (গুহ্যানি) গুপ্ত (নামা আবিষ্কৃণোতি) নামের আবিষ্কার করেন অর্থাৎ যেমন গীতা অধ্যায় ১৭ মন্ত্র ২৩ তে "ওঁ, তত্, সত্", এখানে তত্ ও সত্ এটি গুপ্ত মন্ত্র আছে যা আমাকে (সন্ত রামপাল দাসকে) ওই পরমেশ্বর বলেছেন এবং এই (তিন) মন্ত্র দ্বারাই পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব।

সূক্ষ্ম বেদে পরমেশ্বর বলেছেন যে :-

"সোহম্" শব্দ হম জগ মেঁ লায়ে, সারশব্দ হম গুপ্ত ছিপাএ।

ভাবার্থ :- পরমেশ্বর স্বয়ং "সোহম্" শব্দটি ভক্তির জন্য বলেছেন। এই সোহম মন্ত্রটি কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে (বেদ, গীতা, কুরআন, পুরাণ এবং বাইবেলের মধ্যেও) নেই। আবার সূক্ষ্ম বেদে আরও বলেছে যে :-

সোহম্ উপর ঔর হৈ, সত্য সুকৃত এক নাম।
সব হংসোঁ কা বন্স হৈ, সুন্ন বসতী নহীঁ গাম॥

ভাবার্থ :- "সোহম্" নামটি তো পরমাত্মা প্রকট করে দিয়েছেন অর্থাৎ আবিষ্কার করেছেন কিন্তু সার শব্দকে গুপ্ত রেখেছিলেন। এখন আমাকে (লেখক সন্ত রামপালকে) বলে দিয়েছেন, যে মন্ত্র আমি আমার অনুগামী শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার সময় প্রদান করি। এই মন্ত্রটি গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩- তে যে "ওঁ (ওম্) - তত্ - সত্" -এর সহিত সম্বন্ধ রয়েছে।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ৯ সূক্ত ৯৪ মন্ত্র ১)

अभि यदेमिन्वाजिनीरुशतीरुशन्तं पतिं न जनयः सुपृक्षे न विशः ।
अपो वृणानः पवते कवीयन्व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥१॥

পদার্থঃ—(सूर्म्ये) সূর্য্য के विषय में (न) जैसे (विशः) रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं । उसी प्रकार (विशः । मनुष्यों की बुद्धियाँ (स्वर्यन्ते) अपनी-अपनी उन्नति के विषय करती हैं । (अस्मिन् अभि) जिस परमात्मा में (आजिनीय) सर्वोपरि बलों के समान (शुभः) शुभ बल है वह परमात्मा (अपोवृणानः) कुलों का अन्धकार दोता हुआ (पवते) सबको पवित्र करता है । (कवीयन्) कवियों की तरह आचरण करता हुआ (पशुवर्धनाय) सर्वोत्कृष्ट पद के लिए (व्रजं, न) इन्द्रियों के अधिकरण मन के समान 'व्रजन्ति इन्द्रियाणि यस्मिन् तद् व्रजम्' (मन्म) वो अधिकरणरूप है वही ध्येय का धाम है ॥१॥

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৪ মন্ত্র ১-এর অনুবাদও আর্যসমাজের বিদ্বানদের দ্বারা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ :- পুস্তক বিস্তারের কথা ধ্যানে রেখে, তাদেরই অনুবাদ হতে নিজের অভিমত ব্যক্ত (সিদ্ধ) করবো। যেমন, পূর্বে লিখিত বেদমন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা তাঁর নিজ মুখ কমল হতে বাণী উচ্চারণ করে তত্ত্বজ্ঞানকে বলেন। তিনি লোকোক্তির মাধ্যমে, কবিত্ব দ্বারা দোহা, শব্দ, সাখী, ছন্দ দ্বারা বাণী বলেন, সেই কারণে প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে তিনি এক বিখ্যাত কবির (পদবি) উপাধি প্রাপ্ত করেন। তাঁর নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর সাহেব।

এই ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ৯৪ মন্ত্র ১-তেও এটাই স্পষ্ট রয়েছে যে, যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন, তিনি (কবিয়ন্ ব্রজম্ ন) কবি ব্যক্তিদের মতো আচরণ করতে করতে পৃথিবীর উপর বিচরণ করেন।

(প্রমাণ ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ২০ মন্ত্র ১)

प्र कविर्देवजीतयेऽव्यो वारेभिरर्षति ।
साह्वान्विश्वा अभि स्पृधः ॥१॥

পদার্থঃ—वह परमात्मा (कविः) मेधावी है और (अव्यः) सबका रक्षक है (देवजीतये) विद्वानों की तृप्ति के लिये (अर्षति) ज्ञान देता है (साह्वान्) सहनशील है (विश्वाः, स्पृधः) सम्पूर्ण दुष्टों की संग्रामों में (अभि) तिरस्कृत करता है ॥१॥

বিশ্লেষণ :- ঋগ্বেদ মন্ডল ৯ সূক্ত ২০ মন্ত্র ১-এর অনুবাদও করা হয়েছে আর্য সমাজের বিদ্বানেরা করেছেন। এর অনুবাদ সঠিক কম এবং ভুল অধিক রয়েছে। এর মূল পাঠে লেখা আছে যে :-

প্র কবির্দেব বিতয়ে অব্যঃ বারেভিঃ অর্ষতি সাহ্বান্ বিশ্বাঃ অভি স্পৃধঃ।

সরলার্থ :- (প্র) বেদ জ্ঞান দাতা থেকে অন্য যিনি (কবির্দেব) কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, তিনি বিদ্বানদের অর্থাৎ জিজ্ঞাসুদের (বীতয়ে) জ্ঞান ধনের তৃপ্তি করানোর জন্য (বারেভিঃ) শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে (অর্ষতি) জ্ঞান দেন। তিনি (অব্যঃ) অবিনাশী এবং রক্ষক আছেন (সাহ্বন্) সহনশীল (বিশ্বাঃ) তত্ত্বজ্ঞান হীন সর্ব দুষ্টুদের (মিথ্যা গুরুদের)-কে (স্পৃধঃ) আধ্যাত্ম জ্ঞানের স্পর্ধা অর্থাৎ জ্ঞান গোষ্ঠী রূপী তর্ক যুদ্ধে (অভি) পূর্ণ রূপে তিরস্কৃত করে তাদের শুকনো মুখ করে দেন।

বিশেষ :- (ক) এই মন্ত্রের অনুবাদের ফটোকপি যদি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কিছু শব্দের অর্থ আর্য সমাজের বিদ্বানরা ছেড়ে দিয়েছেন যেমন - "প্র" এবং "বারেভিঃ"। যার কারণে বেদের যথার্থ ভাব সামনে প্রকাশ পাইনি।

(খ) আমার অনুবাদে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ওই পরমাত্মা পবিত্র আত্মাদের (দৃঢ় ভক্তদের) জ্ঞান প্রদান করেন এবং ওই দয়ালু পরমাত্মার নামও লেখা আছে :- "কবির্দেব"। আমরা তাঁকে কবীর পরমেশ্বর বা কবীর সাহেব বলে থাকি।

বিশ্লেষণ :- উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট হল যে, পূর্ণ ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা কবীর আল্লাহ। তিনিই সঠিক সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান সূক্ষ্মবেদে {যা তার কথিত মুখ কমল দ্বারা বলা কবীর বাণীতে (কলাম-এ-কবীর)} বলেন। ওই সম্পূর্ণ জ্ঞান বর্তমানে এই দাস (রামপাল দাস) ছাড়া পৃথিবীতে কারোর কাছে নেই। এটা অহংকারের কথা নয়, এটাই সত্য কথা। সকল ধর্মের মানবগণ (নারী ও পুরুষ) হলো ওই আল্লাহ কবীরের (পরমেশ্বর কবীর) আপন প্রিয় আত্মা। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য হলো সকলের কল্যাণ করা। এই স্থানে শয়তান (কাল ব্রহ্ম) সবাইকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। সত্যের মার্গ তিনিই এসে দেখান। এখন আপনারা আরও অধিক তথ্য পড়ুন ওই পরমেশ্বরের বিষয়ে, তিনি কি কি ধরনের বেশ ধারণ করে পবিত্র আত্মাদের কাছের পৌঁছে যান।

☞ **অল-খিজ্রকে আজ ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা অনুসারে, বিভিন্ন নামে জানা যায় এবং তাঁর পূজা (ইবাদত) করা হয়। অল-খিজ্রের বিষয়ে ৫৫ হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু কথা নিম্নে লিখিত আছে:-**

(১). হজরত মুহম্মদকে অল-খীজ্র দর্শন দেওয়া ও সাথে ভ্রমণ।

Al-Zuhad -তে বিবরণ রয়েছে। মুহম্মদ বলেন যে, অল-খিজ্র ও এল্লিয়াহ (ইলয়াস/Elijah) প্রতি বছর রমজানের মাসে জেরুসলমে একসাথে ঘুরে বেড়ান।

কিছু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান বিদ্বানরা এটা মানেন যে, অল-খিজ্র ও এল্লিয়াহ একই ব্যক্তি আছেন। এল্লিয়াহের বাইবেলে ৫ টি স্থানে (মথি / Matthew ১৭:১-৮, ২ বংশাবলী / ২ Chronicles ২১:১২, ১ রাজা / King, ২ রাজা/King, মালাখি/Malachi ৩:১ & ৪:৫) এবং কুরআন শরীফে দুটি স্থানে (সূরা আল-সাফফাত ৩৭ আয়াত নং ১২৩ থেকে ১৩২ এবং সূরা আন'আম ৬ আয়াত নং ৮৫) তে উল্লেখ রয়েছে।

Umar II -তে বিবরণ আছে, যে ব্যক্তি মুহম্মদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনিই অল-খিজ্র ছিলেন।

Abu Zara Al Razi -তে বিবরণ আছে, নবি মুহম্মদ নিজের জীবন কালে অল-খিজ্রের সাথে কেবল দুইবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। একবার যুবক বয়সে ও দ্বিতীয়বার বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু অল-খিজ্রের বয়সের একদম পরিবর্তন হয়নি।

Ayun Akhbar Al-Rida-তে বিবরণ রয়েছে যে, আলী বলেছিলেন যে, মদীনার এক গলি দিয়ে যাওয়ার সময়, অল-খিজ্র হজরত মুহম্মদকে ও আমাকে দর্শন দিয়ে কথাও বলেছিলেন।

(২). (Al Bayhaqi) নবি মুহম্মদের অন্তিম সংস্কারের সময় অল-খিজ্রের উপস্থিতি হওয়া এবং হজরত আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

মুহম্মদের মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহকে অন্তিম দর্শনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে রাখা হয়েছিল। অতঃপর সুন্দর লম্বা নাক-নকশাযুক্ত, আকর্ষিত মনোমুগ্ধ সাদা দাড়িযুক্ত এক পরাক্রমশালী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের ভিড়কে ভেদ করে, নবি মুহম্মদের মৃতদেহের কাছে এসে ক্ষণিক শোক ব্যক্ত করে চলে গিয়েছিলেন। পরে আলী বলেছিলেন যে, সেই ব্যক্তি অল-খিজ্র ছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায়, আলীর সঙ্গে অল-খিজ্রের সাক্ষাৎকার কাবার নিকট হয়েছিল। সেখানে অল-খিজ্র আলীকে এক দোয়া (মন্ত্র) দিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি এই দোয়া করবে, এই দোয়া তোমাকে অদ্ভুত লাভ দেবে। তোমার অপরাধের (পাপের) পরিমাণ যদি আকাশের যত তারা কিংবা মাটিতে পড়ে থাকা যত টুকরো টুকরো পাথরের পরিমাণও যদি হয়ে থাকুক না কেন, এই দোয়া (মন্ত্র) ওই সমস্ত পাপ গুলো চোখের এক পলকের (Blink of an eye) মধ্যে ধ্বংস করে দেবে।

৩. Lataif al Minan (১:৮৪-৯৮) - তে উল্লেখ আছে যে, অল-খিজ্র আজও জীবিত আছেন।

মুসলমানেরা এটা বিশ্বাস করে যে, অল-খিজ্র অমর (immortal) এবং আজও পৃথিবীতে জীবিত ও উপস্থিত রয়েছেন আর আল্লাহর মার্গে যারা ভ্রমিত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে মার্গ দর্শন করান।

৪. অল-খিজ্রের সম্পর্কে আরও কিছু প্রচলিত রূপকথাগুলি।

মুসলিম পন্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, অল-খিজ্রকে লোকের মধ্যে নরম হাতের কারণে চেনা যায়। কয়েকজন মানেন যে, অল-খিজ্রের হাতে হাড় নেই। সুফি ইমামগণেরা মানেন যে, আমাদের নিজের জীবনকালে অল-খিজ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অবশ্যই হয়। যদি আপনি কখনো কোনো সাদা দাড়িযুক্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন করেন (হাত মিলান) আর তাঁর হাতে যদি হাড় না থাকে, তাহলে বুঝবেন তিনিই অল-খিজ্র আছেন। অল-খিজ্রকে জিন্দা পীরও বলা হয়। মুসলিম দেশগুলোতে অল-খিজ্রের অসংখ্য স্মৃতিসৌধ রয়েছে।

"আল্লাহ কবীর হজরত মুহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন"

বেদে যেমন প্রমাণ রয়েছে, পরমেশ্বর অর্থাৎ কাদির আল্লাহ সমস্ত কায়নাতকে (সৃষ্টিকে) রচনা করেছেন, তিনি আকাশের উপরে ওই সিংহাসন হতে পৃথিবীর উপরে পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। সেই পবিত্র আত্মাদের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত মুহম্মদ, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ আকবর সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু অন্য আলেমগণ ভুল জ্ঞানের আধারে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বেচুন (নিরাকার) বলেন। যার কারণে একথা বিশ্বাস করাটা কঠিন হয়ে যায় যে, যিনি অল-খিজ্র রূপে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি আল্লাহ তায়ালা আছেন। এই কারণে হজরত মুহম্মদ জীকে আল্লাহ তায়ালা, অল-খিজ্র রূপে দেখা করেছিলেন কিন্তু কেউ আল্লাহ তালাকে চিনতে পারেননি।

সন্ত গরীবদাসজীকেও (গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা- ঝজ্জর, রাজ্য-হরিয়ানা, দেশ-ভারত) দশ বছর বয়সে জিন্দা বাবার অর্থাৎ অল-খিজ্রের বেশে আল্লাহ তালা মিলেছিলেন। যখন বালক গরীবদাসের বিশ্বাস হয়নি যে, এই জিন্দা বাবা রূপে স্বয়ং পরমাত্মাই আছেন, তখন সন্ত গরীব দাসকে পরমাত্মা আকাশের উপর যে স্থানে সিংহাসন (তখ্ত) রয়েছে, সেই সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বালক গরীব দাসকে উপরের আকাশের সমস্ত স্থানে (ব্রহ্মাণ্ড ও লোকগুলো) ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন। সেখানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে দেখিয়েছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান তার আত্মাতে স্থাপিত করে দিয়েছিলেন। সন্ত গরীবদাসকে পুনরায় পৃথিবীতে তার দেহতে ফিরিয়ে দিলেন। বালক গরীবদাসকে মৃত ভেবে চিতার উপরে কাঠের

স্তূপে রেখে দিয়েছিল আর আগুন লাগাতে বাকি ছিল, তৎক্ষণাৎ গরীব দাস জীবিত হয়ে উঠে চলতে লাগলেন। সন্ত গরীবদাসকে আল্লাহ আকবীর জী (পরমেশ্বর কবীর) যা বলেছিলেন, ওই বাণীই সন্ত গরীবদাস, তাঁর নিজের মুখ হতে উচ্চারণ করে বাণীর (সাখীর) মাধ্যমে বলতে লাগলেন, যে জ্ঞান কবীর পরমাত্মা বলেছিলেন:-

গরীব, খুরাসান কাবুল কিলা, বগদাদ বনারস এক। বলখ ঔর বিলায়ত (ইংল্যান্ড) তক হম হী ধাঁরে ভেষ॥

অর্থাৎ খুদা কবীর সাহেব বলেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীর উপর যত দেশ-প্রদেশ আছে, যেখানে যেখানে ভালো আত্মারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে যথার্থ আধ্যাত্ম জ্ঞান বলার জন্যই আমি বিভিন্ন বেশ ধারণ করি। আরব দেশ কাবুলে, খুরাসানে (রোমের একটি শহর), বগদাদে (ইরাক দেশের রাজধানীতে), বেনারসে (ভারতের একটি শহরে) এবং ইংল্যান্ড (বিলাত) দেশে ও অন্যান্য দেশে আমিই যাই। আমার কাছে সব দেশ, সব মানুষ এক সমান।

হজরত মুহম্মদের সঙ্গে জিন্দা বাবার রূপে খুদা কবীর আরবের মক্কা শহরে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কবীর খুদা সন্ত গরীবদাস মহারাজকে যে বাণী বলেছিলেন।, তা এইরূপ বাণী (অমর কছ রমৈণী হতে) : -

মুহম্মদ বোধ সুনো ব্রহ্মজ্ঞানী, শঙ্কর দ্বীপ সে আয়ে ধুনঁ ধ্যানী॥ (২৫)
লোক দীপ মেঁ হম লেগৈউঁ, ইচ্ছা রূপী বহাঁ ন রহেউঁ॥(২৬)
উলট মুহম্মদ মহল পঠায়া, গুঝ বীরজ এক কলমা ধায়া ॥ (২৭)
রোজা বংগ, নিমাজ দঙ্গ রে। বিসমল কী নহীঁ বাত কহী রে॥ (২৮)

অর্থাৎ কবীর সাহেব বলেছেন যে, নবী মুহম্মদের আত্মা শিব (তমোগুণ) দেবতার (শঙ্করের লোক/ধাম) থেকে এসেছিলেন। ভক্তিতে তাঁর ধ্যান অধিক থাকতো। যখন কালের দ্বারা পাঠানো ফেরেশতা জিব্রাইল নবী মুহম্মদকে ধমক দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে কাল ব্রহ্মের জালে ফাঁসিয়ে রাখার জন্য অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়েছিল, সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান তিনি জনতাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। যখন আমি (কবীর খুদা) দেখলাম যে, পবিত্র আত্মা মুহম্মদও কালের জালে ফেঁসে গিয়েছে, তখন আমি তার সঙ্গে দেখা করে, তাকে সঠিক জ্ঞান বুঝিয়েছিলাম। তার অতি আগ্রহের কারণে তাকে উপরের নিজ লোকে, যেখানে আমার সিংহাসন (তখ্‌ত) আছে, সেই পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম। যে স্থান থেকে মুহম্মদ এসেছিল, তার সেই শঙ্করের লোকও দেখিয়ে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলাম কিন্তু নবী মুহম্মদ নিজে একবারও সতলোকে থাকার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করেনি। এইজন্য পুনরায় তার শরীরে তার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এরপরেও মুহম্মদকে মাঝেমাঝে আমি গুপ্ত রূপে সাহায্য করতে থাকতাম। বাণী (মুহম্মদ বোধ থেকে নেওয়া হয়েছে) :-

ঐসা জ্ঞান মুহম্মদ পীরম্, জীন মারী গউ শব্দ কে তীরম্।
শব্দে ফির জীবাঈ, জিন গোসত নহীঁ ভখ্যা। হংসা রাখ্যা, ঐসা পীর মুহম্মদ ভাঈ॥

অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর মুহম্মদকে এক কলমা "আল্লাহ আকবর" জপ করতে বলেছিলেন। তা জপ করার কারণে মুহম্মদের মধ্যে কিছু সিদ্ধি প্রকট হয়ে গিয়েছিল। একদিন সকলের সামনে নবী মুহম্মদ বচন সিদ্ধি দ্বারা এক গাভীকে মেরে জীবিত করে দিয়েছিলেন। পীর মুহম্মদ এমন মহান ছিলেন। তিনি জীবকে (গাই গরু) রক্ষা করেছিলেন, তার মাংস ভক্ষণ করেননি। বাণী (অমর কছ রমৈণী থেকে নেওয়া) :-

চার যার মিল মসলত ভীনী। গউ পকড় কর বিসমল কীন্হী॥ (২৮)
তব হম মুহম্মদ য়াদ কিয়া রে। শব্দ স্বরূপী বেগ গয়া রে॥ (২৯)
মুঈ গউ হম বেগ জিবাঈ। জব মুহম্মদ কে নিশ্চয় আঈ॥ (৩০)
তুম্হ সতকবীর অলহ দরবেশা। মোমিন মুহম্মদ কা গয়া অনদেশা॥ (৩১)
দাস গরীব অনাহদ থীরম্। ভজ ল্যো সতনাম অরূ সত কবীরম্॥ (৩২)

অর্থাৎ যে সকল মুসলমানদের সামনে হজরত মুহম্মদ বচন সিদ্ধি-শক্তি দ্বারা গাভী (Cow) মেরে পুনরায় বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা জীবিত করেছিলেন। এই কথা তিনি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যারা তার বিরোধী ছিল, তারা মসলত (Meeting) করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, আমরা গাই গরুকে (Cow) বিস্মিল করব অর্থাৎ গাভীকে গলা কেটে হত্যা করব, যদি মুহম্মদ আমাদের সামনে গরুটিকে জীবিত করে, তাহলে আমরা তাঁকে মানব।

নির্দিষ্ট দিনে হাজার হাজার মুসলিম ও অমুসলিমদের সামনে গাভীকে কাটা হয়েছিল। নবী মুহম্মদ গরুটিকে জীবিত করার জন্য সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র করে নিয়েছিলেন কিন্তু গরুটি জীবিত হয় নি। তখন নবী মুহম্মদ আল্লাহ কবীরকে আল্লাহ আকবর বলে, উচ্চস্বরে কয়েকবার ডেকেছিলেন। আল্লাহ আকবর বলতে বলতে পৃথিবীর উপর প্রতিবার মাথা মাটিতে নীচু করে আর বার বার আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে দুই হাত তুলে, আল্লাহ আকবর বলে ডাকতে লাগলেন, বর্তমানে যাকে সিজদা বলা হয়। তখন কবীর খুদা তাঁর কাছে পৌঁছলেন। কবীর খুদাকে কেবল হজরত মুহম্মদই দেখতে পারছিলেন তবে উপস্থিত অন্য কোনো লোক দেখতে পায়নি। কবীর আল্লাহকে দেখে নবী মুহম্মদ

সিজদা করলেন এবং নিজের সম্মান রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন কবীর পরমেশ্বর (কাদির কবীর আল্লাহ) গরুটিকে তৎক্ষণাৎ জীবিত করে দিলেন। এরপর মুহম্মদের শঙ্কা সমাপ্ত হল আর বললেন, হে সতকবীর (অমর কবীর)! আপনি বাস্তবেই আল্লাহর দরবেশ (সন্ত / নবী) আছেন। হজরত মুহম্মদ তখনও আল্লাহ্ কবীর জীকে খুদা মানছিলেন না। তিনি খুদার শক্তিযুক্ত সন্ত (নবী) বলে মানছিলেন। যার কারণে কবীর পরমেশ্বর গাইকে জীবিত করে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

তারপর খুদা কবীর হজরত মুহম্মদের অরুচিকর ভাব দেখে, আর তার সঙ্গে ওই বেশে দেখা করেননি। এই প্রকার শক্তি দেখা সত্ত্বেও কাল ও কর্মের প্রভাবে, সতলোকে যাওয়ার কথা মানেননি। সেইজন্য তিনি সত্য ইবাদত লাভ করতে পারেননি। কাল ব্রহ্মের (পর্দার পিছনে থেকে কথা বলা প্রভুর) বলা ইবাদত {রোজা রাখা, নামাজ পড়া, আজান বা বংগ দেওয়া এসব) দ্বারা জান্নাতে (Heaven) যাওয়ার সম্ভব নয়। যে কলমা জপ করার জন্য কবীর আল্লাহ নবী মুহম্মদকে দিয়েছিলেন, তার দ্বারা সিদ্ধি আসতে পারে, যুদ্ধে সফলতা প্রাপ্ত হতে পারে। এটি জান্নাতে যাওয়ার সহযোগী নয়। যার কারণে নবী মুহম্মদ জান্নাতে যেতে পারেননি। তিনি পিতর লোকে অন্যান্য নবীদের কাছে গিয়েছিলেন। এরপরে পুনরায় তিনি অন্য যোনীতে জন্ম গ্রহণ করবেন।

৫. রুমীর দ্বারা অল-খিজ্রের জিকির (উল্লেখ)। রুমীর দ্বারা তার মুর্শীদ (গুরু) শমস তবরেজের (Shams Tebrez) মহিমাতে লেখা দুটি রচনা Masnavi (মসনবী) ও Diwan-e-Kabir (দীবান-এ-কবীর)-তেও অল খিজ্রের (জিকির) উল্লেখ রয়েছে।

৬. Hayat-al-Qulub (Volume 2) Battle of Badar

Amirul Momineen থেকে Ibn Babawayh বলেছেন :- হজরত আলী বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে এক রাতে অল-খিজ্র আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, দয়া করে আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া (নাম মন্ত্র) দেন, যাতে আমি যুদ্ধে জয়ী হতে পারি। অল-খিজ্র আমাকে বললেন, পড় "O he, O one who is not except that He is." সকাল হতেই আমি এর চর্চা হজরত মুহম্মদের সঙ্গে করেছিলাম। এ কথা শুনে মুহম্মদ বললেন, হে আলী! অল-খিজ্র তোমাকে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নাম শিখিয়েছেন। এরপর আলী আরও বললেন, আমি বদরের যুদ্ধের সময়, অল-খিজ্র দ্বারা বলা বড় নামগুলি (মন্ত্র গুলো) ক্রমাগত স্মরণ করেছিলাম।

"ইসলামের অমীমাংসিত ধাঁধা"

যদি পুনর্জন্ম না মানা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ইসলামিক মুখপাত্রদের কাছে পাওয়া যাবে না :-

যেমন - কেউ নির্ধন, কেউ ধনী। কারোর সন্তান আছে, কেউ নিঃসন্তান। কেউ ফকির, কেউ মহারাজা সুলতান। কেউ অন্ধ, কেউ খোঁড়া, কেউ স্বাস্থ্যবান। এই বিবেচনা করা অনিবার্য, উপরোক্ত পার্থক্য কি কারণে? যদি পুনর্জন্ম না মানা হয়, তাহলে এই অমীমাংসিত ধাঁধা চিরকাল থেকেই যাবে। আমরা যদি পুনর্জন্মতে বিশ্বাস করি, তাহলে এর সমাধান হয়ে যায়।

সন্ত গরীবদাস বলেছেন :-

"পিছলে জপ - তপ সে হোত হৈঁ পূর্ণ হংস মুরাদ॥"

অর্থাৎ হে ভক্ত আত্মা! পূর্বজন্মের জপ ও তপস্যা দ্বারা মনোবাসনা পূর্ণ হয়। পূর্বজন্মে যে ব্যক্তি যেমন জপ ও তপস্যা করেছে বা পাপ ও পুণ্যকর্ম করেছে, সেই ভিত্তিতে কেউ রাজা হয়েছেন, কেউ বড় সরকারি কর্মকর্তা হয়েছেন, কেউ বড় শেঠ ধনী ব্যক্তি হয়েছেন, কেউ দরিদ্র, কেউ অন্ধ, কেউ খোঁড়া হয়েছেন। কেউ অসুস্থ, কেউ স্বাস্থ্যবান হয়েছেন। আবার কেউ চাকর, কেউ দাসী, কেউ রানী, কেউ মহারানী। কেউ পূর্ণ আয়ু পর্যন্ত বেঁচে থাকে, কেউ অল্প বয়সেই মারা যায়। কেউ পশু, কেউ পাখি, কেউ নর্দমার পোকা-মাকড়। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলেই এসব হয়।

"পুনর্জন্ম হয়, পড়ুন তার অনেক প্রমাণ"

৭. সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধম

সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধম বলখিও মাঝে মাঝে অল-খিজ্রের দর্শন করতে থাকতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইলম (জ্ঞান) প্রাপ্তি করে, সুলতান ইব্রাহিম রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করে দিয়েছিলেন এবং বাকি জীবন আল্লাহর ইবাদত করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। রুমি তার নিজের গুরু শমস্ তবরেজের সাথে দেখা করার পর, তার লিখিত "Masnavi" পুস্তকে সুলতান ইব্রাহিমের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধমের সাথে অল কবীর সাক্ষাৎ করেছিলেন। বারংবার বোঝানোর পরে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে মোক্ষের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। দয়া করে পড়ুন, কিভাবে আল্লাহ কবীর (পরমেশ্বর কবীর) সুলতান

ইব্রাহিমকে কালের এই জাল থেকে বের করেছিলেন?

"সম্মনের আত্মাই সুলতান ইব্রাহিম ছিলেন"

যে সময়ে পরমেশ্বর কবীর সাহেব কাশীতে একশো বিশ বছর পর্যন্ত লীলা করেছিলেন, ওই সময়ে দিল্লি নিবাসী সম্মন তিনি জাতিতে মনিহার, তাঁর স্ত্রী নেকী ও পুত্র শিব (সেউ) পরমেশ্বরের নিকট হতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তারা পরমাত্মার উপদেশ দৃঢ়তার সাথে পালন করতেন। পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মহিলাদের চুড়ি পরানোর জন্য লোকের বাড়ীতে বাড়িতে যেতেন, তার সাথে সাথে গুরুদেব কবীরেরও মহিমা গুণগাণ করতেন।

তারা বলতেন যে, আমাদের গুরুদেব বাদশা সিকন্দর লোধীর অসাধ্য রোগ কেবল এক আশীর্বাদের দ্বারা ঠিক করে দিয়েছিলেন। এছাড়া সম্রাট সিকন্দর লোধী স্বামী রামানন্দের গলা কেটে দিয়েছিলেন, আমার সদগুরুদেব তার ধড়ের উপর মাথা জুড়ে দিয়ে, তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। কামাল নামের এক ছেলে মারা গিয়েছিল, তার বংশের লোকেরা অন্তিম শেষকৃত্য রূপে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই মৃত ছেলেটিকেও সদগুরু কবীর সাহেব বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, এছাড়াও শেখতকী নামে এক ধর্মগুরু যিনি বাদশা সিকন্দরের গুরু ছিলেন, তার বিশ্বাস হয়নি যে, স্বামী রামান্দের গলা কাটার পরেও কবীর সাহেব জীবিত করে দিয়েছিলেন। শেখতকী রাজা সিকন্দরকে বলতেন যে, কবীর কেবল যন্ত্র-মন্ত্র করতে পারে আর কিছু নয়, মৃত মানুষ কি কখনো জীবিত হয়? আমার সামনে যদি কোনো মৃত ব্যক্তি জীবিত করে, তবেই আমি মানবো।

বাদশা সিকন্দরের কবীর সাহেবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কেননা অসাধ্য রোগের কারণে সুলতান সিকন্দর মহাদুঃখী ছিলেন এবং রামানন্দ স্বামীকে সুলতান সিকন্দর নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। তার সামনে কবীর পরমাত্মা জীবিত করে দিয়েছিলেন। ওই দিন শেখতকীও নদীর তীরেই উপস্থিত ছিল। মৃত বালককে ভেসে আসতে দেখে বলল যে, যদি এই মৃত বালককে আমার সামনে জীবিত করে দেয়, তাহলে আমি কবীরকে আল্লার নবী বলে মানবো।

কবীর সাহেব বললেন, হে শেখতকী! আপনিও তো এক বড় পীর, একবার আপনিও তো চেষ্টা করুন। পরে বলবেন, আমিও তো জীবিত করে দিতে পারতাম। উপস্থিত সকল মন্ত্রী ও বাদশা তারাও বললেন যে, আপনি কি কোনো সামান্য ব্যক্তি? এই কাজ তো করতেই পারেন।

শেখতকী লজ্জায় যন্ত্র-মন্ত্র করতে লাগল কিন্তু তা বৃথা হল। সে বলল, মৃত কখনো জীবিত হয় না। কবীর সাহেব চেয়েছিলেন যে, মৃতদেহটি দূরে ভেসে চলে যাক আর সম্মান বেঁচে যায়। ওই চলে গেল শব। কবীর সাহেব হাতের ঈশারা করে বললেন, মৃত শরীর আমার নিকট ফিরে এসো। ইঞ্জিনযুক্ত নৌকার মতো ওই বালকের মৃত দেহ উল্টে ফিরে এলো। কবীর সাহেব বললেন, হে জীবাত্মা! যেখানেই থাকো না কেন? কবীরের আদেশে মৃতদেহে প্রবেশ করো আর বাইরে এসো। ওই সময়ই ১২ বছরের ওই বালক জীবিত হয়ে, নদী থেকে বেরিয়ে এলো। উপস্থিত দর্শকরা বলতে লাগল যে, কবীর সাহেব তো কামাল (চমৎকার) করে দিয়েছেন। এরপর ওই বালকটির নাম কামাল রাখা হল। কবীর আল্লাহ ওই বালককে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তানের মতো প্রতি পালন করতে লাগলেন। শেখতকী লজ্জায় যেন মুর্ছে গেল কিন্তু হার স্বীকার করেনি। তাই বলতে লাগল যে, এই বালক তো সদমায় (কোমায়) ছিল, এইজন্য তার পরিবারের লোক ভুল করে মৃত ভেবে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমি তো কবীরকে তখনই মানবো, যদি এই কবীর আমার মৃত মেয়েকে জীবিত করে দেয়, যে অনেক বছর ধরে কবরে দাবানো রয়েছে।

আল্লাহ কবীর বললেন, দুদিন পর আপনার কন্যাকে জীবিত করে দেবো। আশেপাশের গ্রাম এবং দিল্লি শহরে এর ঘোষণা করে দাও, যাতে সবাই এসে দেখতে পারেন। সেই ভাবেই সবকিছু করা হল। কবর ভেঙে দেওয়া হল, এরপর কবীর পরমেশ্বর বললেন, হে শেখতকী! আপনি আগে মেয়েটিকে জীবিত করার প্রয়াস করুন, তা না হলে পরে বলবেন যে, মেয়েটি সদমায় (কোমায়) ছিল। উপস্থিত জনতারা বললেন, কবীর সাহেব! যদি শেখতকীর ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি তার কন্যাকে মরতে দিতেন? অতএব আপনিই চেষ্টা করুন। পরমাত্মা কবীর বললেন, হে শেখতকীর কন্যা! জীবিত হয়ে যা। মেয়েটি জীবিত হয়নি। এই প্রকার দুইবার বললেন। তারপরেও মেয়েটি জীবিত হল না। শেখতকীর নিজের কন্যার জীবিত না হওয়ার কোনো দুঃখ নেই, কবীর পরমাত্মার পরাজয়ে আনন্দ উদযাপন করতে লাগল হাততালির সহিত নাচতে লাগল। এই বার কবীর সাহেব যখন বললেন, হে জীবাত্মা! যেখানেই থাক না কেন, এই কবীরের আদেশে শরীরে প্রবেশ করো এবং কবর থেকে বাইরে এসো। কথা বলতে যতটা দেরি হল, এর মধ্যেই ১২ বছরের ওই মেয়েটির শরীর নড়তে-চড়তে লাগল আর তখন মেয়েটি উঠে বাইরে এলো এবং কবীর পরমাত্মাকে দন্ডবৎ প্রণাম করল। আল্লাহ কবীর বললেন, হে শেখতকীর কন্যা! তোমার নিজের পিতার সাথে ঘরে যাও। শেখতকী বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কন্যার হাত ধরে ঘরে যেতে বলল। মেয়েটির নাম কামালী রাখলেন, কেননা উপস্থিত

জনতা বলতে লাগল কামাল (চমৎকার) হয়ে গেল, কামাল হয়ে গেল, এইজন্য মেয়েটির নাম কামালী রাখা হল।

কামালী তার আব্বার উদ্দেশ্যে বললো, শেখতকীর দিক থেকে তো আমি যমরাজের কাছে চলেই গিয়েছিলাম। এখন তো আমি আল্লাহ আকবরের কন্যা। আমার এই পরম পিতা কবীরই হলেন স্বয়ং আল্লাহ। এই প্রকার ওই মেয়েটি কবীর পরমশ্বরের আশীর্বাদে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত প্রবচন করল। সে নিজের পূর্ব জন্মের পরিচয় দিল যে, পূর্বে আমি একবার রাবিয়া নামে জন্ম নিয়েছিলাম। যখন আমার বয়স ১২ বছর হয়, তখন এই পরমপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তাঁর বলা সাধনা আমি ৪ বছর পর্যন্ত করেছিলাম। পরে পুনরায় আমি নিজের মুসলমান ধর্মের সাধনা করতে লাগলাম, যা ব্যর্থ ছিল। এর পরের জন্মে বাঁসুরী নামে এক মেয়ে হয়ে জন্ম হল এবং মক্কাতে গিয়ে নিজের শরীরকেও কেটে, সেখানে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এর পরের জন্মে আমি এক বেশ্যা হয়ে জীবন কাটিয়েছি। পূর্ব জনমে কেবল চার বছর কবীর আল্লাহর বলা সত্য ভক্তি, নিষ্ঠার সহিত করার কারণে, আমি আড়াই জন্ম মানুষের পেয়েছিলাম। এখন আমার আর কোনো মানবজীবন অবশিষ্ট ছিল না, পশুর যোনিতে যাওয়ার ছিল। ওই সময় এই পরমপিতা পরমেশ্বর, ধর্মরাজের কাছে গিয়ে আমাকে মুক্ত করে এনে দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তাঁরই কৃপায় আজ আমি মানবজীবন পেয়েছি। এখন আমি আমার আসল পিতা কবীর আল্লাহর সাথেই থাকব।

কবীর সাহেব এই কামালীকে মেয়ের মতো পালন করে নিজের বাড়িতে রাখলেন। পরে উপস্থিত লক্ষাধিক শ্রোতারা পরমাত্মা কবীর সাহেবের নিকট হতে নাম দীক্ষা নিলেন। প্রথমে সবাইকে পাঁচ নামের মন্ত্র দিলেন। {এই ভাবে কবীর সাহেবের তখন ৬৪ লাখ শিষ্য হয়ে গিয়েছিল। তারা কবীর সাহেবের অলৌকিক ঘটনা দেখেই তাঁর শরণে এসেছিলেন।} দিল্লি শহরের মহিলারা নেকী ও সম্মনের কাছ থেকে এই অদ্ভুত ঘটনাগুলো শোনার পরে তারা চর্চা করত যে, এই প্রকার চমৎকার সম্ভব হতে পারে কি? কেউ আবার বলল যে, ওই সময় আমার স্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিল। যখন শেখতকীর মেয়েকে কবর থেকে জীবিত করা হয়েছিল তখন আমার স্বামীর তখন এই কথাতে রাগ হয়েছিল যে, কবীর সাহেব ওই মেয়েটিকে কেন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন? যার মেয়ে, তার হাতেই তো তুলে দেওয়া উচিৎ ছিল। ভাবার্থ হল, সামগ্রিকভাবে ওই মহিলারা ভিতর থেকে এই ঘটনাকে কেউ কেউ তামাশাও মনে করছিল, তবে তাদের সামনে চুপ করে থাকতো।

"নেকী - সেউ - সম্মনের বলিদানের কথা"

এক সময় কবীর সাহেব হঠাৎ নিজের সম্মন নামের ভক্তের ঘরে দুই সেবককে (কামাল ও শেখফরিদকে) সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সম্মনের বাড়িতে কেবল তিন সদস্য ছিল। সম্মন, সম্মনের স্ত্রী নেকী ও সম্মনের পুত্র সেউ (শিব)। ভক্ত সম্মন এতই দরিদ্র ছিল যে, কোনো কোনো সময় তো তাদের ঘরে অন্নও থাকত না, তখন সারা পরিবার ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়তো। ওইদিন ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছিল। ভক্ত সম্মন তার গুরুদেব কবীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব! আপনারা ভোজন কখন করবেন?

কবীর সাহেব বললেন, ভাই খিদে তো পেয়েছে, ভোজনের আয়োজন করো। সম্মন বাড়ির ভিতরে গিয়ে তার স্ত্রী নেকীকে বললেন, গুরুদেব ভগবান আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তাড়াতাড়ি ভোজন তৈরি করো।

নেকী বললেন, ঘরে একটু অন্ন-দানাও নেই।

সম্মন বললেন, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এসো।

নেকী বললেন, আমি চাইতে গিয়েছিলাম কিন্তু কেউ আটা ধার দেয়নি। তাদের ঘরে আটা থাকা সত্ত্বেও আটা দেয়নি এবং এই কথাও শোনালেন যে, তোমাদের ঘরে তো তোমাদের গুরুদেব এসেছেন আর তোমরা বলতে যে, তোমার গুরু নাকি ভগবান। তোমার গুরু যদি ভগবান হন, তাহলে ধার করার প্রয়োজন হবে কেন? তিনি কেন তোমাদের ঘর ভরে দিতে পারেন না? এই প্রকার নানা কথা বলে ঠাট্টা করতে লাগলো।

সম্মন তখন বললেন, তোমার কাপড়টি দাও, সেটি কারোর কাছে বন্ধক রেখে, তিন কেজি আটা নিয়ে আসবো।

নেকী বললেন, এই কাপড়টা তো ছিঁড়ে গিয়েছে, এটা কেউ বন্ধক রাখবেন না। এই কথা শুনে সম্মন চিন্তিত হয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি কত হতভাগ্য যে, আজ আমার ঘরে ভগবান এসেছেন আর আমি তাকে ভোজনও করাতে পারছি না। হে পরমাত্মা! এমন পাপী প্রাণীকে পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছেন? আমি এতটাই নিকৃষ্ট যে, আগের জন্মে মনে হয় কোনো পুণ্যই করিনি। এখন আমি সদগুরুকে কিভাবে মুখ দেখাবো? এই কথা বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

তখন তার স্ত্রী নেকী বলতে লাগলেন, সাহস রাখুন, কাঁদবেন না, পরমাত্মা এসেছেন, তিনি এই কথা শুনলে দুঃখ পাবেন আর ভাববেন যে, আমাদের আসাতে দুঃখী হয়ে কাঁদছেন। এরপর সম্মন চুপ হলেন। তারপর নেকী বললেন, আজ রাতে পিতা-পুত্র দুজনে মিলে তিন সের (পুরানো ওজন আনুমানিক এক কিলো গ্রাম) আটা চুরি করে আনেন,

কেবল গুরুদেব ও ভক্তদের জন্য।

তখন পুত্র সেউ বলল, "মা! গুরুজী তো বলেন, চুরি করলে পাপ হয়। আপনিও তো আমাকে শিক্ষা দিতেন যে, পুত্র! কখনও চুরি করতে নেই। যারা চুরি করে তাদের সর্বনাশ হয়। আজ আপনি এ কি কথা বলছেন, মা? আমার কি পাপ করা উচিত হবে মা? এতে তো আমাদের ভজন নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর মা! আমরা চুরাশি লক্ষ যোনিতে কষ্ট পাবো। মা এমন কথা কখনো বলো না! আপনাকে আমার দিব্যি মা।"

তখন নেকী বলল "পুত্র! তুমি ঠিক কথাই বলেছো যে, চুরি করা পাপ, তবে পুত্র! আমরা এটি নিজের জন্য করবো না, গুরুদেব ও সাধুদের জন্য করবো।

যে নগরে বসবাস করেছি, এর রক্ষার জন্য চুরি করবো। নেকী বলল, পুত্র! এই শহরের মানুষগুলো আমাদের উপর খুব হিংসা করে, আমি এদেরকে বলেছিলাম যে, আমাদের গুরুদেব কবীর সাহেব (পূর্ণ পরমাত্মা) পৃথিবীতে এসেছেন, তিনি এক মৃত গাই ও তার বাছুরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন, যেটিকে বাদশা সিকন্দর লোধী টুকরো টুকরো করিয়ে দিয়েছিলেন, এছাড়া একটি ছেলে ও একটি মেয়েকেও জীবিত করিয়ে দিয়েছিলেন। সিকন্দর বাদশার অসাধ্য জ্বলন রোগও সমাপ্ত করে দিয়েছেন এবং শ্রী স্বামী রামানন্দকে (কবীর সাহেবের গুরুদেব) সিকন্দর বাদশা তরবারি দিয়ে হত্যা করে দিয়েছিলেন, তাকেও কবীর সাহেব জীবিত করে দিয়েছিলেন। নগরবাসীরা এই কথাগুলো শুনে হাসি-ঠাট্টা করছে আর বলছে যে, তোমাদের গুরু কবীর সাহেব তো ভগবান, তাহলে তিনি তো অন্ন দিয়ে তোমাদের ঘর ভরে দিতে পারেন। তাহলে কেন তোমরা অন্নের (আটার) জন্য অন্যদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছো?

"পুত্র! এরা অবুঝ প্রাণী। আজ কবীর সাহেব যদি এই নগরে ভোজন না করে চলে যান, তাহলে কাল ভগবানও এতই রুষ্ট হয়ে যাবেন যে, এই শহরকে ধ্বংস না করে ফেলে। হে পুত্র! এই বিপত্তি থেকে বাঁচতে হলে, অন্ন চুরি করতেই হবে। তবে ওই অন্ন আমরা খাবো না, কেবল আমাদের সদগুরু ও তাঁর সাথে যে সকল ভক্তরা এসেছেন, তাঁদেরকে প্রসাদ বানিয়ে ভোজন করাবো।" একথা বলে নেকীর চোখ জলে ভরে গেল আর পুত্রকে বলল "পুত্র! তুমি কিন্তু না বোলো না।

তখন নিজের মায়ের চোখের জল মুছতে মুছতে পুত্র সেউ বলতে লাগলো যে, "কেঁদো না মা! আপনার এই পুত্র আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করবে। মা! আপনি তো খুবই ভালো।"

এরপর মাঝরাতে পিতা (সম্মন) ও পুত্র (সেউ) দুজনেই চুরি করতে গেল। এক ধনী শেঠের দোকানের দেওয়ালে সিঁধ কাটলেন অর্থাৎ সুড়ঙ্গ করলেন। সম্মন বললেন, "পুত্র! আমি ভিতরে যাচ্ছি, যদি কোনো ব্যক্তি আসে, তাহলে ধীরে গলায় বলে দেবে, আমি তোমার হাতে আটা দিয়ে দেব আর তুমি নিয়ে পালিয়ে যাবে।"

সেউ বললো, "না বাবা! আমিই ভিতরে যাবো, কারণ আমি যদি ধরাও পড়ি, তাহলে বাচ্চা ভেবে আমাকে ক্ষমা করে দেবে।"

সম্মন বললেন, "পুত্র সেউ! তোমাকে ধরে যদি মেরে ফেলে, তাহলে আমি আর তোমার মা কিভাবে জীবিত থাকব?"

এরপর সেউ প্রার্থনা করতে করতে সুড়ঙ্গ দিয়ে দোকানে প্রবেশ করল। তখন সম্মন বললেন, "পুত্র! অনুমান করে কেবল তিন সের (কিলো) আটা আনবে, এর অধিক আনবে না। বালক সেউ তার ছেঁড়া ফাটা চাদরে আনুমানিক তিন সের আটা বেঁধে যখন বেরিয়ে আসতে লাগলো, তখন রাতের অন্ধকারে দাড়িপাল্লার উপরে তার পা স্পর্শ হয়ে গেল। জোরে আওয়াজ হওয়ার কারণে মুদি দোকানদার জেগে গেলেন আর সেউকে দেখে চোর চোর বলে, ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। এর পূর্বে সেউ ওই চাদরে বাঁধা আটা, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাহিরে বের করে দিয়ে বলল, বাবা! শেঠ আমাকে ধরে নিয়েছে। তুমি এই আটা নিয়ে সদগুরু ও ভক্তদের ভোজন-সেবা করিয়ে দাও। আমার জন্য চিন্তা কোরো না।

আটা নিয়ে সম্মন যখন ঘরে চলে গেলেন, তখন নেকী তার পুত্র সেউকে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পুত্র কোথায়?" সম্মন বললেন, "দোকানের শেঠ তাকে ধরে একটা থামের সাথে বেঁধে রেখেছে।

নেকী বললেন, "আপনি শীঘ্র সেখানে যান আর ছেলেটির মাথা কেটে নিয়ে আসেন, কেননা ছেলেটিকে চিনতে পারলে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবে। তারপরে সদগুরুকে আমাদের বাড়িতে দেখে শহরের লোকেরা বলবে যে, এই গুরুই চুরি করায়। হতে পারে সদগুরু দেবকে তারা বিরক্ত করতে পারে। আমরা পাপী প্রাণী ভোজন করানোর বদলে তাঁকে জেলে বন্দী না করিয়ে দিই। এই বলে মা তার স্বামীকে পুত্রের মাথা কেটে আনার জন্য বললেন, সেটাও আবার নিজের গুরুদেবের জন্য।

সম্মন হাতে একটা কর্দ (লম্বা এক ছুরি) নিলেন ও শেঠের দোকানে গিয়ে পুত্রকে বললেন, "পুত্র সেউ! একবার

মাথাটা বের কর, কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলবো। আগামীকাল তো আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারবো না, হতে পারে যে, কাল তোমাকে এরা মেরে ফেলবে।

এরপর সেউ ওই দোকানদার শেঠকে (ব্যবসায়ীকে) বললো যে, শেঠবাবু! বাইরে আমার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতে চান। কৃপা করে আমার দড়িটা একটু ঢিলা করে দেন, যাতে আমার মাথাটা কেবল সুড়ঙ্গ থেকে সামান্য বাইরে বেরোতে পারে।

দোকানদার শেঠ তার কথা মেনে দড়িটা ততটাই ঢিলা করে দিলেন, যতটা সরলভাবে গলা বেরিয়ে যেতে পারে।

সেউ বললো, বাবা! আমার গলাটা কেটে দাও। যদি তুমি আমার গলা না কাটো, তাহলে বুঝবো তুমি আমার বাবা নও। যদি আমাকে চিনতে পারে, তাহলে দোকানদার আমাদের বাড়ি পৌঁছে যাবে, কেননা এই শেঠের পরিচয় রাজার সাথে রয়েছে। ইনি আমাদের গুরুদেবকে হত্যা করিয়ে দেবেন। তাহলে পিতা! আমরা সবাইকে কেমন করে মুখ দেখাবো? পুত্রের এই কথা শোনা মাত্রই অতি শীঘ্রতার সহিত সম্মন তার পুত্রের মাথা কেটে ঘরে নিয়ে গেল।

শেঠ ছেলেটির হত্যা হওয়া দেখে, সেউয়ের মৃত দেহ টেনে নিয়ে দূরে এক পুরানো ইটের ভাটার ছিল, সেখানে ফেলে দিলো। এরপরে নেকী সম্মনকে বললেন, আপনি পুনরায় সেখানে যান, হয়তো সেখানে ছেলেটির ধড়ও বাইরে পেয়ে যাবেন, সেই ধড় উঠিয়ে নিয়ে আসুন। যখন সম্মন ঐ দোকানে গেলেন, তার পূর্বেই দোকানের মালিক দেওয়ালের ওই সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সম্মন পুত্রের লাশ টেনে নিয়ে যাওয়ার ওই চিহ্ন দেখে দেখে লাশের নিকটে পৌঁছে গেলেন এবং লাশটি তুলে ঘরের ভিতরে এনে রেখে দিলেন, তার শরীরের উপরে পুরানো একটা মোটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিলেন আর পুত্রের মাথাটা আলমারির একটা তাকের (সেলফে) উপর রেখে, আলমারির দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উদয় হল, নেকী স্নান করে সদগুরু ও সাধুদের জন্য রান্না করলেন। তারপর ভোজন গ্রহণের উদ্দেশ্যে সদগুরু কবীর সাহেবদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। নেকী কবীর সাহেব ও অন্য দুই সন্তের (কামাল ও শেখ ফরিদ) সামনে শ্রদ্ধার সহিত তিনটি মাটির থালায় ভোজন সাজিয়ে পরিবেশন করলেন। কবীর সাহেব বললেন, এই তিনটি থালার ভোজন প্রসাদকে ছয়টি থালাতে ভাগ করে পরিবেশন করো আর তোমরা তিনজনও সাথে বসো ও এই প্রেমের প্রসাদ গ্রহণ করো। সম্মন-নেকী দুইজনে অনেকবার প্রার্থনার সহিত অনুরোধ করলেন কিন্তু কবীর সাহেব তাদের অনুরোধ স্বীকার করলেন না। তারপর ছয়টি পাত্রে প্রসাদ পরিবেশন করে দিলেন। পাঁচজনে প্রসাদ খেতে বসে গেলেন। তখন কবীর সাহেব বললেন :-

আও সেউ জীম লো, য়হ প্রসাদ প্রেম। শীশ কটত হৈঁ চোরোঁ কে, সাধোঁ কে নিত্য ক্ষেম॥

কবীর সাহেব (আল্লাহু আকবর / অল খিজ্র) বললেন, সেউ! এসো ভোজন করে নাও। মাথা তো চোরদের কাটে, সন্তগণের (ভক্তগণের) নয়। তাদের তো রক্ষা ও ক্ষমা হয়। কবীর সাহেব এতটুকু কথা বলতেই, ওই সময়ই সেউয়ের মাথা শরীরের সঙ্গে জুড়ে গেল। কেটে যাওয়ার কোনো চিহ্নই গলাতে ছিল না এবং ওই ভোজনের সারিতে (লাইনে) বসে সেউ ভোজন করতে লাগল। বলো কবীর সাহেবের (কবিরমিতৌজা) জয়। (বেদের বচন:- কবির্ = কবির্দেব = কবীর পরমেশ্বর, অমিত + ঔজা = যাঁর শক্তির কোনো সীমা নেই অর্থাৎ অসীম।)

সম্মন ও নেকী দেখলেন যে, গলায় কোনো চিহ্নও নেই। ছেলেটি কিভাবে জীবিত হলো? ভিতরে গিয়ে দেখল, সেখানে কোনো ধড় ও মাথা ছিল না। শুধু রক্তের ছিটাফোঁটা লেগে ছিল, যা কেবল এই পাপী মনের সন্দেহকে দূর করার জন্য প্রমাণ সরূপ ছিল।। সত সাহেব।।

এইপ্রকার অনেক লীলা সাহেব কবীর (কবিরগ্নি) করেছিলেন। যে কারণে স্বতঃসিদ্ধ হয় যে, ইনিই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা (কাদির আল্লাহ)। সামবেদ সংখ্যা নং. ৮২২ এবং ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সূক্ত ১৬২ মন্ত্র ২-এ বলা হয়েছে যে, কবির্দেব তাঁর বিধিবৎ ভক্ত সাথীর আয়ুও বাড়িয়ে দেন। যদি তার মৃত্যুও হয়ে যায়, তবুও তাকে ধর্মরাজের (যমের) নিকট হতে ছাড়িয়ে এনে, একশো বছরের জন্য জীবনও প্রদান করে দেন।

॥ জয় হো পরমেশ্বর কবীর বন্দী ছোড়ের (অল-খিজ্রের)॥

সম্মনের আত্মা পরে নৌশের খান হয়েছিল

নেকী ও সেউ (নেকী ও সম্মনের পুত্র) তো ওই জনমেই মোক্ষ লাভ করেছিল কিন্তু সম্মনের হৃদয়ে আঘাত লাগে যায় যে, আজ যদি আমার কাছে ধন থাকত, তাহলে আমাকে কখনই আমার পুত্রকে কাটতে হতো না। পরমাত্মা ওই জনমেই নেকী -সম্মন-সেউকে ধন-সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তারা আর নির্ধন ছিল না। সম্মন পরে দিল্লির এক মহান ধনী ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। পরমেশ্বর কবীর (কাদির আল্লাহ) রূপী সদগুরুর উদ্দেশ্যে একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করে (কুরবানি) দেওয়ার কারণে, পরের জন্মে নৌশেরখাঁ

শহরে রাজার ঘরে জন্ম নিলেন এবং পরে রাজাও হলেন। ৮০টি খাজানা হীরা-মুক্তা দ্বারা পূর্ণ ছিল কিন্তু তিনি কাউকে দান করতেন না এবং না কখনো পরমেশ্বরকে স্মরণ করতেন।

পরমেশ্বর কবীর খুদা, জিন্দা বাবার (অল-খিজ্র) বেশ ধারণ করে নৌশেরখাঁ শহরের বাদশা নৌশেরখানের কাছে গিয়ে তাকে দান করার জন্য উপদেশ দিলেন। রাজা বললেন, আমি নির্ধন রাজা। জিন্দা বাবা বললেন, তোমার তো ৮০টি খাজনার কোষাগারের পতাকা লাগানো রয়েছে। (এতে এক রাজার পরিচয় হতো যে, যার কাছে যত খাজানার কোষাগার থাকতো, সে ততগুলি পতাকা লাগিয়ে রাখতো।)

রাজা বললেন, এগুলো তো কয়লা। জিন্দা বাবা বললেন, যেমন তোর বিচার, তেমনি এগুলি সব কয়লা হয়ে যাবে। রাজা যখন কোষাগার খুলে খাজনা দেখলেন, তখন সেগুলো সত্যিই কয়লা হয়ে গিয়েছিল। রাজা জিন্দা বাবা রূপী পরমাত্মার চরণ ধরে ক্ষমা চাইলেন। তখন পরমাত্মা বললেন, যদি বেশীর ভাগ ধন দান করে দাও, তাহলে পুনরায় এগুলি হীরা-মুক্তা হয়ে যাবে। রাজা বললেন, যেমন আপনার আদেশ, আমি তেমনই করব। খাজনার কোষাগার পুনরায় হীরা-মুক্তাতে ভরে গেল। রাজা নৌশেরখান বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করলেন। যার ফলস্বরূপ পূর্বজন্মে সদগুরুর ভক্তি ও সেবার ফলস্বরূপ তিনি ইরাক দেশের বলখ নামক শহরের রাজা হলেন। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নে দেওয়া :-

"সুলতান অব্রাহিমের জন্ম কাহিনী"

অধম শাহ নামের এক ফকির ছিলেন। তিনি বলখ শহর থেকে কিছুটা দূরে এক কুঁড়েঘর তৈরি করে সেখানে থাকতেন। কখনো কখনো তিনি শহরে বেড়াতে যেতেন। একদিন তিনি বলখ শহরের রাজার একমাত্র যুবতী ও অত্যধিক সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। তখন ফকির অধম শাহের মনে ওই মেয়েটিকে বিবাহ করার প্রবল ইচ্ছা জাগলো।

সে রাজার নিকট গিয়ে বললেন, আপনার কন্যার বিবাহ (নিকাহ) আমার সঙ্গে করিয়ে দেন। রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর ফকিরকে কিছু বলার পূর্বে ভাবতে লাগলেন যে, এই ফকিরকে যদি তার কথার জবাব দেই, তাহলে তিনি হয়তো রেগে গিয়ে আমাকে অভিশাপ দিতে পারেন, এইজন্য তিনি ভয় পেয়ে অকস্মাৎ হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারলেন না। কেবল তিনি ফকিরকে বলে দিলেন যে, আপনি পরের দিন আসবেন। এরপর রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আগামী কাল ফকির যখন আসবেন, তখন তাকে বলে দেবেন যে, রাজার মেয়েকে বিবাহ করতে হলে মুক্তার একটা মালা আনতে হবে কিংবা একশোটা মুক্তা আনতে হবে, অন্যথায় বিবাহ হবে না। পরের দিন ফকির আসার পরে তাকে এই শর্তের কথা বলে দেওয়া হলো।

এই কথা শুনে ফকির মুক্তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ বলে দিয়েছিল যে, মুক্তা সমুদ্রে পাওয়া যায়। তাই তিনি সমুদ্রের তীরে গিয়ে নিজের করমন্ডলে (লোটাতে) সমুদ্রের জল ভরে, কিছুটা দূরে গিয়ে বালিতে ঢালতে লাগলেন। এই ভাবে কয়েক দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। এইরূপ চেষ্টা করতে করতে শরীরও প্রায় দুর্বল হয়ে সমাপ্ত হতে লাগলো।

যে ব্যক্তি দেখতেন, সেই বলতেন যে, ঘর ত্যাগ করে এসেছিলেন আল্লাহর প্রাপ্তির জন্য কিন্তু এখন নরকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সমুদ্র কখনো খালি হবে না, আপনি ভক্তি করুন।

পরমাত্মা জিন্দা বাবার বেশে সেখানে প্রকট হলেন এবং ফকির অধম শাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছেন? তিনি বললেন, রাজার মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। তার জন্য মুক্তার শর্ত রেখেছেন। একজন বলেছিলেন যে, মুক্তা সমুদ্রে পাওয়া যায়। সেইজন্য চেষ্টা করছি সমুদ্র খালি করে মুক্তা নিয়ে যাবো।

জিন্দা বাবা বললেন, সমুদ্র কখনও খালি হবে না। তুমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাবে। যে উদ্দেশ্যে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছ, সেই মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করো, তাহলে কিছু কাজ হবে। তুমি জীবনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে রেখেছো। অধম শাহ বললেন, আমাকে আপনার শিক্ষার কোনো দরকার নেই। আমি আমার কাজ করছি আর আপনি আপনার কাজ করুন। কবীর পরমেশ্বর বললেন যে :-

বিকার মরে মত জানিয়া, জ্যোঁ ভূভল (রাখ) মেঁ।
জব করৈল্লে ধধকহী, কোঈ বচৈ সতগুরু শরণ লাগ।

{কৌতুক :- একজন ৭০-৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ ব্যক্তি মদ্যপান করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল। তার হাতে সাহারা নেবার জন্য একটি লাঠি ছিল, সেটি মাটিতে পড়ে যায় এবং সেই লাঠি উঠানোর জন্য সে অসমর্থ ছিল। কারণ সে নেশায় ছিল, আর পড়ে গেলে পুনরায় উঠে দাঁড়ানো তারপক্ষে অসম্ভব ছিল।

এক ভদ্রলোক ওই পথেই যাচ্ছিলেন, তাকে দেখে ওই বৃদ্ধ মদ্যপ ব্যক্তি তোতলামি স্বরে বললো যে, আমার লাঠিটা তুলে আমাকে দাও। পথিকের বুঝতে বেশি সময় লাগেনি, তাই তিনি বললেন, দাদু! আপনি আপনার বয়সটা

তো একবার দেখুন। এই বয়সে মদ পান করা শোভা দেয় না। আপনার নাতি-নাতনি নিশ্চয় আছে, তাদের উপর কি প্রভাব পড়বে?

একথা শুনে বৃদ্ধ বলল, শিক্ষা দেওয়া ছাড়া কি কোনো কথা নেই? আর এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত আমাকে ছাড়া, অন্য কেউ কি মেলেনি? যদি লাঠি উঠানোর হয় তো উঠা, তা না হলে চলে যা। ঠিক এইরূপ অবস্থা ছিল, ওই অধম শাহ ফকিরের।}

পরমাত্মা দেখলেন যে, এ ভক্ত তো মারা যাবে। কবীর জিন্দা বাবা (অল-খিজ্র/খিজির) তার নিজ শক্তি দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবাহকে তীরে আঘাত করলেন, তখন হাজার হাজার মুক্তা বালিতে দেখা গেল। হে আল্লাহ বলে, ফকির অধম শাহ হাজার হাজার মুক্তা তার কাপড়ে বেঁধে নিলেন। এরপর বাদশার দরবারে গিয়ে রেখে দিয়ে বললেন, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে শাহজাদীকে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। মন্ত্রীগণ সৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, একে লাঠি মেরে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসো। তেমনই করা হল। পরমাত্মার কৃপায় তিনি মরলেন না। কয়েকদিনের মধ্যে চলা ফেরা করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর রাজার কন্যা মারা গেল আর তাকে কবরে দাফন করে দিলেন এবং তার কবরের পাশে চারজন প্রহরীকে ছেড়ে রাখা হয়েছিল, যাতে কোনো বন্য প্রাণী মৃতদেহ নষ্ট করতে না পারে। এই কথা ফকির অধম শাহ জানতে পারলেন। ওই রাতেই তিনি কবরের কাছে গেলেন তখন প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় ছিল। অধম শাহ কবর খনন করে রাজকন্যার মৃতদেহটি বের করলেন আর কবরটি যেমন ছিল, ঠিক তেমনভাবে ঠিকঠাক করে রেখে, মেয়েটির মৃতদেহ তার কুটীরে নিয়ে গেলেন।

ওই রাত্রে বানজারার (যাযাবরদের) কাফেলা, পথ ভুলে ওই জঙ্গলে চলে যায়। কুটীরে প্রদীপ জ্বলছিল, মেয়েটির মৃতদেহ কফনে জড়িয়ে দেওয়ালের সাহায্যে এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, মনে হল যেন মেয়েটি আসন লাগিয়ে বসে রয়েছে, শীতের সময় ছিল। কাফেলার মধ্যে থেকে দুইজন ব্যক্তি আগুন নেওয়ার জন্য ওই কুড়ে ঘরে গেলেন। আওয়াজ শুনে অধম শাহ ভয় পেয়ে ভেবে নিলেন যে, নিশ্চয়ই রাজার লোকজন এসেছে। তিনি কুটীরের পিছনে এক গুহার মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন, যেখানে তিনি সাধনা করতেন।

কাফেলার ব্যক্তিরা মৃত তরুণীকে দেওয়ালের সাহায্যে বসে থাকতে দেখে, ভয় পেয়ে উল্টে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং কাফেলাদের বিষয়টি বললেন। ওই গোষ্ঠীর মধ্যে একজন বৈদ্যও ছিলেন। কিছু লোক বৈদ্যকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। তরুণীকে দেখে বৈদ্য বললেন, এই মেয়েটি মারা যায়নি কোমায় রয়েছে, এর চিকিৎসা করা যেতে পারে। কাফেলার মালিক বললেন যে, আপনি চিকিৎসা করুন। যদি মেয়েটি সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে এই মেয়েটির কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে, সে কে? তার পিতা বা স্বামী কোথায়? প্রথমে মেয়েটির নগ্ন শরীরের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বৈদ্য হাতের শিরাকে চিরে অশুদ্ধ রক্ত বের করলেন।

রাজকুমারী কয়েক মিনিটের মধ্যেই জীবিত হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল যে, এখানে আমি কিভাবে এলাম? অধম শাহ (ফকির) প্রদীপের আলোতে দেখলেন যে, এরা রাজার লোক নয় আর তিনি রাজকন্যাকেও জীবিত দেখলেন। এই দেখে তিনি কাফেলারদের নিকটে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, সেই কথা মেয়েটিও শুনলো।

রাজকুমারীকে কাফেলাদলের ব্যক্তিরা বোঝালেন যে, যদি আপনাকে এই ফকির কবর থেকে বের করে না আনতেন, তাহলে আপনি তো এই সংসার ছেড়ে চলেই যেতেন। এখন আপনার উচিত, এই ফকিরের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা মেনে জীবন কাটানো। মেয়েটি স্বীকার করলো। সেই ব্যক্তিরা তাদের দুইজনকে বিবাহ দিলেন অর্থাৎ নিকাহ পড়ালেন। কাফেলার সর্দার বললেন, যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে যেতে চান, তাহলে আমরা আপনাদের সেবা করবো এবং কোনো কষ্ট হতে দেবো না। গৃহস্থ ফকির বললেন, আমরা এখানেই থাকব কিন্তু আপনাদের উপকার আমি কখনও ভুলব না। আপনারা আল্লাহর স্বরূপ হয়ে এসেছেন। আমাদের দুজনেরই মৃত্যু হওয়ার ছিল। আপনারা আমাদের জীবনের রক্ষা করেছেন। তারপর তাদের সেখানে রেখে কাফেলার লোকজন চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে রাজকুমারী এক সুন্দর পুত্রের জন্ম দিলেন। তার নাম "সুলতান ইব্রাহিম" রাখলেন। চার বছর বয়স হওয়ার পরে, বলখ শহরের এক মৌলবির কাছে লেখাপড়ার জন্য বালকটিকে ভর্তি করে দিলেন। প্রতিদিন সকালে ফকির অধম শাহ তার পুত্রকে মৌলবীর কাছে দিয়ে আসতেন এবং সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে আসতেন। বলখের বাদশাহের একটি মাত্র কন্যা ছিল, কোনো পুত্র ছিল না। বাদশাহ দরিদ্র বাচ্চাদের সাহায্য করতেন। তিনি বিদ্যার্থীদের পুরস্কৃতও করতেন, এছাড়া দরিদ্র বাচ্চাদের বস্ত্রও বিতরণ করতেন। একদিন বলখের রাজা সেই মৌলবীর কাছে গেলেন। রাজা ওই অধম শাহ ফকিরের পুত্রকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তার চেহারা রাজার কন্যার সাথে মিলতো।

বাদশাহ মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কার সন্তান? মৌলবী বললেন, জঙ্গল থেকে এক ফকির আসেন,

তার পুত্র। তার পিতা সকালে ছেড়ে যান আর সন্ধ্যায় নিয়ে যান। আমি বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। বালকটি উঠে গিয়ে রাজাকে জড়িয়ে ধরল। রাজা তাকে কোলে তুলে চলতে শুরু করলেন আর মৌলবীকে বললেন যে, যদি এর পিতা আসেন, তাহলে রাজমহলে পাঠিয়ে দেবেন, সেখান থেকে তিনি নিয়ে যাবেন। রাজা বালকটিকে রাণীকে দেখালেন, তাকে দেখে তার মেয়ের কথা মনে পড়তেই মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বালকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ক্ষীর-হালুয়া খাবার নিজে তৈরি করে বালকটিকে খাওয়ালেন। রানী বললেন যে, এ তো আমার মেয়ের মুখের সাথে একেবারে মিলে যাচ্ছে। এদিকে ফকির মৌলবীর কাছ থেকে হয়ে, রাজার প্রাসাদে চলে গেলেন। রাজা চাকরদের বলে রেখেছিলেন যে, এই বালকের পিতা এলে, তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবে না, সম্মানের সাথে তাকে নিয়ে আসবে। ওই ফকিরকে দেখে রাজা বললেন, এই বালকটি কার?

ফকির বললেন, এটি আমার বালক। আপনার কন্যা হতে জন্মেছে। রাজা বললেন, ফকির হয়ে মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়। ফকির এবার সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন কিন্তু এরপরেও রাজা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই ফকিরকে ও চাকরদেরকে সাথে নিয়ে মেয়েটির কবর খনন করে দেখতে পেলেন যে, কবরে লাশ নেই। এরপরে ফকিরের কুঁড়েঘরে গেলেন, সেখানে তার মেয়েকে একটা ছেঁড়া ফাটা কাপড় পড়ে বসে থাকতে দেখলেন। সেই কাপড়ে অনেক স্থানে ছোট ছোট কাপড় দ্বারা জোড়া লাগানো ছিল। নিজের মাতা-পিতাকে দেখা মাত্রই সে দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কন্যা, বালক ও ফকিরকে নিবেদন করে রাজা তার নিজের মহলে নিয়ে গেলেন ও ফকির অধমকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দিলেন। যার কারণে তাকে শাহ বলা হতো। তার নাম পূর্বে 'অধম' ছিল। কিছুদিন থাকার পর অধম শাহের রাজ্য-পাঠ ঐশ্বর্য ভালো লাগেনি। তিনি তাদের নিকট প্রেম পূর্বক ভালোভাবে বিদায় নিয়ে পুনরায় তার কুটীরে চলে গেলেন এবং কখনো কখনো রাজমহলে গিয়ে তার পুত্র ও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসতেন। কয়েক বছর পরে অধম শাহ ফকিরের মৃত্যু হলো এবং তার সমাধি ওই কুটীরেই বানিয়ে দেওয়া হলো এবং আশে-পাশে সুন্দর বাগান তৈরি করা হলো। সেখানে মেলা হতে লাগলো।পুত্র ইব্রাহিমকে তার দাদু (নানা) ওই রাজ্যের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন।

বিচারণীয় বিষয় :-

কবীর কমাঈ আপনি, কবহু ন নিষ্ফল জায়। সাত সমন্দর আড়ে পড়ে, মিলে অগাউ আয়॥

অর্থাৎ ভক্তির যেমন কামাই (সাধনা) করা হয়, তা কখনই নিষ্ফল যায় না, তাতে সাত সমুদ্রের মতো বাধাও আসুক না কেন।

ভক্তি করার জন্য ভক্তের শরীর স্বভাব খুবই সহযোগী হয়। ভালো সংস্কারযুক্ত মাতা-পিতার দ্বারা জন্মানো সন্তানের শরীরে, মাতা-পিতার স্বভাবও অবশ্যই থাকে। এই সুলতান ইব্রাহিম পূর্বের জন্মে সম্মন মনিহারি ছিলেন এবং তিনি সদগুরু রূপী কাদির আল্লাহর সেবাতে নিজের পুত্র সেউকে কুরবানি দিয়ে ছিলেন এবং পরে তার মৃত পুত্রকে কবীর পরমাত্মা জীবিত করে দিয়েছিলেন, সেই সম্মন পরবর্তীতে রাজা হয়েছিল কিন্তু ভক্তি করেনি। এইবার সম্মনের ওই আত্মাকে এমন পিতার দ্বারা শরীর দিয়েছেন, যিনি জন্ম থেকেই পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ রূপে সমর্পিত ছিলেন। সম্মনের এই আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পরমেশ্বর অধম শাহের মধ্যে বিবাহ করার জন্য প্রবল প্রেরণা করিয়েছিলেন। রাজার মেয়েটির কোমায় থাকা, সমুদ্রে মুক্তা খোঁজ করা, বানজারা কাফেলার লোক রাস্তা ভুলে কুটীরে চলে যাওয়া, পরে তাকে জীবিত করা একটা লীলা ছিল। সুলতান ইব্রাহিমের জন্ম পাক বা পবিত্র আত্মা মেয়েটির দ্বারা হওয়া, যে এক জন ফকিরের (অধম শাহের) সাথে থেকে বৈবাহিক জীবন-যাপন করেছিল, যার কারণে উচ্চ বিচারে পরিণত হয়েছিল। সংসারের কোনো খারাপ প্রভাব কন্যাটির উপর পড়েনি। সদগুরুর জন্য নিজের পুত্র সেউয়ের বলিদান এবং নৌশেরখান রূপে অরব টাকা-পয়সা দান (জাকাত) দেওয়া। ওই জাকাতের ফলও জীবকে দেওয়ার ছিল। সেইজন্য কবীর পরমেশ্বর এই লীলা করেছিলেন। অধম শাহ ফকিরের ঠাকুরদাদা ওই বলখ শহরের বাদশা ছিলেন, যার রাজ্য একটি যুদ্ধের পর অব্রাহিমের দাদু (নানা) ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর সেই রাজ্য ওই বংশেরই সুলতান অব্রাহিম (ইব্রাহিম) প্রাপ্ত করেছিল। অধম শাহ ফকিরও ভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে, পরে পশুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন যে : -

এ সব খেল হমারে কিএ। হম সে মিলে সো নিশ্চয় জীয়ে॥

জো জন হমরী শরণ হৈ, তাকা হুঁ মৈঁ দাস। গেল গেল লাগ্যা ফিরুঁ, জব তক ধরতী আকাশ॥

সুলতান ইব্রাহিমকে শরণে নেওয়া

{আল্লাহ আকবর জিন্দা বাবার (অল খিজ্র/খিজির) বেশ ধারণ করে বার-বার সুলতান ইব্রাহিমকে বুঝিয়েছেন।}

সম্মনওয়ালা জীবন পূর্ণ করে শরীর ত্যাগ করলেন। তারপর ওই সম্মনের জীবাত্মা পরের জন্মে নৌশেরখান পরে রাজা সুলতান ইব্রাহিম (অব্রাহিম) হলেন। ইরাকের অভ্যন্তরে বলখ নামের এক শহর ছিল, সেই শহর তার রাজধানী ছিল। ওই আত্মা, সম্মনের জীবনে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করেছিলেন তার কারণে মানব জীবন প্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন এবং যে দান ওই সময় করেছিলেন, তার প্রতিফল স্বরূপ রাজা হয়েই এসেছিলেন। সম্মনের ওই সময়ে সব থেকে বড় দান ছিল, তিন সের আটা, যা নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানি (বলিদান) দিয়ে করেছিলেন। সেই কারণে তিনি ধনী রাজাই হয়ে এসেছিলেন। নৌশেরখানের জীবনকালেও কবীর আল্লাহ (পরমাত্মা) কোনো এক কারণ বানিয়ে, নৌশেরখান দ্বারা দান করিয়ে ছিলেন। তার কারণেও বলখের ধনী রাজা হন। তার আঠারো লাখ ঘোড়া ছিল। হীরা-মুক্তা কম ছিল না। এক জোড়া জুতোতে আড়াই লাখ টাকার হীরা লাগানো থাকতো। বলা হয় তিনি ১৬ হাজার স্ত্রী রেখে মৌজ -মস্তি করতেন এবং শিকার করতে যেতেন। প্রচুর জীব হিংসা করতেন।

একদিন রাজার মহলের নিকট কোনো এক ভক্তের ঘরে কিছু সন্তের দল এসেছিল। তারা সৎসঙ্গ করলেন। রাজা নিজের মহলের ছাদে বসে সম্পূর্ণ সৎসঙ্গ শুনে,তার পরমাত্মার ভক্তি করার জন্য মনে প্রবল প্রেরণা হলো। প্রাতকালে মন্ত্রীকে ডেকে বললেন ভালো সন্তের সন্ধান করে, আমার সঙ্গে দেখা করাও।

এক ভণ্ড সাধু বাবা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। রাজাকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা তার বলা মার্গ অনুসারে ভক্তি করতে লাগলেন। রাজার আঙ্গুলে বহুমূল্য এক আংটি ছিল। ভণ্ড বাবা দেখাতো যে, সে ধন কখনো স্পর্শ করে না। মনে হতো যেন, সে কত ত্যাগী ও বৈরাগী কিন্তু ছিল ধুরন্ধর বা চতুর। সুলতানও তার প্রতি প্রভাবিত ছিলেন। ওই চতুর ভণ্ড বাবা নিজের শিষ্যকে বলল যে, রাজা ইব্রাহিম যে, স্বর্ণকারের নিকট হতে তার আংটি বানিয়েছেন ,তার নিকট হতে ওই প্রকার নকল সোনার ও নকল হীরা-মুক্তার একটি আংটি তৈরি করে আনো। পরে ঠিক একই প্রকার নকল আংটি তৈরি হয়ে গেল।

একদিন রাজা ওই সন্তের নিকট গেলেন। সন্ত তখন রাজার সাথে নৌকা ভ্রমণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সুলতান ইব্রাহিম অধম নৌকা ভ্রমণের প্রবন্ধ করে দিলেন। নদীর মাঝখানে নৌকা পৌঁছতেই বাবা বললো যে, রাজন! আপনার আংটি খুবই সুন্দর, একটু দেখান তো। রাজা আংটি খুলে বাবাকে দিলেন, বাবা তখন সেটি দেখতে লাগলো আর রাজার চোখে ফাঁকি দিয়ে আংটি বদলা-বদলি করে নিল। রাজা বললেন আপনার ইচ্ছা হলে আংটি টি নিতে পারেন আর তা না হলে আপনাকে আমি এই রকম অন্য একটি আংটি বানিয়ে দেবো। বাবা বললো, আরে সাধু-সন্তের নিকট এটি তো কেবল মাটি। এই বলে নকল আংটি টি নদীর জলে ফেলে দিলো।

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, বাস্তবেই এই গুরু হলেন ত্যাগী ও বৈরাগী। কিছুদিন পরে ওই ভণ্ড বাবার পোল খুলে গেল। তার চেলা (শিষ্য) রাজাকে বলে দিলো যে, আপনার আংটি এই ভণ্ড বাবা এই-এই ভাবে চালাকি করে আপনাকে ঠকিয়েছে আর আসল আংটি তাঁর কাছেই রয়েছে। যখন রাজা সেই আংটি টি ওই ভণ্ড সাধুর কুটীরে মাটির নীচে থেকে পেলেন, তখন খুবই দুঃখ পেলেন এবং সেইদিন থেকে সাধু-সন্তের প্রতি বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে উঠে গেল আর ওই ভণ্ড সাধুকে তিনি জেলে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর থেকে রাজা তাঁর রাজ্যের সমস্ত সাধু-সন্ত-মহন্তদের ডেকে ডেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, যদি আপনি খুদাকে পেয়েছেন, তাহলে আমার সাথেও সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, এর উত্তর কারোর কাছে ছিল না। এক সন্ত বললেন, আমি খুদার সন্ধান দেব কিন্তু প্রথমে আপনি এক গ্লাস দুধ কাউকে আমার সামনে আনতে বলুন। চাকর দ্বারা দুধের গ্লাস আনা হলো। সন্ত, দুধের মধ্যে আঙুল রেখে রাজাকে বললেন, রাজন! এই দুধে তো ঘি নেই। রাজা বললেন, দুধ থেকে ঘি প্রাপ্ত করার একটা বিধি রয়েছে। প্রথমে দুধ গরম করতে হয়, তারপর সেই দুধ যখন হালকা গরম থাকবে, তখন সামান্য দইয়ের জাওন দিয়ে জমানোর জন্য রেখে দিতে হয়, তারপরে দই তৈরি হয়। এরপর সেই দইকে মন্থন করলে মাখন তৈরি হয় আর সেই মাখনকে আগুনে গরম করলে, তারপর ঘি তৈরি হয়। সেই সন্ত বললেন, সুলতান! যেমন দুধ থেকে ঘি প্রাপ্ত করার জন্য একটা বিধি রয়েছে। ঠিক এইরূপ মানব শরীর দ্বারা খুদাকে প্রাপ্ত করার বিধি রয়েছে। সেই বিধি দ্বারাই খুদা প্রাপ্ত হয়। সেই বিধি প্রাপ্তি করার জন্য গুরু ধারণ করে, তাঁর বলা অনুসারে সাধনা করুন।

রাজার মনে গুরুর প্রতি ঘৃণা ছিল। তাই তিনি সকলকে সেই দৃষ্টিকোণ দ্বারা দেখছিলেন, তিনি সমস্ত সাধুদের জেলে পুরে দিলেন। সবাইকে দিয়ে যাঁতা ঘোরাতেন। সমস্ত সাধু-সন্ত পরমাত্মার জন্যই তো ঘর-পরিবার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু সঠিক ভক্তির মার্গ না পাওয়ার কারণে, নিজেদের মহিমা প্রাপ্তির ইচ্ছায়, অধিক থেকে অধিক

শিষ্য কিভাবে বানানো যায়, বড় আশ্রম কিভাবে তৈরি করা যায়, এই ধরনের প্রচেষ্টায় লেগে যান কিন্তু তারা পরমাত্মার প্রিয় আত্মা হন। তারা পরমেশ্বরের জন্য প্রয়াসশীল হন তাই পরমাত্মার কৃপা তাদের উপর থাকে। তাদেরকে সত্যজ্ঞান দেওয়ার জন্য, পরমাত্মা অন্য বেশ ধারণ করে এসে, তাদেরকে বোঝান কিন্তু কালের জালে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, তারা বিশ্বাস করে না যে, পরমেশ্বর সকলের পিতা। তিনি বালক ভেবে সকলকে ক্ষমা করতে থাকেন, এরপরেও তিনি তাদের সাহায্য করতে থাকেন।

লীলা নং ১ :- জেলে কারাগারে দুঃখী ভক্তদের ডাক শুনে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এবং নিজের পরম ভক্ত সম্মনকে কালের জাল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর কবীর জী একটা মহিষের পিঠের উপর বসে, সুলতান অব্রাহীম অধমের রাজ দরবারে (কার্যালয়ে) পৌঁছে গেলেন।

সাধু বেশে পরমেশ্বরকে দেখে অব্রাহিম সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন? কবীর পরমেশ্বর বললেন যে, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছি। অব্রাহিম প্রশ্ন করলেন যে, আমাকে বলুন আল্লাহ দেখতে কেমন? যদি খুদার সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করেছেন, তাহলে আমাকেও সাক্ষাৎ করান। তারপর কবীর পরমেশ্বর একটা মহিষকে বললেন যে, বলে দে মহিষ! আল্লাহ কে? কোথায় থাকেন? খুদার কসম সত্য বলবি। মহিষটি মানুষের মতো বললো যে, অব্রাহীম! আমার উপর যিনি বসে রয়েছেন, তিনিই হলেন আল্লাহু আকবর। সুলতান অব্রাহিম মহিষটিকে কথা বলতে দেখে, আশ্চর্য হলেন এবং মুগ্ধও হলেন। ভাবতে লাগলেন, এ কোনো অলৌকিক কিছু হতে পারে। এরপর পরমেশ্বর মহিষ সহ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অব্রাহিমের মাথায় চক্কর এসে গেল। এরমধ্যেই পরমাত্মা জেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কারাগারের সৈন্যদের পূর্বে আদেশ দেওয়া ছিল যে, কোনো স্থানে সাধু দেখলেই, তাদের জেলে ঢুকিয়ে দেবে। এর জন্য তারা পরমাত্মাকেও জেলে ঢুকিয়ে দিলো।

সৈন্যরা বলল যে, যাঁতা চালাও। অন্য সব সাধুরাও যাঁতা চালিয়ে আটা পিষছিলেন ও কাঁদছিলেন। কবীর জী সৈন্যদের বললেন, আমরা কয়েদিরা একটি কাজ করব আর একটি কাজ সিপাহীরা করবে। আমরা যদি যাঁতা চালাই, তাহলে যাঁতাতে দানা (গম, ছোলা, বাজরা) সিপাহী ঢালবে কিংবা আমরা যদি দানা ঢালি, তাহলে সিপাহী তোমরা যাঁতা চালাবে।

এরপর সিপাহী ক্রোধিত হয়ে বলল, আমরা দানা ঢালবো আর তুমি যাঁতা চালাবে। এইকথা শুনে কবীর পরমেশ্বর বললেন, সব সাধুরা উঠে দাঁড়াও। এই বলে তিনি তাঁর নিজের যাঁতাতে লাঠি লাগিয়ে দিলেন। ওই সময়েই সমস্ত (360 টি) যাঁতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে লাগলো। পরমাত্মা বললেন, সৈনিক ভাই! দানা ঢালো আর পিষে নাও যত দরকার হয় ততো আর সাধুদের বললেন যে, সকলে চোখ বন্ধ করো। এরপর সকলে চোখ বন্ধ করলেন। পরে পরমেশ্বর সকলকে চোখ খুলতে বললেন। চোখ খুলতেই সবাই জেলের বাইরে বলখ শহর থেকে দূরে এক জঙ্গলে নিজেদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। পরমেশ্বর কবীর বললেন, তোমরা এই রাজার রাজ্য ত্যাগ করে, অনেক দূরে চলে যাও। সমস্ত ভক্তগণ পরমেশ্বরকে প্রণাম করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে অন্য দূরের রাজ্যে চলে গেলেন। রাজা জানতে পারলেন যে, এক সিদ্ধ ফকির এসেছিলেন ও সকল বন্দীদের ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন কিন্তু কোনো সিপাহী যেতে দেখেনি। একটা চাক্কিতে লাঠি লাগাতে সমস্ত (৩৬০ টি) চাক্কি চলছিল। রাজা জেলে পরিদর্শনের জন্য গেলেন এবং চলন্ত অবস্থায় সমস্ত চাক্কি ঘুরতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এরপর চাক্কি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর রাজা নানান বিচারে মগ্ন হয়ে গেলেন।

লীলা নং ২ :- কিছুদিন পর পরমেশ্বর কবীর জী এক উট পালক গ্রাম্য ব্যক্তির বেশ ধারণ করে, হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে রাজ মহলের ছাদের উপর প্রকট হলেন। ওই সময় রাত্রি ছিল আর রাজা ঘুমাচ্ছিলেন। পরমাত্মা লাঠি দিয়ে ছাদের উপর জোরে জোরে ঠক ঠক করে আওয়াজ শুরু করলেন। এই আওয়াজে সুলতান অব্রাহিম জেগে গেলেন আর তক্ষুনি চাকরদের ক্রোধভরা স্বরে ধমক দিয়ে বললেন, উপরে কে আছে, যে এইরকম শব্দ করছে? তাকে ধরে নিয়ে এসো। চাকর উপরে গেলেন এবং উট পালক রূপী বেশধারী পরমাত্মাকে ধরে সুলতানের সামনে হাজির করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কে? আর আমার রাজ প্রাসাদের ছাদে কি করছিস?

পরমেশ্বর বললেন, আমি একজন উট চারণকারী। আমার একটি উট হারিয়ে গেছে, তাই আপনার ছাদে সন্ধান করছিলাম। সুলতান অধম বললেন, হে ভোলে বান্দা! ছাদের উপর উট কিভাবে চড়তে পারে? এটা না তো কখনও হয়েছে আর না কখনো হতে পারে। কোনো জঙ্গলে গিয়ে উটকে খোঁজ করো।

পরমেশ্বর কবীর বললেন, হে অব্রাহিম! যেমন উট ছাদের উপরে হয় না আর না ছাদের উপর কখনো খোঁজ করলে পাওয়া যায়, অতএব উটকে জঙ্গলে খোঁজ করা উচিত। ঠিক এইপ্রকার পরমাত্মাকে রাজ সিংহাসনে বসে এবং ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ করে পাওয়া যায় না, তাঁকে সাধু-সন্তদের মধ্যে খোঁজ করলে পাওয়া যায়। এই কথা

বলে, কবীর পরমেশ্বর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সুলতান অব্রাহিম অধম এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মন্ত্রী ও রাণীরা মিলে ঝাঁড়-ফুঁক করা একজন তান্ত্রিককে ডাকলেন। তিনি রাজার ডান হাতে একটি তাবিজ বেঁধে দিয়ে বললেন, রাজার উপর ভূত-প্রেতের ছায়া আছে, ঠিক হয়ে যাবে। এদিকে রাজ্য শাসনে রাজার মন বসছে না, সর্বদা উদাস থাকতে লাগলেন আর এর মধ্যে পুনরায় আরো কয়েকজন সাধু-সন্তদের তিনি জেলে বন্দী করে দিলেন।

পরমেশ্বর পুনরায় জেলে গেলেন। একইভাবে তাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেন। এবার সমস্ত বন্দীদের বললেন, সবাই চোখ বন্ধ করো আর কিছু সময় আল্লাহর কথা চিন্তন করো, তারপরে যাঁতা চালাবো, তাহলে যাঁতা আপনা আপনিই চলতে থাকবে। সকল বন্দীরা দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে আল্লাহর চিন্তন করতে লাগলেন। পরমেশ্বর একটা যাঁতাতে লাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে দিতেই, সকল যাঁতা ঘুরতে লাগল।

পরমাত্মা কবীর জী সকলকে বললেন, চোখ খোলো। সবাই চোখ খুলতেই বলখ শহর থেকে জেলের বাইরে, অনেক দূরে এক জঙ্গলে নিজেদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। পরমেশ্বর বললেন, পুনরায় আর কখনও এই সুলতানের রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে না। এরপর থেকে রাজা সাধু-সন্তদেরকে জেলে ঢোকানো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু ভয়ের কারণে এরপর থেকে কোনো সাধু ও মহন্তরা ওই রাজ্যে যেতেন না। {কবীর পরমেশ্বরও এটাই চেয়েছিলেন যে, কোনো নকল গুরু যেন এই রাজ্যে না আসে আর রাজাকে ভ্রমিত করে যেন আমার (পরমাত্মার) নিকট হতে দূর না করে দেয়। এই কারণে তাদেরকে এই উপায়ে দূরে রাখা দরকার ছিল।} কিছু দিন পর সুলতান অব্রাহিম স্বাভাবিক হয়ে গেলেন এবং আমোদ -প্রমোদে হারিয়ে গেলেন।

লীলা নং ৩ :- পরমাত্মা কবীরজি নিজ গুণ অনুসারে পুনরায় একটি লীলা করতে এলেন। এক যাত্রীর বেশ ধারণ করে, কাঁখে একটা কাপড়ের গাঁঠরি (পুঁটলি) নিয়ে গ্রাম্য বেশভূষায় সন্ধ্যাবেলায় সুলতানের নিবাস স্থানে এলেন। সুলতান প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে উঠানে এক চেয়ারে বসেছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন? কবীর পরমেশ্বর বললেন যে, আমি একজন যাত্রী, তাই রাত্রি আপনার ধর্মশালায় (অতিথিশালায়) কাটাতে চাই। বলুন, এক রাত্রের ভাড়া কত নেবেন।

সুলতান অব্রাহিম অধম হেসে বললেন যে, হে সরল পথিক! এটা অতিথিশালা (ধর্মশালা) নয়, এটা তো আমার রাজমহল আর আমি এই শহরের রাজা। পরমাত্মা বন্দীছোড় দয়ার সাগর প্রশ্ন করলেন, আপনার পূর্বে এই মহলে কে থাকতেন? সুলতান অব্রাহিম অধম উত্তর দিলেন যে, আমার বাবা-ঠাকুরদাদা প্রমুখরা থাকতেন।

প্রভুর প্রশ্ন :- তারা এখন কোথায় আছেন? আমি তাদের দেখতে চাই।

সুলতান বললেন :- তাঁরা তো আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন।

পরমাত্মা প্রশ্ন করলেন যে, আপনি এই প্রাসাদে কতদিন থাকবেন? উত্তর দেবার সময় সুলতান ভেবে বললেন যে, আমাকেও তো একদিন মরতে হবে। পরমেশ্বর বললেন, হে সরল প্রাণী! এটা অতিথিশালা (ধর্মশালা) নয় তো আর কি আছে?

তেরে বাপ-দাদা পড় পীঢ়ী। বে বসে ইসী সরায় মেঁ গীদ্দী॥
এইসে হী তু চল জাঈ। তাতেঁ হম মহল সরায় বতাঈ॥
অব তু তখ্‌ত বৈঠকর ভুলী। তেরা মন চঢ়নে কো সূলী॥

এইটুকু বলেই পরমাত্মা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সুলতান অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলো। এবার অন্য মৌলবীকে ডাকা হলো। তিনি বাম হাতে একটি তাবিজ বেঁধে ঝাড়ফুঁক করে বললেন, এখন আর কিছু হবে না, এরপরে তিনি চলে গেলেন।

লীলা নং ৪ :- কিছুদিন পর রাজা স্বাভাবিক হয়ে পুনরায় আমোদ প্রমোদে মেতে উঠলেন। দিনের বেলায় বাদশাহ অব্রাহিম তার নিজের নৌলখা (যে বাগানে নয় লক্ষ ফলের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো থাকে, তাকে নৌলখা বাগ বলা হয়) বাগানে বিশ্রাম করতেন এবং তার বিছানা দাসীরা সুন্দর করে বিছিয়ে রেখে দিত। চারিদিকে ফুলের তোড়া রেখে দিত। এই দাসীদের পোশাক রাণীদের থেকে আলাদা হতো। সব চাকরাণী বা বান্দিদের পোশাক একই রকম হতো।

দীনদয়াল কবীর পরমেশ্বরকে (আল্লাহ) তাঁর প্রিয় আত্মা সম্মনকে কাল ভগবানের জাল থেকে বাঁচানোর জন্য কত প্রকারের উপায় না করতে হয়েছিল। একদিন পরমেশ্বর কবীর সাহেব দাসীর বেশ ধারণ করে রাজার বিছানা (সেজ) সাজালেন এবং বিছানার চারিপাশে ফুলের তোড়া দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন এবং তারপরে সেই বিছানাতেই শুয়ে পড়লেন। বাদশা অব্রাহীম এসে দেখলেন যে, তার বিছানায় এক বান্দি (দাসী) ঘুমিয়ে রয়েছে। রাজা ভাবলেন, এই চাকরানীর আমাকে মোটেই ভয় নেই? সুলতান ওই সময় চাবুক উঠিয়ে শুয়ে থাকা পরমেশ্বরের কোমরে

তিনবার চাবুক মারলেন। পরমেশ্বরের কোমরের ওই স্থানে তিনটি লাল দাগ পড়ে গেল, এমন কি চামড়া পর্যন্ত উঠে গেল। দাসী রূপে পরমেশ্বর বিছানা থেকে নেমে, প্রথমবার তো কান্নার অভিনয় করলেন। এরপরেই খুব জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। এতবার চাবুক মারার পরে দাসীকে হাসতে দেখে অব্রাহিম অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, এই রকম মারার পর তো এই বান্দির অজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত আর তা না হলে মৃত্যু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। রাজা দাসীর বেশধারী পরমাত্মার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে দাসী! হাসছিস কেন?

পরমাত্মা বললেন, আমি এই বিছানায় কেবল এক দন্ড (২৪ মিনিট) বিশ্রাম করেছি আর এই এক দন্ড বিশ্রামের জন্য আমাকে তিনবার চাবুকের দণ্ড পেতে হয়েছে, এছাড়া আমার শরীরের চামড়াও উঠে গিয়েছে। আমি এই কারণে হাসছি যে, তাহলে যিনি এই খারাপ বিছানাতে (সেজ) দিনরাত বিশ্রাম করেন, তার কি দশা হবে? সেই কথা ভেবে তোমার প্রতি আমার করুনা হচ্ছে, হে ভোলা প্রাণী!

মৈঁয় এক ঘড়ী সেজ পর সোঈ। তাতে মেরা য়হ হাল হোঈ॥
জো সোবৈ দিবস ঔর রাতা। উনকা ক্যা হাল বিধাতা।
গৈব ভয়ে খবাসা। সুলতানী ভয়ে উদাসা।
য়হ কৌন ছলাবা ভাঈ। যাকা ভেদ সমঝ না আঈ।

এ দৃশ্য দেখে সুলতান অব্রাহিম অধম অজ্ঞান হয়ে গেলেন আর কিছুক্ষণ পরে সচেত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, এসব কি হচ্ছে? আমি বুঝতে পারছি না।

লীলা নং ৫ :- কিছুদিন পর মন্ত্রী ও রাণীরা পরামর্শ করে ভেবে বললেন, রাজাকে শিকারে নিয়ে যাও আর কয়েক দিন ওই জঙ্গলে থাকো, তাহলে রাজার মনের দুশ্চিন্তা কম হয়ে যাবে। অবশেষে এমনটিই করা হলো। প্রথম দিন দুপুর পর্যন্ত কোনো পশু শিকার না হওয়ার কারণে, রাজার ভালো লাগেনি। কারণ জঙ্গলে তো হরিণ দলে-দলে চলে কিন্তু আজ একটাও হরিণ দেখা যায়নি। হঠাৎ একটা হরিণ দেখতে পেয়ে রাজা বললেন যে, এই হরিণ যেন পালাতে না পারে। যার নিকট দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। দেখতে দেখতে হরিণটি রাজার ঘোড়ার নীচ দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে গেল। রাজা লজ্জায় পড়ে ঘোড়াটিকে হরিণের পিছু পিছু দৌড় করালেন। হরিণটি অনেক দূরে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। এদিকে রাজা ও তার ঘোড়ার খুবই তৃষ্ণা পায়, দুজনের প্রাণ যেন বেরিয়ে যাওয়ার মতো হয়। তাই জীবন বাঁচাতে আল্লাহর কাছে পানির জন্য দোয়া করতে লাগলেন। তার সাময়িক থাকার স্থানে ফিরে যেতে লাগলেন। সেই স্থান প্রায় এক ঘন্টা দূরত্বে ছিল। তাই জীবিত ফেরা কঠিন ছিল।

কিছুদূর এগিয়ে ডানে-বামে তাকিয়ে দেখলেন যে, দূরে এক জিন্দা ফকির বসে রয়েছেন। তার কাছাকাছি স্বচ্ছ জলের একটি ছোট জলাশয় ছিল। তার চারপাশে ফলদার বৃক্ষও ছিল। মিষ্টি ফল ধরেছিল। রাজা জীবন রক্ষার আলো দেখতে পেলেন। তিনি জল পান করলেন ও ফলও খেলেন। এরপর ঘোড়াকেও জল পান করিয়ে একটি গাছে বেঁধে দিলেন। জিন্দা বাবার দিকে যখন তাকালেন, তখন দেখলেন তাঁর নিকট তিনটি সুন্দর পুষ্ট কুকুর বাঁধা ছিল। একটি কুকুর বাঁধার শিকল (চেন = লোহার তৈরি শিকল) পাশেই রাখা ছিল।

সুলতান, ফকিরকে সালাম ওয়ালেকুম করলেন, উত্তরে তিনিও বললেন, ওয়ালেকুম সালাম। রাজা বললেন, হে ফকির! তিনটি কুকুর নিয়ে আপনি কি করবেন? এর মধ্যে থেকে দুটি কুকুর আমাকে দিয়ে দেন। ফকির বললেন, এই কুকুরগুলি আমি কাউকে দিতে পারব না। এদেরকে আমার পাঠ পড়াতে হবে। এই তিনজন (কুকুর তিনটি) বলখ শহরের রাজা ছিল। আমি এদেরকে বোঝাতাম যে, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো, এই সংসারে চিরকাল থাকবে না, মরার পরে কুকুরের জীবন প্রাপ্ত করবে। এখন তোমরা নান পুরী, পোলাও কাজু-কিশমিশ, মুনাক্কা-দাক্ষ, ক্ষীর, হালুয়া ও ফল খাচ্ছ। এটা তোমাদের পূর্বজন্মের পুণ্য ও ভক্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। যদি এই মানবজীবনে ভক্তি না করো, তাহলে কুকুর এবং অন্যান্য পশুর জীবনে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়ার জন্য এইরকম ভালো ভোজন পাবে না। এঁটো খাবার খেতে হবে, মল (বিষ্ঠা) খেতে হবে এবং নোংরা নালার জল পান করতে হবে। যখন রাজা ছিল, তখন আমার কথার উপর গ্রাহ্য করেনি। তারা এই কথা ভাবত যে, এই ফকির মূর্খ। ওই সময় ভাবত যে, ভক্তি করলে রাজ্য কে সামলাবে এবং রাণীদের কি হবে? এখন ওই তিনজন এই কুকুর হয়েছে। দেখো! আমি কাজু, বাদাম ও কিশমিশ দ্বারা তৈরি করা হালুয়া-ক্ষীর এদের সামনে রেখেছি, কিন্তু এদেরকে খেতে দিই না, কেবল দেখাতে থাকি। যখন এরা খাবার জন্য চেষ্টা করে, তখন এদের আমি পিটাই। এই বলে পরমেশ্বর পাশে খালি পড়ে থাকা শিকলটা উঠিয়ে, কুকুরগুলোকে মারতে শুরু করলেন আর কুকুরগুলো যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো। পরমেশ্বর বললেন যে, খাবি হালুয়া, দাঁড়া! খাওয়াচ্ছি তোদের হালুয়া। তোদেরকে তো এঁটো শুকনো রুটির টুকরা দেবো। পরে রাজাকে ডেকে বললেন, ও ঘোড়াওয়ালা ভাই! এই যে খালি শিকল রয়েছে, বলো তো এই শিকলটা কিসের জন্য খালি রয়েছে? এটা

হলো, বলখ শহরে যে সুলতান অব্রাহিম ইবন অধম নামের বাদশা রয়েছে, সেই বাদশাও সংসার ও রাজ্যের সাজসজ্জা দেখে অন্ধ হয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। এখন সে মনে করতে পারছে না যে, মরার পরে তাকে কুকুরও হতে হবে। তাকে অনেকবার বুঝিয়েছি যে, ভক্তি করে নে, এই রাজমহল রূপী সরাইখানায় (ধর্মশালায়) চিরকাল থাকতে পারবি না কিন্তু তার তো খুদার প্রতি কোনো ভয়ই নেই। সে তো নিজেই খুদা সেজে নির্দোষ সাধু-সন্ত ও ফকিরদের শাস্তি দিচ্ছে। আমি দূরে আছি, তাই বেঁচে রয়েছি। ওই বাদশা মরবে আর ভক্তি না করার কারণে যখন কুকুর হবে, তখন তাকে আমি এনে এই শিকলে বেঁধে দেবো।

জিন্দা ফকিরের মুখ থেকে এসব কথা শুনে কুকুরের রূপে তার পূর্বপুরুষদের দুর্দশা দেখে, অব্রাহিম কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হে ফকির বাবা! বলখ শহরের রাজা আমিই। আমাকে ক্ষমা করে দেন। এই বলে ফকিরের চরণের পড়লেন। চরণে পড়ার কিছুক্ষণ পরে উঠেই দেখলেন, না সেখানে জিন্দা বাবা ছিল, না জলাশয়, না বাগান, না কুকুরগুলি ছিল। সুলতান এই ঘটনাকে স্বপ্নও ভাবতে পারেন নি, কেননা ঘোড়ার চারটি পা তখনও জলে ভেজা ছিল। কিছু ফল ছিড়ে রেখেছিলেন , সে ফলগুলোও সাথে সুরক্ষিত রাখা ছিল। সুলতানের বুঝতে বেশি সময় লাগেনি আর তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় পিঠে চড়ে সাময়িক থাকার স্থানে পৌঁছে গেলেন আর মুখ দিয়ে একটা কথাও বলতে পারলেন না। জিনিসপত্র গুছিয়ে শহরের দিকে ফেরার জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার কাফেলা বলখ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

লীলা নং ৬ :- রাজ্যপ্রাসাদে ফিরে একটি রুমে বসে সুলতান কাঁদতে লাগলেন। রানী ও মন্ত্রী সকলে বোঝাতে চাইলেন যে, এইসব তো এমনি ঘটতেই থাকে। মুখ্য রাণীরা বলতে লাগলেন যে, এমন ঘটনা তো মহিলাদের সঙ্গে ঘটে, আপনি তো পুরুষ, আপনি মনে সাহস রাখুন। আপনি তো প্রজাদের অভিভাবক।

ওই সময় এক কুকুর সেখানে এলো, তার মাথায় ঘা হয়ে গিয়েছিল আর সেই ঘায়ে পোকা পড়ে, কুড়ে-কুড়ে খাচ্ছিল। কুকুরটি বলল, হে সুলতান অব্রাহিম! আমিও কোনো এক সময়ে রাজা ছিলাম। আজ পর্যন্ত আমি যত প্রাণী শিকার করেছি অর্থাৎ মেরেছি ও যুদ্ধে যত সৈন্যদের হত্যা করেছি, আজ তারা সেই প্রতিশোধ নিচ্ছে। আমার মাথাতে পোকা হয়ে তারা কুড়ে-কুড়ে খাচ্ছে কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। এই পরিস্থিতি তোরও হবে। নিজের ভবিষ্যত দেখে নে, তোর পিছনে পিছনে স্বয়ং খুদা (আল্লাহ) ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুই পরিবার ও রাজ্য শাসনের মায়াতে পড়ে, নিজের জীবন নষ্ট করছিস। (এই লীলাও স্বয়ং পরমেশ্বরের অর্থাৎ কবীর আল্লাহর ছিল। এটি ছিল অন্তিম ঝটকা ও সতর্কবার্তা, কারণ অব্রাহিমকে এই মায়াজাল থেকে উদ্ধার করার ছিল।)

ওই রাতেই মুখে কালি মেখে, একটি শাল জড়িয়ে নিলেন এবং হাতে একটা বালিশ, একটি লোটা (ঘটি), একটা পাতলা গদি অর্থাৎ বিছানা নিয়ে কমদ দড়ির সাহায্যে মহলের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। (কমদ = একটি মোটা দড়ি যাতে প্রতি দুই ফুট অন্তর অন্তর একটা গাঁট লাগানো থাকে, যার দ্বারা বিপদের সময় ছাদ থেকে নীচে নামার জন্য কাজে লাগে।)

লীলা নং ৭ :- সারা রাত রাস্তায় চলতে চলতে অব্রাহিম ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি এক মালিনীকে বাগানের বাইরে কুল বিক্রি করতে দেখে কুলের দাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মালিনী বললেন, এক সের কুলের দাম কেবল এক আনা। (১৬ আনাতে এক টাকা হয়, এক সেরে হয়, এক কিলোগ্রাম)। ওই সময় আনা চলত। রাজার কাছে কেনার জন্য আনা ছিল না। তিনি যে জুতা পড়েছিলেন, ওই সময় ওই দুটি জুতোর দাম ছিল, আড়াই লাখ টাকা। কেননা তার উপরে হীরা ও পান্না জড়ানো ছিল।

রাজা বললেন, আমার কাছে এক আনা বা টাকা নেই। এই জুতা আছে, এর দাম আড়াই লাখ টাকা। এই দুটো জুতো নিয়ে নাও, আমি খুব ক্ষুধার্ত আর আমাকে এক সের কুল ওজন করে দাও। মালিনী এক সের কুল ওজন করে অব্রাহিমের চাদরে ঢালতে গেল, তখন একটি কুল নীচে পড়ে গেল। ওই কুল উঠানোর জন্য মালিনী যখন হাত বাড়ালো, অব্রাহিম তখন সেই কুল মালিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলেন। দুজনেই নিজের নিজের কুল বলে দাবি করতে লাগলেন।

ওই সময়ই কবীর পরমেশ্বর প্রকট হয়ে বললেন, হে অজ্ঞানী! এ তো মূর্খ, যার এতটাও বিবেক নেই যে, একটা কুলের পিছন ওই ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করছে, যে ব্যক্তি আড়াই লাখ টাকার জুতো ছেড়ে দিয়েছে। এরপর রাজাকে বললেন, আরে মূর্খ! আড়াই লাখ টাকার জুতো ছেড়ে দিতে পারছিস আর এক পয়সার কুল নিয়ে ঝগড়া করছিস, এটা তোর কোন ধরনের ত্যাগ? বিবেক দ্বারা কাজ কর। এই কথা বলে, পরমাত্মা সুলতান অধমের মুখে এক চড় মেরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জীবনের যাত্রা এই রকমও হতে পারে :- সুলতান এগিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন যে, এক দরিদ্র লোক,

একটি মাটির ঢেলার উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, ওই সময় সুলতান বালিশ ও বিছানা ফেলে দিলেন। এরপর এগিয়ে গিয়ে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি হাতে করে নদীর জল পান করছেন। এই দেখে জলের ঘটিও ফেলে দিলেন।

কালের গোলক ধাধাঁয় ফেঁসে থাকা ব্যক্তিকে বোঝানো :- রাস্তায় চলার পথে বৃষ্টি শুরু হল ও শীতল বায়ু বইতে লাগল। অব্রাহিম এক কুঁড়েঘর দেখতে পেলেন, যেটি এক কৃষকের ছিল। তার কাছে দুই বিঘা সেচবিহীন জমি ছিল ও একটি বৃদ্ধ গাভী ছিল, যে চার-পাঁচ বার প্রসব করেছিল, তার এক অন্ধ স্ত্রী ছিল। শীতল বায়ু প্রবাহের কারণে ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য, অব্রাহিম অধম সুলতান সেই কুঁড়েঘরের পেছনে শুয়ে পড়লেন। রাত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনে কথা বলছিলেন যে, বৃষ্টি হয়ে ভালোই হয়েছে। আমাদের খাওয়ার জন্যও ভাল ফসল পেকে ঘরে আসবে আর গরুর জন্য খাবারও অনেক হয়ে যাবে। আমাদের এমন ঠাঁট হয়ে যাবে, ওইরকম ঠাঁট বলখ বুখারের বাদশারও নেই।

সুলতান অব্রাহীম অধম এই সব কথাবার্তা শুনে ভাবলেন, এদের বুদ্ধির উপর অজ্ঞানের পাথর চেপে রয়েছে জেনে, তাদেরকে ভবিষ্যতে হওয়া দুঃখের সঙ্গে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে, সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাদের কুঁড়েঘরের দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অব্রাহিম তাদের ভক্তি করার প্রেরণা এবং মায়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জ্ঞান দিতে লাগলেন আর বললেন যে, আপনার কাছে একটি গরু, এক স্ত্রী ও দুই বিঘা জমি রয়েছে। আপনারা এইসব আঁকড়ে বসে রয়েছেন আর এটাকেই বলখের রাজার থেকেও অধিক ঠাঁট মনে করছেন? এসব তো কয়েক দিনের মেলা। চলুন আপনাদেরকে আমি আমার গুরুজির নিকট হতে উপদেশ দিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে আপনাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমিই বলখ শহরের সুলতান অব্রাহিম অধম। আমি ওই রাজ্য ত্যাগ করে পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে চলছি।

তারা বললেন যে, আমাদের তো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আপনি বলখ শহরের বাদশা। যদি তাই হয়, তাহলে আপনার মতো মূর্খ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। অতএব আপনার শিক্ষার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। সুলতান বললেন :-

গরীব, এক রান্ডী (স্ত্রী) ঢান্ডী (গাভী) না তজেঁ , য়ে নর কহিয়ে কাগ।
বলখ বুখারা তজ দিয়া, য়হ কুছ পিছলী লাগ॥

এরপর অব্রাহীম অধম পৃথিবীর তো সুলতান আর রইলেন না কিন্তু ভক্তির সুলতান তিনি অবশ্যই হয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ ভক্ত রাজ হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণে তাকে সুলতান বা ভালোবেসে সুলতানী নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরপর থেকে তার বিষয়ে কেবল সুলতান নামই লেখা হবে। ধর্মদাস জী পরে ধনী ধর্মদাস নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ভক্তির ধনী ছিলেন। এমনকি সংসারের ধনেরও তার কাছে কোনো অভাব ছিল না, সুলতানকে আল্লাহ (পরমেশ্বর) দেখা দিলেন এবং প্রথম মন্ত্র দিয়ে বললেন যে, এরপরে তোমাকে সতনাম দেব ও তারপর সার শব্দ দেব।

কবীর সাগরের অধ্যায় "সুলতান বোধ" পৃষ্ঠা নং ৬২-তে প্রমাণ রয়েছে :-

প্রথম পান প্রবানা লেঈ। পীছে সার শব্দ তোঈ দেঈ॥
তব সতগুরু নে অলখ লখায়া। করী পরতীত পরম পদ পায়া॥
সহজ চৌকা কর দীনহা পানা (নাম)। কাল কা বন্ধন তোর বগানা॥

বিচার করুন :- ওই সময় অব্রাহিমের কাছে না তো আরতি চৌকা করার মতো কোনো ধন ছিল আর না অন্য কোনো সুবিধা ছিল। এটাই হল কবীর পরমাত্মার যথার্থ দীক্ষার বিধি। এখানে আরতি চৌকা করতে লাখ ও হাজার হাজার টাকার জিনিস, নারকেল ইত্যাদির কোনো প্রাবধান নেই। এটা তো পরে যদি কেউ পাঠ করাতে চায়, তাহলে করাতে পারে, অন্যথায় দীক্ষা বিধি কেবল মন্ত্রিত জল ও মিষ্টি পদার্থ (মিশ্রি-চিনি, গুড়, নকুলদানা) দেওয়া যেতে পারে। সত্যনাম ও সার শব্দে পানীয় (পানীয় দ্রব্য) দেওয়া হয় না। কেবল দীক্ষা মন্ত্র বলা হয় ও বোঝানো হয়। সন্ত গরীবদাস জীর (গ্রাম- ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর, হরিয়ানা রাজ্য) সঙ্গে কবীর পরমেশ্বর সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁকে দৃব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। তারই আধারে সন্ত গরীবদাস জী বলেছিলেন যে:-

গরীব, হম সুলতানী নানক তারে, দাদূ কুঁ উপদেশ দিয়া। জাতি জুলাহা ভেদ না পায়া, কাশী মাহীঁ কবীর হুয়া॥
গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতী নহীঁ ভার। সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ। কুল কে সিরজনহার॥

"অব্রাহিম অধম সুলতানের বিষয়ে সন্ত গরীবদাস জীর বিচার"

কবীর পরমেশ্বর নিজের শিষ্য গরীবদাস জীকে বলেছিলেন যে :-

☆সুনত জ্ঞান গলতানা, পদ পদে সমানা॥ টেক॥
অমর লোক সে সতগুরু আয়ে, রূপ ধরয়া করবাঁনা।

ঢুঁঢ়ত উঁট মহল মেঁ ডৌঁলে, বুঝত শাহ বিয়ানা। (টেক)
কহা কবীর হম কারবান হোয় আয়ে। মহলৌঁ পর উঁট বতায়ে॥১॥
বোলে পাদশাহ সুলতানাঁ, তুঁ রহতা কহাঁ দিবানাঁ॥২॥
দুজৈ কাসিদ গবন কিয়া রে। ডেরা মহল সরায় লিয়া রে॥৩॥
জব হম মহল সরায় বতাঈ। সুলতানী কুঁ তাবর আঈ॥৪॥
অরে তেরে বাপ দাদা পড় পীঢ়ী। য়ে বসে সরায় মেঁ গীদী॥৫॥
ঐসে হী তুঁ চল জাঈ। য়ৌঁ হম মহল সরায় বাতাঈ॥৬॥
অরে কোঈ কাসিদ কুঁ গহ ল্যাবৈ। ইস পণ্ডিত খানে ধ্যাবৈ॥৭॥
উঠে পাদশাহ সুলতানা। বহাঁ কাসিদ গৈব ছিপানা॥৮॥
তীজে বান্দী হোয় সেজ বিছাই। তন তীন কোরড়ে খাঈ॥৯॥
তব আয়া অনহদ হাঁসা। সুলতানী গহে খবাসা॥১০॥
ম্যাঁয় এক ঘড়ী সেজাঁ সোই। তাতৈঁ মেরা য়ৌহ, হবাল হোঈ॥১১॥
জো সোবৈঁ দিবস অরু রাতা। তিন কা ক্যা হাল বিধাতা॥১২॥
তব গৈবী ভয়ে খবাসা। সুলতানী হুয়ে উদাসা॥১৩॥
য়ৌহ কৌন ছলাবা ভাঈ। য়াকা কছু ভেদ ন পাঈ॥১৪॥
চৌথে যোগী ভয়ে হম জিন্দা। লীনহেঁ তীন কুত্তে গল ফন্দা॥১৫॥
দিনহী হম সাঁকল ডারী। সুলতানী চলে বাগ বাড়ী॥১৬॥
বোলে পাতশাহ সুলতানা। কহা সে আয়ে জিন্দ দিবানা॥১৭॥
য়ে তীন কুত্তে ক্যা কিজে। ইনমেঁ সে দোয় হম কুঁ দিজে।১৮॥
অরে তেরে বাপ দাদা হৈঁ ভাই। ইন বড় বদফৈল কমাই॥১৯॥
য়হাঁ লোহ লঙ্গর শীশ লগাই। তব কুত্যৌঁ ধূম মচাই॥২০॥
অরে তেরে বাপ দাদা পড় পীঢ়ী। তুঁ সমঝে ক্যুঁ নহী গীদী॥২১॥
অব তুম তখ্‌ত বৈঠকর ভূলী। তেরা মন চঢ়নে কুঁ শূলী॥২২॥
যোগী জিন্দা গৈব ভয়া রে। হম না কুছ ভেদ লহ্যা রে॥২৩॥
বোলে পাদশাহ সুলতানা। জহাঁ খড়ে অমীর দিবানা॥২৪॥
য়েহ চ্যার চরিত্র বীতে। হম না কছু ভেদ ন লীতে॥২৫॥
বহাঁ হম (কবীর) মার্‌'য়া জ্ঞান গিলোলা। সুলতানি মুখ নহীঁ বোলা॥২৬॥
তব লগে জ্ঞান কে বানা। ছাড়ী বেগম মাল খজানা॥২৭॥
সুলতানী যোগ লিয়া রে। কবীর সতগুরু উপদেশ দিয়া রে॥২৮॥
ছোড়া অঠারা লাখ তুরা রে। সব লাগ্যা মাল বুরা রে॥২৯॥
ছোড়ে গজ গৈঁবর জল হোড়া। অব ভয়ে বাট কে রোড়া॥৩০॥
সংগ সোলহ সহংস সুহেলি। এক সে এক অধিক নবেলি॥৩১॥
গরীব, অঠারহ লাখ তুরা তজ্যা, পদমনী সোলহ সহংস।
এক পলক মেঁ ত্যাগ গয়ে, সো সতগুরু কে হংস॥৩২॥
গরীব, এক রান্ডী - ঢান্ডী না তজৈঁ, য়ে নর কহিয়ে কাগ।
বলখ বুখারা ত্যাজ দিয়া, যথ কুছ পিছলী লাগ॥৩৩॥
ছোড়ে মীর খান দীবানা, অরবোঁ খরব খাজানা॥৩৪॥
ছোড়ে হীরে হিরম্বর লালা। সুলতানী মোটে তালা॥৩৫॥
জিন লোগ পরগনাঁ ত্যাগা। সুন শব্দ অনাহদ লাগ্যা॥৩৬॥
পগড়ী কী কৌপীন বনাঈ। শালৌঁ কী অলফী লাঈ॥৩৭॥
শীষ কিয়া মুঁহ কারা। সুলতানী তজ্যা বুখারা॥৩৮॥
গণ গন্ধর্ব ইন্দ্র লরজে। ধন্য মাত পিতা জিন সিরজে॥৩৯॥
ভয়া সপ্তপুরী পর সাকা। সুলতানী মারগ বাঁকা॥৪০॥

জিন পাঁচৌঁ পকড় পছাড়ু'য়া। ইনকো তো দে দিয়া বাড়া॥৪১॥
সুন্ন শব্দ অনাহদ রাতা। জহাঁ কাল কর্ম নহী জাতা॥৪২॥
নহী কচ্ছ মচ্ছ কুরম্ভা। জহাঁ ধৌল ধরণি নহী থম্ভা॥৪৩॥
নহী চন্দ্র সুর জহাঁ তারা। নহী ধৌল ধরণি গৈনারা॥৪৪॥
নহী শেষ মহেশ গণেশা। নহী গৌরা শারদ ভেষা॥৪৫॥
জহাঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু না বাণী। নহী নারদ শারদ জানী॥৪৬॥
জহাঁ নহী রাবণ নহী রামা। নহী মায়া কা বিশ্রামা॥৪৭॥
জহাঁ পরসুরাম নহী পর্চা। নহী বলি বাবন কী চর্চা॥৪৮॥
নহী কংস কানহ কর্তারা। নহী গোপী গ্বাল পসারা॥৪৯॥
যৌহ আবন জান বখেড়া। যহাঁ কৌণ বসাবৈ খেড়া॥৫০॥
জহাঁ নৌ দশমা নহী ভাই। দুজে কুঁ ঠাহর নাঁহী॥৫১॥
জহাঁ নহী আচার বিচারা। নহী কোঈ শালিগ পূজনহারা॥৫২॥
বেদ কুরান ন পণ্ডিত কাজী। জহাঁ কাল কর্ম নহী বাজী॥৫৩॥
নহী হিন্দু মুসলমানা। কুছ রাম ন দুবা সলামা॥৫৪॥
জহাঁ পাতী পান ন পূজা। কোঈ দেব নহী হে দুজা॥৫৫॥
জহাঁ দেবল ধাম ন দেহী।চীন্ত্যো কৃ্যঁ না শব্দ সনেহী॥৫৬॥
নহী পিণ্ড প্রাণ জহাঁ শ্বাসা। নহী মের সুমের কৈলাশা॥৫৭॥
নহী সত্যযুগ দ্বাপর ত্রেতা। কহুঁ কলিযুগ কারণ কেতা॥৫৮॥
যৌহ তো অঞ্জন জ্ঞান সফা রে। দেখো দীদার নফা রে॥৫৯॥
নিঃবীজ সত নিরঞ্জন লোঈ। জল থল মেঁ রমতা সোঈ॥৬০॥
হৈ নির্ভয় নির্গুণ বীনা। সোই শব্দ অতীতম চীনহা॥৬১॥
অডোল অবোল অনাথা। নহী দেখ্যা আবত জাতা॥৬২॥
হৈ অগম অনাহদ সিন্ধা। যোগী নির্গুণ নিরবন্ধা॥৬৩॥
কছু বার পার নহী থাহম। সতগুরু সব শাহনপতি শাহম॥৬৪॥
উলটা পন্থ খোজ হে মীনা। সতগুরু কবীর ভেদ কহৈঁ বীনা॥৬৫॥
যৌহ সিন্ধু অথাহ অনুপং। কছু না ছায়া না ধূপং॥৬৬॥
জহাঁ গগন ধুঁনি দরবানী। জহাঁ বাজে সত্য সহিদানী॥৬৭॥
সুলতান অধম জহাঁ রাতা। তহাঁ নহী পাঁচ তত্ত কা গাতা॥৬৮॥
জহাঁ নির্গুণ নূর দিবালা। কছু ন ঘর হৈ খালা॥৬৯॥
শীষ চঢ়ায় পগ ধরিয়া। য়োহ সুলতানী সৌদা করিয়া॥৭০॥
সতগুরু জিন্দা যোগ দিয়া রে। সুলতানী অপনা কিয়া রে॥৭১॥
কহৈ দাস গরীব পূর্ণ পীরা। সতগুরু মিলে কবীরা॥৭২॥

{সন্ত গরীবদাস জীর এই উপরোক্ত বাণীর অর্থ এই যে, এই বাণীর মধ্যেও সুলতান অব্রাহিম ইবন অধমের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে।}

"অব্রাহিম অধম সুলতানের পরীক্ষা"

সুলতান অব্রাহিম অধম একদিন এক সাধুর কুঁড়েঘর দেখলেন, তিনি কয়েক বছর ধরে ওই স্থানে সাধনা করছিলেন, অব্রাহিম তার কাছে গেলেন। সেই সাধক বললেন, এখানে থেকো না, এখানে খাবার ও জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, তুমি অন্য কোনো স্থানে চলে যাও। সুলতান অব্রাহিম বললেন, আমি তোমার অতিথি হয়ে এখানে আসিনি। আমি যার অতিথি (আল্লাহর অতিথি), তিনি আমার রিজিকের (খাবারের) ব্যবস্থা করবেন। মানুষ নিজের ভাগ্য সাথে নিয়ে আসে। কেউ কারোর খায় না। হে বেইমান! তুই তো একজন ভালো নাগরিকও নয়। তুই চাইছিস আল্লাহর সাথে দেখা হবে, যার বিচার ঠিক নেই, সে পরমার্থ করতে পারে না। পরমার্থ কর্ম না করে, খুদা পাওয়া সম্ভব নয়। যিনি জীবন দিয়েছেন, তিনি আহারও দেবেন। এই বলে অব্রাহিম কিছু দূরে গিয়ে বসে পড়লেন।

সন্ধ্যার সময় আকাশ থেকে একটি প্লেট নেমে এলো, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তরকারী, হালুয়া, ক্ষীর, রুটি এবং এক ঘটি জল ছিল। প্লেট সাজিয়ে তার উপর রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। অব্রাহিম প্লেট থেকে কাপড়টি তুলে

পুরানো সাধককে দেখালেন। ওই পুরানো সাধকের কাছেও আকাশ থেকে দুটি রুটি এসেছে, সেটি আবার যবের আটার এবং সাথে এক ঘটি জলও এসেছে।

এই দেখে পুরানো সাধক রেগে গিয়ে বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমার পাঠানো ভোজন আহার করবো না। আপনি তো ভেদাভেদ করেন, আমাকে তো শুকনো যবের রুটি দিয়েছেন আর অব্রাহিমের জন্য ভালো পোলাওযুক্ত ভোজন পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তালা আকাশবাণী করলেন যে, হে ভক্ত! এই অব্রাহিম একজন ধনী রাজা ছিলেন। এর কাছে অরব-খরব খাজানা, ১৬ হাজার রানী, সন্তান, ধনী (মন্ত্রী) ও দীবান (মুন্সী), চাকর-দাসীও ছিল। এই সুলতান আমার জন্য এমন বৈভব পূর্ণ জীবন ছেড়ে এসেছে, একে আমি কেনই বা দেবো না, বল! তুই তোর মর্যাদায় থাক, তুই এক ঘাসী ছিলি। সারাদিন ঘাস কেটে কেবল এক টাকাই উপার্জন করতিস আর মাথার উপর বোঝা নিয়ে প্রতিদিন বয়ে মরতিস। তোর না স্ত্রী ছিল, না মাতা ছিল, আর না তোর পিতা কোনো শেঠ বা ধনী ব্যক্তি ছিল। তোকে রান্না করা ভোজন পাঠাচ্ছি আর এরপরেও তুই অহঙ্কার করছিস? যদি তুই আমার দয়াতে সন্তুষ্ট না থাকিস, তাহলে অন্য কোথাও চলে যা। আর যদি ভক্তি থেকে বিমুখ হয়ে যাস, তাহলে তোর ঘাস খোঁড়ার জন্য নীরানি, কাঁছি অস্ত্র আর ঘাস বাঁধার জন্য জাল এই যে রাখা আছে, এখন যা আর ঘাস খুঁড়ে খুঁড়ে খা। তবে যদি কিছু অর্জন করতে চাস, তাহলে আমার কৃপা হতে বাইরে পা রাখিস না। ভক্তের মধ্যে যদি কখনো অভিমান হয়ে যায়, তাহলে সে পরমাত্মা থেকে অনেক দূরে চলে যায় আর যদি ভক্তের মধ্যে অধীন ভাব থাকে, তাহলে সে হক্কের (পরমেশ্বরের) নিকটে থাকে।

সুলতান অধম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যে, হে দাতা! আমি পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করবো এবং আপনার ভক্তিও করবো। আপনি এইপ্রকার ভোজন আর পাঠাবেন না। শুকনো খাবার খেয়ে কেবল আপনার চরণে থাকতে চাই। আপনি যে ভোজন পাঠাচ্ছেন, এই খাবার খেয়ে মনে দোষ আসবে আর সেই কারণে আমার দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যেতে পারে। অব্রাহিম সুলতানের এই প্রকার প্রার্থনা করা শুনে, পুরানো ভক্ত লজ্জাতে মাথা নীচু করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে প্রভু! আমার ভুল ক্ষমা করে দেবেন, আপনার কৃপাতেই আমি সুখী থাকবো। ওই দিন থেকে অব্রাহিম জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে আনত এবং পরে সেই কাঠ বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, ভোজনের সামগ্রী নিয়ে আসতেন এবং আট দিন পর্যন্ত তাই খেতেন ও ভক্তি করতেন।

"ভক্তের বিচার সম্পূর্ণ নির্মল হওয়া উচিত"

কয়েক বছর পর এক স্থানে অব্রাহিম ভ্রমণ করতে বেরোলেন। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির বাগান ছিল এবং সেই ধনী ব্যক্তির একজন চাকরেরও দরকার ছিল, তাই সুলতানকে ধরে এনে বাগান দেখার দায়িত্ব দিলেন। এক বছর পর ধনী ব্যক্তি তার বাগান দেখতে এলেন এবং অব্রাহিমকে তিনি কিছু ডালিম ছিঁড়ে আনতে বললেন। অব্রাহিম ডালিম ছিঁড়ে এনে দিলেন, সেই ডালিমগুলো খুব টক ছিল। ধনী ব্যক্তি বললেন, তুই এক বছরে এটাও জানতে পারলি না যে, মিষ্টি ডালিম কোনটি এবং কেমন হয়?

সুলতান বললেন, মালিক! আপনি আমাকে বাগান রক্ষার জন্য রেখেছেন, বাগান ধ্বংস করার জন্য নয়। যদি রক্ষকই ভক্ষক হয়ে যায়, তাহলে কিভাবে চলবে? আমি কোনোদিন তো কোনো ফল খেয়েই দেখিনি, তাহলে মিষ্টি-টকের জ্ঞান আমার কী ভাবে জানতে পারবো? ধনী ব্যক্তি যখন অন্য চাকরদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন অন্য চাকররা বললো যে, এই চাকর যে খাবার পেতো, ব্যাস! তাই খেয়েই বাগানের চারিদিকে ঘুরতো আর কিছু বিড় - বিড় করতে থাকত। আমরা গুপ্ত থেকেও দেখেছি কিন্তু এই ব্যক্তিকে কখনো কোনো ফল ছিঁড়ে খেতে দেখিনি, এমন কি নীচে পড়ে যাওয়া ফলও কখনো উঠিয়ে খেতে দেখিনি।

এক চাকর বললেন যে, ইনি বলখ শহরের রাজা ছিলেন। আমি ১০ বছর আগে তাকে জঙ্গলে শিকার করার সময় দেখেছিলাম। যখন আমি ইনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি বলখ শহরের সুলতান ইব্রাহিম অধম? প্রথমে তো ইনি অস্বীকার করেছিলেন, পরে বললাম আপনাকে আমি জঙ্গলে শিকার করতে দেখেছিলাম। আমার শ্যালক ইয়াকুব আপনার সেনাবাহিনীতে একজন বড় অধিকারী। সে আমাকে জানিয়েছে যে, রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এখন তারই পুত্র সিংহাসনে বসেছেন। তখন সুলতান আমাকে কাউকে বলতে মানা করে দেন। শেঠ এই কথা শুনে তার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং অনেক টাকা দিয়ে বললেন, আপনি এই টাকা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করুন এবং ভক্তিও করুন। আমার বাড়িতে থাকুন অথবা এই বাগানেই আপনাকে আমি মহল তৈরি করে দেবো, এখানে থেকেই আপনি ভক্তি করুন। সুলতান, শেঠকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

"দাসের পরিভাষা"

এক সময় সুলতান এক সাধুর আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সন্তের বিশেষ অনুরোধে সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। সাধুর নাম ছিল হুকুম দাস, তাঁর সঙ্গে বারোজন শিষ্যও থাকতেন। প্রত্যেক শিষ্যের নামের পিছনে দাস পদবি যুক্ত ছিল। ফকির দাস, আনন্দ দাস, কর্ম দাস, ধর্মদাস ইত্যাদি। কিন্তু তাদের আচরণ দাসের মতো ছিল না। তাঁদের গুরু একজনকে সেবা করতে বললে,

অপরজন বলত এইবার ধর্মদাসের পালা তাকে বলুন আর ধর্মদাস বলত এটা আনন্দ দাসের পালা। তাদের এই আচরণ দেখে সুলতান বললেন যে :-

"দাসা ভাব নেড়ে নহীঁ, নাম ধরায়া দাস।
পানী কে পীয়ে বিন, কৈসে মিট হৈ প্যাস॥"

সুলতান ওই শিষ্যদের বোঝালেন যে, আমি যখন রাজা ছিলাম তখন একজন ক্রীতদাসকে (গোলাম) কিনে এনেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি খেতে পছন্দ করো? দাস উত্তর দিলো, দাসকে যে খাবার মালিক দেবেন, সেটাই তার পছন্দ। এরপর বললেন, তোমার কি ইচ্ছা হয়? তুমি কোন কাজ করতে পছন্দ করো? সে বললো, যে কাজের আদেশ মালিক দেবেন, সেটাই আমার পছন্দ। তুমি কি পরিধান করো? সে বললো, মালিকের দেওয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরিধান করি। এরপর তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম, সাথে ধনও দিয়েছিলাম। তার সেই কথা মনে রেখে, আমি আমার গুরুর আদেশ পালন করি। আমি কখনই নিজের ইচ্ছায় চলি না, প্রভু যা দেন, তার আদেশ পালন করে আহার করি। আমি নিজেকে দাস মনে করে সেবা করি। পরমাত্মাকে খুশি করার জন্য, গুরুদেবকে প্রসন্ন করা খুবই অনিবার্য হয়। দাসের পরিভাষা জানার পর, সমস্ত শিষ্য তাদের গুরুজির আদেশ পালন করতে লাগলো এবং একে অপরের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে লাগল। এইভাবে জীবন সফল করেছিল।

"সুলতান অধমকে সারনাম কিভাবে প্রাপ্ত হল?"

পরমেশ্বর কবীরজি একটা আশ্রম বানিয়ে থাকতে লাগলেন। তিনি জিন্দা বাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুলতানকে প্রথম মন্ত্র দীক্ষার দেওয়ার কয়েক মাস পরে, সতনামের (দুই-অক্ষরের মন্ত্রের) দীক্ষা দিলেন, যার মধ্যে একটি মন্ত্র হল "ওম্" এবং অন্য নামটি উপদেশ নেওয়ার সময় বলা হয়। সুলতান বহুবার আশ্রমে পরমাত্মার দর্শনের জন্য আসতেন। সত্যনামের পরে যদি সারনাম প্রাপ্ত হওয়ার উপযোগী হয়, তখন সাধককে সারশব্দ দীক্ষা দেওয়া হয়। এক বছর পর সুলতান অধম গুরুর আশ্রমে (কুটীরে) গিয়ে বিনম্র হয়ে সারনাম দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন পরমেশ্বর বললেন, এক বছর পরে এই দিনেই এসো, আমি তোমাকে সারনাম দেব। তবে দর্শনের জন্য যে কোনো সময় আসতে পারো। সুলতান অব্রাহিম অধম ওই নির্ধারিত দিনে সারনাম নেওয়ার জন্য, গুরুদেবের কুটীরে উপস্থিত হলেন। সেদিনও গুরুদেব বললেন যে, আরো এক বছর পর এই দিনেই সারনাম দেওয়া হবে। এইভাবে এগারো বছর কাটিয়ে দিলেন, মাঝে মাঝে তিনি সদগুরুর দর্শন করতে আসতেন কিন্তু সারনামের জন্য নির্দিষ্ট দিনে আসতে হতো। এগারো বছর পরে সুলতান সারশব্দের দীক্ষা প্রাপ্ত করার জন্য আসছিলেন। পথে একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন ওই বাড়ির মালকিন উপর থেকে আবর্জনা গলির মধ্যে ফেলতে গিয়ে ভুল করে সেটি সুলতান ভক্তের উপর পড়ে যায়, তখন তিনি উঁচু গলায় বললেন, তুমি কি দেখতে পাওনা না? গলিতে মানুষও তো আসা যাওয়া করে? আজ যদি আমি রাজত্ব ছেড়ে না আসতাম, তাহলে তোর শরীরের চামড়া তুলে ফেলতাম।

সেই বোন ক্ষমা চেয়ে বললেন, হে ভাই! আমারই ভুল হয়েছে, আগে গলিতে দেখে নেওয়া উচিত ছিল, এরপর থেকে খেয়াল রাখবো। ওই বাড়ির বোনটিও জিন্দা বাবার ভক্ত ছিলেন। ওই ভক্তিমতী যখন সুলতান ইব্রাহিমকে আশ্রমে দেখলেন, তখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব! ওই নির্জনে যে ভক্ত বসে রয়েছেন, তিনি কি কখনো রাজা ছিলেন? জিন্দা বাবা বললেন, কেন কি হয়েছে, পুত্রী? এখানে তো রাজা আর ফকিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তুমি এই প্রশ্ন কিসের জন্য করলে? তবে উনি পূর্বে বলখ শহরের রাজা ছিলেন। আমি তাকে জ্ঞান বুঝিয়েছিলাম, তাই তিনি রাজ্য ত্যাগ করে দিয়েছিলেন পরে পরিশ্রম করে কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন ও ভক্তিও করতেন। সেই বোন বললেন, আমার দ্বারা ভুল করে ছাদের উপর থেকে শুকনো আবর্জনা তাঁর শরীরের উপর পড়ে গিয়েছিল, তখন ইনি ক্রোধিত হয়ে বলেছিলেন যে, আমি যদি আজ রাজ্য ত্যাগ না করতাম, তাহলে তোর চামড়া তুলে দিতাম। সৎসঙ্গ সমাপ্ত হওয়ার পর, যখন সার শব্দ প্রাপ্ত করার জন্য ভক্তদের ডাকা হলো। যখন সুলতান অব্রাহিমের পালা এলো, তখন গুরুদেব বললেন, তুমি তো এখনও রাজা রয়েছ, বাচ্চা! সারনাম তো দাস ভাবপ্রবণ ব্যক্তির (বিনম্র ভক্তকে) প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যারা শরীরকে মাটি মেনে নিয়েছে। সুলতান বললেন, গুরুদেব! রাজ্য তো ত্যাগ করেছি অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। গুরু মহারাজ বললেন, আমার কাছে কিছু লুকিয়ে থাকে না। তুমি রাজ্য ত্যাগ করেছ কিন্তু রাজত্ব ভাব ত্যাগ করোনি। তুমি এক বছর বাদে এই দিনে সারনামের জন্য আসবে। এক বছর পর সেই নির্ধারিত দিনে সুলতান পুনরায় আসছিলেন আর আশ্রমে আসতে হলে ওই বাড়ির পাশ দিয়েই আসতে হয়। গুরুদেব ওই শিষ্যাকে বললেন, আগামীকাল ওই রাজা সারনাম নিতে আসবে, আশ্রমে আসার জন্য তোমার বাড়ির নিকটবর্তী রাস্তা দিয়েই আসতে হয় আর অন্য কোনো রাস্তা নেই। এবার জলের মধ্যে গোবর-ছাই মিশিয়ে বালতি ভরে তার মাথায় ঢেলে দেবে, এরপরে তার প্রতিক্রিয়া কি হয়, সেই কথা আমাকে বলবে। সেই বোন ঠিক তেমনটি করল আর সাথে সাথে বলেও দিল যে, ভাই! ভুল করে পড়ে গিয়েছে! আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেব। আপনি এই পুকুরে স্নান করে নিন। এবার সুলতান বললেন, বোন! মাটির উপর মাটিই তো পড়েছে, ঠিক আছে, আমি স্নান করে নিজের কাপড় ধুয়ে নেবো। সুলতানের এই সকল প্রতিক্রিয়ার কথা ওই শিষ্যা গুরুদেবকে বললো।

এরপর পরমাত্মা কবীর সাহেব তাকে সারশব্দ দিয়ে বললেন, হে পুত্র! আজকে তুমি দাস হয়েছো এবং এখন তুমি মোক্ষ অবশ্যই প্রাপ্ত করবে।

এইজন্য ভক্তগণকে এই কাহিনী থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। সারনাম প্রাপ্তির জন্য তাড়াহুড়ো (শীঘ্রতা) করবেন না। নিজের মধ্যে সমস্ত বিকারগুলি আগে সমাপ্ত করুন ও বিবেক দ্বারা কাজ করুন, তাহলে মোক্ষ প্রাপ্তি নিশ্চিত।

"রাজা বড়, না ভক্ত রাজ বড়?"

একবার সুলতান অধম, বলখ শহরের বাইরে একটা পুকুরের কাছে গিয়ে বসলেন। ওই সময় তার পুত্র রাজা হয়েছিল। সে পিতার খবর শুনে, হাতির পিঠে চড়ে ব্যান্ড - বাজনা নিয়ে পুকুরের নিকট পৌঁছলেন আর পিতাকে ঘরে যেতে অনুরোধ করলেন। সুলতান ঘরে যেতে অস্বীকার করলেন। পুত্র বললেন, আপনার চেহারা কেমন বানিয়েছেন? আপনি এখানে রাজ প্রাসাদে ঠাঁট-বাঁট, মৌজ-মস্তিতে থাকবেন। ভিখারির মতো কেন কষ্ট পাচ্ছেন। আমার আদেশে সবকিছু হয়ে যায়। সুলতান বললেন, পরমাত্মা যা করতে পারেন, রাজা তা করতে পারে না। পুত্র বললেন, আপনি একবার আজ্ঞা করুন, আমি তাই করে দেবো কিন্তু আপনাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে। সুলতান বললেন, ঠিক আছে, স্বীকার করলাম। হাতে কাপড় সেলাই করা একটা সূঁচ আমি এই পুকুরে ফেলে দিচ্ছি, এই সূঁচটি জল থেকে বের করে আমাকে ফিরিয়ে দে। রাজা কিছু সিপাহীদের, ডুবুরিদের ও জেলেদেরকে ডেকে সূঁচ খোঁজার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু সব বৃথা হয়ে গেল। পুত্র বললেন, পিতা! একটা সূঁচের পরিবর্তে হাজার সূঁচ এনে দিচ্ছি। তবে আপনার আল্লাহ কি এই সূঁচ বের করে দেবেন? তখন সুলতান বললেন, হে পুত্র! যদি আমার আল্লাহ এই সূঁচ বের করে দেন, তাহলে তুমি কি ভক্তি করবে? সন্ন্যাস নেবে কি? পুত্র বললেন, আপনি প্রথমে আপনার প্রভুকে দিয়ে এই সূঁচ বের করান, তারপর ভাববো। সুলতান ইব্রাহিম বললেন, হে আল্লাহ তালার কন্যা মাছ! এই দাসের (আমার) একটা সূঁচ তোমার পুকুরে পড়ে গিয়েছে, আমার সূঁচটি বের করে আমাকে দেওয়ার কৃপা করো। কিছুক্ষণ পরে একটি মাছ মুখে করে একটা সূঁচ নিয়ে পুকুরের ধারে ইব্রাহিমের কাছে এলো, ইব্রাহিম সূঁচটি হাতে নিয়ে মাছটিকে হাত জোড় করে, নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালেন। পরে সুলতান বললেন, পুত্র! দেখ পরমাত্মা যা করতে পারেন, মানব কিংবা রাজা কখনও তা করতে পারে না। অতএব এখন কি ভক্তি করবে? পুত্র বললেন, আল্লাহ সূঁচই তো আপনাকে এনে দিয়েছেন, আমি আপনাকে হীরা- মুক্তা দিতে পারি আর ভক্তি তো আমি বৃদ্ধ অবস্থা এলেই করবো। এই কথা শুনে ভক্ত ইব্রাহিম উঠে নিজের গুহাতে চলে গেলেন।

"বিকার অর্থাৎ কাম, মোহ, ক্রোধ, বাসনা, নষ্ট হয় না, তবে শান্ত হয়ে যায়"

বিকার মরে না জানিয়ো, জ্যোঁ ভূভল মেঁ আগ। জব করেল্লই ধধকহী, সৎগুরু শরণা লাগ॥

এক সময় সুলতান ইব্রাহিম মক্কা শহরে গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, ভ্রমিত মুসলমান পূণ্যার্থীগণ মক্কাতে হজের জন্য বা এমনি পরিভ্রমণের জন্য আসতে থাকেন, তাদেরকে বোঝানো খুবই প্রয়োজন। তাদেরকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছুদিন সুলতান ইব্রাহিম মক্কায় থাকলেন। কয়েকজন শিষ্য বানালেন। কোনো এক হজ যাত্রী বলখ শহরে গিয়ে বলে দিল যে সুলতান ইব্রাহিম মক্কায় থাকেন। ছোট পুত্র তার পিতার দর্শনের জন্য জেদ ধরল, তখন তার মা-পুত্র এবং ওই নগরের কিছু নারী-পুরুষকে সাথে নিয়ে ইব্রাহিমের সাথে মক্কায় গিয়ে দেখা করলেন। ইব্রাহিম তার শিষ্যদের এই শিক্ষা দিতেন যে, বিনা দাড়ি -গোঁফ যুক্ত বালকের দিকে ও পরস্ত্রীর দিকে অধিক সময় পর্যন্ত দেখা উচিত নয়, এমনটি করলে তাদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়। নিজের পুত্রকে দেখে ধৈর্য ধরতে না পেরে, তিনি তার সন্তানের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলেন, তখন তার বালকের বয়স প্রায় ১৩ বছর ছিল। শিষ্যরা বললেন, গুরুদেব! আপনি তো আমাদের শিক্ষা দিতেন যে, দাড়ি-গোঁফহীন বালকের দিকে অধিক সময় তাকানো উচিত নয় কিন্তু আপনি তো স্বয়ং দেখছেন। ইব্রাহিম বললেন, জানিনা আমার আকর্ষণ কেন ওই ছেলেটির দিকে যাচ্ছে? ওই সময় এক বৃদ্ধ বললেন, মহারাজ! ইনি আপনার স্ত্রী (বেগম) এবং এই ছেলেটি আপনার পুত্র। আপনি যখন রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তখন এই পুত্র তার মায়ের গর্ভে ছিল, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ওই সময় বালকটি পিতার চরণ ছুঁয়ে, পিতার কোলে বসে পড়লো। ইব্রাহিমের চোখে মমতার অশ্রু ঝরে পড়ল।

পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে আকাশবাণী হল, হে সুলতান! আমার প্রতি কি তোর ভালোবাসা রইল না, নিজের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আছে। তুই নিজের ঘরে চলে যা। ওই সময় ইব্রাহিমের ধাক্কা লাগল এবং চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ তালা! এটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, হয় আপনি আমাকে মৃত্যু দিয়ে দেন, নয়তো এই বালককে মৃত্যু দিয়ে দেন। ওই সময়ই বালকটি মারা গেল। ইব্রাহিম উঠে চলে গেলেন। বলখ শহর থেকে আসা ব্যক্তিরা বালকটির অন্তিমসংস্কার করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য, এক ভক্তকে সকল মানদণ্ড পূরণ করতে হয়, তবেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা অবিলম্বে সেই বালক আত্মাটিকে মানবজীবন দান করলেন এবং তাঁরই এক ভক্তের ঘরে জন্ম দিলেন আর শৈশব থেকেই সেই জীবআত্মার পরমাত্মার মার্গ প্রাপ্ত হয়ে গেল। একবার সব ভক্ত সৎসঙ্গের উদ্দেশ্যে জিন্দা বাবার আশ্রমে একত্রিত হলেন। ওই

সময় সেই বালকটির বয়স ছিল মাত্র চার বছর। পরমেশ্বরের কৃপায় বালকটির বসার স্থান, ইব্রাহিমের স্থানের পাশেই মিলল। ইব্রাহিমকে দেখে বালকটি বলল, পিতা! আপনি আমাকে মক্কাতে ছেড়ে কেন চলে এসেছিলেন? আমি এখন ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়েছি। দেখুন! আল্লাহ আমাকে আপনার সাথে পুনরায় মিলন করিয়ে দিলেন। এই কথা গুরু জিন্দা বাবার (পরমেশ্বর কবীর / কাদির আল্লাহর) কাছে গেল। তখন জিন্দা বাবা বললেন, এই বালক ইব্রাহিমের পুত্র, যে মক্কাতে মারা গিয়েছিল। এখন পরমাত্মা ওই আত্মাকে ভক্তের ঘরে বালক রূপে জন্ম দিয়েছেন। বালকের মৃত্যুতে ইব্রাহিম খুবই দুঃখিত হয়েছিল কিন্তু সেই দুঃখ কারোর কাছে তিনি প্রকাশ করেন নি। সেদিন তিনি বললেন, হে দয়ার সাগর! আপনি অন্তর্যামী। আজ আমার হৃদয় (কলিজা) হালকা হয়ে গেল। আমার মনে বারবার এটাই আসছিল যে, হে পরমাত্মা! আপনি এ কি করলেন? এর মা কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে? আজ আমার আত্মা সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়ে গেল। জিন্দা বাবা বালকটির পূর্ব জন্মের মাতাকে অর্থাৎ ইব্রাহিমের স্ত্রীকে (বেগমকে) বার্তা পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই এই আশ্রমে আসেন। বালকটিকে ও তার নতুন পিতা-মাতা এবং ইব্রাহিমকেও ডাকা হলো। সেই বালককে পূর্বের মায়ের (বেগমের) সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করালেন। বালকটি পূর্বের মাকে দেখামাত্রই বলল, আম্মাজান! আপনি আমাকে মক্কায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন? ওই স্থানে আল্লাহ এসেছিলেন, দেখুন তিনি এই যে বসে রয়েছেন (জিন্দা বাবার দিকে হাত দেখিয়ে ইশারা করে)। বলল যে, আমাকে সাথে নিয়ে ওনার ঘরে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। আমি এই মায়ের গর্ভে চলে গেলাম, তারপর আমার জন্ম হলো। এখন আমি দীক্ষা নিয়েছি, প্রথম মন্ত্র জপ করি। হে মাতা! আপনিও গুরুদেবের নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করুন, তাহলে আপনার কল্যাণ হয়ে যাবে। ইব্রাহিমের স্ত্রী দীক্ষা নিয়ে নিলেন এবং বললেন যে, এই বালকটিকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন।

পরমেশ্বর কবীর (জিন্দা বাবা) বললেন যে, যদি ওই নরকেই (ইব্রাহিমের ঐশ্বর্য পূর্ণ রাজ্যতে) রাখার হতো, তাহলে এর মৃত্যু কেন হতো? এখন থেকে আপনি আশ্রমে আসতে থাকবেন ও প্রতি মাসে সৎসঙ্গের দিন বালকটির সাথে দেখা করে যাবেন। ইব্রাহিমের মনে ওই বালকের প্রতি অতটা ভালোবাসা ছিল না, কেননা সে অন্যের শরীর হতে জন্মেছিল। কিন্তু মনের ভ্রম ও মূর্খতার নাশ অবশ্যই হয়ে গিয়েছিল। তিনি মনে মনে এটাই ভাবতেন যে, আল্লাহর এমন করা উচিত হয়নি। এখন তিনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহ যা করেন, তা ভালোর জন্যই করেন। যদিও বা ওই সময় আমাদের ভালো লাগেনা। সব জীবই আল্লাহর, তিনি সকলের জন্য ভাবেন কিন্তু আমরা কেবল নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতে থাকি। সেই বালকের প্রতি রাণীরও মায়া কেটে গিয়েছিল কিন্তু আত্মা ওই একই ছিল, এইজন্য মায়ের মতো মমতা জাগ্রত হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে ওই সন্তানকে দেখেই শান্তি অনুভব করতেন। এই কারণ (লীলা) বানিয়ে পরমাত্মা রাণীকে ও তার বালককেও উদ্ধার করেছিলেন।

"ভক্তের স্বভাব হয় তরুবরের (বৃক্ষের) মতো"

একবার এক সৌদাগর (ধনী ব্যবসায়ী) ব্যক্তি এক সমুদ্রের জাহাজে ব্যবসা করতে যাচ্ছিলেন। তার সাথে খাবার তৈরি করা ও কৌতুক করে আনন্দ দেওয়ার জন্য একটা পার্টিও গিয়েছিল। এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল, প্রায় এক মাসের যাত্রাপথ ছিল। হাসিঠাট্টা করার জন্য তাদেরকে এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যার উপর সকলে হাসিঠাট্টা করতে পারে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে, তারা সুলতান ইব্রাহিমকে ধরে নিয়ে গেল। ভাবল, এই ভিখারির দরকার তো খাবার, তা এই ভিখারি পেয়ে যাবে। সমুদ্রে কিছুটা দূর চলে যাওয়ার পর শেঠের জন্য বিনোদনের অনুষ্ঠান শুরু করা হলো। ইব্রাহিমকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলল যে, এর (ইব্রাহিম) মতো একজন মূর্খ ছিল, সে গাছের ওই ডালেই বসে ছিল, যে ডালটা সে কাটছিল। পরে সে মাটিতে পড়ে মারা গেল। এই বলে সকলে হা হা করে অট্টহাসি করতে লাগল। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এমন অনেক প্রকারের অভদ্র মন্তব্য করতে লাগল।

ইব্রাহীম খুব দুঃখী হয়ে ভাবলেন যে, একমাসের জন্য এইরকম দুঃখ ভোগ করতে হবে, না ভক্তি করতে পারব আর না শান্তিতে থাকতে পারব। ওই সময়ই আকাশবাণী হল যে, হে ভক্ত ইব্রাহিম! তুই বললে, আমি এই মূর্খদের মেরে দেব ও জাহাজকে ডুবিয়ে দেব, কেবল তোকে রক্ষা করবো। এরা তোকে খুব জ্বালাতন করছে। এই আকাশবাণী শুনে জাহাজের সকলেই ভয় পেয়ে গেল। ইব্রাহিম বললেন, হে আল্লাহ! এই কলঙ্ক আমার মাথায় লাগাবেন না, ওরা অনবিজ্ঞ (মূর্খ)। এত মানুষকে হত্যা না করে, কেবল আমাকেই মেরে ফেলুন অথবা এদেরকে সদবুদ্ধি দেন, যাতে এরা আপনার ভক্তি করে, নিজেদের জীবনের কল্যাণ সাধন করতে পারে। জাহাজের মালিকসহ সকল যাত্রী ইব্রাহিমের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং পরমাত্মার জ্ঞান শুনে তাকে সম্মানের সাথে রাখলেন। ভক্তি করার জন্য জাহাজে তাকে আলাদা স্থান বানিয়ে দিলেন। ইব্রাহিম সকলকে সত্যজ্ঞান বুঝিয়ে আশ্রমে নিয়ে সকলকে জিন্দা বাবা রূপী গুরুর (আল্লাহর) নিকট হতে দীক্ষা দেওয়ালেন।

ইব্রাহিম স্বয়ং দীক্ষা দিতে। যখন জিন্দা বাবাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর কবীরজিকে কেউ ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে বললেন যে, হে গুরুদেব! ইব্রাহিম দীক্ষা দেন। তখন পরমেশ্বর বললেন, হে ভক্ত! আপনি ভুল করছেন, কারণ আপনি এর অধিকারী নন। সেইদিন থেকে ইব্রাহিম দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং তার সমস্ত শিষ্যদেরকে পুনরায় গুরুদেবের (পরমাত্মা/কবীর

আল্লাহের) নিকট হতে দীক্ষা দেওয়ালেন এবং নিজেও ক্ষমা চেয়ে নাম শুদ্ধিকরণ করিয়ে নিলেন। এরপর সংকল্প করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবেন না।

প্রশ্ন :- এই কথার প্রমাণ কোথায় রয়েছে যে, অল-খিজ্র রূপে কবীর আল্লাহই লীলা করছিলেন এবং কবীরজী তাঁতীই (কাশী -ভারতবাসী) কাদির আল্লাহ, যিনি সমস্ত সৃষ্টি রচনা করেছেন।

উত্তর :- প্রথমে এটা প্রমাণ করছি যে, কাশী (বেনারস) শহরে যে কবীর নামক তাঁতী থাকতেন, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির রচয়িতা খুদা (কাদির আল্লাহ/পরমেশ্বর)। এরজন্য অনেকেই প্রত্যক্ষদর্শী (Eye witness) রয়েছেন, যাঁরা ওই সর্বশক্তিমান (কাদির) আল্লাহকে উপরের সিংহাসনে (তখ্‌তে) বসে থাকতে দেখেছেন এবং বলেছেন, যে কবীরজি বেনারস কাশী শহরে (ভারতবর্ষ) তাঁতীর ভূমিকা (লীলা /অভিনয়) করতেন, তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

☞ **প্রত্যক্ষদর্শী নং. ১ :- সন্ত গরীবদাস জী, গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, রাজ্য-হরিয়ানা নিবাসী (দেশ-ভারতবর্ষ) :-** সন্ত গরীবদাস জী দশ বছরের বালক নিজের জমিতে গ্রামের অন্যান্য গোয়ালাদের সাথে প্রতিদিনের মতো গরু চরাতে গিয়েছিলেন। বিক্রমী সংবত্ ১৭৭৪ (১৭১৭ সাল) ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের (পূর্ণিমা) দ্বাদশীর দিন বেলা প্রায় দশটার সময় গোয়ালারা এবং বালক গরীবদাস জী একটি জান্ডি বৃক্ষের নীচে ছায়ায় বসে ভোজন করছিলেন। পরমেশ্বর জিন্দা বাবার (অল-খিজ্র/খিজির) বেশ ধারণ করে, উপর আকাশের ওই সিংহাসন (তখ্‌ত/আরশ) থেকে দ্রুতগতিতে কিছু দূরে পৃথিবীতে নেমে এসে গোয়ালাদের নিকট গেলেন। ওই জান্ডি বৃক্ষটি গ্রাম - কবলানা থেকে গ্রাম- ছুড়ানীতে যাওয়ার কাঁচা রাস্তার উপরে ছিল আর সন্ত গরীবদাস জী জমি কবলানা গ্রামের সীমা সংলগ্নে ছিল। {সন্ত গরীবদাসের পিতার নিকট এক হাজার তিনশো পঁচাত্তর (১৩৭৫) একর জমি ছিল। সেই জমির মধ্যেই চারণ ভূমি (গরু চরানোর ময়দান) বানিয়ে রাখা হয়েছিল। যেখানে ছুড়ানী গ্রামের অন্যান্য নির্ধন ব্যক্তিরাও নিজের গরুদের চরানোর জন্য নিয়ে যেতেন।} জিন্দা বাবাকে অর্থাৎ সাধুকে দেখে গোয়ালাদের (গো-পালক) মধ্যে বয়স্ক একজন বললেন, সাধুবাবা ভোজন করুন! সাধুবাবা বললেন, "ভোজন তো আমি আমার কুটীর থেকে করে এসেছি।" কিছু গোয়ালারা একসাথে বলল যে, যদি ভোজন না করেন "তাহলে দুধ পান করুন"। পরমেশ্বর বললেন, " হ্যাঁ, দুধ পান করতে পারি কিন্তু এমন গরুর দুধ পান করাও যে গরু বাচ্চা প্রসব করেনি অর্থাৎ কুমারী গরুর দুধ। গোয়ালারা এই কথাকে কৌতুক ভেবে নেয় ।

বালক গরীবদাস জী উঠলেন এবং তার এক প্রিয় আদরের কুমারী গরু নিয়ে এসে বললেন, হে সাধুবাবা! এই হলো কুমারী গরু কিন্তু এ কিভাবে দুধ দেবে? তখন সাধুবাবা বললেন, এ দুধ অবশ্যই দেবে, তুমি পরিষ্কার একটা পাত্র (বাসন) নিয়ে এসো আর এই কুমারী গরুর ওলানের নীচে রেখে দাও। বালক গরীবদাস জী একটি মাটির পাত্র (৩-৪ কেজি দুধ ধরে সেইরকম একটা ছোট মাটির পাত্র) হাতে নিয়ে কুমারী গরুর ওলানের নীচে বসে পড়লেন। জিন্দা বাবা (অল-খিজ্র/খিজির) কুমারী গরুর পিঠের উপর হাত দিয়ে ধীরে চাপড় মারলেন। ওই কুমারী গরুর দুধের চারটি বাট লম্বা ও মোটা হয়ে আপনা-আপনি দুধ পড়তে লাগল। যখন তিন চার কিলোগ্রাম দুধে মাটির পাত্রটি ভরে গেল, তখন অনায়াসেই দুধ আসা বন্ধ হয়ে গেল। বালক গরীব দাস জী সেই দুধে ভর্তি পাত্রটি সাধু বাবাকে দিয়ে বললেন, বাবাজি! এটা তো আপনার দয়াতে প্রাপ্ত হয়েছে, আপনি পান করুন। জিন্দা বাবা সেই পাত্রে মুখ রেখে কিছুটা দুধ পান করলেন এবং বাকি দুধ গোয়ালাদের দিয়ে বললেন, পান করে নাও! এটা প্রসাদ । অন্য গোয়ালারা এই বলে উঠে চলে গেল যে, এই দুধ যাদু-মন্ত্র করে কুমারী বাছুর থেকে বের করেছেন, এটা পান করলে আমাদের কোনো ভূত প্রেতের বাধা হয়ে যাবে। ইনি কোনো এক তান্ত্রিক (ভূত প্রেত ছাড়ানো ব্যক্তি) বলে মনে হচ্ছে। কুমারী গরুর দুধ পাপের দুধ আর জানিনা যে, এই সাধু বাবা কোন জাতির? তাঁর এঁটো দুধ আমরা পান করব না।

বালক গরীবদাস জী জিন্দা বাবার কাছ থেকে দুধের পাত্রটি নিয়ে, গোয়ালাদের চোখের সামনেই সেই পাত্রের দুধ কিছুটা পান করে নিলেন। গোয়ালাদের মধ্যে বয়স্ক গোয়ালা ওই দুধ পান করতে নিষেধ করছিলেন কিন্তু বালক মানেন নি। সবাই দূরে চলে গেলেন। সেখানে কেবল জিন্দা বাবা ও বালক গরীবদাস জী রয়ে গেলেন। তারপর বালককে কিছু জ্ঞান শোনালেন। বালকটি সতলোক ও সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে (যিনি শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের থেকেও অধিক শক্তিশালী যাঁর বিষয়ে বাবা বলেছিলেন) নিজের চোখে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জিন্দা বাবা বালক গরীবদাসের জীবাত্মাকে তার শরীর থেকে বের করে আকাশে নিয়ে গেলেন। শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের লোক দেখালেন, স্বর্গ ও নরক দেখালেন, কাল ব্রহ্মের ব্রহ্মলোক (মহাস্বর্গ/ মহাজন্নত) দেখালেন। তারপর তার উপরে নিজের অমরলোকে নিয়ে গেলেন। যে জিন্দা বাবা বালকের সাথে গিয়েছিলেন, তিনি উপরে তৈরি করা সিংহাসনের (তখ্‌ত/আরশ) উপরে বসে পড়লেন, ওই সময়ই ওই জিন্দা বাবার রূপ বদলে গিয়ে, পরমাত্মার আসল রূপ হয়ে গেল। ওই পরমাত্মার এক রোম কূপের (শরীরের রোম থেকে) যে প্রকাশ বের হচ্ছিল, তা কোটি সূর্যের প্রকাশের থেকেও অধিক ছিল। অমরলোক প্রকাশমান ছিল। বালক গরীবদাসের শরীরও অন্য হয়ে গেল, যার প্রকাশ ষোল সূর্যের সমান ছিল। অমরলোকের সমস্ত ভক্ত ও ভক্তিমতী (হংস/হংসিনী) নিজের পরমেশ্বরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে লাগলেন। জয় হোক কবীর সৎপুরুষের, এই প্রকার জয় ধ্বনি দিতে লাগলেন। সকলে বললেন, ইনি হলেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনহার সমর্থ

পরমেশ্বর। তাঁর নাম কবীর। তারপর পরমাত্মা সমস্ত জ্ঞান, তাঁর নিজের নবী গরীবদাস জীর আত্মার মধ্যে ভরে দিলেন। সমস্ত সতলোক ও নীচের সকল লোক গুলি দেখিয়ে বালকের জীবাত্মাকে তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এদিকে সকলে বালক গরীবদাসকে মৃত ভেবে, তার শরীরকে অন্তিমসংস্কার করার জন্য চিতার (কাঠের স্তূপের) উপরে রেখে দিয়েছিলেন। আগুন জ্বালাতেই যাচ্ছিলেন, তখনই বালক গরীবদাস উঠে পড়লেন। গ্রামে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগলো। সন্ত গরীবদাস জীকে ওই জিন্দা বাবা বেশধারী পরমেশ্বর দীক্ষা দিলেন। সন্ত গরীবদাস জী সচক্ষে দেখা এবং পরমেশ্বরের মুখ কমল থেকে শোনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দোঁহা, ছন্দ, শব্দাবলী রূপে বলেছিলেন, যে বাণীগুলো এক দাদু জীর পন্থ থেকে দীক্ষিত গোপাল দাস নামের এক মহাত্মা তিনি লিখেছিলেন। লেখনকার্য সম্পন্ন করতে প্রায় ছয় মাস লেগে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গ হল, কোথায় এর প্রমাণ রয়েছে যে, অল-খিজ্রই হলেন অল-কবীর? :- যেমন এই "অল-খিজ্রের (অল-কবীরের) পরিচয় বিষয়" প্রকরণে "রুমীর পরিচয়" নামক শির্ষকে লেখা আছে যে, রুমী নামের এক ব্যক্তি তুর্কি দেশে কোন্যা শহরের একটি মসজিদের মৌলবী ছিলেন, যিনি মুসলমান ধর্মের প্রচার করতেন। মানুষ তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। যিনি শমস তবরেজ নামক সন্তের জ্ঞান বুঝে মৌলবী উপাধি ত্যাগ করে, গুরু শমস তবরেজের বলা অনুসারে ভক্তি করতেন, যিনি একজন প্রসিদ্ধ কবিও হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বলখ শহরের রাজা (বলখী) সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধম, অল-খিজ্র দ্বারা অনুপ্রেরণা পেয়ে রাজত্ব ত্যাগ করেছিলেন। শেষ জীবন অল খিজ্রের সংস্পর্শে থেকে কাদির আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতান অল-খিজ্রের দর্শন করতেন। উপরে আপনারা সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধমের বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রকরণটি পড়েছেন, যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ কবীর সুলতানকে ইবাদতের জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন। এইজন্য এই থেকে প্রমাণ হয় যে, অল-খিজ্রই হলেন অল কবীর। এর সমর্থন সন্ত গরীবদাস জীও তাঁর বাণীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে : -

গরীব, হম সুলতানী নানক তারে, দাদূ কুঁ উপদেশ দিয়া। জাতি জুলাহা ভেদ না পায়া, কাশী মাঁহী কবীর হুয়া॥

অর্থাৎ সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে, আমাদের সকলকে (আমি গরীবদাস, সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধম, শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক এবং সন্ত দাদূ) ওই সদগুরু কবীর আল্লাহ পার করেছেন, যিনি কাশী শহরের জোলা (তাঁতী) জাতিতে এসেছিলেন। তারপর বললেন যে :-

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার। সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ। কুল কে সৃজনহার॥

অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকর্তা অর্থাৎ সমস্ত কায়নাতের সৃজনকর্তা হলেন, আমার সদগুরু কবীর পরমেশ্বর। তিনিই সমস্ত লোক (ধাম), সমস্ত তারাগুলি এবং সমস্ত নক্ষত্রমন্ডলকে (সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ) সৃষ্টি করে, নিজের শক্তি দ্বারা স্থির করে রেখে দিয়েছেন। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলা হয়। ওই সৃষ্টিকর্তা কবীরের উপর এই সমগ্র সৃষ্টির (অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের) কোনো ভার (ওজন) নেই। যেমন বৈজ্ঞানিক বিমান (Airplane) তৈরি করে উড়িয়ে থাকেন। নিজেরাও তাতে বসে আরোহণ করেন। যেমন ওই বিমানের বৈজ্ঞানিকের ওপর কোনো ভার নেই এবং উল্টে তার ওপর চড়ে বসে রয়েছেন। ঠিক এইপ্রকার কাদির খুদা কবীর সকল ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে, তার উপর বসে রয়েছেন এবং সকল জীব তার উপরে রেখেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অল-খিজ্রই হলেন অল-কবীর।

☞ **প্রত্যক্ষদর্শী নং ২ (সন্ত দাদূ দাস) :-** সন্ত দাদূ দাস এগারো বছরের বালক ছিলেন। ওই সময় গ্রামের বাইরে এক জঙ্গলে কবীর সাহেব জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে বালক দাদূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার আত্মাকে শরীর থেকে বের করে, এই অল-কবীর উপরে নিজের সতলোকে নিয়ে যান। বালক দাদূ তিন দিন ও রাত পর্যন্ত অজ্ঞান ছিলেন। তিনি তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে, তাঁর নিজের সিংহাসন (তখ্‌ত) দেখালেন এবং তিনি তাঁর নিজের পরিচয় করালেন যে, আমিই পূর্ণ ব্রহ্ম (পরমেশ্বর)। সমগ্র সৃষ্টি আমি রচনা করেছি। বালক দাদূকে আল্লাহ কবীর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদর্শন করিয়ে তৃতীয় দিনে জীবাত্মাকে তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যখন সন্ত দাদূ দাস চেতনা ফিরে পেলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি হয়েছিল? তখন দাদূ দাস বললেন, আল্লাহ কবীর জী, তিনি এক জিন্দা বাবার বেশে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন আমাকে দীক্ষা দেন, তারপর তিনি উপর আকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় দাদূ দাসের সাথে তার সমবয়সী কিছু বালকরাও ছিল। তারাও বলেছিল যে, এক জিন্দা বাবা যন্ত্র-মন্ত্র করে জল পড়ে, স্বয়ং পান করলেন এবং এক পানের পাতাকে মুড়ে বাটির মতো তৈরি করে, তার মধ্যে অবশিষ্ট এঁটো জল বালক দাদূকেও খাইয়ে দিলেন, তারপরে আর জিন্দা বাবাকে দেখতে পাওয়া যায়নি আর কিছুক্ষণ পরেই বালক দাদূ দাস অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ত গরীবদাস জী তাঁর নিজের বাণীতে পরমেশ্বর কবীর জীর দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে এইরূপে বলেছেন যে :-

গরীব, দাদূ কুঁ সতগুরু মিলে, দঈ পান কী পীক। বুঢ়া বাবা জিসে কহেঁ, য়হ দাদূ কী নহীঁ সীখ॥

অর্থাৎ সন্ত দাদূ দাসের সাথে সৎগুরু রূপে কবীর আল্লাহ সাক্ষাৎ করেছিলেন, যিনি এক জিন্দা বাবার বেশে ছিলেন। তিনি বালক দাদূকে পানের পাতার উপর নিজের মুখ থেকে বের করা জল ঢেলে, দীক্ষার সময় খাইয়েছিলেন। যে ব্যক্তিরা এই কথা বলেন যে, দাদূর সঙ্গে যে বৃদ্ধ বাবা সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি তন্ত্র-মন্ত্র বিদ্যা জানতেন, এই কথা সন্ত দাদূ দাস কখনও বলেননি।

সন্ত দাদূ তাঁর বিষয়ে যা বলেছেন তা এইপ্রকার, যা সন্ত দাদূর দ্বারা বলা বাণী হতে দাদূ গ্রন্থে লেখা আছে। সেই বাণী নিম্নে :-

জিন মোকুঁ নিজ নাম দিয়া, সোঈ সৎগুরু হমার। দাদূ দূসরা কোঈ নহীঁ, কবীর সিরজনহার॥

দাদূ নাম কবীর কা, সুনকর কাঁপে কাল। নাম ভরোঁসৈ জো চলে, হোবে না বাঁকা বাল॥

কেহরী নাম কবীর হৈ, বিষম কাল গজরাজ। দাদূ ভজন প্রতাপ সে, ভাগে সুনত আবাজ॥

অর্থাৎ সন্ত দাদূ দাস বলেছেন যে, আমাকে যিনি (নিজ নাম) ভক্তির যথার্থ মন্ত্র দিয়েছেন, তিনি আমার সদগুরু। তাঁর নাম হল কবীর। এই কবীর হলেন সমস্ত কায়নাতের (সৃষ্টির) উৎপত্তিকর্তা (সৃজনহার)।

❖ সন্ত দাদূ বলেছেন যে, "কবীর" নাম শুনতেই জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল ব্রহ্ম) কাঁপতে থাকেন। কবীর নাম এতই শক্তিশালী যে, যদি একজন ভক্ত কবীর কাদির আল্লাহর দ্বারা বলা নামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে জীবন যাত্রা করেন, তাহলে কাল ব্রহ্ম তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

❖ সন্ত দাদূ কবীর খুদার সমর্থতার বিষয়ে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বলেছেন যে, কালও খুব শক্তিশালী কিন্তু কবীর আল্লাহর সামনে সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। কাল (গজরাজ) হল হাতিদের রাজার সমান বলবান। কবীর আল্লাহর ইবাদত (ভক্তি) করার নামও (মন্ত্র) অধিক শক্তিশালী। তিনি কেহরীর অর্থাৎ বব্বর সিংহের (সবচেয়ে বড় সিংহ) মতো শক্তিশালী। ওই নামের জপ (ভজন) করলে, ওই নাম রূপী কেহরীর শক্তির সামনে কাল টিকতে পারে না অর্থাৎ নামের সূক্ষ্ম গর্জন (ধ্বনি) শুনে কাল রূপী গজরাজ পালিয়ে যায়। সন্ত দাদূ দাস স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কবীর জী হলেন সমগ্র সৃষ্টির (কায়নাত) উৎপত্তি কর্তা, তিনিই পরমেশ্বর।

☞ **প্রত্যক্ষদর্শী নং. ৩ :- {সন্ত ধর্মদাস বান্ধবগড় নিবাসী (মধ্যপ্রদেশ, ভারত)}** :- হিন্দু ধর্মে জন্ম হওয়ার কারণে ধর্মদাস হিন্দু ধর্মগুরুদের দ্বারা বলা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের আধারে সাধনা করতেন। এক সময় ধর্মগুরুদের কথা অনুসারে তীর্থযাত্রার সময়ে মথুরাতে (শ্রী কৃষ্ণের নগরীতে) গিয়েছিলেন। পাথর ও পিতলের দেবী-দেবতাদের (শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শঙ্কর এবং দেবী ইত্যাদি) মূর্তিগুলি একটি ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সকালে উঠে তীর্থস্থানে (যে পুকুরে শ্রী কৃষ্ণ স্নান করেছিলেন) গিয়ে স্নান করে মূর্তিগুলিকে পূজা করতে লাগলেন। ওই সময় কবীর আল্লাহ ভারতের কাশী শহরে জোলার (তাঁতীর) ভূমিকায় লীলা করার জন্য সংসারে প্রকট হয়েছিলেন। যিনি ধর্মদাসকে সত্য ভক্তি মার্গ বলার জন্য মথুরার ওই পুকুরের নিকট গিয়ে ধর্মদাসের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম দেখতে লাগলেন। ধর্মদাস মূর্তি উপাসনা করার পর শ্রীমদভগবত গীতা পাঠ করলেন। খুদা কবীর এমন ভাব দেখালেন যেন ধর্মদাসের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন ও শুনছেন। ধর্মদাস তার প্রতিদিনের ন্যায় ভক্তিমূলক ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত করে মুক্ত হলেন। তখন পরমেশ্বর কবীর সাহেব তার সঙ্গে জ্ঞান চর্চা করতে লাগলেন। এই জ্ঞান চর্চা কয়েক দিন যাবৎ চলল এবং ধর্মদাসকেও আল্লাহ কবীর নিজের সতলোকে তৈরি ওই সিংহাসনের (তখ্ত) কাছে নিয়ে গিয়ে উপরের সমস্ত ধামগুলি এবং নিজের সতলোক (অমর ধাম) দেখালেন ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান বোঝালেন। এদিকে ধর্মদাস তিনদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। এরপরে সন্ত ধর্মদাসের জীবাত্মাকে পুনরায় তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এরপর থেকে সন্ত ধর্মদাস তার পূর্বের ভক্তি (ইবাদত) ত্যাগ করে দিলেন এবং নিজেই নিজের নবী হয়ে আসা সেই আল্লাহ কবীর জীর দ্বারা বলা সত্য ইবাদত করে পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছিলেন।

সন্ত ধর্মদাস আল্লাহ কবীরের মহিমায় এই প্রকার অনেক বাণী বলেছেন: -

আজ মোহে দর্শন দিয়ো জী কবীর॥

অমরলোক সে চলকর আয়ে, কাটন জম কি জঞ্জীর।

হিন্দু কে তুম দেব কহায়ে, মুসলমান কে পীর।

দোনোঁ দীন কা ঝগড়া ছিড় গয়া, টোহা না পায়া শরীর॥

ধর্মদাস কী অর্জ গোঁসাঈ, বেড়া লঙ্ঘাঈয়ো পরলে তীর॥

অর্থাৎ সতলোক দেখে আসার পরে ধর্মদাস মেনে নিয়েছিলেন যে, কাশীর তাঁতী কবীর জী সমস্ত কায়নাতকে (সৃষ্টি) উৎপন্ন করেছেন। তাঁর মহিমা বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন, যা তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন।

যখন পরমেশ্বর কবীর জী ভারত দেশে গোরখপুর জেলা, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে, মগহর নামক স্থান থেকে সশরীরে সতলোকে গিয়েছিলেন। ওই সময় হিন্দু রাজা বীর সিং বাঘেল, যিনি কাশী শহরের রাজা ছিলেন এবং মুসলিম নবাব বিজলী খান পাঠান, যিনি মগহর এলাকার নবাব ছিলেন, উভয়ই তাঁর শিষ্য ছিলেন। মগহর কাশী ছাড়া অন্যান্য অনেক স্থানের হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিরাও কবীর আল্লাহর শিষ্য ছিলেন, যাদের সংখ্যা চৌষট্টি লক্ষ বলে কথিত আছে। যখন কবীর আল্লাহ সতলোকে যাওয়ার কথা বললেন, তখন উভয় ধর্মের (হিন্দু-মুসলিম) ব্যক্তিরা ও রাজা নিজের নিজের রীতি অনুসারে অন্তিম সংস্কার করার জেদ ধরে লড়াই করার

জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তখন কবীর পরমাত্মা সবাইকে বললেন যে, কেউ লড়াই করবে না। আমি একটা চাদর নীচে বিছাবো আর একটা চাদর গায়ে (শরীরের উপরে) দেবো। তোমরা আমার শরীরকে দুই ভাগ করে নেবে এবং এক-একটা চাদর ও অর্ধেক-অর্ধেক শরীর দুই সম্প্রদায়ের (মুসলমান ও হিন্দু) শিষ্যগণরা সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। যারা লড়াই করবে তাদের আমি ত্যাগ করে দেবো। এরপরে একটি চাদর বিছানো হল, তার উপর ভক্তরা শ্রদ্ধাভরে দুই থেকে তিন ইঞ্চি পুরু করে সুগন্ধি ফুল বিছিয়ে দিলেন। এর পরে কবীর খুদা সেই চাদরের উপর শুয়ে পড়লেন ও অন্য একটি চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিলেন। উভয় ধর্মের ব্যক্তিরা মনে দোষ নিয়ে ভাবছিলেন যে, অর্ধেক দেহকে সংস্কার (দাহ বা মাটিতে দাফন) করলে অশুভ অর্থাৎ খারাপ হয়। এইজন্য লড়াই করে গুরুদেবের (খুদা কবীরের) সম্পূর্ণ শরীরকে নিয়ে আমাদের ধর্ম অনুসারে সংস্কার করব। আল্লাহ কবীর জী তো সকলের মনের কথা জানতেন। কিছু সময় পর আকাশবাণী হল যে, ওই চাদর উঠিয়ে দেখো, ওর নীচে মৃত শরীর নেই। সবাই উপরের দিকে তাকালেন আর দেখলেন যে, কবীর পরমাত্মা আকাশে উপরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে বললেন যে, আমি হলাম সর্ব সৃষ্টির রচনহার পরমেশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ কবীর কর্তা। তোমরা আমাকে বুঝতে পারোনি। তারা যখন চাদরটি তুললেন, তখন দেখলেন যে, সেখানে মৃতদেহ নেই, কেবল সুগন্ধিত ফুলের স্তূপ ছিল। কবীর খুদা আকাশের ওই নিজ সিংহাসনে উপর বিরাজমান হলেন। যদি এই অলৌকিক ঘটনা পরমেশ্বর না ঘটাতেন, তাহলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যেতো এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যেতো। ওই ভয়ংকর অনর্থকে কবীর আল্লাহ ছাড়া, কেউ ঠেকাতে পারতেন না। ওই সময় হিন্দু-মুসলমান একে অপরের গলা জড়িয়ে অর্থাৎ আলিঙ্গন করে, কাদির আল্লাহর বিদায়ের দুঃখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন যে, আমাদের মাঝে আমাদের সাথে কাদির আল্লাহ থাকার পরেও আমরা আল্লাহ কবীরকে চিনতে পারিনি। আমাদের বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। এরপর দুই ধর্মের লোকেরা এক একটা চাদর ও অর্ধেক ফুল ভাগ করে নিলেন। বিজলী খান পাঠান (মগহরের নবাব) তার প্রিয় পীর কবীর আল্লাহর জন্য, উভয় ধর্মের (হিন্দু ও মুসলিম) ব্যক্তিদের (১০০ ফুট পার্থক্য রেখে) এক নির্দিষ্ট স্থানেতে ফুলের অন্তিম সংস্কার করার জন্য জায়গা দিলেন। উভয় ধর্মের লোকেরা একটা চাদর ও অর্ধেক ফুল সমান ভাবে ভাগ করে নিজ-নিজ রীতি অনুসারে অন্তিম সংস্কার করলেন। আজও দুই ধর্মের সেই স্মৃতিস্তম্ভ মগহর নগরে (জেলা - সন্ত কবীর নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত দেশে) বিদ্যমান আছে। নবাব বিজলী খান পাঠান এই দুই ধর্মের স্মৃতিস্তম্ভের জন্য ওই সময় ৫০০- ৫০০ বিঘা করে জমি দান (জাকাত) করে দিয়েছিলেন।

যখন কবীর পরমেশ্বর সকলের কাছ থেকে চলে গেলেন, এই বিরহে সন্ত ধর্মদাস কাঁদতে - কাঁদতে বলেছিলেন, হে পরমেশ্বর কবীর! আমাকে পুনরায় একবার দর্শনের কৃপা করুন। আপনি তো আপনার সতলোক তখ্‌ত (সিংহাসন) থেকে পৃথিবীর উপর আমাদের কর্মবন্ধন রূপী শিকল (বন্ধন) কাটতে এসেছিলেন। উভয় ধর্মের মধ্যে লড়াই হতে যাচ্ছিল। সকলে নিজের নিজের সেনা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন। আপনার মৃত দেহ পাওয়া যায়নি, আপনিই কাদির আল্লাহ, এটা বোঝানোর জন্য এই লীলাই যথেষ্ট। হে পরমেশ্বর! আমার জীবন রূপী নৌকাকে (তরীকে) এই সংসার রূপী নদীর কিনারায় পার লাগিয়ে দেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন। কয়েকদিন পর কবীর আল্লাহ সতলোক থেকে পুনরায় এসে, সন্ত ধর্মদাসের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন। তারপরে সন্ত ধর্মদাসকে সতলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যিনি অল-খিজ্র রূপে হজরত মুহম্মদ (স.) ও অন্যান্য প্রমুখদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, সেই অল-কবীরই হলেন সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা কাদির আল্লাহ।

☞ **সাক্ষী নং. ৪ (সন্ত মলুক দাস) :-** কবীর আল্লাহ্ সন্ত মলুক দাসকেও সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে দেখিয়ে সূক্ষ্ম আত্মাকে পুনরায় তার শরীরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভক্তি করার পূর্বে মলুক দাস শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের (শ্রীবিষ্ণুর) পরম ভক্ত ছিলেন। অতঃপর পূর্বের পূজা ত্যাগ করে আল্লাহ্ কবীরের বলা অনুসারে ভক্তি করার পরে মোক্ষ লাভ করেছিলেন।

সন্ত মলুক দাস বলেছেন :-

জপো রে মন সাহেব নাম কবীর, জপো রে মন পরমেশ্বর নাম কবীর॥
একসময় গুরু বংসী বজাঈ, কালন্দ্রী কে তীর।
সুর নর মুনিজন থকত ভয়ে, রুক গয়া জমনা নীর॥
অমৃত ভোজন স্হারে সতগুরু জিমে, শব্দ দুধ কী ক্ষীর।
দাস মলুক সলুক কহতে হৈ, খোঁজো খসম কবীর॥

অর্থাৎ সন্ত মলুক দাস স্পষ্ট বলেছেন যে, পরমাত্মা কবীরের নাম জপ করো। ওই সকলের মালিক কবীর কর্তাকে (খসমকে) সন্ধান করে, তাকে চিনুন এবং সত্য সাধনা করে সতলোকে কবীর খুদার কাছে যান। যেমন শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি মধুর সুরে বাঁশি বাজাতেন আর সেই মধুর সুর শুনে গোপীগণ ও গরু আকর্ষিত হয়ে তার নিকট চলে যেত। মলুক দাস বলেছেন যে, একবার আমার সদগুরু কবীর সাহেব যমুনা নদীর তীরে (কালেন্দ্রীর) বাঁশি বাজিয়েছিলেন, যা শুনে স্বর্গের দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং আশেপাশের গ্রামের লোকেরা আকর্ষিত হয়ে চলে এসেছিলেন। আর কী বা বলব! যমুনা নদীর জলও স্থির হয়ে গিয়েছিল। আমার সদগুরু শব্দের ক্ষীর আহার করেন অর্থাৎ অমৃত ভোজনের সাথে সাথে অমর আনন্দও ভোগ করেন। সন্ত মলুক দাস সচক্ষে দেখে বলেছিলেন যে, কবীর হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম অর্থাৎ কাদির আল্লাহ্।

☞ **সাক্ষী নং. ৫ (শ্রী নানক দেব) :-** পরমাত্মা কবীর শ্রীনানকদেবের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছিলেন। যে সময় শ্রীনানক দেব সাহেব, সুলতানপুর শহরের নবাবের মুদীখানায় চাকরি করতেন। সুলতানপুর শহর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে বেঈ নদী প্রবাহিত হতো। সেই বেঈ নদীতে শ্রীনানক দেব প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন।

একদিন পরমাত্মা জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে বেঈ নদীর তীরে প্রকট হলেন, সেখানে শ্রী নানক দেবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞান চর্চা হয়েছিল। তারপরে শ্রীনানকদেব নদীতে ডুব দিলেন কিন্তু জল থেকে বাইরে আসেননি। ওখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা মেনে নিয়েছিলেন যে, নানকদেব নদীতে ডুবে গিয়েছেন। শহরের লোকেরা নদীতে জাল ফেলে ও ডুবুরি এনে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি, কেননা শ্রী নানকদেব তো জিন্দা বাবা রূপে প্রকটিত পরমাত্মার সাথে সচ্চখণ্ডে (সত্যলোকে) চলে গিয়েছিলেন। তিন দিন পরে গুরুনানকদেব পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। ওই বেঈ নদীর তীরে ওই স্থানেই দাঁড়িয়ে গেলেন, যে স্থান থেকে তিনি অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রী নানক দেবকে জীবিত দেখে সুলতানপুরের বাসিন্দাদের খুশীর

আর ঠিকানা রইল না। শ্রী নানকদেবের বোন নানকীর ওই সুলতানপুর শহরে বিবাহ হয়েছিল। শ্রী নানকদেব তার বোনের কাছেই থাকতেন। নিজের ভাইয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত বোন নানকী যখন এই খবর শুনলেন, তখন দুঃখ খুশিতে বদলে গেল ও আশ্চর্য হলেন। শ্রীনানকদেব পরমাত্মা, সত্যজ্ঞান ও সচ্চানাম (সত্যনাম) প্রাপ্ত করলেন। পুস্তক ভাই বালে বালী "জন্ম সাখী গুরু নানক দেবজী"- তে এবং পুস্তক "প্রাণ সঙ্গলী" হিন্দি ভাষায় লেখা যার সম্পাদক হলেন সন্ত সম্পূর্ণ সিং। এই দুই পুস্তকে প্রমাণ আছে যে, শ্রীগুরু নানকদেব স্বয়ং শিষ্য মর্দানাকে বলেছিলেন, পরমাত্মা (খুদা) জিন্দা বাবার রূপ ধারণ করে, বেঈ নদীর তীরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যখন আমি স্নান করার জন্য গিয়েছিলাম। আমি তিন দিন পর্যন্ত তাঁরই সাথে ছিলাম। ওই জিন্দা বাবা আমার সদগুরু এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টির রচনহার। তিনিই হলেন বাস্তবিক "বাবা" বলার অধিকারী, অন্যদের "বাবা" বলা উচিত নয়। তাঁর নাম হল কবীর।

কায়ম দায়ম কুদরতী সব পীরন সির পীর আলম বড়া কবীর॥

এইজন্য শ্রী নানক দেবের বাণী (মহলা ১) তে যা আছে, তা সূক্ষ্ম বেদের সাথে মিল খায়, তাই এটি সঠিক। অন্যান্য সাধুদের বাণী ততটা সঠিক নয়। তার কারণ হল, শ্রী নানক দেবের সঙ্গে কবীর পরমাত্মা সাক্ষাত করেছিলেন।

প্রমাণ :- শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবের পৃষ্ঠা ২৪ লেখা বাণী : -

এক সুআন, দুঈ সুআনী নাল ভলকে ভৌঁকহী সদা বিয়াল,
কুড় ছুরা মুঠা মুরদার ধাণক রূপ রহা করতার।
তেরা এক নাম তারে সংসার মৈঁ এহো আশ এহো আধার, ধাণক রূপ রহা করতার।
ফাহী সুরত মলূকী বেশ, এহ ঠগবাড়া ঠগী দেশ।
খরা সিয়াণাঁ বহুতা ভার, ধাণক রূপ রহা করতার॥

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবের ৭৩১ পৃষ্ঠায়, নিম্নলিখিত বাণীটি রয়েছে :-

নীচ জাতি পরদেশী মেরা, ক্ষণ আবৈ ক্ষণ জাবৈ।
জাকি সঙ্গত নানক রহন্দা কিউকর মুন্ডা পাবৈ॥

৭২১ পৃষ্ঠাতে নিম্নের বাণী লেখা আছে :-

য়ক অর্জ গুফতম পেশ তোদর, কুন করতার। হক্কা কবীর করীম তু, বেএব পরবরদিগার॥

এই উপরোক্ত অমৃতবাণী শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেবের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শ্রী নানকদেবের সাথে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি হলেন "কবীর করতার", যিনি কাশীতে তাঁতী (ধাণক) রূপে লীলা করতে এসেছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাশীর (ভারত) জোলা (তাঁতী) কবীরই হলেন সকলের উৎপত্তিকর্তা এবং সকলের ভরণ-পোষণকারী সামর্থ্যবান পরমাত্মা অর্থাৎ কাদির আল্লাহ। তিনিই অল-খিজ্রের রূপ ধারণ করে পবিত্র আত্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি এই প্রকার অন্যান্য নানা রূপ ধারণ করে, শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে ভক্তির সর্বোত্তম বিধির জ্ঞান করাতেন। উপরোক্ত সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধমের প্রকরণ দ্বারাও স্পষ্ট হয় যে, অল-খিজ্রই হলেন কবীর আল্লাহ

৪. রুমীর পরিচয় :- রুমী ছিলেন বিশ্বের একজন সুপরিচিত কবি এবং কবীর সাহেবের পরে দ্বিতীয় স্থানে রুমীর কথা আসে। পশ্চিমী দেশে রুমী খুবই বিখ্যাত ছিলেন। রুমীর কবিতা আমেরিকায় সর্বাধিক বিক্রি হয়। রুমীর রচনা "Masnavi" আর Diwan-e-Kabir -কে Melvana Museum, Turkey দেশের Konya শহরে রাখা হয়েছে। রুমীর মাজার Turkey দেশের Konya শহরে অবস্থিত। তাঁর সঙ্গে রুমীর মুর্শিদ শমস তবরেজেরও কৃত্রিম কবর নির্মাণ করা রয়েছে। প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রুমীর মাজারে (সমাধিতে) সিজদা করতে যান এবং আশ্চর্যের বিষয় হল যে, মুসলমানদের চেয়ে অধিক অমুসলিম ব্যক্তিরা সেখানে যায়।

রুমীর সাথে শমস তবরেজের সাক্ষাৎকার :-

রুমী ছিলেন তুর্কী দেশের কোন্যা শহরের মসজিদের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলবী এবং মুসলমান ধর্মের প্রচার-প্রসার করতেন এবং তার অনেক শার্গিদ (শিষ্য) ছিল।

তারিখ ১৫ -ই নভেম্বর সাল ১২৪৪, ৬০ বছর বয়সের এক সাদা দাড়িওয়ালা ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর কালো পোশাক, তিনি কোন্যা শহরের বিখ্যাত চীনা বাজারে ব্যবসায়ীদের সরাইখানায় গেলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল শমস তবরেজ (Shams Tabrez)। লোকে জানতে চাইলে তিনি বলতেন, আমি একজন ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী। তিনি সেখানে কিছু খোঁজ করছিলেন এবং অবশেষে তিনি রুমীকে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখলেন।

একদিন রুমী একটি হৌজের (পুকুরের) কাছে পুরানো ইলমী পুস্তকের একটি স্তূপ নিয়ে বসে ছিলেন ও তাঁর নিজের

শার্গীদদের (শিষ্যদের) পড়াচ্ছিলেন। শমস তবরেজ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ওই পুস্তকের স্তূপের দিকে ইশারা করে রুমীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব কী? রুমী ব্যঙ্গাত্মকভাবে উত্তর দিলেন, বাবা "এটা সেই জিনিস, যা তুমি জানো না"। এই কথা শুনে শমস তবরেজ ওই পুস্তকগুলো পুকুরের জলে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলেন। এই দেখে রুমী আগুনের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, হে বেয়াদপ! এটা তুই কী করলি? তুই কি জানিস, এই পুস্তকগুলো কত মূল্যবান ছিল? এই কথা শুনে শমস তবরেজ হৌজে (পুকুরে) ঝাঁপ দিয়ে এক এক করে সব পুস্তকগুলো জল থেকে বের করে বাইরে রেখে দিলেন কিন্তু পুস্তকের একটা পৃষ্ঠাও জলে ভেজেনি। উল্টো সেগুলো থেকে ধুলো বের হচ্ছিল। এই প্রকার আশ্চর্য দৃশ্য দেখে রুমী স্তম্ভিত হয়ে শমস তবরেজকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! এটা কি? শমস তবরেজ উত্তর দিলেন "এটা সেই জিনিস যা আপনি জানেন না" এরপরে তিনি ওইস্থান থেকে চলে গেলেন।

পরেরদিন রুমী নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে বাজারে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকেরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁর (রুমীর) হাতে চুমু দিচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ শমস তবরেজ সেখানে পৌঁছলেন ও রুমীর ঘোড়ার লাগামটা ধরে নিলেন। রুমী চিনতে পারলেন যে, ইনিই সেই জিন্দা বাবা। যার সাথে রুমী পুনরায় সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। জিন্দা বাবা বললেন, রুমী একটা সমস্যা আছে। আমাকে বলো তো, হজরত মুহম্মদ বড়, না কি বায়াজিদ বসতামী বড়? (ইন্টারনেটে এমন বিবরণ পাওয়া যায় যে, মন্সূর-অল-হল্লাজ যিনি অনল হকের স্লোগান লাগিয়েছিলেন, সেই বায়াজিদ বসতামী তার জীবনকে প্রভাবিত করার মধ্যে একজন আছেন।) রুমী বললেন, এর উত্তর তো বাচ্চারাও জানে যে, হজরত মুহম্মদ বড়। জিন্দা বাবা বললেন, হজরত মুহম্মদ যদি বড় হতেন, তাহলে তিনি কেন বলেছিলেন যে "হে আল্লাহ! আমি তোমাকে চিনি না, তুমি কে?" আর বায়াজিদ বসতামী কেন এ কথা বলেছিলেন যে "হে আল্লাহ! আপনি পাক অর্থাৎ পবিত্র, আপনি বাদশাদেরও বাদশা এবং আপনার প্রতাপ অসীম।" দুজনের মধ্যে দীর্ঘ সময় আলোচনা হলো এবং জিন্দা বাবার যুক্তি-তর্ক শুনে রুমী অজ্ঞান হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। রুমী চোখ খুলতেই দেখতে পেলেন তার মাথা জিন্দা বাবার (কাদির আল্লাহর) কোলে। জিন্দা বাবা রুমীকে নিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। এরপরে শমস তবরেজ কোন্যা শহর থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর রুমী জিন্দা বাবার জন্য পাগলের মতো হয়ে গেলেন আর জিন্দা বাবার খোঁজে এদিক - সেদিক ঘুরতে লাগলেন। এক বছর পরে রুমী কারোর দ্বারা জানতে পারলেন যে, শমস তবরেজকে কেউ দামাস্কাস শহরে (বর্তমানে সিরিয়া দেশের একটি শহর) দেখেছে। রুমী তার বড় পুত্রকে বললেন, ঘরে যত সোনা, রূপা, গয়না, টাকা পয়সা যা কিছু আছে, সব নিয়ে যাও আর জিন্দা বাবাকে এখানে নিয়ে এসো। রুমীর বড় পুত্র দামাস্কাস শহরে পৌঁছে শমস তবরেজের নামে ভাণ্ডারা (মহা অনুষ্ঠান) শুরু করে দিলেন এবং কিছু দূরে দেখলেন যে, জিন্দা বাবা একটা ছেলের সাথে দাবা খেলছেন। রুমীর বড় পুত্র জিন্দা বাবাকে অনুরোধ করে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে কোন্যা শহরে ফিরিয়ে আনলেন। রুমী জিন্দা বাবাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! আপনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন? আপনি আমার সাথে এমনটি কেন করলেন? আমি এক বছর ধরে আপনার স্মৃতিতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। জিন্দা বাবা বললেন যে, যদি আমি নিরুদ্দেশ না হতাম, তাহলে আজ আমার প্রতি তোমার হৃদয়ে এমন প্রেমের আগুন জ্বলত না। এরপর বাবা রুমীকে ইলম (জ্ঞান) প্রদান করলেন, যা প্রাপ্ত করার পর রুমী তার পূর্বের পরম্পরাগত ইবাদত অর্থাৎ উপাসনা ছেড়ে দেন। এই দেখে রুমীর শিষ্যরা শমস তবরেজের প্রতি হিংসা করতে লাগলো।

একদিন রুমী নিজের মুর্শিদ অর্থাৎ গুরু শমস তবরেজের সাথে তার নিজের কুটীরে বসেছিলেন। তখন রুমীর ছোট পুত্র ও কিছু শিষ্য মিলে শমস তবরেজকে হত্যা করার উদ্দেশ্য সেখানে পৌঁছে শমস তবরেজকে ডাকতে লাগলো। শমস তবরেজ রুমীকে বললেন যে, রুমী! এখন আমার চলে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে। শিষ্যরা যখনই তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার উঠালো, তক্ষুনি শমস তবরেজ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"কবীর সাহেবজি মন্সূর আলীকে উদ্ধার করেছিলেন"

পরমাত্মা কবীর জী নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্র ভালো আত্মা শমস তবরেজের সঙ্গে জিন্দা বাবা রূপে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাকে আল্লাহু আকবরের (কবীর পরমাত্মা) অর্থাৎ নিজের বিষয়ে বুঝিয়ে সতলোক দেখিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ছেড়েছিলেন। এরপরে কবীর আল্লাহর অর্থাৎ জিন্দা বাবার আর দর্শন হয়নি। তাকে কেবল একটা "অনল হক" নামের মন্ত্র দিয়েছিলেন, যার অর্থ মুসলমানরা ভুল বলতেন যে, "আমিই সে" মানে আমিই আল্লাহ অর্থাৎ জীবই হলো ব্রহ্ম। এর যথার্থ মন্ত্র হলো "সোহম্"। এই মন্ত্রকে কোনো অর্থ করে স্মরণ করতে হয় না। এটিকে পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) বশীকরণ মন্ত্র মেনে জপ করতে হয়। শমস তবরেজ পরমাত্মার দেওয়া মন্ত্রের নাম জপ করতেন। তার আশ্রম বাগদাদ (বর্তমানে ইরাক দেশের রাজধানী) শহরের বাইরে বণী নামক স্থানে ছিল।

(এক স্থানে এমনও লেখা আছে যে, আল্লাহ কবীর শমস তবরেজকে প্রেরণা করে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং শমস তবরেজের বেশ ধারণ করে, আসল শমস তবরেজের আশ্রমে থাকতে লাগলেন। তারপর পাকিস্তানের মুলতান শহরে ওই লীলার শেষের

দিকে শমস তবরেজকে মুলতান শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই সময় মুহম্মদ মন্সূর মারা গিয়েছিলেন। আসল শমস তবরেজ মৌন হয়ে গিয়েছিলেন, কথা বলতে পারছিলেন না। কয়েক বছর ধরে তার এই রকম দশা ছিল কিন্তু তিনি সুস্থ ছিলেন। কবীর পরমেশ্বরও ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকদিন যাবৎ মৌন ধারণ করে রেখেছিলেন। যেদিন আসল শমস তবরেজ বাইরে থেকে মুলতানে এলেন, ওইদিন পরমাত্মা কবীর জী ভ্রমণে প্রতিদিনের ন্যায় আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু ফিরে আসেননি। যে সময় কবীর (শমস তবরেজ রূপী আল্লাহ কবীর) প্রতিদিনের ন্যায় আশ্রমে ফিরে আসতেন, ওই সময় শমস তবরেজ আশ্রম দেখতে পেলেন, তারমধ্যে চলে গেলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারা জানলেন যে, পীর শমস তবরেজ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। শমস তবরেজের মুলতান শহরে আসতেই মৃত্যু হয়ে গেল । পরে লোকেরা একটি মাজার বানিয়ে দিয়েছিলেন।}

এখন ওই আশ্রমে আল্লাহ কবীর শমস তবরেজের রূপে বিরাজমান হলেন। ওই নগরের রাজার একমাত্র কন্যা ছিল, যার নাম শিমলি। সে শমস তবরেজের জ্ঞান ও সিদ্ধিতে প্রভাবিত হয়ে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে গেল। দিনরাত নাম জপ করত ও সদগুরুর সেবা করার জন্য প্রতিদিন আশ্রমে যেতে লাগল। তার পিতার আদেশ নিয়েই যেত। কন্যার সাধু ভাব দেখে পিতাও বাধা দিতে পারেনি। সে নিজে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সদগুরুর জন্য ভোজন বানিয়ে নিয়ে যেত। কোনো এক ব্যক্তি শিমলির ভাই মন্সূর আলীকে নালিশ করে যে, তোমার বোন শিমলী সন্ধ্যা বেলায় আশ্রমে একা যায়, এটা কিন্তু শোভা দেয় না, এই কথা নিয়ে শহরে লোকেরা অনেক সমালোচনা করছে।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় শিমলি যখন ওই সন্তের জন্য ভোজন নিয়ে আশ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তার ভাই মন্সূর গোপনে তার পিছনে পিছনে আশ্রমে গেলেন আর আশ্রমের দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে ভিতরের কার্যকলাপ দেখতে লাগলেন এবং দেখলেন যে তার বোন সন্তকে ভোজন করালো, তারপরে সন্ত তার বোনকে জ্ঞান শোনাতে লাগলেন। মন্সূরও শুনতে চাইলেন যে, দুজনের মধ্যে কি কথাবার্তা চলছে বা তাদের গতিবিধি কি? প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা যা শিমলী ও সন্ত শমস তবরেজ করছিলেন ও বলছিলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। অন্য দিন তো আধাঘণ্টা সৎসঙ্গ করতেন, ওইদিন দুই ঘণ্টা সৎসঙ্গ করলেন। মন্সূরও প্রতিটি বচন ধ্যানপূর্বক শুনলেন। তিনি তো দোষ দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান শুনে, কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

পরমাত্মার ভক্তি করা অনিবার্য। আল্লাহ সাকার এবং তাঁর নাম কবীর। তিনি উপরের আকাশে বিরাজমান রয়েছেন এবং পৃথিবীর উপরেও মানব শরীরে প্রকট হন। সৎসঙ্গের পরে সন্ত শমস তবরেজ ও শিমলি দুই হাত সামনে রেখে, পরমাত্মার কাছে প্রসাদ চাইলেন। আকাশ থেকে দুই বাটিতে দুইজনের হাতে অমৃত প্রসাদ এলো। শমস তবরেজ ওই দিন অর্ধেক অমৃত পান করলেন এবং শিমলী সব অমৃতই পান করে নিল। শমস তবরেজ বললেন কন্যা! আমার এই অবশিষ্ট অমৃত প্রসাদ আশ্রমের বাইরে দাঁড়ানো কুকুরটিকে খাইয়ে দিয়ে এসো, তার অন্তঃকরণ পাপে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, এই প্রসাদ পান করলে তার মন পরিষ্কার (পবিত্র) হয়ে যাবে। শিমলি গুরুদেবের অবশিষ্ট প্রসাদ নিয়ে দেওয়ালের দিকে গেলেন। গুরুজি বললেন, ছিদ্র দিয়ে ফেলে দাও, তুমি বাইরে গেলে কুকুরটি পালিয়ে যাবে। মেয়েটির তো গুরুদেবের প্রতিটি বাক্য পালন করার ছিল, তাই শিমলি ওই ছিদ্র দিয়ে অমৃত ফেলে দিল যে ছিদ্র দিয়ে মন্সূর গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। মন্সূরের মুখ কিছুটা স্বাভাবিকভাবেই খোলা ছিল। তাতে সম্পূর্ণ অমৃত চলে গেল। এরপরে মন্সূরের অন্তঃকরণ পরিষ্কার (পবিত্র) হয়ে গেল আর তারপর থেকে সদগুরুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার প্রবল ইচ্ছা হল। পরে তিনি আশ্রমের দরজায় এলেন। শিমলি চিনতে পেরে ভয় পেয়ে গেল, তাই কিছু বলতে পারল না। মন্সূর সরাসরি গুরু শমস তবরেজের চরণে পড়ে, তার মনের পাপের কথা বলে দিলেন এবং নিজের উদ্ধারের জন্য ভিক্ষা চাইলেন। এরপরে তিনি (শমস তবরেজ) মন্সূরকে দীক্ষা দিলেন।

এরপর থেকে মন্সূর প্রতিদিন আশ্রমে যেতে লাগল আর "অনল হক" মন্ত্রকে বলে-বলে জপ করতে লাগল। এরপর মুসলমান সমাজ বিরোধ করে বলতে লাগল যে, মন্সূর কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহকে মনুষ্য হিসেবে বর্ণনা করছে আর এমনও বলে যে, পরমাত্মা (আল্লাহ) নাকি পৃথিবীতে আসেন। "অনল হক" এর অর্থকে মুসলমানেরা ভুল করে বলতে লাগল যে, মন্সূর নিজেকে আল্লাহ বলছে। একে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা উচিত কিংবা "অনল হক" বলা বন্ধ করা উচিত। মন্সূর রাজার পুত্র ছিল। এর কারণে কারোর সাহস হচ্ছিল না যে, মন্সূরকে হত্যা করবে। যদি সে একজন সাধারণ ব্যক্তির পুত্র হতো, তাহলে কবে রাম নাম সত্য করে দিতো। শহরের হাজার হাজার ব্যক্তি রাজার নিকট গেল। বাদশাহকে মন্সূরের অপরাধের বিষয় জানানো হল। রাজা সকলের সামনে মন্সূরকে বোঝালেন কিন্তু এরপরেও সে "অনল হক - অনল হক" জপ করতে লাগল। বাদশাহ উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা বলো, এর জন্য মন্সূরকে কী শাস্তি দেওয়া উচিত? জনতা বলল যে, মন্সূরকে চৌরাস্তার মোড়ে বেঁধে রাখা হোক আর শহরের প্রতিটি মানুষের উচিত মন্সূরকে প্রায় আধা কেজি ওজনের এক একটি পাথর দিয়ে মারা হোক এবং তাকে বলা হোক যে, সে যেন কাফেরদের ভাষা ছেড়ে দেয়। যদি মন্সূর অনল হক বলে, তাহলে এক এক করে সবাই তাকে পাথর মেরে এগিয়ে যাবে। পরে অন্যজন এসে এই কথাই বলল, তাহলে বিরক্ত হয়ে মন্সূর 'অনল হক' বলা ছেড়ে দেবে।

শহরের সমস্ত নাগরিক এক একটি পাথর নিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। ওই নাগরিকদের লাইনে ভক্তিমতী

বোন শিমলিও দাঁড়িয়েছিল। সে এক হাতে পাথর আর অন্য হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শিমলি ভাবতে লাগল যে, মন্সূর হলো আমার ভক্ত ভাই। পাথরের পরিবর্তে ফুল ছুড়ে মারব। তাহলে জনতার মধ্যে কোনো নিন্দাও হবে না এবং ভাইও কষ্ট পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) মন্সূরকে বলছিল যে, ছেড়ে দে অনল হক বলা, তা না হলে পাথর ছুড়ে মারবো। মন্সূর বললেন, অনল হক, অনল হক, অনল হক, অনল হক, সাথে সাথে সকলে পাথরও মারতে লাগলো। প্রভু ভক্ত মন্সূর অনল হক, অনল হক বলতেই থাকল। শরীর রক্তময় হয়ে গেল অর্থাৎ গুরুতর জখম আঘাতে, রক্ত ঝরতে লাগলো। পরমাত্মার প্রেমী অনল হক বেশি করে বলতে লাগল ও হাসতে লাগল। যখন মন্সূরের বোন শিমলির পাথর ছোড়ার পালা এলো, তখন সে কিছু বলল না। মন্সূর তার বোনকে চিনতে পেরে বললেন, বোন! "অনল হক" বলো। শিমলি অনল হক বলল না। হাতে নিয়ে রাখা ফুল ভাই মন্সূরের দিকে ছুড়ে মারল। মন্সূর ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল। শিমলি বলল, ভাই! যখন অন্য ব্যক্তিরা পাথর মেরে তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করছিল, তখন তুমি কান্না করলে না আর আমি কেবল একটা ছোট্ট ফুল মেরেছি, যার আঘাত লাগলে কোনো ব্যথা-বেদনা হয়না, এটিতেই তুমি এমনভাবে কাঁদতে লাগলে, এর কারণ কি?

মন্সূর বলল, বোন! জনগণ তো জানে না যে, আমি কিসের জন্য কুরবান করছি কিন্তু তোমার তো জ্ঞান আছে যে, পরমাত্মার জন্য তন, মন, ধন আমার কাছে খুবই তুচ্ছ। নিরপরাধ ভোলা জনতার পাথর ছুড়ে মারায় আমার কোনো দুঃখ হয়নি, কারণ এদের জ্ঞান নেই। তবে বোন! তুমি তো সবকিছু জানো, তুমিই তো আমাকে এই ভক্তি মার্গে নিয়ে এসেছিলে, তোমার হাতটা আমার দিকে কিভাবে উঠলো? বিশ্বাসঘাতক! তোমার ফুলের আঘাত তো আমার কাছে পাথরের আঘাত থেকেও অধিক লেগেছে। তোমাকে গুরুজি (মুর্শিদ) ক্ষমা করবেন না। শহরের সকল ব্যক্তি পাথর মেরে মেরে বাড়ি চলে গেল। কয়েকজন ধর্মের ঠিকাদার মন্সূরকে আহত অবস্থায় রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, বাদশাহ! ধর্মের উপর রাজ-কাজ কিংবা পরিবার বড় নয় কিন্তু মন্সূর তো এখনও 'অনল হক' বলা ছাড়ছে না। এই মন্সূরকে বলা হোক যে, সে যেন অনল হক বলা ছেড়ে দেয়। তা না হলে তার হাত, পা ও গলা কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে। যদি এই কাফের অনল হক বলা বন্ধ না করে, তাহলে এই কাফেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে, পুড়িয়ে ছাই করে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। এরপর মন্সূরকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলা হল যে, 'অনল হক' বলা ছেড়ে দে, তা না হলে তোর হাত কেটে ফেলা হবে। মন্সূর নিজের হাত ওই ব্যক্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে (যিনি তলোয়ার নিয়ে হাত কাটার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল) আবার "অনল হক" বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তখনই জল্লাদ তার এক হাত কেটে দিল। আবার জল্লাদ বললো, অনল হক বলা ছেড়ে দে, তা না হলে অন্য হাত কেটে দেবো। মন্সূর দ্বিতীয় হাতও তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার "অনল হক" বললেন। এর পর অন্য হাতও কেটে দেওয়া হল। পরে বলা হয়, এবার 'অনল হক' বললে, গলা কেটে দেবো। মন্সূর এবারও অনল-হক, অনল-হক, অনল-হক এইরূপ তিনবার বললেন। এবার জল্লাদ মন্সূরের গলা কেটে দিলো, পরে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে নদীতে প্রবাহ করে দিলো। সেই ছাই থেকে অনল হক, অনল হক, প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর এক মন্সূরের বদলে হাজার হাজার মন্সূর "অনল হক" "অনল হক" বলতে বলতে শহরের রাস্তায় ও অলি-গলিতে ঘুরতে লাগলো। সকলে ভয়ে নিজ-নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করেই রইল। এরপর আল্লাহ মন্সূরের এই লীলাকে সমাপ্ত করলেন বা গুটিয়ে নিলেন। এবার কেবল একটা মন্সূরই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে 'অনল হক', 'অনল হক' বলতে লাগলেন, আবার কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্তর্ধ্যানও হয়ে গেলেন। এরপরে মন্সূর নাম বদল করে, তার নাম মুহম্মদ রাখা হল আর তাকে নিয়ে সদগুরু (শমস তবরেজ) পাকিস্তানের মুলতান শহরের দিকে রওনা দিলেন।

{এক পুস্তকে লেখা আছে যে, মন্সূর আলি যে শহরের রাজার পুত্র ছিলেন, ওই শহরের নাম ছিল বাগদাদ। যে শহর বর্তমানে ইরাক দেশের রাজধানী। সন্ত গরীবদাস জী নিজের বাণীতে এই একই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গরীব, খুরাসান কাবুল কিলা, বগদাদ বনারস এক। বলখ ঔর বিলায়ত লগ, হম হী ধারৈ ভেষ॥

অর্থাৎ যেমন কবীর আল্লাহ বেনারস (কাশী) শহরে লীলা করার জন্য কিছু সময় ছিলেন, তেমনভাবে তিনি বাগদাদেও ছিলেন। বাগদাদ থেকে মন্সূরকে উদ্ধার করেছিলেন আর বেনারস থেকে স্বামী রামানন্দকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বলখ শহর থেকে সুলতান ইব্রাহিম ইবন অধমকে উদ্ধার করেছিলেন। বিলেত অর্থাৎ ইংল্যান্ড পর্যন্ত আমিই (পরমেশ্বর কবীর) এক এক বেশ ধারণ করে লীলা করি।}

"মন্সূর আলীর শব্দ (বাণী)"

অগর হৈ শৌক আল্লাহ সে মিলনে কা, তো হরদম নাম লৌ লগাতা জা॥(টেক)॥
ন রখ রোজা, ন মর ভূখা, ন কর সিজদা। বজূ কা তোড় দে কূজা, শরাবে নাম জাম পীতা জা॥১॥
পকড় কর ইশক কা ঝাড়ু, সাফ কর দিল কে হুজরে কো।
দূঈ কী ধুল রখ সির পর, মুসল্লে পর উড়াতা জা॥২॥
ধাগা তোড় দে তসবী, কিতাবে ডাল পানী মেঁ। মসাইক বনকর ক্যা করনা, মজীখত কো জলাতা জা॥৩॥

কহৈ মন্সূর কাজী সে, নিবালা কুফর কা মত খা। অনল হক্ক নাম বর হক হৈ, য়হী কলমা সুনাতা জা॥৪॥

অর্থাৎ আল্লাহ কবীরের (অল-খিজ্র/জিন্দা বেশধারীর) নিকট হতে জ্ঞান শোনার পর জানা গেল যে, বর্তমান সমাজে যে সাধনা করা হচ্ছে, এ সামান্য লাভ দেয়। মোক্ষলাভ তো সূক্ষ্মবেদের জ্ঞানে বর্ণিত সাধনা দ্বারাই সম্ভব। যার কারণে প্রথাগত ইবাদত (পূজা) ত্যাগ করে সত্য ভক্তি করতে হয়, যা সমাজের অন্য মানুষদের ভালো লাগে না, তারা তীব্র বিরোধিতা করে ও জীবনের শত্রু হয়ে যায়। এটাই কারণ ছিল ভক্ত মন্সূরকে মারার। কিন্তু ভক্ত কখনই মরে না। যখন মন্সূরের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হয়ে গেল যে, পূর্বের সাধনা {রোজা (ব্রত) রাখা, আজান (বংগ) দেওয়া, নামাজ পড়া, ছাগল, গরু জবাই (হত্যা) করা ইত্যাদি} মোক্ষ লাভের জন্য সহযোগী বা যথেষ্ট নয়, এটা নরকের মার্গ। তখন তিনি নিজ ধর্মের প্রচারকদের বোঝাতে চেয়ে বলেছিলেন যে, "হে কাজী! যদি আপনার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার সখ বা ইচ্ছা থাকে, তাহলে প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সত্য নামের জপ (বিশেষ করে) ধ্যান লাগিয়ে করতে হবে। রোজা (ব্রত) করা ত্যাগ করে দেন। ক্ষুধার্ত থেকে মরলেও কিন্তু আল্লাহকে পাওয়া যায় না। স্নান (অজু) ইত্যাদি না করে যে আপনি ধার্মিক ক্রিয়াকার্য করা গুনাহ (পাপ) মনে করেন, তা কেবল ভ্রম মাত্র। স্নানের জন্য জল নিয়ে আসা কলস (কুঁজা) অর্থাৎ ঘড়াকে ভেঙে কোথাও ফেলে দাও অর্থাৎ স্নান ও ধোয়া-কাচা করার চক্করে না লেগে থেকে অর্থাৎ শরীরের উপরিভাগ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলেই মোক্ষ প্রাপ্তির সাধনা সফল হয় না। তারজন্য হৃদয় আগে শুদ্ধ (পবিত্র) করা উচিত। নাম জপ করার নেশা করো অর্থাৎ আল্লাহর নাম জপের (জপওয়ালা মদ বা শরাব পান করো) নেশা করো। আল্লাহকে গভীর প্রেম (ইশ্ক) করো। প্রেমের (ইশ্ক) ঝাড়ু দিয়ে হৃদয়ের ময়লা (দোষ) পরিষ্কার করো। দুঈ (হিংসা ও দ্বেষ) বিনাশ করে সত্যিকারের ভক্ত হও। মালা তো নিয়ে রেখেছেন কিন্তু যথার্থ নামের সাধনা করছেন না, সেই মালাকে (তসবি) ভেঙ্গে দাও আর যে কিতাবগুলো (কুরআন মাজিদ, জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল) পড়েন আর এটা পড়েই ভেবে নিয়েছেন যে, এর দ্বারা মোক্ষ লাভ হবে, সেটি আপনার ভুল ধারণা। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, এই গ্রন্থগুলি জল প্রবাহিত করে দেন। প্রভু (আল্লাহকে) প্রাপ্তির জন্য অহংকারকে জ্বালিয়ে দেন অর্থাৎ অভিমানকে ত্যাগ করুন। ভক্ত মন্সূর কাজীকে বলেছিলেন যে, জীব হিংসা (গরু-ছাগল ইত্যাদি হত্যা) করা বন্ধ করুন। এ (কুফ্র) পাপ করো না। "অনল হক" নাম যথার্থ মোক্ষের মন্ত্র, এই কলমা পড়।

রুমীকে আল্লাহ কবীর শমস তবরেজের বেশ ধারণ করে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং মন্সূর আলীর সাথেও দেখা করেছিলেন। শমস তবরেজ মুসলিম সুফী সন্ত ছিলেন। কোনো কোনো পুস্তকে এটাও উল্লেখ আছে যে, পরমাত্মা কবীর আল্লাহ গুপ্ত রূপে প্রেরণা করে শমস তবরেজকে আশ্রম ত্যাগ করার ইচ্ছা উৎপন্ন করে ছিলেন, কারণ সেই শহরে শমস তবরেজের বিরোধিতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যেই শমস তবরেজ আশ্রম ত্যাগ করলেন, তার সাথে সাথে কবীর পরমাত্মা স্বয়ং শমস তবরেজের রূপ ধারণ করে আশ্রমে থাকতে লাগলেন। কারণ সেখান থেকে আল্লাহ কবীরজির প্রিয় হংস আত্মা মন্সূরকে উদ্ধার করার ছিল। রাজা এবং সেখানকার জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতার পরও শমস তবরেজ বেশধারী অল খিজ্র (কবীর আল্লাহ) তাঁর শাগির্দ শাহজাদা মুহম্মদকে (মন্সূরকে অর্থাৎ তার নাম পরিবর্তন করে মুহম্মদকে) সাথে নিয়ে হিন্দুস্তানের (বর্তমান পাকিস্তানের) মুলতান শহরে চলে গিয়েছিলেন। এরপর সতগুরু শমস তবরেজ এবং শাহজাদা মুহম্মদ মুলতান শহরেই নিজেদের নিবাসস্থান বানিয়ে নিলেন এবং তাঁর জ্ঞান শুনে কিছু ভালো আত্মারা তাঁর অনুগামী বা ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে ভক্তি ক্রিয়া হওয়ার কারণে, সেখানকার জনগণ তীব্র প্রতিবাদ শুরু করতে লাগল। এছাড়া যারা তাঁর অনুযায়ী হয়েছিলেন, তারাও আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। শমস তবরেজের কাছে রান্না করার জ্বালানি কাঠও ফুরিয়ে গিয়েছিল।তিনি শাহজাদাকে (মুহম্মদ /মন্সূর) বললেন, এই আটা দিয়ে একটা বড় মোটা রুটি বানিয়ে শহরে নিয়ে যাও এবং কারোর বাড়ি থেকে রুটিটি বানিয়ে নিয়ে এসো। শাহজাদা মোটা কাঁচা আটার গোলা নিয়ে শহরে গেলেন কিন্তু কেউ রুটি সেঁকে দিলো না, উল্টে তারা মুহম্মদকে মুখে মেরে আহত করে দিয়েছে, রুটি না সেঁকেই (শিষ্য) ঘরে ফিরে এল এবং সদগুরুজিকে বললেন যে, লোকেরা আমাকে এমন দশা করে দিল, রুটিও সেঁকে দেয়নি। তখন শমস তবরেজ রুটি হাতে রেখে সূর্যের (Sun) দিকে মুখ করে বললেন, এখানে এসে আমার রুটি সেঁকে দে। একথা বলা মাত্র সদগুরুর (কাদির আল্লাহর) আদেশে সূর্য মাটির কাছাকাছি আসতে লাগল এবং তাপ এতটাই বেড়ে গেল যে, সম্পূর্ণ মুলতান শহর আগুনের ভাট্টি হয়ে জ্বলতে লাগল। দরজা ও দেওয়াল গরম হতে লাগল। কিছু বুদ্ধিমান লোক সদগুরুর সেবা করার উদ্দেশ্যে সেখানে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, কয়েকজন অবুঝ লোকের কর্মের জন্য দয়া করে সমস্ত মুলতানবাসীদের আপনি শাস্তি দেবেন না।

সদগুরু বললেন, এরা অবুঝ নয়, এরা দুষ্ট। এরা আগুনের মতো সামান্য বস্তুও সন্তকে দিতে অস্বীকার করেছে। এই বাচ্চাটির (মন্সূরের/মুহম্মদের) মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তখন বললেন, এরা আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত নয়, আল্লাহর বাস্তে এদের ক্ষমা করে দিন। একথা শুনে সদগুরু শমস তবরেজ বললেন, তোমরা খুদা অর্থাৎ আল্লাহর নামকে মাঝখানে এনেছো, তাই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তাপ কমিয়ে দাও। জানিনা এই মানুষগুলো জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করবে? একথা বলতেই সূর্য তাঁর স্থানে ফিরে গেল।

এরপর থেকে মুলতানের মানুষ শমস তবরেজ সদগুরুর ভক্ত হতে লাগলো। সদগুরু (কবীর আল্লাহ) যিনি শমস তবরেজের চরিত্রের অভিনয় করছিলেন, তিনি তাঁর পরিকল্পনার অনুসারে কিছুদিন নীরবতা পালন করেছিলেন। কেননা শমস তবরেজ তাঁর নিজের শিষ্য মন্সুরের সাথে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও অত্যাচার হওয়া দেখে বাকরুদ্ধ (মৌন) হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কারণে কবীর পরমাত্মাও কিছুদিন নীরব (মৌন) হয়ে ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ন্যায় একদিন প্রাতঃকাল ভ্রমণ করতে গেলেন কিন্তু আর কোনোদিন সেখানে ফিরে আসেননি। সেই দিনই আসল শমস তবরেজ মৌন ধারণ করে আশ্রমে ফিরে এলেন এবং সেদিনই তিনি শরীর ত্যাগ করে দিলেন। আজ পর্যন্ত এই রহস্য মানুষ জানতে পারেনি। আসল শমস তবরেজের শরীরকে কবরে দাফন করে দেওয়া হল এবং ১৩২৯ সালে তাঁর এক স্মারকও তৈরি করে দেওয়া হল। আবার ১৩৯৮ থেকে ১৫১৮ সাল পর্যন্ত একশো কুড়ি বছর, কাশীতে (ভারতে) কবীর পরমেশ্বর লীলা করেছিলেন। ওই সময় কামালী নামের একটি মেয়েকে তিনি কবর থেকে জীবিত করেছিলেন এবং কামালী যুবতী হওয়ার পরে যখন উপরোক্ত মুলতান শহরের ঘটনা জানতে পারল, তখন ওই স্থান দেখার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল, তাই সদগুরুকে নিবেদন করেন। এরপরে ওই মুলতান শহরেই এক ভক্তের বাড়িতে কামালীকে বিবাহ দিয়েছিলেন।

সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন যে :-

গরীব, সতগুরু শমস তবরেজ কুঁ, বাটী ধরিয়া হাথ। সূরজ কুঁ সেকী জহাঁ, তেজপুঞ্জ কা গাত॥

অর্থাৎ সৎগুরু সমস তবরেজ কাঁচা রুটি হাতে রেখে, সূর্যকে সেঁকতে বললেন, ওই সময়ই সূর্য পৃথিবীর নিকট এসে গিয়েছিল। তখন শমস তবরেজ রূপধারী সদগুরুজির শরীর তেজপুঞ্জে পরিণত হয়ে গেল অর্থাৎ নূর শরীর দৃশ্যমান হল। সূর্যের তাপে সেই রুটি খাওয়ার যোগ্য হয়ে গেল।

ভক্ত শেখ ফরীদের ঘটনা

ভক্ত শেখ ফরীদের জন্ম মুসলমান ধর্মে শেখ বংশে হয়েছিল। শেখ ফরীদ শৈশবকালে খুবই চঞ্চল ছিলেন। রাস্তায় খেলতে গেলে শিশুদের মারতেন, তাই তারা তাঁর অভিযোগ করতে এলে, তাঁর মা খুবই দুঃখ পেতেন। মাতা বিচার করলেন যে, শেখ ফরীদের খেজুর খুবই প্রিয়, অতএব তাকে নামাজ পড়তে বলি। তাহলে সে কিছু সময়ের জন্য শান্ত হয়ে থাকবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর মা বললেন যে, পুত্র! আল্লাহর নামাজ (প্রার্থনা) করতে হয়। শেখ ফরীদ বললেন, নামাজ পড়লে আল্লাহ (প্রভু) কি দেবেন? মা বললেন যে, আল্লাহ খেজুর দেবেন। ফরিদ বললেন, মা কখন করতে হবে নামাজ? মা ভেবে চিনতে ওই সময়কে নির্ধারণ করলেন, যে সময় তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, সেই সময় শেখ ফরীদ ঘরের বাইরে পালিয়ে যেতেন। এইজন্য তিনি তার কাজের ওই সময়টাই নামাজ পড়ার কথা বললেন। পরে নামাজ পড়ার জন্য তিনি একটা চাদর বিছিয়ে শেখ ফরীদকে বললেন যে, এখানে বসে চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে বলবে যে, আল্লাহ খেজুর দাও! আল্লাহ খেজুর দাও! এইভাবেই বলতে থাকবে। মা একটি গাছের তলায় চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, চোখ বন্ধ রাখতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যের আলো তোমার শরীরের উপরে পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে নামাজ করতে থাকবে। শেখ ফরীদ যখন চোখ বন্ধ করে নিতেন, তখন তার মা একটা তাল গাছের ছোট্ট পাতার ওপর চাদরের নীচে কোনো এক কোণায় খেজুর রেখে দিতেন আর সূর্য দেহে পড়তেই শেখ ফরীদ চোখ খুলে কোথাও খেজুর না দেখতে পেয়ে, মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, মা! আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন, আমি আর কখনও নামাজ পড়বো না। আল্লাহ খেজুর দেননি। মা বললেন, পুত্র! আল্লাহ সবকিছু গোপনে করেন। চাদরের নীচে খুঁজে দেখো, তাহলে অবশ্যই পাবে। শেখ ফরীদ যখন চাদর তুললেন, সত্যি করেই চাদরের নীচে খেজুর দেখতে পেলেন এবং খুশি খুশি করে খেজুর খেয়ে বললেন, মা! আবার কবে আমাকে নামাজ পড়তে হবে? মা বললেন, যখন পড়তে হবে, তখন আমি বলে দেবো। এইরূপ প্রতিদিন তিনি তার কাজের সময় চাদর বিছিয়ে দিতেন আর ওই সময় শেখ ফরীদ চোখ বন্ধ করে বসে পড়তেন আর মা তখন তার চাদরের নীচে খেজুর রেখে দিতেন। একদিন তার মা খেজুর রাখতে ভুলে যান আর শেখ ফরিদের শরীরে রোদ্র পড়তেই তার চোখ খুলে গেল। এরপরে সে খেজুর খুঁজতে লাগল। চাদরের নীচে যথারীতি খেজুর বের করে, খেজুর খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মা ভাবলেন যে, হায়! আজ তো আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি, খেজুর তো রাখতেই ভুলে গিয়েছি, তবে আজ খেজুর না পেলে, সে খুব জ্বালাতন করবে এবং কখনও সে আর নামাজ পড়তে চাইবে না। আজ আমাকে খুব বিরক্ত করবে। এর মধ্যে শেখ ফরীদ খেজুর খেতে খেতে মায়ের কাছে এলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্র! খেজুর কোথা থেকে নিয়ে এসেছিস? বালক শেখ ফরীদ বললেন, কেন মা! আল্লাহ তো রোজ নামাজের সময় খেজুর দেন। মা বললেন, সত্যি করে বল! শেখ ফরীদ বললেন যে, আমি সত্যি বলছি মা, দেখো! এই পাতায় আল্লাহ খেজুর রেখে গেছেন। শেখফরীদের মা বুঝে গেলেন যে, তার বালক সাধারণ নয়। শেখ ফরীদ ইসলাম ধর্মের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতেন। একদিন শেখ ফরীদের সঙ্গে এক সুফি সাধুর দেখা হয়, তিনি শেখ ফরীদকে বলেছিলেন, তপস্যা করলে খুদা পাওয়া যায় কিন্তু তুমি যে সাধনা করছো, এ সাধনা দ্বারা খুদা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমিও ইসলাম ধর্মে জন্ম নিয়েছি। তবে এক সুফী সন্ত (সাধু) আমাকে এই ভক্তি মার্গ বলেছেন, আমি তাঁর কথা অনুসার ইবাদত করছি। আমার নাম এই, গ্রামের বাইরে অমুক স্থানে আমার এক আশ্রম আছে। শেখ ফরীদ কিছুদিন পর স্বাভাবিকভাবে ওই সুফি সন্তের আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, ওই সাধু অনেক সিদ্ধিযুক্ত, এই কথা আশ্রমে আসা বাইরের লোকেরা বলেছিলেন, যারা মুসলমান ছিলেন। এরপর শেখ ফরীদ ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে ওই ফক্কড় ফকিরের শিষ্য হয়ে আশ্রমে থাকতে লাগলেন। ওই ফকির সিদ্ধি প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি হুক্কা খেতেন। তাঁর আশ্রমে মোট সাতজন শিষ্য ছিল, তারা সকলে গৃহ ত্যাগ করেই এসেছিল। প্রতিদিন এক শিষ্যই সমস্ত সেবা করতো। গুরুদেবের খাবার তৈরি করা, ভোজনের পরপরই গুরুর জন্য হুক্কা ভরে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া, গুরুর কাপড়

ধোয়া ইত্যাদি কাজ। শেখ ফরীদ মন দিয়ে আশ্রমের সমস্ত সেবা করতো এবং সমস্ত স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও বেশী রাখতেন, সেই কারণে গুরুজি শেখ ফরীদের অনেক প্রশংসা করতেন, যা অন্য শিষ্যদের চোখে খারাপ লাগতো। তাই অন্য সব শিষ্য মিলে, গুরুদেবের দৃষ্টি থেকে শেখ ফরীদকে নীচে নামানোর জন্য একটা ষড়যন্ত্র করলো, বর্তমানে বর্ষাকাল চলছে আর আজ শেখ ফরীদের সেবা করার দিন। গুরুদেব ভোজনের পরপরই হুঁক্কা সেবন করতেন। যদি কোনো শিষ্য হুঁক্কা সাজিয়ে আনতে দেরি করতো, তাহলে গুরুদেব তাকে লাঠি দিয়ে মারতেন ও তাকে অনেক দিন পর্যন্ত সেবা থেকে বঞ্চিত করে দিতেন কিন্তু শেখ ফরীদ কখনো দোষ করতেন না। একদিন শেখ ফরিদ ভোজন বানালেন। আগুন প্রতিদিনের মত রাখা ছিল। তিনি গুরুজিকে ভোজন করালেন। তারপরে উনুনের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, আগুন নিভে গিয়েছে,আগুন নেই। গুরুজি রেগে না যান, এই ভয়ে শেখ ফরিদ দৌঁড়ে-দৌঁড়ে গ্রামে গেলেন, যা আধা কিলোমিটার দূরে। আশ্রম থেকে গ্রাম কিছুটা দূরত্বে ছিল। এক বুড়ি মহিলা উনুনে আগুন জ্বালিয়ে রুটি বানাচ্ছিল। শেখ ফরীদ বললেন, বুড়িমা! আগুন দেন, আমার গুরুদেবের হুঁক্কা ভরবো। আমাদের উনুনের আগুন নিভে গিয়েছে, গুরুজি যদি রেগে যান, তাহলে আমার জীবন নরক হয়ে যাবে। বুড়িমা অনেক কষ্ট করে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছিল, কারণ বর্ষার সময় ছিল। বুড়িমা রেগে বলল যে, চোখ কানা করলে আগুন পাওয়া যায়। আমি চোখ কানা করে আগুন জ্বালিয়েছি, তুইও তোর চোখটা কানা কর, তাহলে আগুন পাবি। শেখ ফরীদ নিজের একটা চোখে চিমটা দিয়ে আঘাত করে, এক চোখ বের করে বুড়িমার সামনে রেখে দিয়ে বললেন, নাও বুড়িমা! এক চোখ উঠিয়ে দিয়েছি, এখন তো আমাকে আগুন দাও। বুড়িমা ঘাবড়ে গেল। তিনি জানতেন যে, ওই ফকির একজন সিদ্ধ পুরুষ, তিনি আমার সর্বনাশ করে দেবেন। তৎক্ষণাৎ উনুন থেকে আগুন বের করে দিল। শেখ ফরীদ আগুন ছিলুমে ভরে দৌড়ে দৌড়ে আশ্রমে গেলেন। ফকির কেবল দুইবার শিষ্যের নাম ধরে ডেকে বলতেন যে, হুঁক্কা নিয়ে এসো। দুই আওয়াজে না এলে, তৃতীয়বার লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করতেন। গুরু প্রথমবার ডাক দিলেন। তখন শেখ ফরীদ অর্ধেক পথ পর্যন্ত এসেছিল। দ্বিতীয়বার যখন আওয়াজ দিলেন,তখন আশ্রমে প্রবেশ করলেন। গুরুদেব দ্বিতীয়বার বললেন যে, শেখ ফরীদ! কোথায় মরে গিয়েছিস? শেখ ফরীদ বললেন যে, এসে পড়েছি গুরুজি! শেখ ফরিদ অন্ধ চোখে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। গুরুজিকে জানালেন যে, বৃষ্টির কারণে আশ্রমের আগুন নিভে গিয়েছিল, তাই দৌড়ে গিয়ে দূরের গ্রাম থেকে আগুন নিয়ে এসেছি। গুরুদেব অন্ধকারে একটু কম দেখতেন। তাই শেখ ফরীদের চোখে কাপড় বাঁধা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, চোখে কি হয়েছে? শেখ ফরীদ বললেন, কিছু না গুরুদেব! আপনার দয়ায় সব ঠিক আছে। গুরুদেবও তার এই কথায় খুব একটা গুরুত্ব দেননি। সকালে ওই বুড়ি মহিলা শেখ ফরীদের চোখ একটা মাটির ঢাকনা পাত্রে নিয়ে আশ্রমে আসে আর ফকিরের নিকট নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আপনার শিষ্য গতকাল সন্ধ্যায় আগুন আনতে গিয়ে, আমাকে বলেছিল যে, বুড়িমা! আমাকে একটু আগুন দাও, আমাদের আশ্রমের আগুন নিভে গিয়েছে, গুরুদেব ভোজন সমাপ্ত করতেই হুঁক্কা সেবন করেন। হুঁক্কা ভরতে দেরি হলে তিনি রেগে যান আর কয়েক দিন যাবৎ সেবা থেকে বঞ্চিত করে দেন। গুরুদেব যদি রেগে যান, তাহলে তো আমার জীবন নরক হয়ে যাবে। বুড়িমা বললেন যে, আমি অনেক কষ্ট করে আগুন জ্বালিয়ে ছিলাম। ধুঁয়াতে আমার চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল, ফুঁক মেরে -মেরে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমি রেগে গিয়ে আপনার শিষ্যকে বলে ছিলাম যে, চোখ নষ্ট করেই আগুন জ্বালাতে হয়, তোর চোখ নষ্ট কর তাহলে আগুন পাবি। আমার কথা সত্য মেনে আপনার শিষ্য তার একটা চোখ উঠিয়ে আমার হাতে রেখে দিয়ে বললেন যে, যদি আমার গুরুদেব রেগে যান, তাহলে আমার চোখ কিসের কাজে লাগবে? এইজন্য আপনার শিষ্যের এই চোখ আমি নিয়ে এসেছি। এই শুনে গুরুদেব শেখ ফরীদকে ডেকে বললেন যে, চোখের কাপড়টা খোলো। কাপড় খুলতেই দেখা গেল যে, চোখ ঠিক-ঠাক হয়ে গিয়েছে কিন্তু একটা চোখ একটু ছোটো হয়ে গিয়েছে। বুড়িমা নিজের চোখে এই সব দেখার পরে গ্রামে গিয়ে ওই ফকিরের সিদ্ধির মহিমা গেয়ে বলতে লাগলেন যে, উনি বড় চমৎকারী সাধু, যিনি আমার সামনে উঠিয়ে দেওয়া চোখ ঠিক করে দিয়েছেন। গুরুদেব শেখ ফরীদকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ দিলেন যে, তোর সাধনা একদিন সফল হবেই।

গুরুদেবের মৃত্যুর পর শেখ ফরীদ আশ্রম ত্যাগ করলেন এবং তার গুরুদেব বলে গিয়েছিলেন যে, তপস্যা করলে মোক্ষ পাওয়া যায়, তাই যেমনটি গুরুর আদেশ ছিল, শেখ ফরীদ খুবই নিষ্ঠার সাথে তা পালন করছিলেন। বারো বছর পর্যন্ত তো কুঁয়ার মধ্যে উল্টো ঝুলে তপস্যা করেছিলেন। ওই সময় শুধু সোয়া মণ (প্রায় ৫০ কেজি) অন্ন খেয়েছিলেন, যা নামমাত্রই অর্থাৎ (প্রতিদিন এগারো থেকে বারো গ্রাম খেতেন।) এই কারণে শরীরটা একদম কঙ্কাল হয়ে গিয়েছিল। শেখ ফরীদ কিছু সময় কুঁয়ার বাইরে ঘুরে বেড়াতেন ও কিছু সময় বসে থাকতেন। একদিন কিছু কাক তাকে মৃত মনে করে, তার চোখ দুটি খাওয়ার জন্য মাথার উপরে বসল, তার শরীরে মাংস কম ছিল। শেখ ফরীদ বলবেন! হে কাকগণ! তোমরা আমার চোখ দুটিকে বাদ দিয়ে আমার শরীরের সব মাংস খেয়ে নাও কিন্তু আল্লাহকে দর্শন করার জন্য কেবল চোখ দুটিকে ছেড়ে দাও। শেখ ফরিদের এই কথা শুনতেই কাকগুলো উড়ে চলে গেল। শেখ ফরীদ পুনরায় নিজের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে যথারীতি কুঁয়ার মধ্যে ঝুলে গেলেন। কবীর আল্লাহ জিন্দা বাবার (অল-খিজ্রের) বেশ ধারণ করে, কুঁয়ার কাছে এলেন এবং দড়িটি ধরে শেখ ফরীদকে কুঁয়ো থেকে যখনই উপরে তুলতে গেলেন, শেখ ফরীদ বললেন, ভাই! আপনি আমাকে নড়াবেন না। আপনি আপনার কাজ করুন আর আমি আমার কাজ করছি। পরমাত্মা বললেন, আপনি কি করছেন? শেখ ফরিদ বললেন, আমি আল্লাহকে দর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করছি। পরমাত্মা কবীর বললেন, আমিই আল্লাহু আকবর। শেখ ফরীদ বললেন, ভাই! ঠাট্টা করবেন না, আল্লাহ তো নিরাকার (বেচুন/আকারহীন), তিনি মানব রূপে আসেন না। পরমাত্মা বললেন যে, আপনি বলছেন যে, পরমাত্মা নিরাকার আর অন্যদিকে বলছেন যে, পরমাত্মার (আল্লাহর) দর্শন করার জন্য ঘোর তপস্যা করছি। তবে বলা হয় যে, সূর্যের প্রকাশ ও জ্ঞান তো চমকের মতই লাগে। শেখ ফরিদ মনে করলেন যে, আল্লাহ নেই, তাহলে আল্লাহর বাখবর (পয়গম্বর) তো অবশ্যই আছেন। এই ভেবে শেখ ফরীদ চরণ ধরে তত্ত্বজ্ঞান বুঝলেন। পরে কবীর পরমাত্মার বলা সাধনা করে, নিজের কল্যাণ করিয়ে নিলেন।

(অধ্যায় নং ৪)

"রহমত রহমানের"

"আমি বুঝেছি আল্লাহর মহিমা"

আমার নাম মুবারক খান, জেলা ঔরৈয়া (উত্তরপ্রদেশ) নিবাসী। উপরোক্ত পংক্তিটির কথা আমার জীবনে চরিতার্থ হয়েছে, কেননা যখন আমি সন্ত রামপালজি মহারাজের দ্বারা লিখিত পবিত্র পুস্তক "জ্ঞান গঙ্গা" পড়তে শুরু করলাম, তখন সেখানে দেখলাম যে, সন্ত রামপালজি মহারাজ বলছেন, কুরআন শরীফ সূরা ফুরকান ২৫ আয়ত নং ৫২-৫৯-তে লেখা আছে যে, ওই আল্লাহ হলেন কবীর, যিনি পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর খবর কোনো বাখবরের (তত্ত্বদর্শীর / পূর্ণগুরুর) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তো দেখো। আগে আমি জুম্মার নামাজ পড়তে যেতাম কিন্তু কখনো সন্তুষ্টিতে থাকতে পারিনি। ওইসব করেও আমি কখনো সুখ পেতাম না। এত নামাজ পড়তাম কিন্তু তার ফল শূন্যই ছিল। আমার মেয়ের একদিন নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর 'জ্ঞান গঙ্গা' পুস্তকে যেসব প্রমাণ লেখা ছিল, তা আমি কুরআন শরীফের সাথে মিলিয়ে দেখেছি, তা একদম ঠিক-ঠাকই দেখতে পেয়েছি আর ভাবলাম যে, সব কথাই তো ঠিক আছে কিন্তু সন্ত রামপালজী মহারাজ আল্লাহ তো হতে পারেন না। আমি বললাম, যদি আপনি আল্লাহ হন, তাহলে আমার দাড়িগুলো যেন উধাও (অদৃশ্য) হয়ে যায়। এরপর যখন আমি রাতে ঘুমানোর পর সকালে উঠলাম, তখন আমার দাড়িতে জ্বলছিল। তারপর যখন আয়নাতে গিয়ে নিজের চেহারা দেখতে গেলাম তখন দেখলাম যে, আমার দাড়ির চুলগুলো সব উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন আমি ভাবলাম যে, মনে হচ্ছে সন্ত রামপালজী মহারাজ সত্যি করেই তো আল্লাহই আছেন। তারপর আমি আশ্রমে গিয়ে দেখলাম, সব একই সমান, আল্লাহর কাছে যেমন সব এক সমান হয়। তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ একটি শব্দ গেয়েছিলেন যে :-

মোকূঁ কহাঁ ঢুন্ডে রে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।
না তীর্থ মেঁ, না সূরত মেঁ, না কাশী কৈলাশ মেঁ, মৈঁ তো হুঁ বিশ্বাস মেঁ ॥

সন্ত রামপালজি মহারাজের নিকট হতে আমি নাম দীক্ষা নিয়েছিলাম ২ রা অক্টোবর ২০১২ সালে এবং নাম দীক্ষা নেওয়ার পর, সন্ত রামপালজি আল্লাহ আমার সমস্ত সমস্যা সমাপ্ত করে দিয়েছেন। নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমার ডিপ্রেশনের সমস্যাও দূর হয়ে গিয়েছে আর আমার মেয়ের যে নিউমোনিয়া হয়েছিল, সেই মেয়েও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। একবার আমার মেয়ে রাস্তা পার করছিল হঠাৎ এক অটোর নীচে তার পা চলে যায়। আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে, মেয়ের পা পিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু যখন তাকে দেখলাম তখন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ পেলাম, তার কোনো ক্ষতি হয়নি। কেননা আমাদের উপর তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজি মহারাজের কৃপা ছিল। এছাড়া আমার মেয়ের ক্যান্সারও হয়ে গিয়েছিল, তখন আমার স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন এবং আশেপাশের লোকজন বলতে শুরু করল যে, সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছে যাওয়ার কারণে এমনটা হয়েছে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে, সতগুরু রামপালজি মহারাজের নিকটে গেলেই মেয়েটি ভালো হবে। তারপর আমি আমার গুরুজীর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, হে গুরুজি! আমার মেয়ের ক্যান্সার হয়েছে, আপনি কৃপা করুন। তখন গুরুজি বললেন, পুত্র! সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কেবল এই ভক্তিই করো। এই ভক্তি করার পরেই আমার মেয়ের ক্যান্সার আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আমি এক মুসলমান সমাজ থেকে এসেছি কিন্তু সন্ত রামপালজি মহারাজের কৃপায় আজ আমি মাংসকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনা। এ ছাড়া বিড়ি-সিগরেট, তামাক ও মদকে তো আমি হাতও লাগাই না। কুরআন শরীফে যা লেখা আছে, তা আজ সন্ত রামপালজি মহারাজের শরণে আসার পরে বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ বলেছেন যে, এই ধর্ম তো হল একটা দেয়াল, ভক্তির মার্গে এটা আপনাকে মানতে হবে না। আল্লাহ, খুদা, রাম, ঈশ, গড় সব একই। আল্লাহ ধর্মও বানাননি আর তিনি মানুষকেও বিভক্ত করেননি। এইজন্য হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সকলেই ওই একই পরমাত্মার সন্তান। সন্ত রামপালজি মহারাজের (বাখবরের) নিকট হতে নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে, জানতে পারলাম যে, এটিই হল সঠিক ভক্তি বিধি, যা শাস্ত্রতে প্রমাণিত আছে আর সন্ত রামপালজি মহারাজই হলেন দয়ালু আল্লাহ বা পরমাত্মা। সকলকে সন্ত রামপালজি মহারাজের আশ্রয়ে (শরণে) আসা উচিৎ এবং যথার্থ ভক্তি করে নিজের নিজের কল্যাণ করিয়ে নেওয়া উচিত।

ভক্ত মুবারক খান
জেলা- ঔরৈয়া, উত্তরপ্রদেশ

"এখন হলাম প্রকৃত মুসলমান"

আমি সেলিম খান, জেলা-ইটাবা ও উত্তরপ্রদেশের নিবাসী। আমি মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এসেছি কিন্তু এক সত্য মুসলমান কেমন হয়? সেই কথা আমি বাখবর (তত্ত্বদর্শী সন্ত) রামপালজি মহারাজের জ্ঞান বোঝার পরই জানতে পেরেছি। আজ আমি সত্যিকারের প্রকৃত একজন মুসলমান হতে পেরেছি। বন্দিছোড় সদগুরু রামপালজি মহারাজের নিকট হতে ২০১৩ সালে আমি নাম দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজের নিকট হতে নাম দীক্ষা নেওয়ার পূর্বে আমি মুসলিম ধর্ম অনুসারেই ইবাদত (ভক্তি-পূজা) করতাম কিন্তু ওই ইবাদত করে আমি কোনো আত্মতৃপ্তি পাইনি। যেমন মুসলিম সমাজে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, বকরা ঈদ উদযাপন করা, ইবাদত করা, দরগাতে যাওয়া ইত্যাদি করে থাকে, এই সবই আমি করতাম কিন্তু আমি একদিনও শান্তি অনুভব করতে পারিনি। যেমন আমি দরগাতে যখন যেতাম, তখন মৌলবী বলতেন, আল্লাহ আছেন কিন্তু এই কথা কেউ বলতেন না যে, সেই আল্লাহ কে? তিনি বলতেন, আল্লাহ হলেন কেবল এক নূর। তখন আমি বলতাম, কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই আল্লাহকে দেখেছেন? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কারোর কাছে ছিল না। বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজের বিষয়ে আমাকে তাঁরই এক শিষ্য বলেছিলেন যে, আপনাদের কুরআন শরীফে বাখবরের বিষয়ে জিকির অর্থাৎ উল্লেখ আছে, আপনি ওই বাখবরকে শনাক্ত করে, তাঁর দ্বারা বলা ইবাদত করুন। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন, এটিও করে দেখি। তারপর আমি একদিন সন্ত রামপালজি মহারাজের আশ্রমে গেলাম। সেখান থেকে তাঁরই কোনো এক ভক্ত আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহর জিকির বা উল্লেখ আছে, তিনি তো ছয় দিনে সৃষ্টি করে, সপ্তম দিনে সিংহাসনে আসীন হলেন। আশ্রম থেকে ফেরার পর আমি বাড়িতে এসে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফ ও বাইবেল দুটি গ্রন্থতেই সন্ধান করে দেখতে চাইলাম যে, সত্যি করেই কি ইনি ঠিক কথা বলছেন কি না? তারপর বাস্তবে যা তিনি বলেছিলেন, তা সবই পবিত্র কুরআন শরীফ ও বাইবেলটিতে মিলে গেল। অনেক স্থানে কবীর সাহেবের নামও ছিল। তারপর আমি ভাবলাম, যে জ্ঞান সন্ত রামপালজি মহারাজ বলছেন, তা সম্পূর্ণ রূপে সত্য। পবিত্র কুরআন শরীফে যে বাখবরের উল্লেখ আছে, সেই বাখবর হলেন সন্ত রামপালজি মহারাজ, যাঁর নিকট সব কথার ইলম (জ্ঞান) আছে। সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পর, আমি মানুষের বিরোধও অনেক সহ্য করেছি। ওই লোকদের যখন আমি বুঝিয়ে বলতাম যে, আল্লাহ হলেন কবীর, তখন মৌলবী বলতেন যে, আল্লাহর তো ৯০ নাম আছে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কুরআন শরীফে দেখুন। যখন তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ দেখলেন, তখন সেখানে লেখা ছিল "কবীর বড়"। আমি বললাম, দেখুন কুরআন শরীফেও লেখা রয়েছে, এর মধ্যে কবীর বড় লেখা আছে। লোকেরা লুকানোর জন্য কবীরকে বড়-বড় লিখে দিয়েছেন, তারপর তিনি বললেন ঠিক আছে। এখন সেখানে যখন যাচ্ছেন কিন্তু সাথে নামাজও পড়তে থেকো। আমি বললাম নামাজ কি? তিনি বললেন, নামাজ হল নবীজির চোখের শীতলতা। আমি বললাম, তাহলে আমার সব ভক্তি তো নবীর কাছে চলে যাবে, আমার কাছে তো কিছুই থাকবে না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথায় ফেঁসে গিয়েছো? কোথায় হিন্দু ধর্মগুরুদের কাছে চলে গিয়েছো? তুমি তো বেকার হয়ে গিয়েছো। আমরা তোমাকে সমাজ থেকে বের করে দেব।

আমি ওই লোকদের বলতে চাই যে, আমি আমার নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। আমার ধর্মের ইবাদতগুলো কেবল সংশোধন করেছি, তবে যে জ্ঞান না থাকার কারণে আমার একটুও লাভ হচ্ছিল না। বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজ যে শাস্ত্রের জ্ঞান রাখেন, তিনি আমাকে সঠিক ইবাদত বলেছেন আর আমিও তাই করছি। একবার আমার মায়ের ৪০০০ টাকা ঘর থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আর মা তখন আমাকে বলেছিলেন যে, তুই আমার টাকা চুরি করেছিস। তখন আমি বলেছিলাম, আমি সন্ত রামপালজি মহারাজের শিষ্য, আমি চুরি করিনা। তারপর আমি সন্ত রামপালজি মহারাজকে বললাম যে, হে আল্লাহ! আমার মায়ের ৪ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন পরমাত্মা বললেন যে, পেয়ে যাবে। যখন আমি আমার আলমারি দেখলাম, তখন মায়ের পয়সার ব্যাগ পেলাম, যার মধ্যে ৪ হাজার টাকাও রাখা ছিল। আমি মাকে সেই টাকা দিয়ে বললাম যে, এই সব আমার বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজের দয়াতে হয়েছে। একবার আমার মায়ের পেটে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে শরীর খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সব সময় ব্যথা থাকত। যখনই কাজ থেকে আমি বাড়ি আসতাম, সব সময় তাকে কাঁদতেই দেখতাম। এই দেখে একদিন আমি মাকে বললাম, মা! আপনি একবার বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নিন। আপনার সমস্ত কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যাবে। পরে কবীর প্রকট দিবসের দিন সন্ত রামপালজি মহারাজের নিকট হতে নাম দীক্ষা নিলেন, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ আছেন। যে ব্যক্তিরা মনে করেন যে, সন্ত রামপালজি মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পর মুসলমান ব্যক্তি হিন্দু হয়ে যাবে, এ সব কথা একেবারেই ভুল। আমরা সবাই একই আল্লাহর সন্তান, সেই আল্লাহই আমাদের

সৃষ্টি করেছেন। আমি নিজেই একজন মুসলমান কিন্তু কুরআন শরীফের ও নিজেদের পবিত্র শাস্ত্রের কোনো ইলম ছিল না কিন্তু বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজ আমাকে ওই সমস্ত জ্ঞান দিয়েছেন। আপনি যে ধর্মের আছেন, সেই ধর্মেই আপনি থাকুন কিন্তু সত্য ইবাদত করুন, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ লাভ পাবেন। আপনিও সময় থাকতে বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজকে চিনুন। বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজ পবিত্র শাস্ত্রগুলির অনুসারেই সত্যভক্তি বলেন। আপনি সন্ত রামপালজী মহারাজের দ্বারা লিখিত "জ্ঞান গঙ্গা" ও "জীবনের পথ" পবিত্র পুস্তক পড়ে, জ্ঞান বুঝে তাঁর নিকট হতে নাম দীক্ষা গ্রহণ করে, নিজের ও নিজের পরিবারের কল্যাণ করুন।

ভগত সলিম খান
জেলা- ইটাবা (উত্তরপ্রদেশ)

"ভূত-প্রেতের বন্ধন হতে পেলাম মুক্তি"

আমি শাহিনা গর্গ, শিমলা (হিমাচল প্রদেশ) নিবাসী। শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতকোত্তর অর্থাৎ পোস্ট গ্রেজুয়েট। এক মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ও আল্লাহর খোঁজ করার কারণে রোজা রাখা এবং নিয়মিত নামাজ, এই সবই আমি করতাম। এরমধ্যে আমার ভূত-প্রেতের সমস্যাও হয়ে গিয়েছিল। অনেক পীর, ফকির ও মাজারে, এই সমস্ত সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। আমার বিবাহ এক হিন্দু পরিবারে হয়েছে।আমি হিন্দু রীতি অনুসারেও ভক্তি সাধনা করতাম কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও আমাকে অনেক স্থানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন কিন্তু এরপরেও কোন লাভ হয়নি। পরিবারে মানসিক ও আর্থিক সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। তারপর আমার এক আত্মীয় যিনি সিমলায় থাকেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সন্ত রামপালজি মহারাজের আশ্রয়ে চলে যাও, সেখানে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা তার কথা বিশ্বাস না করেই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তিনি আমাদের একটি "জ্ঞান গঙ্গা" পুস্তকও দিয়েছিলেন কিন্তু সেই বইটি আমরা ৩/৪ মাস ধরে না পড়েই ঘরে ফেলে রেখেছিলাম। তারপরে যখন আমার বেশী সমস্যা হতে শুরু করল, তখন আমি ২০১৪ সালের জুন মাসে সন্ত রামপালজি মহারাজের নিকট হতে নাম দীক্ষা নিলাম। যখন সন্ত রামপালজি মহারাজ আমাকে আশীর্বাদ দিলেন তখন মনে হল যে, আমার শরীর থেকে অনেক ভারী ওজন যেন কমে গেল এবং বাখবর সন্ত আমাকে বললেন যে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমরা বাড়িতে চলে আসলাম এবং সেদিন থেকে আমার ভূত-প্রেত বাধা সমাপ্ত হয়ে গেল আর আমি সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেলাম। এই অসুস্থতার কারণে আমার তালাক হওয়ার কথা ছিল, যা সন্ত রামপালজি মহারাজের নিকট হতে নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে কেটে গিয়েছে। এখন আমি সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে রয়েছি। আমার স্বামীর চাকরি ছিল না। সন্ত রামপালজি মহারাজের দয়ায় আজ তিনি চাকরিও পেয়ে গিয়েছেন। বাখবর সন্ত রামপালজি মহারাজ পবিত্র শাস্ত্রের অনুসার ভক্তি বিধি বলেন। ভক্ত সমাজের কাছে আমার এই অনুরোধ যে, আপনারা সন্ত রামপালজি মহারাজের শরণে আসুন, তিনিই হলেন পূর্ণ সন্ত, যিনি সঠিক ভক্তি বিধি বলেন।

ভক্তিমতী শাহিনা গর্গ
সিমলা, হিমাচল প্রদেশ
যোগাযোগ নম্বর :- ৮৩০৭৭৪৪৫০৬

❖❖❖

☞ আপনারা উপরের কিছু ভক্তের আত্মজীবনী পড়লেন। এমন এমন হাজার ও লাখ লাখ ভক্ত আছেন, যারা তাদের আত্মজীবনীও এই পুস্তকে লেখাতে ইচ্ছুক কিন্তু এখানে স্থানের অভাবের কারণে, আমরা কেবল কিছু ভক্তের আত্মজীবনী লিখতে পেরেছি। যদি সকল ভক্তের আত্মজীবনী লেখা হয়, তাহলে হয়তো শত শত বই ছেপে যাবে। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

(অধ্যায় নং 5)
সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি রচনা

সর্ব প্রথমে সতপুরুষ (পরমেশ্বর) একাই ছিলেন, কোনো রচনা ছিল না। সবার প্রথমে পরমেশ্বর চার অবিনাশী লোকের (অমর ধামের) রচনা বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা করলেন।

(১) অনামী লোক (ধাম) যাকে অকহ লোকও বলা হয়।

(২) অগম লোক (৩) অলখ লোক (৪) সতলোক।

পরে পরমাত্মা চার লোকে (ধামে) চার রূপ ধারণ করলেন এবং চার উপমাত্মক নামের দ্বারা প্রত্যেক লোকে প্রসিদ্ধ হলেন।

(১) অনামী লোকে অনামী পুরুষ অর্থাৎ অকহ পুরুষ নামে।

(২) অগম লোকে অগমপুরুষ নামে।

(৩) অলখ লোকে অলখপুরুষ নামে।

(৪) সতলোকে তিনি সতপুরুষ উপমাত্মক নাম রাখলেন।

তারপরে চার লোকে (ধামে) পরমাত্মা বচন শক্তি দ্বারাই এক একটা সিংহাসন (তখ্‌ত) বানালেন। প্রত্যেক সিংহাসনের উপর সম্রাটের মতো মুকুট ইত্যাদি পরিধাণ করে বিরাজমান হয়ে গেলেন। এরপরে সতলোকে পরমেশ্বর অন্যান্য আরও কিছু রচনা করলেন। তিনি এক শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা ১৬ টি দ্বীপ ও একটি মানসরোবর রচনা করলেন। এরপরে ষোল বচন শক্তি দ্বারা, ষোল পুত্র উৎপন্ন করলেন। তাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন অচিন্ত, তেজ, সহজদাস, জোগজীত, কূর্ম, ইচ্ছা, ধৈর্য ও জ্ঞানী।

নিজের পুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বোঝাতে চাইলেন যে, সমর্থ্য ছাড়া কোনো কার্য সফল হয় না অর্থাৎ যার কর্ম তারই করা সাজে আর অন্য কেউ করলে তা মূর্খতাই হয়।

সতপুরুষ নিজের অচিন্ত নামের এক পুত্রকে সতলোকে অন্য কিছু রচনা করার দায়িত্ব দিয়ে বললেন যে, আমি তোমাকে কিছু শক্তি প্রদান করে দিয়েছি। অচিন্ত সেই বচন শক্তি দ্বারা অক্ষর পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) উৎপত্তি করলেন। অক্ষরপুরুষ (অক্ষর ব্রহ্ম) যুবক রূপে উৎপন্ন হলেন। এরপরে তিনি মানসরোবরে স্নান করতে গিয়ে জলে ভাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রা এসে গেল আর তারপর তিনি সরোবরের গভীর নীচে চলে গেলেন। (সতলোকে সকলের অমর শরীর হয়, সেখানে আত্মাদের শরীর শ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়)। অনেক সময় পর্যন্ত অক্ষর পুরুষ জল থেকে বাইরে এলেন না। তাই অচিন্ত আগে সৃষ্টি করতে পারছিলেন না। তখন অচিন্তের প্রার্থনা শুনে সতপুরুষ (পরম অক্ষর পুরুষ) মানস সরোবরে গিয়ে কিছু জল নিজের হাতে নিলেন। সেই জল দিয়ে এক বিশাল ডিম্বাকার বানালেন এবং এক আত্মাকে বচন শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করে, সেই ডিমের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জলে ছেড়ে দিলেন। জলের নীচে ডিমটা যেতে লাগল, তখন তার বিশাল গড়-গড় শব্দের আওয়াজে অক্ষর পুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। অক্ষর পুরুষ ক্রোধ দৃষ্টিতে তাকালেন যে, কে আমাকে জাগিয়ে দিল। ক্রোধ ভরা দৃষ্টিতে তাকাতেই ওই ডিম্বাকারটি (ডিমটি) ফেটে গেল আর তারমধ্যে থেকে এক তেজোময় ব্যক্তি বেরিয়ে এলো, তার নাম ক্ষর পুরুষ রাখা হল। (এই ক্ষর পুরুষ পরে গিয়ে কাল নামে পরিচিত হয়)। এরপরে সতপুরুষ (পূর্ণ পরমাত্মা) দুইজনকে বললেন, তোমরা জল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো আর বললেন যে, অক্ষর পুরুষ তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তোমাকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য এই সমস্ত কিছু করেছি। এরপর ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষকে সতপুরুষ বললেন যে, তোমরা দুইজন অচিন্তের দ্বীপে গিয়ে নিবাস করো।

কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর জ্যোতি নিরঞ্জনের (ক্ষর পুরুষ যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন কালও বলা হয়) মনে বিচার করলো যে, আমরা তিনজন তো এক দ্বীপে রয়েছি আর বাকি অন্য ভাই সকল তো আলাদাভাবে

এক এক দ্বীপে রয়েছে। এই বিচার করে আলাদা অন্য দ্বীপ প্রাপ্ত করার জন্য তপস্যা প্রারম্ভ করল। এর পূর্বে সতপুরুষ নিজের অচিন্ত নামের পুত্রকে বলল যে, তোমার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করা সম্ভব নয়। আমি তোমাকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্য কিছু রচনা করতে বলেছিলাম কিন্তু অচিন্ত তুমি তো অক্ষর পুরুষকে ঘুম থেকেও জাগাতে পারলে না। সুতরাং ভবিষ্যতে এমন কোনো চেষ্টা আর কখনই করবে না। এখন আমি আমার শব্দ শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচনা করব।

সতপুরুষ সতলোকে অসংখ্য লোক (ধাম) রচনা করলেন এবং প্রতিটি লোকে নিজ বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা অসংখ্য অন্য আত্মাদের উৎপত্তি করলেন। এই সমস্ত লোক সতপুরুষের সিংহাসনের আশে-পাশের সীমানাতেই আছে। এরমধ্যে কেবল পুরুষ হংসই (সতলোকে মানুষদেরকে হংস বলা হয়) থাকে এবং পরমেশ্বর তাদেরকে শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তাঁরা নিজেদের পরিবার (পুরুষ হংস) বচন শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করতে পারে। তাঁরা কেবল দুটি পুত্রই উৎপন্ন করতে পারে।

ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা শুরু করল। তিনি ৭০ যুগ পর্যন্ত শুরু করলেন। সতপুরুষ ক্ষর পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের জন্য তপস্যা করছো? ক্ষর পুরুষ বললেন, হে পরম পিতা! যে স্থানে আমরা তিনজন রয়েছি এই স্থান আমার জন্য যথেষ্ট নয়, কৃপা করে আমাকে পৃথক স্থান প্রদান করুন। পরমেশ্বর (সতপুরুষ) ক্ষর পুরুষকে ৭০ যুগ তপস্যা করার প্রতিফল স্বরূপ ২১ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করলেন, যা সতলোকের বাইরের এলাকায় ছিল, যেমন ২১ প্লট প্রাপ্ত হয়। জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষর পুরুষ) বিচার করলেন যে, এই সকল ব্রহ্মাণ্ডে কিছু রচনাও করা প্রয়োজন, তারজন্য পুনরায় আরো ৭০ যুগ তপস্যা করল। তারপর সতপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন যে, এবার কি প্রয়োজন? ক্ষর পুরুষ বললেন, সৃষ্টি রচনা করার সামগ্রী দেবার কৃপা করুন। সতপুরুষ তাকে পাঁচ তত্ত্ব (জল, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ) এবং তিন গুণ (রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ) প্রদান করে বললেন যে, এই সব দ্বারা নিজে রচনা কর।

ক্ষর পুরুষ তৃতীয়বার আরো ৬৪ যুগ পর্যন্ত তপস্যা শুরু করল। যখন ৬৪ যুগ পর্যন্ত তপস্যা করতে হয়ে গেছে, তখন সত্যপুরুষ বললেন, এখন আবার কি প্রয়োজন? ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) বললেন, হে পরমপিতা! আমার একা থাকতে ভাল লাগছে না, তাই কৃপা করে কিছু আত্মা আমাকে প্রদান করুন। ক্ষর পুরুষ আত্মাদেরকে কিভাবে প্রাপ্ত করেছিল, এরপরে পড়ুন :-

আমরা কালের (ক্ষর পুরুষের) লোকে কিভাবে এসেছি?

যে সময় ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল, তখন আমরা সবই আত্মারা, এই ক্ষর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যেমন যুবক-যুবতীরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তাদের দেখে আমাদের কোনো লাভ হয় না, ব্যর্থই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তারা নিজেরা ইনকাম করার জন্য নাচা-নাচি করে আর যুবক বাচ্চারা তাদের দেখে, নিজেদের ধন নষ্ট করে। ঠিক এইপ্রকার আমরা আমাদের পরমপিতা সতপুরুষকে ত্যাগ করে কাল পুরুষকে (ক্ষর পুরুষকে) হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। পরমেশ্বর আমাদের সকল সুখ-সুবিধা দিচ্ছিলেন, তার থেকে আমরা মুখ ঘুরিয়ে, এই নকল অভিনয় করা কাল ব্রহ্মকে ভালোবাসতে লেগেছিলাম। সতপুরুষ মাঝে মধ্যে আমাদের বার বার আকাশ বাণী দ্বারা সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, হে সন্তানগণ! তোমরা কালের এই ক্রিয়াকর্মকে (তপস্যা) দেখো না, খুশিতে থাকো। আমরা উপর থেকে তো সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু মনে মনে কাল ব্রহ্মকেই ভালোবাসতে থাকি কিন্তু পরমাত্মা তো অন্তর্যামী, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সব আত্মারা এখানে থাকার আর যোগ্য নয়। কাল পুরুষ (ক্ষরপুরুষ/জ্যোতি নিরঞ্জন) যখন দুইবার তপস্যা করে ফল প্রাপ্ত করে নিল, তখন সে ভাবল যে, এখন কিছু জীবাত্মাদেরও আমার সাথে থাকা উচিৎ। একা থাকতে আমার মন লাগছে না। এইজন্য জীবাত্মা প্রাপ্তি জন্য তপস্যা শুরু করল। চৌষট্টি যুগ পর্যন্ত তপস্যা করার পরে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, জ্যোতি

নিরঞ্জন! এখন কিসের জন্য তপস্যা করছো?

ক্ষর পুরুষ বলল, পরমপিতা! আমাকে কিছু আত্মা প্রদান করুন, কারণ আমার একা-একা থাকতে মন লাগছে না। সতপুরুষ বললেন যে, তোমার তপস্যার প্রতিফলে আমি তোমাকে আরও অন্য ব্রহ্মাণ্ড দিতে পারি, কিন্তু আমার আত্মাদেরকে দিতে পারি না। এরা আমার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। হ্যাঁ, যদি তারা স্বয়ং যেতে চায়, তাহলে তারা যেতে পারে। যুবক কবিরের (সামর্থ্যবান সৎপুরুষ কবীরের) বচন শুনে জ্যোতি নিরঞ্জন ওইসময় আমাদের কাছে আসেন। আমরা সকল হংস আত্মারা, পূর্বেই ক্ষর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমরা সকলেই তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের বলল যে, আমি পরম পিতার নিকট হতে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানাপ্রকার সৌন্দর্য্যময় স্থান বানানো আছে, তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে ? আমরা সবই হংস আত্মারা যারা আজ জ্যোতি নিরঞ্জনের এই ২১ (একুশ) ব্রহ্মাণ্ডে কষ্ট ভোগ করছি, আমরা সকলেই বললাম যে, আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত আছি, যদি পরম পিতা আদেশ দেন। অতঃপর ক্ষর পুরুষ (কাল), পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবিরের (সমর্থ কবীর প্রভুর) নিকটে গিয়ে আমাদের বার্তা জানালেন। তখন কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, আমার সম্মুখে যারা স্বীকৃতি দেবে তাদের আজ্ঞা দেবো। এরপর ক্ষর পুরুষ ও পরম অক্ষর পুরুষ (কবিরমিতৌজা)দুইজনেই আমাদের নিকট এলেন। সত কবির্দেব বললেন, যে সকল হংস আত্মারা ব্রহ্মের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক, তারা হাত উঠিয়ে স্বীকৃতি দাও। নিজের পরম পিতার সামনে হাত উঠাবার সাহস কারোর হয়নি, তাই কেউ স্বীকৃতি দিতে পারেননি। অনেক সময় পর্যন্ত সকলে নিস্তব্ধ ছিল। এরপরে এক হংস আত্মা সাহস করে বললেন যে, পরম পিতা! আমি যেতে চাই। তারপর তাঁর দেখা-দেখী (যে সকল জীবাত্মাগণ আজ কালের (ব্রহ্মের) এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে রয়েছে) আমরা সকল আত্মারাই হাত উঠিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম। পরমেশ্বর কবীরজী এরপরে জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন যে, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও আর যারা তোমার সঙ্গে যাবার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে, আমি ওই হংস আত্মাদেরকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এরপর জ্যোতিনিরঞ্জন নিজের ২১ ব্রহ্মাণ্ডে চলে গেলেন। ওই সময় পর্যন্ত এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সতলোকেই (পরমেশ্বরের ধাম) ছিল।

তারপর পূর্ণব্রহ্ম সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস আত্মাকে এক কন্যার রূপ দিলেন কিন্তু স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনি) রচনা করেননি এবং সকল হংস আত্মাদের (যারা জ্যোতি নিরঞ্জনের সাথে যেতে চেয়েছিল) ওই মেয়েটির শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং সেই কন্যাটির নাম আষ্ট্রা (আদিমায়া/প্রকৃতিদেবী/দূর্গা) হয়। সতপুরুষ (পরমাত্মা) মেয়েটিকে বললেন যে, কন্যা! তোমাকে আমি শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি। ব্রহ্ম যত জীব উৎপন্ন করতে বলবে, তুমি তত জীব উৎপন্ন করে দেবে। পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের সহজ দাস নামক এক পুত্রের দ্বারা প্রকৃতিকে (দূর্গাকে) ক্ষর পুরুষের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। সহজ দাসজী জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন যে, পরমপিতা এই বোনের (দূর্গার) শরীরে, ওই সমস্ত হংস আত্মাদের প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যারা আপনার (জ্যোতি নিরঞ্জন) কাছে যাওয়ার জন্য স্বীকৃতি ব্যক্ত করেছিল। এই বোনকে পরমপিতা বচন শক্তি প্রদান করেছেন, আপনি যত জীবাত্মা চাইবেন, প্রকৃতি (দূর্গা) তত জীবাত্মা নিজের বচন শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করে দেবে। এই কথা বলে সহজ দাস নিজের দ্বীপে চলে গেলেন।

দূর্গা যুবতী হওয়ার কারণে তাঁর রং-রূপ ফুটে উঠেছিল। তার এই রূপ দেখে ব্রহ্মের (জ্যোতি নিরঞ্জনের) মনে বিষয়-বাসনা উৎপন্ন হয়ে যায়, তার জন্য প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করে। তখন দূর্গা বললেন, হে জ্যোতি নিরঞ্জন! আমার কাছে পরম পিতাজীর দেওয়া শব্দ শক্তি আছে। আপনি যত প্রাণী উৎপন্ন করতে বলবেন, আমি বচন শক্তি দ্বারা তত প্রাণী উৎপন্ন করে দেব কিন্তু আপনি মৈথুন পরম্পরা শুরু করবেন না। আপনিও ওই পরমপিতার শব্দ শক্তি দ্বারা ডিম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং আমিও ওই পরমপিতার বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা উৎপন্ন হয়েছি। অতএব আপনি আমার বড় ভাই হলেন, ভাই-বোনের এই সম্পর্ক নষ্ট করলে মহাপাপের কারণ হবেন কিন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর কোনো প্রার্থনা না শুনে, নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা

নখ দিয়ে দূর্গাকে স্ত্রী ইন্দ্রী (ভগ) বানিয়ে দিয়ে কুকর্ম (বলাৎকার) করার মন বানিয়ে নিল।

ওই সময় দূর্গা নিজের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য কোনো উপায় না দেখে সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে এবং জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখের মধ্য দিয়ে পেটের ভিতর প্রবেশ করে পূর্ণব্রহ্ম কবীর দেবের নিকট নিজের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। ওই সময় কবির্দেব (কবির্ দেব) নিজের বচন পুত্র যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ জোগজীতের রূপ বানিয়ে সেখানে প্রকট হলেন এবং কন্যা দূর্গাকে ব্রহ্মের পেট থেকে বের করে জ্যোতি নিরাঞ্জনকে বললেন যে, আজ থেকে তোর নাম "কাল" হবে এবং তোর জন্ম মৃত্যু হতে থাকবে। এই কারণে তোর নাম হবে ক্ষর পুরুষ এবং তুই প্রতিদিন এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের প্রতিদিন ভোজন করবি আর সোয়া লাখ (এক লাখ পঁচিশ হাজার) প্রাণীদের তুই প্রতিদিন উৎপন্ন করবি। তোমাদের দুইজনকে (দুর্গা ও ক্ষর পুরুষকে) একুশ ব্রহ্মাণ্ড হতে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হল।

এই কথা বলার সাথে সাথে ২১ ব্রহ্মাণ্ড বিমানের গতির মতো চলতে লাগল, সহজ দাসের দ্বীপের নিকট থেকে ১৬ সংখ ক্রোস (এক ক্রোস প্রায় ৩ কিলোমিটার হয়, এতটা) দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিশেষ বিবরণ :- এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল তিন শক্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

(১) পূর্ণ ব্রহ্মকে অন্য উপমাত্মক নামের দ্বারাও জানা যায়, যেমন- সতপুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম, পরম অক্ষর পুরুষ, কবীর কাদির আল্লাহ, পরমেশ্বরের আরো অন্যান্য নাম আছে। এই পূর্ণব্রহ্ম হলেন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, বাস্তবে তিনিই হলেন একমাত্র অবিনশ্বর (অবিনাশী/অমর)।

(২) পরব্রহ্ম যাঁকে অক্ষর পুরুষ নামেও জানা যায়। এই পুরুষ বা প্রভু বাস্তবে অবিনাশী (অমর) নয়। ইনি কেবল সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।

(৩) ব্রহ্ম যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল, ক্ষর পুরুষ, ধর্মরায় ইত্যাদি নামেও জানা যায়, যে কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু/মালিক)। এরপরে এই ব্রহ্মের (কালের) সৃষ্টির কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হবে, যার মধ্যে তিনটি আরও অন্য নামের বিষয়ে পড়বেন :- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার মধ্যে পার্থক্য :- এক ব্রহ্মাণ্ডে বানানো সর্বোপরি স্থানে ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) স্বয়ং তিন গুপ্তস্থান রচনা করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের রূপ ধারণ করে থাকেন এবং নিজের স্ত্রী প্রকৃতির (দূর্গার) সহযোগে তিন পুত্রকে উৎপত্তি করেন এবং তাঁদের নামও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিবই রাখেন। যিনি ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তিন লোকে (পৃথিবীলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোকে) এক রজোগুণ বিভাগের মন্ত্রী (মালিক)। এই ব্রহ্মাকে ত্রিলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয় এবং ব্রহ্ম যিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার রূপে থাকেন, তাকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকিয় ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্মকে (কালকে) আবার সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মাও বলা হয়।

শ্রী বিষ্ণু পুরাণে প্রমাণ :- চতুর্থ অংশ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ তে শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন :- যে অজন্মা সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বরের আদি, মধ্য, অন্ত, স্বরূপ, স্বভাব ও সার আমরা জানতে পারিনা। (শ্লোক ৮৩)

যে আমার রূপ ধারণ করে সংসারের রচনা করে, স্থিতির সময় যিনি পুরুষ রূপে এবং রুদ্র রূপে বিশ্বকে গ্রাস করে নেয়, অনন্ত রূপে সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করে (শ্লোক ৮৬)

(দেখুন এক ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র - ফোটো কপি)

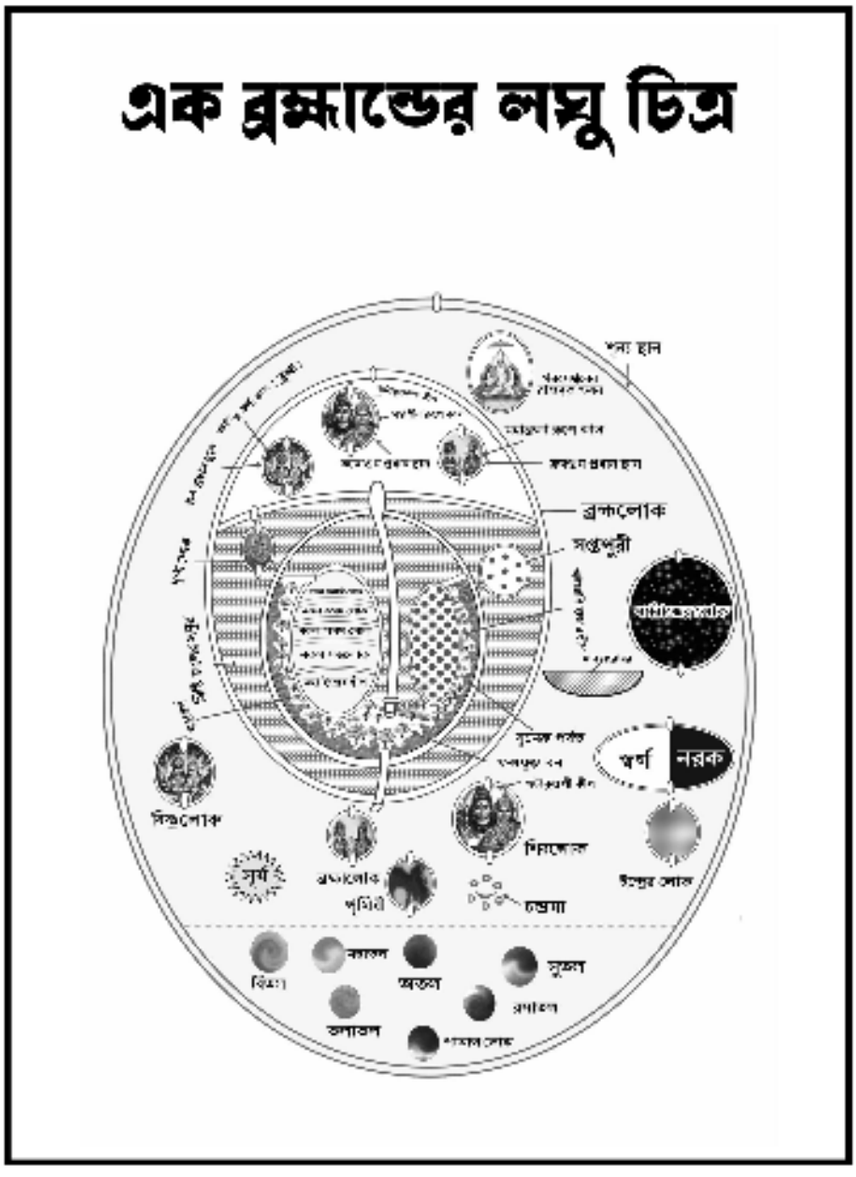

"শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি"

কাল (ব্রহ্ম) প্রকৃতিকে (দুর্গাকে) বললেন, এখন আমাকে কে আর কি খারাপ করবে? যা ইচ্ছা আমি তাই করব। প্রকৃতি তখন পুনরায় প্রার্থনা করে বললেন, আপনি একটু লজ্জা তো রাখুন। প্রথমে তো আপনি হলেন আমার বড় ভাই, কেননা ওই পূর্ণ পরমাত্মার (কবির্দেবের) বচন শক্তি দ্বারাই আপনি (ব্রহ্ম) ডিম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং পরে ওই পূর্ণ প্রভুর বচন শক্তিতে আমি উৎপন্ন হয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনি আমার বড় ভাই হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত আমি আপনার পেট থেকে বের হয়েছি, সেই সম্পর্কে আমি আপনার মেয়ে আর আপনি আমার পিতা হচ্ছেন। অতএব এই পবিত্র সম্পর্ক খারাপ করলে মহাপাপ হবে। আমার কাছে পরমপিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে। আপনি যত প্রাণী বলবেন, আমি বচন শক্তিদ্বারা তত প্রাণী সৃষ্টি করে দেব। জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল/ব্রহ্ম) দুর্গার একটা কথাও না শুনে বলল, আমার যা শাস্তি পাওয়ার আমি পেয়ে গিয়েছি। আমাকে সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি যা খুশি তাই করব। এই কথা বলে কাল পুরুষ (ক্ষর পুরুষ) বলপূর্বক প্রকৃতির সহিত বিবাহ করল এবং তিন পুত্রকে (রজোগুণ যুক্ত ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত বিষ্ণু ও তমোগুণ যুক্ত শিবশঙ্করকে) উৎপত্তি করলেন। যুবক না হওয়া পর্যন্ত এই তিন পুত্রকে দুর্গা অজ্ঞান করে রাখলেন এবং যুবক হওয়ার পরেই শ্রী ব্রহ্মাকে পদ্মফুলের উপরে, শ্রী বিষ্ণুকে শেষ নাগের বিছানার উপরে এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপরে সচেতন করে একত্র করে দেওয়ার পরে, প্রকৃতি (দুর্গা) এই তিনজনের বিবাহ করিয়ে দিলেন। ব্রহ্মের (কালের) আদেশে তাঁর স্ত্রী প্রকৃতিদেবী (দুর্গা) তিন পুত্রকে এক ব্রহ্মাণ্ডে তিন লোকে (স্বর্গ লোকে, পৃথিবী লোকে, পাতাল লোকে) এক এক বিভাগের মন্ত্রী পদকে সামলানোর জন্য নিযুক্ত করে দিলেন। এক ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্ম লোকের রচনা করলেন। সেখানে তিনটি গুপ্ত স্থান বানিয়ে রেখেছেন। একটা রজোগুণ প্রধান স্থান, যেস্থানে এই ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন কাল স্বয়ং মহাব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং নিজের স্ত্রী দুর্গাকে মহাসাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুইজনের সংযোগে এই স্থানে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে আপনা আপনি রজোগুণ যুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্থান সত্ত্বগুণ প্রধান স্থান বানিয়ে রেখেছেন, সেখানে এই ক্ষর পুরুষ স্বয়ং মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করে থাকেন আর নিজের স্ত্রী দুর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রাখেন, যে পুত্র এই স্থানে উৎপন্ন করেন, তার নাম বিষ্ণু রাখেন এবং সেই বালক সত্ত্বগুণ যুক্ত হয়ে যায়। তৃতীয়ত এই কাল ওই স্থানে এক তমোগুণ প্রধান স্থান বানিয়ে রেখেছেন। ওই স্থানে এই কাল স্বয়ং সদাশিব রূপ বানিয়ে থাকেন এবং নিজের স্ত্রী দুর্গাকে মহাপার্বতী রূপে রাখেন। এই স্থানে দুইজনে স্বামী-স্ত্রী ব্যবহারের দ্বারা যে পুত্র উৎপন্ন করেন, তার নাম শিব রাখেন, সে তমোগুণ যুক্ত হয়ে যায়। (প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শ্রী শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতার পৃষ্ঠা নং ২৪ - ২৬ তে, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র (মহেশ্বর) থেকে অন্য সদাশিব আছেন এবং রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬-৭-৯ পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৫ ও ১১০ -তে অনুবাদকর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত এবং পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত। যার অনুবাদ কর্তা হলেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী) আবার এঁদের কাছে গোপন রেখে অর্থাৎ ঠকিয়ে কালব্রহ্ম নিজের ভোজনের জন্য, জীবদের উৎপত্তি শ্রী ব্রহ্মার দ্বারা এবং স্থিতি (একে অপরকে মায়া-মমতা দিয়ে কালের মায়াজালে ফাঁসিয়ে রাখা) শ্রী বিষ্ণুর দ্বারা করান এবং সংহার অর্থাৎ মৃত্যুর কর্ম শ্রী শিবের দ্বারা করান, (কেননা কাল পুরুষ অভিশপ্ত হয়ে রয়েছে, যার কারণে প্রতিদিন একলক্ষ মানব ধারী প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীর থেকে ময়লা বের করে খেতে হয়, তার জন্য একুশ নম্বর ব্রহ্মাণ্ডে একটা তপ্ত শিলা বানিয়ে রেখেছে, যা সর্বদা গরম থাকে। তার উপর মৃত্যুর পরে প্রতিটি মানবের সূক্ষ্ম শরীরকে গরম করে গলিয়ে ময়লা বের করে খায়। এই তপ্ত শিলার উপরে মানবের সূক্ষ্ম শরীর রাখলে মরে না কিন্তু কষ্ট অসহনীয় হয়। এর পরে ওই প্রাণীকে তার কর্ম অনুসারে অন্য শরীর প্রদান করে)। মনে করুন, কোনো বাড়িতে তিনটি রুম বানানো রয়েছে। একটি রুমে অশ্লীল চিত্র লাগানো রয়েছে। সেই রুমে যেতেই মনের মধ্যে খারাপ বিচার উৎপন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় রুমে সাধু-সন্তু ও ভক্তদের চিত্র লাগানো রয়েছে, সেই রুমে যেতেই মনের মধ্যে ভালো বিচার এবং প্রভুর চিন্তন মনে পড়বে। তৃতীয় রুমে দেশ ভক্ত বীর পুরুষদের কিংবা শহীদদের চিত্র লাগানো রয়েছে, সেই রুমে যেতেই মনে বিদ্রোহীভাব উৎপন্ন হয়ে যায়। ঠিক এই প্রকার এই ব্রহ্ম (কাল) নিজের বুদ্ধি- বিচার দ্বারা, উপরের ওই তিন গুণযুক্ত প্রধান স্থান বিশেষভাবে রচনা করেছেন।

(দেখুন ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র ও জোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক, ২১ ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র পরের পৃষ্ঠাতে)

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র

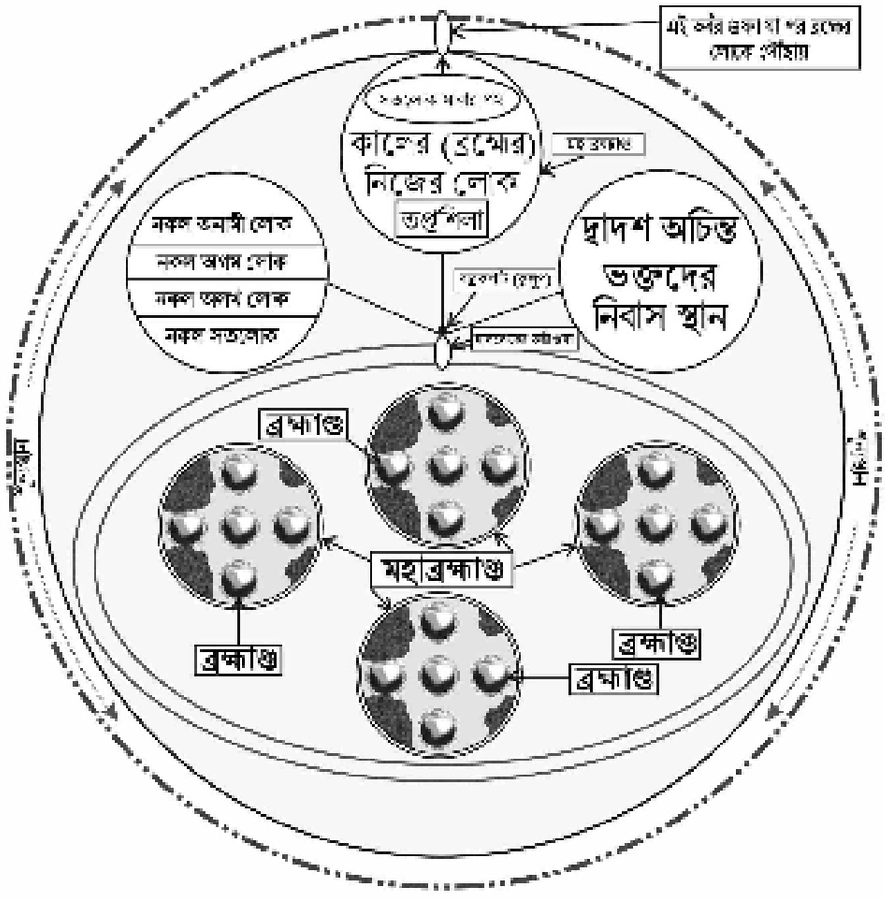

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

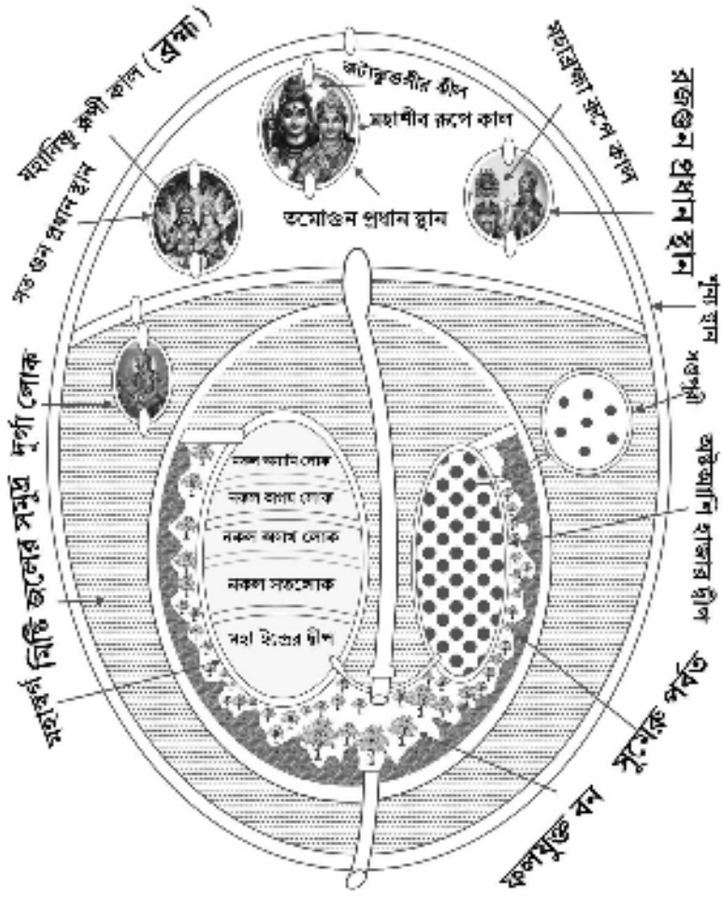

"সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা"

(সূক্ষ্মবেদ থেকে নিষ্কর্ষ রূপে সৃষ্টি রচনার বর্ণনা)

প্রভু প্রেমী আত্মাগণ! প্রথমবার যখন নিম্নের সৃষ্টি রচনা পড়বেন, তখন এমন মনে হবে এটা যেন কোনো একটা রূপকথা কিন্তু সর্ব পবিত্র গ্রন্থের প্রমাণগুলো পড়ার পর দাঁতের নীচে আঙুল দিয়ে বসে ভাবতে বাধ্য হবেন যে, এটা তো বাস্তবিক (সত্য) জ্ঞান কিন্তু এই জ্ঞান এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? কৃপা করে আপনারা ধৈর্য সহকারে পড়বেন এবং এই অমৃত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখবেন। কারণ এই জ্ঞান আপনার একশো এক পূর্ব পুরুষ (বংশ) পর্যন্ত কাজে আসবে। পবিত্র আত্মাগণ! কৃপা করে সত্য নারায়ণ (অবিনাশী প্রভু/সতপুরুষ) দ্বারা রচিত সৃষ্টি রচনার বাস্তবিক জ্ঞান পড়ুন।

(১) পূর্ণ ব্রহ্ম :- এই সৃষ্টি রচনাতে সতপুরুষ হলেন সতলোকের স্বামী (প্রভু), অলখ পুরুষ হলেন অলখ লোকের স্বামী (প্রভু), অগম পুরুষ হলেন অগম লোকের স্বামী (প্রভু) এবং অনামী পুরুষ হলেন অনামী অর্থাৎ অকহ লোকের স্বামী (প্রভু)। এই সকল নাম হল পূর্ণ ব্রহ্মের। যিনি বাস্তবে অবিনেশ্বর (অমর) সর্বশক্তিমান প্রভু। যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, এই চারলোকেই থাকেন। যাঁর অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

(২) পরব্রহ্ম :- এই প্রভু হলেন কেবল সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু)। এই প্রভুকে অক্ষর পুরুষও বলা হয় কিন্তু এই প্রভু ও তাঁর ব্রহ্মাণ্ডগুলো অবিনাশী নয়। এই প্রভু বাস্তবে অবিনশ্বর অর্থাৎ অমর নন।

(৩) ব্রহ্ম :- এই প্রভু হলেন কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (মালিক)। এই প্রভুকে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন ও কাল ইত্যাদি উপমা দ্বারা জানা যায়। এই কাল এবং তাঁর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নাশবান অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায়।

(উপরোক্ত এই তিন পুরুষের (প্রভুর) প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তেও দেওয়া রয়েছে

(৪) ব্রহ্মা :- ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মের বড় পুত্র, বিষ্ণু হলেন দ্বিতীয় (মেজো) পুত্র এবং শিব হলেন তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মের এই তিন পুত্র কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিভাগের (গুণ) স্বামী (প্রভু) এবং তাঁরা হলেন নাশবান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কৃপা করে পড়ুন, নিম্নে লেখা সৃষ্টি রচনা :-

{কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) সূক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ কবীর বাণীতে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান, স্বয়ং নিজেই বলেছেন, যা নিম্নে বর্ণিত করা হয়েছে।}

সর্ব প্রথম কেবল একটি স্থান অনামী (অনাময়) লোক ছিল। যাকে অকহ লোকও বলা হয়। পূর্ণ পরমাত্মা ওই অনামী লোকে একাই থাকতেন। পরমাত্মার প্রকৃত নাম হল কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। সকল আত্মা ওই পূর্ণ ধনী পরমাত্মার শরীরে সমাহিত ছিল। এই কবির্দেবের উপামাত্মক (পদবির) নাম অনামী পুরুষ (পুরুষের অর্থ প্রভু হয়। প্রভু মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসারে বানিয়েছেন, এইজন্য মানবের নামও পুরুষই হয়েছে।) অনামী পুরুষের এক লোমকূপের প্রকাশ সংখ সূর্যের রশ্মি থেকেও অধিক।

বিশেষ :- যেমন কোনো দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক নাম তো অন্য হয় এবং পদের উপমাত্মক (পদবি) নাম প্রধানমন্ত্রী হয়। অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী নিজের কাছে কয়েকটি বিভাগও রেখে নেন। ওইসময় যে বিভাগেরই নথিপত্রের উপর সাক্ষর করবেন, তখন তিনি সেই বিভাগের পদেরই নাম লেখেন। যেমন গৃহ মন্ত্রালয়ের নথিপত্রে সাক্ষর করলে তখন তো ওই সময় নিজেকে গৃহমন্ত্রী লিখবেন। ওই স্থানে ওই ব্যক্তির হস্তাক্ষরের শক্তি তখন কম হয়ে যায়। ঠিক এই প্রকার কবীর পরমেশ্বরের তেজ পুঞ্জের অর্থাৎ রশ্মির প্রকাশের ব্যবধান বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

ঠিক এইপ্রকার পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) নীচের তিন লোকের (অগম লোক, অলখ লোক, সত লোক) রচনা শব্দ (বচন) শক্তির দ্বারা করেছেন। এই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা কবির্দেব(কবীর পরমেশ্বর) তিনিই অগম লোকেতেও প্রকট হয়েছেন এবং কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অগম লোকেরও স্বামী (মালিক/প্রভু) এবং সেখানে তাঁর উপমাত্মক (পদবি) নাম অগম পুরুষ অর্থাৎ অগম প্রভু। এই অগম প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীরও অধিক তেজোময়, যাঁর এক লোম কূপের প্রকাশ হল, খরব সূর্যের প্রকাশের থেকেও অধিক।

এই পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবির দেব = কবীর পরমেশ্বর) অলখ লোকে প্রকট হয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেই অলখ লোকেরও স্বামী এবং সেখানে তাঁর উপমাত্মক (পদবির) নাম হল অলখ পুরুষ। এই অলখ পুরুষও এই পরমেশ্বরের নাম। এই পূর্ণ প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর তেজোময় ও স্বয়ং প্রকাশিত (স্বজ্যোতি)। এক লোমকূপের (লোমের ছিদ্রের) প্রকাশ, অরব সূর্যের প্রকাশের থেকেও অধিক হয়।

পরমেশ্বর কবীর সাহেবের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র

অনামী লোকঃ- এই লোকে কবীর সাহেব অনামী পুরুষ রূপে আছেন। এখানে একাকি থাকেন।

অগম লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অগম পুরুষ রূপে থাকে।

অলখ লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অলখ পুরুষ রূপে থাকে।

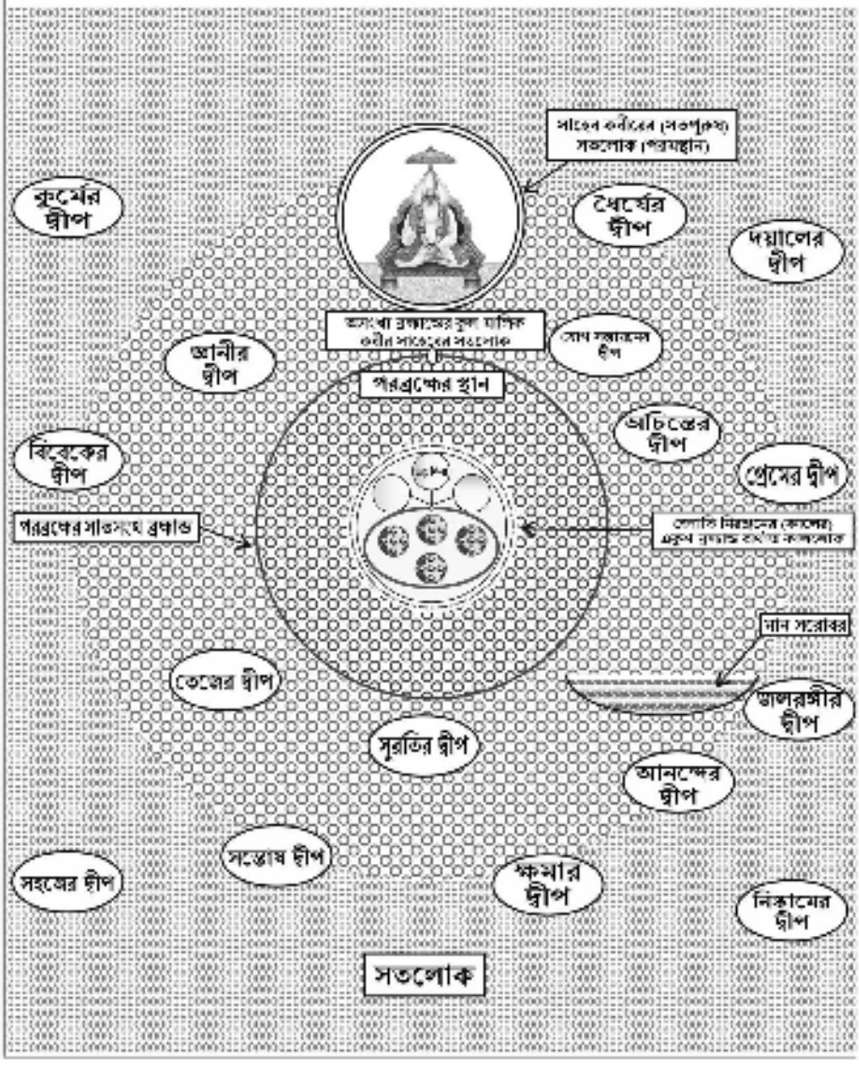

আবার এই পূর্ণ প্রভু সতলোকেও প্রকট হয়েছেন এবং সতলোকেরও অধিপতি তিনিই। এইজন্য এই পরমাত্মার উপামাত্মক (পদবির) নাম হলো সতপুরুষ (অবিনাশী প্রভু)। তাঁরই নাম হল অকালমূর্তি - শব্দ স্বরূপী রাম - পূর্ণ ব্রহ্ম - পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইত্যাদি। এই সতপুরুষ কবির্দেবের (কবীর প্রভুর) মানব সাদৃশ্য শরীর হলো তেজোময়। যাঁর শরীরের এক লোম কূপের প্রকাশ, কোটি কোটি সূর্য ও কোটি কোটি চন্দ্রমার প্রকাশ থেকেও অধিক হয়।

এই কবির্দেব (কবীর প্রভু) সতপুরুষ রূপে প্রকট হয়ে সতলোকে বিরাজমান হয়ে প্রথম অন্য সবকিছুর রচনা করেছেন।

তিনি এক শব্দ (বচন) শক্তি দ্বারা ষোলোটি দ্বীপের রচনা করেছেন। তারপর ষোলো শব্দের দ্বারা ১৬টি পুত্রের উৎপত্তি করলেন এবং এক মান সরোবরের রচনা করলেন, যার মধ্যে অমৃত ভরা। ষোলোটি পুত্রের নাম - (১) "কূর্ম",(২) "জ্ঞানী", (৩) "বিবেক" (৪) "তেজ", (৫) "সহজ", (৬) "সন্তোষ" (৭) "সুরতি", (৮) "আনন্দ", (৯) "ক্ষমা", (১০) "নিষ্কাম" (১০) "জলরংগী", (১২) "অচিন্ত", (১৩) "প্রেম", (১৪) "দয়াল", (১৫) "ধৈর্য", (১৬) "যোগ সন্তায়ন" অর্থাৎ "যোগজীত"।

সতপুরুষ কবির্দেব অচিন্ত নামের আপন পুত্রকে সতলোকে অন্য কিছু রচনা করার দায়িত্ব দিলেন এবং শক্তিও প্রদান করলেন। অচিন্ত পরমাত্মার দেওয়া শব্দ শক্তি দ্বারা অক্ষর পুরুষকে (পরব্রহ্ম) সৃষ্টি করে বললেন যে, আমাকে সাহায্য করো। অক্ষরপুরুষ মানসরোবরে স্নান করতে গিয়ে আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেক সময় পর্যন্ত বাইরে এলেন না। তখন অচিন্ত কবির্দেবকে (কবীর পরমেশ্বর) প্রার্থনা করলেন, তার প্রার্থনা শুনে পরমাত্মা সেখানে এলেন এবং মানসরোবর থেকে কিছু অমৃত জল হাতে নিয়ে একটা ডিম্বাকার বানালেন এবং তার মধ্যে এক আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে মানসরোবরের জলে ছেড়ে দিলেন। সেই ডিম্বাকারের ডিমের ঘড় ঘড় শব্দে অক্ষর পুরুষের ঘুম ভেঙে যায়, সে ক্রোধে ডিমের দিকে তাকানোর কারণে, ডিমটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আর তার ভিতর থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন (ক্ষর পুরুষ) বের হয়। পরে তাঁর নাম কাল বলে অভিহিত করা হয়। এর বাস্তবিক নাম হল কৈল। তখন সতপুরুষ (কবির্দেব) আকাশবাণী করলেন যে, তোমরা দুইজন জল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো এবং অচিন্তের দ্বীপে গিয়ে থাকো। আদেশ পেয়ে অক্ষর পুরুষ ও ক্ষরপুরুষ (কৈল) অচিন্তের দ্বীপে থাকতে লাগলেন (সন্তানদের অপদার্থতা তিনি তাদেরকে দেখালেন, যাতে তারা কখনো প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা না করে, কেননা সামর্থ্যবান প্রভু ছাড়া কোনো কাজ সফল হয় না।) এরপর পূর্ণ ধনী কবির্দেব সর্ব কিছুর রচনা স্বয়ং করলেন এবং নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে এক রাজেশ্বরী (রাষ্ট্রীয়) শক্তি উৎপন্ন করলেন, যার মাধ্যমে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপিত করলেন। একেই পরাশক্তি পরানন্দনীও বলা হয়।

পূর্ণ ব্রহ্ম সমস্ত আত্মাকে নিজের ভিতর থেকে নিজ বচন শক্তি দ্বারা মানব শরীর সদৃশ উৎপন্ন করলেন। প্রত্যেক হংস আত্মাকে পরমাত্মার মতোই শরীর উৎপন্ন করলেন, প্রত্যেক হংস আত্মার শরীরের তেজ ষোল সূর্যের সমান মানব সদৃশ কিন্তু পরমেশ্বরের শরীরের এক লোমকূপের প্রকাশ কোটি কোটি সূর্যের থেকেও অধিক। অনেক সময় ব্যতীত হওয়ার পর, ক্ষরপুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) চিন্তা করলেন যে, আমরা তিনজন (অচিন্ত, অক্ষর পুরুষ, ক্ষর পুরুষ) এক দ্বীপে রয়েছি আর অন্য সবাই এক-এক দ্বীপে রয়েছে। আমিও সাধনা করে আলাদা দ্বীপ প্রাপ্ত করব। তিনি এই সব বিচার করে ৭০ যুগ পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করলেন।

"আত্মারা কালের জালে কিভাবে ফেঁসেছে?"

বিশেষ :- যখন ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা করছিলেন, তখন আমরা আজ যে সব জীব আত্মারা এই জ্যোতি নিরঞ্জনের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছি, আমরা সকলে তাঁর সাধনা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসতে শুরু করি। এই কারণে আমরা নিজস্ব সুখদায়ক প্রভু সতপুরুষ হতে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলাম। যার কারণে আমরা পতিব্রতা পদ থেকে নীচে নেমে গিয়েছিলাম। পূর্ণ প্রভুর দ্বারা বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও আমাদের আসক্তি কালব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ থেকে দূর হয়নি। **{এইপ্রকার প্রভাব আজও কালের সৃষ্টিতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন - যুবক যুবতীরা ফিল্ম স্টারদের (অভিনেতা-অভিনেত্রীদের) নকল অভিনয় দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তারা তাদের নিজেদের রোজগারের উদ্দেশ্যে সেই ভূমিকা করে। যদি কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিকটবর্তী কোনো শহরে এসে যায়, তখন দেখতে পারবেন যে, তাদের দেখার জন্য অনেক বড় ভিড় একত্রিত হয়ে যায়, তাদের দেখে তো কোনো লাভ হয় না, তারা তো অর্থ উপার্জন করছে আর যুবক-যুবতীরা পকেট খালি করে ঘরে ফিরছে। মাতা-পিতা বোঝালেও তারা বোঝে না এবং তাদের মানা করা সত্ত্বেও তারা শোনেনা। লুকিয়ে তারা সেখানে চলেই যায়।}**

পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (পরমাত্মা কবীর) ক্ষর পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো! কি ইচ্ছা? সে বলল, পরম পিতা! এই স্থান আমার জন্য কম পড়ছে, কৃপা করে আমাকে আলাদা দ্বীপ প্রদান করুন। হক্কা কবীর (সত্ কবীর) কাল ব্রহ্মকে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করলেন। জ্যোতি নিরঞ্জন এরপরে ভাবলেন, এই স্থানে কিছু রচনা করার দরকার, খালি ব্রহ্মাণ্ড (প্লট) কোন কাজে আসবে? এই বিচার করে আরোও ৭০ যুগ তপস্যা করে পূর্ণ পরমাত্মার কবির্দেবের (কবীর প্রভুর) কাছে রচনা করার জন্য কিছু সামগ্রী প্রার্থনা করলেন। সতপুরুষ তাঁকে তিন গুণ ও পাঁচ তত্ত্ব প্রদান করলেন, যার দ্বারা ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের

ব্রহ্মাণ্ডে কিছু রচনা করলেন। আবার ভাবলেন, এরমধ্যে কিছু জীবাত্মার প্রয়োজন, একা থাকতে মন লাগছে না। এই বিচার করে আরো চৌষট্টি যুগ পর্যন্ত তপস্যা করলেন। পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব তপস্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে ব্রহ্ম বলেন যে, আমাকে কিছু আত্মা প্রদান করুন, আমার একা একা মন লাগছে না। তখন সতপুরুষ কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, ব্রহ্ম! তোর তপস্যার প্রতিফলে আমি তোকে আরও অনেক ব্রহ্মাণ্ড দিতে পারি কিন্তু আমার আত্মাদেরকে কোনো জপ ও তপস্যা সাধনার ফল স্বরূপ দিতে পারব না। হ্যাঁ! যদি কেউ স্বেচ্ছায় তোর সঙ্গে যেতে চায়, তাহলে সে যেতে পারে। যুবক কবীরের (সমর্থ্য কবীরের) বচন শুনে জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের নিকট এলেন। আমরা এই সকল হংস আত্মারা পূর্বেই ওই কালের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন তখন আমাদের সকলকে বললেন যে, আমি পিতার (পরমাত্মার) নিকট থেকে আলাদাভাবে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানা প্রকারের সৌন্দর্যময় স্থান বানানো হয়েছে, তোমরা সকলে কি আমার সাথে সেখানে যাবে? আমরা সকল হংসরা (আত্মাগণ), যারা আজ এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখি হয়ে রয়েছি, সকলেই বললাম যে, আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, যদি পরমপিতা আজ্ঞা দেন। তখন ক্ষর পুরুষ পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবিরের (সমর্থ্যবান কবীর প্রভুর) নিকটে গেলেন এবং সকল কথা বললেন। তখন কবিরগ্নি (কবীর পরমাত্মা) বললেন যে, যারা আমার সামনে যাওয়ার জন্য স্বীকৃতি দেবে, আমি তাদের যেতে আজ্ঞা দেব। ক্ষর পুরুষ ও পরম অক্ষর পুরুষ (কবিরমিতৌজা=কবির অমিত ঔজা অর্থাৎ যাঁর শক্তির কোনো সীমা নেই, সেই কবীর) দুই প্রভুই হংসাত্মাদের (আমাদের) কাছে এলেন। সত্ কবির্দেব বললেন, যে হংস আত্মারা ব্রহ্মের সঙ্গে যেতে চাও, তারা হাত উপরে উঠিয়ে স্বীকৃতি দাও। ওই সময় নিজের পিতার সামনে কারোর হাত উঠাবার সাহস হয়নি। অনেক সময় পর্যন্ত নিস্তব্ধ ছেয়ে রইল। এরপরে এক হংস আত্মা সাহস করে বললেন, পিতাজী! আমি যেতে চাই। তারপরে তার দেখা-দেখি (আজ এই ২১ ব্রহ্মাণ্ডে যত আত্মারা ফেঁসে রয়েছে) এই আমরা সকল আত্মারাই হাত উঠিয়ে স্বীকৃতি দিলাম। পরমেশ্বর কবীরজী তখন জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও। যারা তোমার কাছে যাওয়ার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিল, আমি ওই সকল হংস আত্মাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এরপর জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে চলে গেলেন। ওই সময় পর্যন্ত এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সতলোকেই ছিল।

তারপর পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব প্রথম ইচ্ছা ব্যক্ত করা ওই হংস আত্মাকে, একটি মেয়ের রূপ বানিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনি) রচনা করেন নি এবং সমস্ত হংস আত্মাদেরকে (যারা জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যাওয়ার জন্য সহমতি দিয়েছিল), ওই মেয়ের শরীরে তাদের সকলকে সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরে ওই মেয়েটি আষ্ট্রা (আদি মায়া/প্রকৃতি/দূর্গা) নামে পরিচিত হয়। এরপর সতপুরুষ বললেন, কন্যা! আমি তোমাকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি, ব্রহ্ম যত জীব উৎপন্ন করতে বলবে, তুমি উৎপন্ন করে দেবে। পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের পুত্র সহজ দাসের দ্বারা দেবী প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষের (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনের) কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সহজ দাস জ্যোতিনিরঞ্জনকে বললেন যে, এই বোনের শরীরে পরমপিতা সমস্ত আত্মাদেরকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যারা আপনার সঙ্গে আসার জন্য সহমতি ব্যক্ত করেছিল। এই প্রকৃতি দেবীকে পরমপিতা বচন শক্তি প্রদান করে দিয়েছেন। আপনি যত জীব চাইবেন, প্রকৃতি দেবী নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করে দেবে। এই বলে সহজ দাস নিজের দ্বীপে চলে গেলেন।

প্রকৃতি দেবী (মেয়েটি) যুবতী হওয়ার কারণে রং-রূপ ফুটে উঠছিল। তাকে দেখতেই কালব্রহ্মের মনের ভিতর বিষয়-বাসনা জেগে উঠলো আর তখনই তিনি প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি শুরু করলেন। এই দেখে দূর্গা বললেন যে, জ্যোতি নিরঞ্জন! আমার কাছে পিতার দেওয়া শব্দ শক্তি রয়েছে। আপনি যত প্রাণী চাইবেন, আমি পরমাত্মার প্রদান করা বচন-শক্তি দ্বারা তত প্রাণী উৎপন্ন করে দেব কিন্তু দয়া করে আপনি মৈথুন পরম্পরা শুরু করবেন না। আপনিও ওই পরমপিতার শব্দ শক্তিতে ডিম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এবং আমিও সেই পরম পিতার বচন (শব্দ) শক্তি দ্বারা আপনার পরে উৎপন্ন হয়েছি, এই কারণে আপনি হলেন আমার বড় ভাই। অতএব ভাই বোনের এই সম্পর্ক পাপের কারণ হবে তবে জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর একটি কথাও না শুনে, নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে প্রকৃতির স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনি) বানিয়ে কুকর্ম (বলাৎকার) করার চেষ্টা করলেন। ওই সময় দূর্গা (প্রকৃতি দেবী) তাঁর নিজের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য, কোনো উপায় না দেখে সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে, জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখ দিয়ে পেটের ভিতর প্রবেশ করে, নিজের রক্ষার জন্য পূর্ণব্রহ্ম কবীরদেবের নিকট প্রার্থনা করলেন। ওই সময় কবির্দেব (কবির দেব) যোগ সন্তায়ন (যোগজীত) নামে নিজের পুত্রের রূপ ধারণ করে ওই স্থানে প্রকট হয়ে কন্যাকে ব্রহ্মের পেট থেকে (উদর থেকে) বের করলেন। জ্যোতি নিরঞ্জনকে বললেন, জ্যোতি নিরঞ্জন! আজ থেকে তোর নাম 'কাল' হবে। তোর জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে, এইজন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ হবে এবং এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে তুই প্রতিদিন ভক্ষণ করবি ও সোয়া লাখ (এক লাখ পঁচিশ হাজার) জীব প্রতিদিন উৎপন্ন করতে থাকবি। এখন একুশ ব্রহ্মাণ্ড সহিত তোদের দুইজনকে এই সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হল। এই কথা বলতেই একুশ ব্রহ্মাণ্ড বিমানের মতো চলতে লাগল এবং সহজ দাসের দ্বীপের নিকট দিয়ে সতলোক থেকে ষোল সংখ কোস (এক কোস প্রায় ৩ কিলোমিটার) দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

এক ব্রহ্মান্ডের লঘু চিত্র

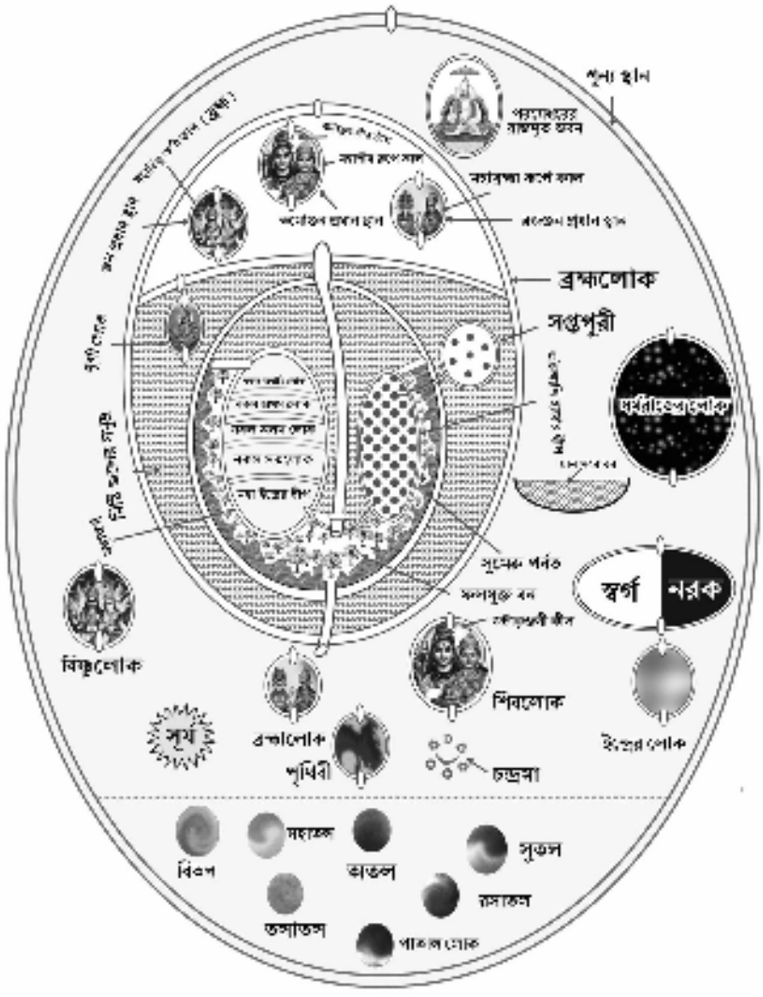

বিশেষ বিবরণ :- এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল তিন শক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হল।

১. পূর্ণ ব্রহ্মকে অন্য উপমাত্মক নামেও জানা যায়, যেমন- সতপুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষর ব্রহ্ম বা পরম অক্ষর পুরুষ ইত্যাদি। এই পূর্ণ ব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী এবং বাস্তবে তিনিই হলেন একমাত্র অবিনাশী (অমর) পরমাত্মা।

২. পরব্রহ্ম যাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। এই পুরুষ (প্রভু) বাস্তবে অবিনাশী নয়। এই পরব্রহ্ম কেবল সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (মালিক)।

৩. ব্রহ্মকে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল, ক্ষর ব্রহ্ম, ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। যিনি কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। এখন এই ব্রহ্মের (কালের) সৃষ্টির এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হবে। যার মধ্যে আরো তিন নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বিষয়ে পড়বেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার মধ্যে পার্থক্য :- এক ব্রহ্মাণ্ডে বানানো সর্বোপরি স্থানের উপরে ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) স্বয়ং তিন গুপ্তস্থানের রচনা করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের রূপ ধারণ করে থাকেন। নিজের স্ত্রী প্রকৃতির (দুর্গার) সহযোগে, তিন পুত্রকে উৎপত্তি করেন এবং তাঁদের নামও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রাখেন আর যিনি ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিন লোকের (পৃথিবীলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোক) কেবল এক রজোগুণ বিভাগের মন্ত্রী (স্বামী)। তাঁকে ত্রিলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয়। ব্রহ্ম যিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার রূপে থাকেন, তাঁকে মহাব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকিয় ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্মকেই (কালকে) সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মাও বলা হয়।

শ্রী বিষ্ণু পুরাণে প্রমাণ :- চতুর্থ অংশ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ২৩০ - ২৩১ -তে শ্রী ব্রহ্মা বলেছেন :- যিনি অজন্মা সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বর আমরা তাঁর আদি, মধ্য, অন্ত, স্বরূপ, স্বভাব ও সার জানতে পারিনা। (শ্লোক ৮৩)

যিনি আমার রূপ ধারণ করে সংসারের রচনা করেন, স্থিতির সময় যিনি পুরুষ রূপে থাকেন এবং যিনি রুদ্র রূপ দ্বারা বিশ্বকে গ্রাস করেন, অনন্ত রূপে সমস্ত জগতকে ধারণ করেন। (শ্লোক ৮৬)

"শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের উৎপত্তি"

কাল (ব্রহ্ম) প্রকৃতি দেবীকে (দুর্গাকে) বললেন, এখন আমাকে কে আর কি ক্ষতি করতে পারবে? আমার যা ইচ্ছা হবে, আমি তাই করব। প্রকৃতি পুনরায় প্রার্থনা করে বললেন, একটু তো লজ্জা রাখুন, প্রথমত আপনি হলেন আমার বড় ভাই, কেননা ওই পূর্ণ পরমাত্মার (কবির্দেবের) বচন শক্তি দ্বারা ডিম থেকে আপনি উৎপন্ন হয়েছেন, তারপরে ওই পূর্ণ প্রভুর বচন শক্তি দ্বারা আমি উৎপন্ন হয়েছি, সেই সম্পর্কে আপনি হলেন আমার বড়ভাই। দ্বিতীয়ত আমি আপনার পেট থেকে বের হয়েছি, এইজন্য আমি সম্পর্কে হলাম আপনার মেয়ে আর আপনি হলেন আমার পিতা। অতএব এই পবিত্র সম্পর্ক খারাপ করলে মহাপাপ হবে। আমার কাছে পরমপিতার দেওয়া শব্দ শক্তি আছে, আপনি যত প্রাণী চাইবেন, তত প্রাণী আমি সৃষ্টি করে দেব। জ্যোতি নিরঞ্জন দুর্গার একটা কথাও শুনলেন না এবং বললেন যে, আমার যে শাস্তি পাওয়ার ছিল তা আমি পেয়ে গিয়েছি। এছাড়া আমাকে সতলোক থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হয়েছে, এখন আমি যা খুশি তাই করব। এই কথা বলে কাল-পুরুষ (ক্ষরপুরুষ) জবরদস্তি করে প্রকৃতি দেবীর সহিত বিবাহ করলেন এবং তিন পুত্রদের (রজোগুণ যুক্ত-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত-বিষ্ণু ও তমোগুণ যুক্ত -শিব অর্থাৎ শঙ্করকে) উৎপত্তি করলেন। যুবক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিন পুত্রকে দুর্গা অজ্ঞান করে রেখে দেন, তারপরে যুবক হওয়ার পরে শ্রী ব্রহ্মাকে পদ্মফুলের উপর, শ্রী বিষ্ণুকে শেষ নাগের বিছানার উপরে এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপরে রেখে চেতনা ফিরিয়ে একত্রিত করে দেন। এরপরে প্রকৃতি দেবী (দুর্গা) এই তিনজনকে বিবাহ করিয়ে দেন। কাল ব্রহ্মের আদেশে প্রকৃতি দেবী (দুর্গা) তিন পুত্রকে এক ব্রহ্মাণ্ডে তিন ধামে বা লোকেতে (স্বর্গ লোক, পৃথিবী লোক, পাতাল লোকেতে) এক এক বিভাগের মন্ত্রী (প্রভু) পদ সামলানোর জন্য নিযুক্ত করে দেন। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজোগুণ বিভাগের এবং শ্রীবিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ বিভাগের আর শ্রী শিব শঙ্করকে তমোগুণ বিভাগের মন্ত্রী (প্রভু) পদে নিযুক্ত করেন। কাল ব্রহ্ম স্বয়ং গুপ্ত (মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব) রূপে মুখ্যমন্ত্রী পদকে সামলান। এক ব্রহ্মাণ্ডে একটি ব্রহ্মলোকের রচনা করলেন এবং সেখানে তিনটি গুপ্ত স্থানও বানিয়ে রেখেছেন।

রজোগুণ প্রধান একটি স্থান রয়েছে, যেখানে এই ব্রহ্ম (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জন) স্বয়ং মহাব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং নিজের স্ত্রী দুর্গাকে মহাসাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুইজনের সংযোগে যে পুত্র ওই স্থানে উৎপন্ন হয়, সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রজোগুণী হয়ে যান।

দ্বিতীয় সত্ত্বগুণ প্রধান একটি স্থান বানিয়েছেন। সেখানে এই ক্ষরপুরুষ স্বয়ং মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করে থাকেন এবং তাঁর নিজের স্ত্রী দুর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রাখেন, যে পুত্র এই স্থানে উৎপন্ন হয়, তাঁর নাম বিষ্ণু রাখেন এবং সেই বালক সত্ত্বগুণযুক্ত হন। তৃতীয় এই কাল সেখানে এক তমোগুণ প্রধান স্থানও বানিয়েছেন। ওই স্থানে এই কাল স্বয়ং সদাশিব রূপ বানিয়ে থাকেন এবং তাঁর স্ত্রী দুর্গাকে মহাপার্বতী রূপে রাখেন এবং এই দুজনের স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের দ্বারা যে পুত্র

উৎপন্ন হয়, তাঁর নাম শিব রাখেন এবং সে তমোগুণ যুক্ত হন। (প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শ্রী শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬ তে যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আর মহেশ্বর থেকে অন্য সদাশিব আছেন এবং রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬, ৭, ৯ পৃষ্ঠা নং ১০০ থেকে ১০৫ ও ১১০ -তে অনুবাদকর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত এবং পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত, গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, যার অনুবাদ কর্তা হলেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী) পরে এই তিন পুত্রকে ভ্রমিত করে, কালব্রহ্ম নিজের আহারের জন্য জীবদের উৎপত্তি শ্রী ব্রহ্মার দ্বারা করান এবং স্থিতির কর্ম (একে অন্যের প্রতি মায়া-মমতা দ্বারা জড়িয়ে কালের জালে রাখা কর্ম) শ্রী বিষ্ণুর দ্বারা করান আর মৃত্যু অর্থাৎ সংহার করার কর্ম শিবের দ্বারা করান (কেননা কাদির আল্লাহ অর্থাৎ সৎপুরুষ তিনি কাল পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই কারণে প্রতিদিন তাঁকে একলক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীর থেকে ময়লা বের করে খেতে হয়। তারজন্য একুশ ব্রহ্মাণ্ডে এক তপ্তশিলা রয়েছে, যেটা সর্বদা গরম থাকে, তার উপর মানবের সূক্ষ্ম শরীরের ময়লা গলিয়ে বের করে খায়। সেই গরম পাথরে জীব মরে না, তবে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়। পরে প্রাণীদেরকে তাদের কর্ম অনুসারে অন্য শরীর প্রদান করে)। সেই কর্ম শ্রী শিবের দ্বারা করান। যেমন কোনো বিল্ডিংয়ে তিনটি রুম বানানো আছে। একটি রুমে অশ্লীল চিত্র লাগানো রয়েছে, সেই রুমে যেতেই মনের মধ্যে খারাপ বিচার উৎপন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় রুমে সাধু-সন্তদের ও ভক্তদের চিত্র লাগানো রয়েছে, ওই রুমে যেতেই ভালো বিচার অর্থাৎ প্রভুর চিন্তন শুরু হয়ে যায়। তৃতীয় রুমে দেশ ভক্তদের ও বিপ্লবী শহীদদের চিত্র লাগানো রয়েছে, ওই রুমে যেতেই মনের মধ্যে বিদ্রোহ ভাব উৎপন্ন হয়ে যায়। ঠিক এই প্রকার ব্রহ্ম (কাল) নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা, উপরের ওই তিন গুণ প্রধান স্থানগুলির রচনা করেছে।

"তিন গুণ কি? প্রমাণ সহিত"

"তিন গুণ হল, রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব। ব্রহ্ম (কাল) ও প্রকৃতি দেবীর (দুর্গা) দ্বারা উৎপন্ন হয়েছেন এবং তিন-দেবতাই নাশবান অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

প্রমাণ :- গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ, যার সম্পাদক হলেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, পৃষ্ঠা ২৪ থেকে ২৬ বিদ্যেশ্বর সংহিতা এবং পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা" - তাতে লেখা আছে যে, এইপ্রকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ রয়েছে কিন্তু শিবকে (ব্রহ্ম-কালকে) গুণাতীত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ :- গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদদেবীভাগবত পুরাণ, যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিমন লাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১২৩ :- ভগবান বিষ্ণু দুর্গার স্তুতি করে বললেন যে, আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শঙ্কর তোমারই কৃপাতে বিদ্যমান হয়েছি। আমাদের তো আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হয়। আমরা নিত্য (অমর/অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য, জগৎজননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন :- যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে তাঁদের পরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি, তোমার সন্তান হলাম না? অর্থাৎ তুমিই সেই, যে আমাকেও উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে তোমার গুণ সদা সর্বদা বিরাজমান রয়েছে। এই প্রকার তিন গুণ দ্বারা উৎপন্ন আমরা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর নিয়মানুসারে কর্মতে তৎপর থাকি।

❖ উপরোক্ত এই বিবরণ কেবল হিন্দীতে অনুবাদিত শ্রী দেবীমহাপুরাণে বিদ্যমান আছে। এখানে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। এইজন্য প্রমাণ দেখুন শ্রীমদদেবীভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশন মুম্বই, এর মধ্যে সংস্কৃত সহিত হিন্দী অনুবাদ করা হয়েছে।

তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক ৪২ :-

ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাতসর্বে বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ

কে অন্যে সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা॥।৪২॥

হিন্দী অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ :- হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি (বিষ্ণু) ও শিব তোমারই প্রভাবে জন্ম নিয়েছি। নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী (অমর) নই, তাহলে অন্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা কি প্রকার নিত্য (অমর) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

পৃষ্ঠা নং ১১-১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :- যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাংঅবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণোঅং হরিঃ। (৮)

অনুবাদ :- ভগবান শঙ্কর বললেন, হে মাতা! যদি আমার উপর আপনি দয়াযুক্ত হন, তাহলে আমাকে তমোগুণ কেন বানালেন, পদ্মফুল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কেন বানালেন এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ কেন বানালেন? অর্থাৎ জীবদের জন্ম-মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মতে কেন লাগিয়ে রেখেছেন?

শ্লোক-১২ :- রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদ্‌ম শিবে (১২)

হিন্দি থেকে বাংলা :- আপনি সর্বদা নিজের স্বামী প্রভু অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সর্বদা ভোগ বিলাস করতে থাকেন। আপনার ভেদ কেউ জানে না।

নিষ্কর্ষ :- 'উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রজোগুণ - ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ - বিষ্ণু ও তমোগুণ - শিব, এই তিনজনই নাশবান অর্থাৎ মৃত্যু হয়। দুর্গার স্বামী হলেন ব্রহ্ম (কাল), যিনি দুর্গার সাথে সর্বদা ভোগ বিলাস করতে থাকেন।

"ব্রহ্মের (কালের) অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা"

সূক্ষ্মবেদ থেকে শেষ সৃষ্টি রচনা.....

তিন পুত্রের উৎপত্তি হওয়ার পর ব্রহ্ম তার স্ত্রী দুর্গাকে (প্রকৃতি) বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভবিষ্যতে আমি আমার নিজের বাস্তবিক রূপে কাউকে দর্শন দেব না। যার কারণে সবাই আমাকে অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার মনে করবে। তাই দুর্গাকে বলেছিলেন যে, তুমি আমার ভেদ কাউকে বলবে না, আমি গুপ্ত থাকব। এরপর দুর্গা জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কি আপনার পুত্রদেরও দর্শন দেবেন না? ব্রহ্ম বললেন, আমি আমার পুত্রদের ও অন্য কাউকেই কোনো সাধনা দ্বারা দর্শন দেব না, এটাই আমার অটল সিদ্ধান্ত অর্থাৎ নিয়ম থাকবে। দুর্গা বললেন, এটা তো আপনার উত্তম নিয়ম নয় যে, আপনি আপনার নিজের সন্তানদেরও দর্শন দেবেন না। তখন কাল বললেন, দুর্গা! এটা হল আমার অসহায়ত্ব (বিবশতা)। কারণ আমাকে এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীর ভক্ষন করার অভিশাপ লেগেছে। যদি আমার পুত্রগণ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ) জানতে পারে, তাহলে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কার্য তারা করবে না। এইজন্য আমার এই অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ট নিয়ম সদা চলতে থাকবে। যখন এই তিনজন কিছুটা বড় হয়ে যাবে, তখন এদেরকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে) চেতনা ফিরিয়ে দেবে। আমার বিষয়ে বলবে না, অন্যথায় আমি তোমাকেও দণ্ড দেব। দুর্গা এই ভয়ে কখনও বাস্তব কথা বলেন না।

{**প্রমাণ :-** এইজন্য গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ -তে বলা হয়েছে যে, এই বুদ্ধিহীন জনসম্প্রদায় (ব্যক্তিরা) আমার অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ নিয়মের বিষয়ে অপরিচিত রয়েছে। আমি কখনো কারোর সামনে প্রকট হই না, নিজের যোগমায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকি। এইজন্য আমার অব্যক্তকে মনুষ্য রূপে আসা কৃষ্ণ মনে করে।

(অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধি হীন (মম্) আমার (অনুত্তমম্) অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অবিনাশী (পরম্ ভাবম্) বিশেষ ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (মাম্ অব্যক্তম) আমার অব্যক্তকে (ব্যক্তিম্) মনুষ্য রূপে (আপন্নম) আসা (মন্যন্তে) মনে করে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণ নই। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪)।

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এবং ৪৮ -তে বলা হয়েছে যে, এটা আমার বাস্তবিক কাল রূপ। এই রূপের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না তো বেদে বর্ণিত বিধি দ্বারা, না জপের দ্বারা, না তপস্যার দ্বারা এবং না কোনো ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা হতে পারে।

যখন তিন পুত্র যুবক হয়ে গেল, তখন মাতা ভবানী (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) বললেন যে, তোমরা সাগর মন্থন করো। প্রথমবার যখন সাগর মন্থন করলেন, তখন (জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের শ্বাস দ্বারা চার বেদ উৎপন্ন করলেন। সেটিকে গুপ্ত বাণী দ্বারা আজ্ঞা দিলেন যে, সাগরে নিবাস করো) চার বেদ বাইরে এলো, সেটা ব্রহ্মা নিলেন। বস্তু নিয়ে তিন সন্তানই মাতা দুর্গার কাছে এলেন। তখন মাতা তার বড় পুত্র ব্রহ্মাকে বললেন যে, এই চার বেদ তুমি (ব্রহ্মা) নিজের কাছে রেখে অধ্যয়ন করো।

নোট :- বাস্তবে পূর্ণব্রহ্ম (পরমেশ্বর) পাঁচ বেদ কালকে (ক্ষর ব্রহ্ম) প্রদান করেছিলেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চার বেদ প্রকট করলেন আর পঞ্চম বেদ লুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে এই পঞ্চম বেদকে পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে কবির্গির্ভীঃ অর্থাৎ কবির্বাণী (কবীর বাণী) দ্বারা লোকোক্তির ও দোহার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার যখন সাগর মন্থন করা হল, তখন তিন কন্যা প্রাপ্ত হল। মাতা সেই তিন কন্যাকে তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। প্রকৃতি (দুর্গা) নিজেরই অন্য তিন রূপ (সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্বতী) বানিয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে দিলেন। সাগর মন্থনের সময় তারা বাইরে এলেন। ওই তিন মেয়ে প্রকৃতিরই তিন রূপ। প্রকৃতি ভগবান ব্রহ্মাকে সাবিত্রী, ভগবান বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ভগবান শঙ্করকে পার্বতীকে স্ত্রী রূপে প্রদান করলেন। তিনজনেই ভোগ বিলাস করলেন তার কারণে সুর ও অসুরদের জন্ম হল।

{যখন তৃতীয় বার সাগর মন্থন করা হয়, তখন ১৪ রত্ন ব্রহ্মাকে, অমৃত বিষ্ণু ও দেবতাদেরকে আর মদ অসুরদেরকে ও বিষ পরমার্থ শিব নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন। এটা তো অনেক পরের কথা।} যখন ব্রহ্মা বেদ পড়তে লাগলেন, তখন জানতে পারলেন যে, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনহার প্রভু অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা তো অন্য কেউ রয়েছেন। তখন ব্রহ্মাজী, বিষ্ণু ও শঙ্করকে বললেন, বেদে বর্ণনা আছে যে, সৃজনহার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা তো অন্য কোনো প্রভু কিন্তু বেদ বলছে, সেই প্রভুর ভেদ তো আমিও জানিনা, তারজন্য সংকেত আছে যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে জিজ্ঞাসা করো। এরপর

ব্রহ্মা তাঁর মাতার নিকট এলেন ও সমস্ত বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। কেননা তাঁর মাতা দুর্গা বলতেন যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই কর্তা, আমিই কর্তা। আমিই সর্বশক্তিমান কিন্তু ব্রহ্মা বললেন যে, বেদ ঈশ্বর কৃত বাণী, এটা মিথ্যা হতে পারে না।

দুর্গা বললেন, তোমার পিতা তোমাকে দর্শন দেবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, মাতা! এখন আপনার কথার উপর আমার অবিশ্বাস হয়ে গেল। আমি ওই পুরুষের (প্রভু) খোঁজ করেই ছাড়ব। দুর্গা বললেন, যদি তিনি তোমাকে দর্শন না দেন, তাহলে তুমি কি করবে? ব্রহ্মা বললেন যে, তাহলে আমি আপনাকে আমার মুখ কখনো দেখাব না। অন্যদিকে জ্যোতি নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন যে, আমি অব্যক্ত (নিরাকার) রূপে থাকব, কাউকে দর্শন দেব না অর্থাৎ একুশ ব্রহ্মাণ্ডে কখনও আমি আমার নিজের বাস্তবিক (আসল) কাল রূপে প্রকাশ্যে আসব না।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং - ২৪

অব্যক্তম্ ব্যক্তিম্, আপন্নম্ , মন্যন্তে, মাম্, অবুদ্ধয়ঃ।
পরম্ ভাবম্, অজানন্তঃ, মম, অব্যয়ম্, অনুত্তমম্ ॥২৪॥

অনুবাদ :- (অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা (মম্) আমার (অনুত্তমম্) অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম) অটল (পরম) পরম (ভাবম্) ভাবকে (অজানন্তঃ) না জানতে পেরে (অব্যক্তম) অদৃশ্যমান (মাম্) আমাকে অর্থাৎ কালব্রহ্মকে (ব্যক্তিম্) নর আকারে কৃষ্ণ (আপান্নম্) প্রাপ্ত হয়েছে (মন্যন্তে) মনে করে ।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক নং ২৫

ন, অহম্, প্রকাশঃ, সর্বস্য, যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়ঃ অয়ম্, ন, অভিজানাতি, লোক, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্॥২৫॥

অনুবাদ :- (অহম্) আমি (যোগমায়া সমাবৃতঃ) যোগ মায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকি (সর্বস্য) সকলের (প্রকাশঃ) প্রকাশ্যে (ন) আসি না অর্থাৎ অদৃশ্য বা অব্যক্ত থাকি, এইজন্য (অজম্) জন্ম না নেওয়া (অব্যয়ম্) অবিনাশী অটল ভাবকে (অয়ম্) এই (মূঢ়ঃ) অজ্ঞানী (লোকঃ) সাংসারিক লোকেরা (মাম্) আমাকে (অভিজানাতি) জানতে পারে (ন) না অর্থাৎ আমাকে কৃষ্ণ মনে করে। কেননা ব্রহ্ম নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে নেয়, তিনি হলেন দুর্গার স্বামী। এইজন্য এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমি শ্রী কৃষ্ণ ও অন্যদের মতো দুর্গা হতে জন্ম গ্রহণ করিনা।

"ব্রহ্মা তাঁর নিজের পিতাকে (কাল, ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা"

তখন দুর্গা ব্রহ্মাকে বললেন, অলখ নিরঞ্জন তোমাদের পিতা তিনি কিন্তু তোমাদের দর্শন দেবেন না। ব্রহ্মা বললেন, আমি দর্শন করেই ফিরব। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি তোমার দর্শন না হয়, তাহলে কি করবে? ব্রহ্মা বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি পিতার দর্শন না হয়, তাহলে আমি আপনার সম্মুখে আসব না। এই কথা বলে শ্রী ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে উত্তর দিশায় চলে গেলেন, যেখানে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার ছিল। সেখানে ব্রহ্মা চার যুগ পর্যন্ত ধ্যান করলেন কিন্তু তাঁর কিছুই প্রাপ্তি হয়নি। কাল আকাশবাণী করলেন যে, জীবের উৎপত্তি কেন করলে না? ভবানী (দুর্গা) বললেন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা জেদ করে আপনার সন্ধান করতে গিয়েছে, ব্রহ্মাকে ছাড়া জীবের উৎপত্তির কার্য করা অসম্ভব। কাল (ব্রহ্ম) বললেন, ব্রহ্মাকে ডেকে আনো আমি ওকে দর্শন দেবো না। তখন দুর্গা (প্রকৃতি) নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা গায়ত্রী নামের এক কন্যাকে উৎপন্ন করে তাঁকে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে আনতে বললেন। গায়ত্রী যখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন তখন ব্রহ্মা সমাধি লাগিয়ে বসেছিলেন। তার আভাসই ছিল না যে, কেউ এসেছেন। তখন আদি কুমারী (প্রকৃতি) গায়ত্রীকে ধ্যানের মাধ্যমে বললেন যে, ব্রহ্মার চরণ স্পর্শ করো। গায়ত্রী তাই করলেন আর ব্রহ্মাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তখন ক্রোধবশে ব্রহ্মা বললেন, ওরে পাপী! তুই কে? যে আমার ধ্যান ভঙ্গ করেছিস? আমি তোকে অভিশাপ দেব। গায়ত্রী বললেন, আমার কোনো দোষ নেই, প্রথমে আমার কথা শোনো, তারপরে না হয় অভিশাপ দিও। আমাকে মাতা দুর্গা আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন, কেননা আপনাকে ছাড়া জীব উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মা বললেন, আমি কিভাবে যাব? পিতার দর্শন তো আমি এখনো করতে পারিনি। এখন মাতার নিকট গেলে তো আমি উপহাসের (ঠাট্টার) পাত্র হয়ে যাব। যদি তুমি মাতার সামনে বলতে পারো যে, পিতার (জ্যোতি নিরঞ্জনের) দর্শন ব্রহ্মার হয়েছে এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি। তখন গায়ত্রী বললেন, আপনি যদি আমার সঙ্গে সম্ভোগ (সেক্স) করেন, তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি। ব্রহ্মা তখন চিন্তা করলেন যে, পিতার দর্শন তো হল না আর এমনভাবে মাতার সামনে গেলে তো লজ্জা লাগবে। তাই কোনো উপায় না দেখে, গায়ত্রীর সাথে রতি ক্রিয়া (সম্ভোগ) করলেন।

তারপর গায়ত্রী বললেন যে, আমার মতো আরো একজন সাক্ষী তৈরি করলে কেমন হয়। ব্রহ্মা বললেন, খুবই

ভালো কথা। তখন গায়ত্রী শব্দ শক্তি দ্বারা (পুহপবতি নামের) এক কন্যা উৎপন্ন করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি সাক্ষী দেবে যে, ব্রহ্মা পিতার দর্শন পেয়েছে? তখন পুহপবতি কন্যা বললেন, আমি কেন মিথ্যা সাক্ষী দেব? হ্যাঁ! যদি ব্রহ্মা আমার সাথে রতি ক্রিয়া করে, তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি। গায়ত্রী ব্রহ্মাকে বুঝিয়ে (প্ররোচিত করে) দিয়ে বললেন যে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। তখন ব্রহ্মা পুহপবতির সাথেও রতিক্রিয়া করলেন এবং তিনজন একত্র হয়ে আদি মায়ার (প্রকৃতির) কাছে এলেন। দুই দেবী উপরোক্ত শর্ত এইজন্য রেখেছিল যে, যদি ব্রহ্মা মাতার সামনে আমাদের মিথ্যা সাক্ষীর কথা বলে দেন, তাহলে মাতা আমাদের অভিশাপ দেবেন। এই জন্য তাকেও দোষী বানিয়ে নিলেন।

(এখানে গরীবদাস জী মহারাজ বলেছেন যে, "দাস গরীব য়হ চূক ধুরোং ধুর")

"মাতা (দূর্গার) দ্বারা ব্রহ্মাকে অভিশাপ"

তখন মাতা (দূর্গা) ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার কি পিতার দর্শন হয়েছে? ব্রহ্মা বললেন, হ্যাঁ মাতা! পিতার দর্শন হয়েছে। দূর্গা বললেন, সাক্ষী কে আছে বলো। ব্রহ্মা বললেন, এই দুই জনের সামনে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। দেবী সেই দুই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সামনে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়েছিল কি? ওই দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ! আমরা নিজের চোখে দেখেছি, এরপর ভবানীর (প্রকৃতির) সন্দেহ হল যে, ব্রহ্ম তো পূর্বেই আমাকে বলে রেখেছিলেন যে, কাউকে তিনি দর্শন দেবেন না কিন্তু এরা বলছে যে, দর্শন হয়েছে। দেবী অষ্টাঙ্গী তখন ধ্যানের মাধ্যমে কাল/ জ্যোতি নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা যা বলছে, এ সব গল্প কি সত্য?

জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন, এই তিনজনই মিথ্যা কথা বলছে। মাতা বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। এরইমধ্যে আকাশবাণী হল যে, এদের কোনো দর্শন হয়নি। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন , মাতা! আমি প্রতিজ্ঞা করে, পিতার সন্ধান করতে গিয়েছিলাম কিন্তু পিতার (ব্রহ্মের) দর্শন হয়নি। আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করছিল, এই জন্য আমরা মিথ্যা কথা বলেছি। তখন মাতা দূর্গা বললেন যে, এখন আমি তোমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছি।

ব্রহ্মাকে অভিশাপ :- তোর পূজা জগতে হবে না। পরবর্তী কালে তোর যে বংশধর হবে, তারা খুবই ভন্ডামি (ছলনা) করবে। মিথ্যা কথা বানিয়ে জগতের লোকদের ঠকাবে। উপর থেকে তো কর্মকাণ্ড (পূজা সাধনা) করতে দেখা যাবে আর ভিতরে তারা বিকার (খারাপ কর্ম) করবে। পুরাণের কথা পাঠ করে শোনাবে কিন্তু নিজেদের কোনো জ্ঞান থাকবে না যে, সদগ্রন্থের বাস্তবিকতা কি? তবুও মান বশ ও ধন প্রাপ্তির জন্য, গুরু সেজে, অনুগামীদের লোকবেদ (শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে রূপকথা) শোনাতে থাকবে। তারা স্বয়ং দেবী-দেবতাদের পূজা করবে এবং অন্যদের করাবে, পরের নিন্দা করে কষ্টের পরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। যারা তাদের অনুগামী (শিষ্য-শিষ্যা) হবে, তাদেরকে পরমার্থের জ্ঞান (পরমাত্মার মার্গের কথা) বলবে না। দক্ষিণা প্রাপ্তি করার আশায়, জগতকে ভ্রমিত করতে থাকবে। স্বয়ং নিজেকে ভালো ভাববে ও নিজেদের বড় মনে করবে এবং অন্যদেরকে নীচু ভাববে। মাতার মুখ থেকে যখন এই কথা শুনলেন, তখন ব্রহ্মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং অনেক সময় পরে জ্ঞান ফিরল।

গায়ত্রীকে অভিশাপ :- তোর স্বামী (পতি) ষাঁড় হবে। তুই মৃত্যুলোকে গাভী হবি।

পুহপবতিকে অভিশাপ :- তোর নিবাস হবে নোংরা স্থানে। তোর ফুল কেউ পূজায় লাগাবে না। এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কারণে তোকে এই নরক ভোগ করতে হবে। তোর নাম কেওড়া কেতকী হবে। (হরিয়ানায় এই ফুলকে কুসোন্ধী বলে) এই ফুলের গাছ নোংরা আবর্জনা স্থানে হয়।

এইপ্রকার তিনজনকে অভিশাপ দেওয়ার পরে, মাতা ভবানী অনুতাপ করলেন। {এই প্রকার প্রথমে জীব তো চিন্তা ভাবনা না করেই, মনের (কাল) প্রভাবে ভুল কাজ করে ফেলে কিন্তু যখন আত্মার (সত পুরুষের অংশের) প্রভাবে জ্ঞান হয়, তখন পরে আফসোস করে। যেমন, মাতা-পিতা নিজের সন্তানদের সামান্য ভুলের কারণে মারেন (ক্রোধিত হয়) কিন্তু পরে অনুতাপ করেন। এই প্রক্রিয়া মনের (কাল নিরঞ্জনের) প্রভাব দ্বারা সর্ব জীবে ক্রিয়াবান হচ্ছে।} হ্যাঁ, তবে এখানে একটা বিশেষ বিষয় হল, জ্যোতি নিরঞ্জনও (কাল-ব্রহ্ম) নিজের আইন তৈরি করে রেখেছে, যদি কোনো জীব কোনো দুর্বল জীবকে অত্যাচার করে, তাহলে তাকে তার প্রতিশোধ পেতেই হবে। যখন আদি ভবানী (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও পুহপবতিকে অভিশাপ দিলেন, তখন অলখ-নিরঞ্জন (ব্রহ্ম-কাল) বললেন, হে ভবানী (প্রকৃতি অষ্টাঙ্গী)! ওদের অভিশাপ দিয়ে তুমি ঠিক করোনি। তাই এখন আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, দ্বাপর যুগে তোমারও পাঁচ স্বামী হবে। (দ্বাপর যুগে দ্রৌপদীই আদি মায়ার অবতার হয়েছিলেন) এই আকাশবাণী শুনে আদি মায়া বললেন, হে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল)! আজ আমি তোমার অধীনে রয়েছি, তাই তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারছ তো করে নাও।

{সৃষ্টি রচনাতে দূর্গার অন্য নামের উল্লেখ বার বার লেখার উদ্দেশ্য হল যে, গীতা, বেদ ও পুরাণে প্রমাণ দেখার সময় ভ্রম উৎপন্ন হবে না। যেমন - গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ আর ৪ -তে কাল ব্রহ্ম বলেছেন যে, প্রকৃতি হলো সমস্ত জীবকে গর্ভে ধারণকারী মাতা আর আমি হলাম ওই প্রকৃতির গর্ভে বীজ স্থাপিত করা সমস্ত জীবের পিতা এবং শ্লোক ৫ -তে বলেছেন যে, প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তিন গুণ সমস্ত জীব আত্মাকে কর্মের বন্ধনে বেঁধে রাখে। (লেখা সমাপ্ত)।

এই প্রকরণে প্রকৃতি হলেন দূর্গা আর তিন গুণ হলেন তিন দেবতা অর্থাৎ রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু , তমোগুণ-শিব এগুলি হল সাংকেতিক নাম।

"বিষ্ণুর নিজের পিতাকে (কাল/ব্রহ্মকে) প্রাপ্তির জন্য প্রস্থান এবং মাতার দ্বারা আশীর্বাদ লাভ"

এরপরে প্রকৃতি দেবী বিষ্ণুকে বললেন, পুত্র! তুমিও তোমার পিতার খোঁজ করো। বিষ্ণু পিতার (কালের) খোঁজ করতে করতে পাতাল লোকে চলে গেলেন, যেখানে শেষ নাগ ছিলেন। বিষ্ণুকে নিজের সীমানায় প্রবেশ করতে দেখে শেষ নাগ ক্রোধিত হয়ে, বিষ ভরা ফোয়ারা (ফুঁ) মারে। তার বিষ ভরা ফোয়ারার প্রভাবে বিষ্ণুর শরীরের রঙ শ্যামলা হয়ে যায়, যেমন রং স্প্রে হয়ে যায়। তখন বিষ্ণু চাইলেন যে, এই নাগকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তখন জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) বিষ্ণুর মনোভাব বুঝতে পেরে ভাবলেন, বিষ্ণুকে শান্ত করা দরকার। তাই আকাশবাণী করে বললেন, বিষ্ণু! এখন তুমি তোমার মাতার কাছে যাও ও সত্য সত্য সমস্ত বিবরণ বলে দাও আর শেষ নাগ যে কষ্ট তোমাকে দিয়েছে তার প্রতিশোধ তুমি দ্বাপর যুগে নিয়ে নিও। দ্বাপর যুগে তুমি (বিষ্ণু) কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবে এবং কালীদহতে কালিন্দ্রী নামক শেষ নাগের অবতার হবে।

উঁচ হোঈ কে নীচ সতাবৈ, তাকর ওএল (বদলা) মোহী সোঁ পাবৈ।
জো জীব দেঈ পীর পুনী কাঁহু, হম পুনি ওএল দিবাবেঁ তাহুঁ॥

তখন শ্রীবিষ্ণু, মায়ের কাছে এসে সমস্ত কথা সত্য সত্য বলে দিলেন, আমার সঙ্গে পিতার দর্শন হয়নি। এই কথায় মাতা দূর্গা (প্রকৃতি) প্রসন্ন হয়ে বললেন, পুত্র! তুমি সত্যবাদী। এখন আমি নিজের শক্তি দিয়ে তোমাকে তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো এবং তোমার মনের সন্দেহ দূর করে দেবো।

কবীর, দেখ পুত্র তোহি পিতা ভীটাউঁ, তৌরে মন কা ধোঁখা মিটাউঁ।
মন স্বরূপ কর্তা কহ জানোঁ, মন তে দূজা ঔর ন মানো॥
স্বর্গ পাতাল দৌর মন কেরা, মন অস্থীর মন অহৈ অনেরা।
নিরংকার মন হী কো কহিয়ে, মন কী আস নিশ দিন রহিয়ে।
দেখ হুঁ পলটি সূন্য মহ জ্যোতি, জহাঁ পর ঝিলমিল ঝালর-হোতী॥

মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি/দূর্গা) বিষ্ণুকে বললেন, মনই হল জগতের কর্তা আর এই মনই হল জ্যোতি নিরঞ্জন। এছাড়া ধ্যানের সময়, যে এক হাজার জ্যোতি দেখতে পাবে, সেটাই হল তার রূপ আর যে শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির বাজনা শুনছো, সেই বাজনা মহাস্বর্গে জ্যোতি নিরঞ্জনেরই বাজছে। তখন মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি) বললেন, হে পুত্র! তুমি সর্ব দেবতাদের মাথার মুকুট (সরতাজ) হবে এবং তোমার সকল কামনা ও কার্য আমি পূর্ণ করব। তোমার পূজা সমস্ত জগতে হবে কেননা তুমি আমাকে সত্য সত্য বলেছো। কালের এই একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীদের বিশেষ অভ্যাস আছে যে, সকলে নিজের বৃথা মহিমা গান করে। যেমন মাতা দূর্গা শ্রী বিষ্ণুকে বলছেন যে, তোর পূজা জগতে হবে। আমি তোকে তোর পিতার দর্শন করিয়ে দিয়েছি। তবে দূর্গা কেবল জ্যোতির প্রকাশ (জ্যোতি নিরঞ্জনের জ্যোতির আলো) দেখিয়ে বিষ্ণুকে ভুলিয়ে দিলেন। শ্রী বিষ্ণুও এই স্থিতি নিজের ভক্তদের বোঝাতে লাগলেন যে, পরমাত্মার কেবল প্রকাশ দেখা যায়, পরমাত্মা নিরাকার। তারপরে আদি ভবানী (তিন দেবতার মাতা/দূর্গা/প্রকৃতি) রুদ্রের অর্থাৎ শঙ্করের বা মহেশের কাছে গিয়ে বললেন যে, মহেশ! এবার তুমিও তোমার পিতার সন্ধান করো। তোমার দুই ভাই তো তোমার পিতার দর্শন পায়নি, তাদেরকে যা দেওয়ার ছিল, তা আমি প্রদান করে দিয়েছি। এখন তুমিও চেয়ে নাও, যা তোমার আবশ্যক। তখন মহেশ বললেন, হে জননী! আমার বড় দুই ভাইয়ের যখন পিতার দর্শন হয়নি, তাহলে আমার চেষ্টা করা বৃথা হবে। কৃপা করে আমাকে এমন বর (আশীর্বাদ) দেন, যাতে আমি অমর (মৃত্যুঞ্জয়) হতে পারি। তখন মাতা বললেন যে, এটা আমি করতে পারবো না। তবে উপায় বলে দিতে পারি, যাতে তোমার আয়ু সব থেকে অধিক হবে। সেটা হল বিধি যোগ সমাধি (এইজন্য মহাদেব বেশিরভাগ সময় সমাধিতেই থাকেন)। এইভাবে মাতা (অষ্টাঙ্গী/দূর্গা) তিনটি পুত্রকে তিন বিভাগ ভাগ

করে দিলেন।

ভগবান ব্রহ্মাকে এই কালের লোকে চুরাশি লক্ষ প্রকারের চোলা (শরীর) রচনা (তৈরি) করার কর্ম অর্থাৎ রজোগুণে প্রভাবিত করে, সন্তান উৎপত্তির জন্য বিবশ করে জীব উৎপত্তি করার বিভাগ প্রদান করেছেন। ভগবান বিষ্ণুকে এই জীবগণকে পালন - পোষণ (কর্ম অনুসার) করার কর্ম এবং মোহ-মমতা উৎপন্ন করিয়ে স্থিতি বজায় রাখার বিভাগ দিয়েছেন।

শঙ্কর (মহাদেব) ভগবান শঙ্কর অর্থাৎ মহাদেবকে সংহার করার (মারার) বিভাগ প্রদান করেছেন, কেননা এই তিন দেবতার পিতা জ্যোতি নিরঞ্জনকে, প্রতিদিন এক লাখ মানব শরীরধারী সূক্ষ্ম জীবাত্মাদেরকে খেতে হয়।

এখানে মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর থেকে কিভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্ভব হয়? এই তিনজন তো নিজের নিজের লোকে অর্থাৎ ধামে থাকেন। যেমন আজকাল সঞ্চার প্রণালীকে চালানোর জন্য উপগ্রহকে উপরের আকাশে পাঠানো হয় আর সেটি নীচে পৃথিবীর উপর সঞ্চার প্রণালী চালানো হয়। ঠিক এইপ্রকার, এই তিন দেবতা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের শরীর থেকে বের হওয়া সূক্ষ্ম গুণের তরঙ্গ, তিন লোকে অর্থাৎ তিন ধামে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যেক প্রাণীর উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। উপরোক্ত বিবরণ এক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের (কাল) রচনা। ক্ষর পুরুষের (কালের) এরূপ একুশটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

কিন্তু ক্ষরপুরুষ (কাল) স্বয়ং তার বাস্তবিক রূপে অর্থাৎ সাকারে সবার সামনে আসেন না। ওই ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার কালকে প্রাপ্ত করার জন্য এই তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) বেদে বর্ণিত বিধি অনুসারে অপ্রান সাধনা করার পরেও ব্রহ্মের (কালের) দর্শন হয়নি। তাঁদের পরে ঋষিগণ বেদকে পড়েছেন। তারমধ্যে লেখা আছে যে, "অগ্নেঃ তনুর্ অসি" (পবিত্র যজুর্বেদে অধ্যায় ১ মন্ত্র ১৫) অর্থাৎ পরমেশ্বর সশরীর আছেন। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ১ তে লেখা আছে যে, "অগ্নেঃ তনুর্ অসি বিষ্ণুবে ত্বা সোমস্য তনূর্ অসি"। এই মন্ত্রে দুই বার বেদ সাক্ষী দিয়েছে যে, সর্বব্যাপক, সর্ব পালন কর্তা সতপুরুষ সশরীরে আছেন। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ৮ তে বলা হয়েছে যে, (কবির্ মনীষী) যে পরমেশ্বরকে সর্ব প্রাণী প্রাপ্ত করতে চান, তিনিই কবির্ অর্থাৎ কবীর। তাঁর শরীর হল নাড়ি বিহীন (অস্নাবিরম্), (শুক্রম্) বীর্য থেকে তৈরি পাঁচ তত্ত্বের দ্বারা বানানো ভৌতিক (অকায়ম্) শরীর নয়। তিনি সকলের মালিক সর্বোপরি, সত্যলোকে বিরাজমান আছেন। ওই পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জের (স্বর্জ্যোতি) স্বয়ং প্রকাশিত শরীর আছে, যা শব্দ রূপ অর্থাৎ অবিনাশী বা অমর। তিনি হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর), যিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকারী (ব্যদধাতা), সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাহার (স্বয়ম্ভূঃ) স্বয়ং প্রকট হয়ে থাকেন, (যথা তথ্য অর্থান্) বাস্তবে (শ্বাশত্) অবিনাশী অর্থাৎ অমর পরমাত্মা (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে প্রমাণ রয়েছে।) ভাবার্থ হল যে, পূর্ণ ব্রহ্মের শরীরের নাম হল কবীর (কবির দেব)। ওই পরমেশ্বরের শরীর নূর তত্ত্ব দিয়ে বানানো। পরমাত্মার শরীর অতি সূক্ষ্ম, তাঁর সেই সূক্ষ্ম শরীরকে একমাত্র ওই সাধকগণই দেখতে পান, যাঁর দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছে। এই প্রকার জীবেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে, যার উপরে পাঁচ তত্ত্বের আবরণ (কভার) অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের কায়া মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মাতা পিতার সংযোগ দ্বারা (শুক্রম্) বীর্য থেকে বানানো। শরীর ত্যাগ করার পরও জীবের সূক্ষ্ম শরীর সাথে থাকে। সেই শরীর ওই সাধকই দেখতে পান, যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এইপ্রকার পরমাত্মা ও জীবের স্থিতি জানবেন। বেদে ওম্ নামের স্মরণ করার প্রমাণ আছে, যা হল কেবল ব্রহ্মের সাধনা। এই উদ্দেশ্যে ওম্ নামের জপকে পূর্ণ ব্রহ্মের জপ মনে করে, ঋষিগণ হাজার বৎসর হঠযোগ করে (সমাধি লাগিয়ে) প্রভু প্রাপ্তির চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রভুর দর্শন হয়নি কিন্তু কিছু সিদ্ধি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়ে যায়। সেই সিদ্ধি রূপী খেলনা দিয়ে খেলে, ঋষিরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রতেই রয়ে যান এবং নিজের অনুভবে শাস্ত্রতে পরমাত্মাকে নিরাকার বলে লিখে দিয়েছেন। ব্রহ্ম (কাল) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি আমার নিজের বাস্তবিক রূপে কাউকে দর্শন দেবো না, আমাকে অব্যক্ত রূপেই সকলে জানবে। (অব্যক্তের ভাবার্থ হল কারোর আকার আছে কিন্তু ব্যক্তিগত রূপে বা স্থূল রূপে দর্শন দেয় না। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দিনের বেলাতেও সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, সূর্য দৃশ্যমান থাকে না। কিন্তু বাস্তবে ওই সূর্য মেঘের আড়ালে তেমন ভাবেই রয়েছে, এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়)। প্রমাণের জন্য দেখুন, গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ - ২৫, গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ ও ৩২ তে।

পবিত্র গীতার জ্ঞান দেওয়া ব্রহ্ম (কাল) শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত বা ভূতের মতো প্রবেশ করে বলেছিলেন যে, হে অর্জুন! আমি বর্ধিত কাল এবং সকলকে খাওয়ার জন্য এখন এখানে এসেছি। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২) তে লেখা আছে যে, এই হল আমার আসল অর্থাৎ বাস্তবিক রূপ, এই রূপকে তুই ছাড়া না তো অন্য কেউ পূর্বে দেখেছে আর না পরে কেউ দেখতে পারবে অর্থাৎ বেদে বর্ণিত যজ্ঞ-জপ-তপ এবং ওম্ নাম ইত্যাদির বিধি দ্বারা

আমার এই বাস্তবিক স্বরূপের দর্শন হবে না। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮) আমি কৃষ্ণ নই, এই মূর্খ লোকেরা কৃষ্ণ রূপে আমার অব্যক্ততাকে ব্যক্ত (মানুষ রূপে) মনে করছে। কেননা এরা আমার খারাপ অর্থাৎ অনুত্তম নিয়মের সাথে অপরিচিত আছে যে, আমি আমার বাস্তবিক অর্থাৎ আসল এই কাল রূপে কারোর সামনে প্রকট হই না। আমি নিজের যোগ মায়ার দ্বারা লুকিয়ে থাকি, (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোকে নং ২৪-২৫) বিচার করুন :- নিজের লুকিয়ে থাকা নিয়ম বা বিধানকে স্বয়ং অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম্) কেন বলছেন?

যদি পিতা নিজের সন্তানদেরও দর্শন না দেন, তাহলে বুঝতে হবে তারমধ্যে কোনো ভুল বা ত্রুটি রয়েছে, যার কারণে লুকিয়ে আছে এবং সুবিধাগুলোও প্রদান করছেন। অভিশাপের কারণে কালকে (ব্রহ্মকে) একলাখ মানব শরীরধারী প্রাণীকে ভক্ষণ করতে হয় এবং প্রতিদিন যে ২৫ শতাংশ বেশি জীব উৎপন্ন হয়, তাদেরকে গতির জন্য এবং কর্ম ভোগের দণ্ড দেওয়ার জন্য চুরাশি লাখ যোনির রচনা করে রেখেছেন। যদি ওই কাল সকলের সামনে কারও স্ত্রী, কারও পুত্র, কারও মাতা ও কারো পিতাকে মেরে খান, তাহলে জ্যোতি নিরঞ্জনের (ব্রহ্ম) প্রতি সকলের ঘৃণা হয়ে যাবে এবং যখনই কোনো সময় পূর্ণ পরমাত্মা কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং এই পৃথিবীতে আসবেন বা নিজের কোনো সংবাদ বাহককে (দূতকে) পাঠাবেন, তখন সর্ব প্রাণী সত্যভক্তি করে কালের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে।

এই জন্য সবাইকে ঠকিয়ে রাখেন এবং পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮, ২৪, ২৫ -এ তার নিজের সাধনা থেকে হওয়া গতিকেও (মোক্ষকেও) খুবই অশ্রেষ্ঠ বা খারাপ (অনুত্তমাম) বলেছেন এবং নিজের বিধানকেও (নিয়মকেও) অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম্/খুবই খারাপ) বলেছেন।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বানানো ব্রহ্মলোকে, একটি করে মহাস্বর্গ তৈরি করে রেখেছে। মহাস্বর্গে একস্থানে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল অগম লোক এবং নকল অনামী লোকের রচনা প্রাণীদের ঠকানোর জন্য প্রকৃতি (দুর্গার/ আদি মায়ার) দ্বারা বানিয়ে রেখেছেন। কবীর সাহেবের একটি শব্দ আছে, "কর নৈনোঁ দীদার মহল মেঁ প্যারা হৈ" তার মধ্যে বাণী আছে যে :-

"কায়া ভেদ কিয়া নিরবারা, য়হ সব রচনা পিণ্ড মঁঝারা হৈ।
মায়া অবিগত জাল পসারা, সো কারীগর ভারা হৈ।
আদি মায়া কিনহী চতুরাঈ, ঝুঠী বাজী পিণ্ড দিখাঈ।
অবিগত রচনা রচি অণ্ড মাহি বাকা প্রতিবিম্ব ডারা হৈ।"

এক ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য লোকেররও রচনা করা রয়েছে। যেমন শ্রী ব্রহ্মার লোক, শ্রী বিষ্ণুর লোক, শ্রী শিবের লোক। যেখানে বসে তিন প্রভু নীচের তিন লোকের (স্বর্গলোক অর্থাৎ ইন্দ্রের লোক-পৃথিবী লোক ও পাতাল লোকের) উপর এক-এক বিভাগের মালিক হয়ে প্রভুত্ব করেন এবং নিজের পিতা কালের ভোজনের জন্য প্রাণীদের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কার্যভার নিয়ন্ত্রণ করেন। এই তিন প্রভুরও জন্ম ও মৃত্যু হয়, তখন কাল প্রভু এদেরকেও খায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে {এটিকে অন্ড বলা হয়। কেননা ব্রহ্মাণ্ডের আকার ডিম্বাকারের মতো বানানো, তাই একে পিণ্ডও বলা হয়। কারণ শরীরে (পিণ্ডে) এক ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কমলগুলিতে টেলিভিশনের মতো দেখা যায়} এক মানসরোবর ও এক ধর্মরায়েরও (বিচারপতিরও) লোকও আছে এবং এক গুপ্ত স্থানে পূর্ণ পরমাত্মা অন্য রূপ ধারণ করে থাকেন। যেমন প্রত্যেক দেশে রাজদূত ভবন হয়। সেখানে কেউ যেতে পারে না। সেখানে কেবল ওই সব আত্মারা থাকে, যাদের সত্যলোকের ভক্তি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। যখন কখনো ভক্তি যুগ আসে, তখন ওই সময় কবীর পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত সদগুরুকে পাঠান। এই সকল পুণ্যাত্মাদের পৃথিবীতে ওই সময় মানব শরীর প্রাপ্ত হয় আর তারা খুব শীঘ্র সত ভক্তিতে লেগে গিয়ে, সদগুরুর থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত করে, পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে নেয়। ওই দূতভবন স্থানে থাকা হংস আত্মাদের নিজের পূর্বের ভক্তি কামাই খরচ হয় না। পরমাত্মার ভাণ্ডার থেকে সর্ব সুবিধা সেখানে উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মের (কালের) উপাসকদের ভক্তির কামাই স্বর্গ - মহাস্বর্গতেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কেননা এই কাল লোকে (ব্রহ্ম লোকে) ও পরব্রহ্ম লোকের প্রাণীদের নিজের কর্ম ফলই কেবল প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র

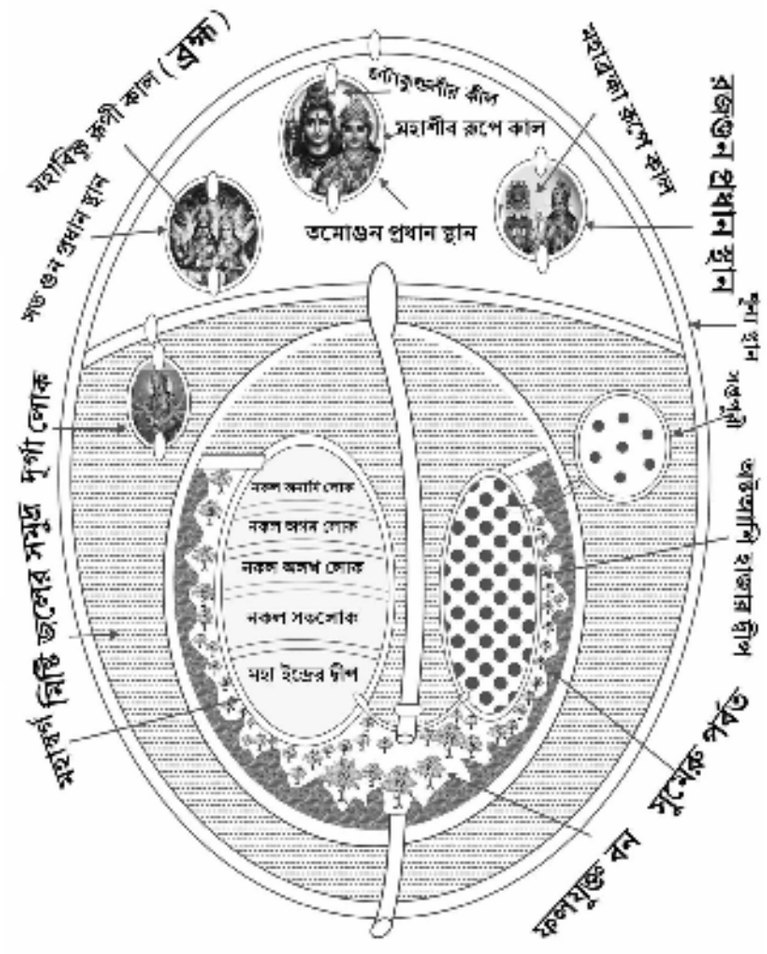

জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র

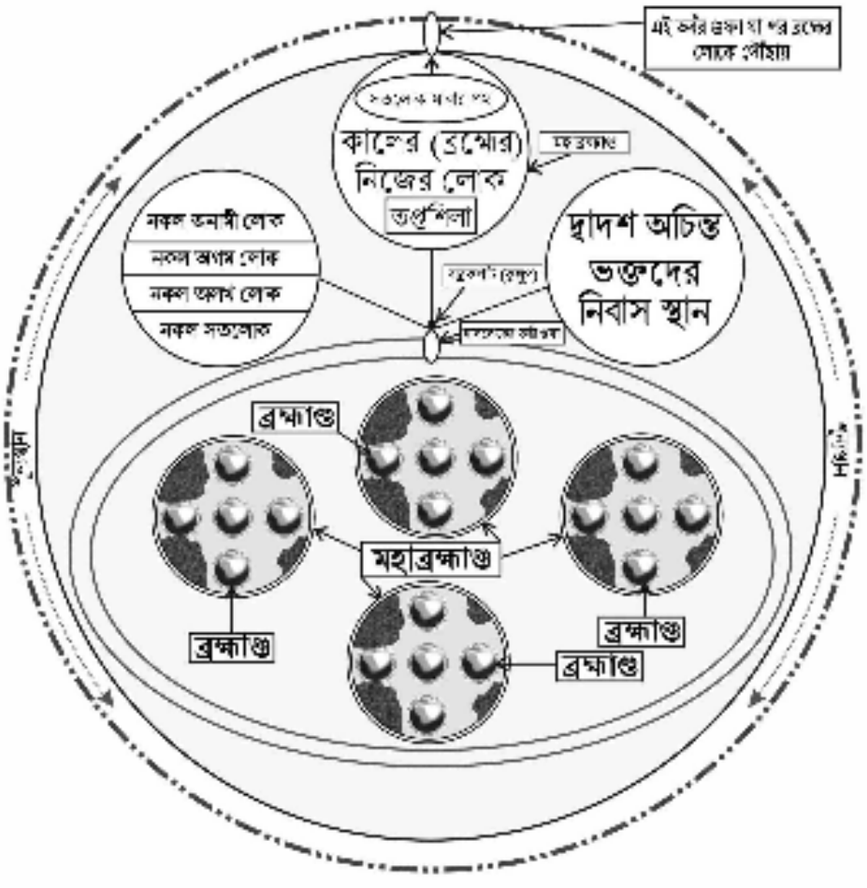

ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) নিজের ২০টি ব্রহ্মাণ্ডকে চার মহাব্রহ্মাণ্ডতে ভাগ করেছেন। এক মহা ব্রহ্মাণ্ডতে পাঁচ ব্রহ্মাণ্ডের সমূহ বানিয়ে দিয়ে, তার চারিদিকে ডিমের মতো গোলাকার পরিধিতে স্থির করে দিয়েছেন। আবার চার মহা ব্রহ্মাণ্ডকেও ডিম্বাকার গোলাকার পরিধিতে স্থির করে দিয়েছেন। একুশতম ব্রহ্মাণ্ডের রচনা এক মহা ব্রহ্মাণ্ডের সমান স্থান নিয়ে বানিয়ে দিয়েছেন। একুশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হতেই তিনটি রাস্তা তৈরি করে রেখেছেন। একুশ ব্রহ্মাণ্ডতেও বাম দিকে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল অগম লোক, নকল অনামী লোকের রচনা প্রাণীদের ঠকিয়ে রাখার জন্য, আদি মায়ার দ্বারা তৈরি করিয়ে রেখেছেন এবং ডান দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ১২ জন ব্রহ্মের সাধকগণদের (ভক্তদের) রাখেন। পরে প্রত্যেক যুগে তাদেরকে নিজের সংবাদ বাহক (নবী/ সদগুরু) বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, যারা শাস্ত্র বিধির বিপরীত (উল্টো) অর্থাৎ ভুল সাধনার জ্ঞান বলেন এবং স্বয়ং নিজেরাও ভক্তিহীন হয়ে যান আর শিষ্যদেরও কালের জালে ফাঁসিয়ে যান। তারপরে সেই গুরু বা নবী ও তার অনুগামীগণ সকলেই নরকে যান। আবার সামনে এক বড় তালা (কুলুফ) লাগিয়ে রেখেছেন। সে রাস্তা কালের (ব্রহ্মের) নিজের লোকে বা ধামে যায়। যে স্থানে এই ব্রহ্ম (কাল) নিজের বাস্তবিক কাল রূপে থাকেন। এই স্থানের উপরে এক বিশাল পাথরের গোল তাওয়ার আকারের (রুটি ভাজার লোহার গোল তাওয়ার মতো) আছে, যা সর্বদা গরম থাকে। যার উপরে কাল এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরগুলোকে ভেজে, তার মধ্য থেকে গন্ধ বের করে খায়। ওই সময় প্রাণীরা খুবই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং হাহাকার করতে থাকে। এর কিছু সময় পরে তারা অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু জীবেরা মরে না। তারপর ধর্মরায়ের লোকে গিয়ে তারা কর্মের আধারে অন্য যোনি প্রাপ্ত করে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকে। উপরোক্ত সামনে লাগানো তালা, ব্রহ্ম (কাল) কেবল নিজের আহারের প্রাণীদের জন্য কিছু সময়ের জন্য খোলেন। তবে পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনাম ও সারনামের দ্বারা স্বয়ং এই তালা খুলে যায়। এই প্রকার কালের জালের বিষয়ে পূর্ণ পরমাত্মা কবীরদেব (কবীর সাহেব /কবীর কাদির আল্লাহ) স্বয়ং তাঁর আপন ভক্ত ধর্মদাসকে বুঝিয়েছিলেন।

"পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা"

কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) পরে বললেন যে, "পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) নিজের কর্মে অবহেলা করেছিল, কেননা সে মানসরোবরে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং যখন পরমেশ্বর (আমি অর্থাৎ কবীর সাহেব) ওই সরোবরের জলে ডিম্ব বানিয়ে ছেড়েছিলাম, তখন অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) ওই ডিমের দিকে ক্রোধ ভরা দৃষ্টিতে দেখেছিল। এই দুই অপরাধের কারণে অক্ষর পুরুষকে সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড সহিত, সতলোক থেকে বাইরে বের করে দিয়েছি। অন্য আরও এক কারণ হল, অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) তার নিজের সাথী ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ) বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে, পরমপিতা কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের/ কবীর আল্লাহর) কথা ভুলে গিয়ে, ক্ষর পুরুষের কথা মনে করতে লাগল এবং ভেবেছিল যে, ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) সেখানে হয়তো খুব আনন্দ উপভোগ করছে, সে স্বতন্ত্র রাজ্য ভোগ করবে আর আমি পিছনে রয়ে গেলাম এবং অন্য কিছু হংস আত্মারা যারা পরব্রহ্মের সাথে সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম-মৃত্যুর কর্মদণ্ড ভোগ করছে, তারা ওই হংস আত্মাদের বিদায়ের কথা মনে করে শোকাতর হয়েছিল, যারা কালের (ক্ষরপুরুষ) সাথে একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে রয়েছে এবং তারা পূর্ণ পরমাত্মা অর্থাৎ সুখদায়ী কবির্দেবের কথা মন থেকে ভুলিয়ে গিয়েছে। পরমেশ্বরের বারংবার বোঝানো সত্ত্বেও কালের প্রতি তাদের আস্থা কম হয়নি। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) ভাবল যে, আমিও যদি অন্য স্থান প্রাপ্ত করি, তাহলে ভালো হবে। এই ভেবে রাজ্য প্রাপ্তি করার ইচ্ছাতে সে সারনামের জপ শুরু করল। এই প্রকার অন্য আত্মারা (যারা পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছে, তারা) ভাবলো, যে সকল আত্মা ওই ব্রহ্মের সঙ্গে গিয়েছে, তারা তো সেখানে খুবই আনন্দ উপভোগ করবে, আমরা পিছে রয়ে গেলাম। পরব্রহ্মের মনে এই ধারণা হল যে, ক্ষর পুরুষ আলাদা হয়ে অনেক সুখী আছে। এই বিচার করে অন্তরাত্মা থেকে অন্য স্থান প্রাপ্তির দৃঢ় নিশ্চয় করে নিলো। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) হঠযোগ করেনি কিন্তু কেবল আলাদা রাজ্য প্রাপ্তি করার জন্য সহজ ধ্যান যোগ বিশেষ স্থির হৃদয় থেকে করছিল। পৃথক স্থান প্রাপ্ত করার জন্য পাগলের মতো বিচরণ করতে লাগল, খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। অন্য কিছু আত্মা যারা পূর্বেই কালের সাথে যাওয়া আত্মাদের প্রেমে ব্যাকুল ছিল, তারা অক্ষর পুরুষের বৈরাগ্য ভাবের উপর আসক্ত হয়ে, তাকেই মনে চাইতে লাগল। পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করার পর, পরব্রহ্ম আলাদা স্থান ও কিছু আত্মাদের চাইলেন। তখন কবির্দেব বলেছিলেন যে, যে সকল আত্মা স্বেচ্ছায় তোমার সাথে যেতে চায়, তাদেরকে পাঠিয়ে দেব।

পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন কোন হংস আত্মারা পরব্রহ্মের সঙ্গে যেতে চাও, সম্মতি ব্যক্ত করো? অনেকক্ষণ পরে এক হংস আত্মা স্বীকৃতি দিল। তার দেখাদেখি পরে ওই সকল আত্মারাও সহমত ব্যক্ত করে দিল। সর্ব প্রথম সম্মতি দেওয়া হংস আত্মাকে স্ত্রী রূপ বানালেন, তার নাম ঈশ্বরী মায়া (প্রকৃতি সুরতি) রাখলেন এবং অন্য আত্মাদের ওই ঈশ্বরীয় মায়ার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, অচিন্তের দ্বারা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্মের) কাছে পাঠিয়ে

দিলেন। (এই সকল আত্মারা পতিব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সাজা পেল)। কয়েক যুগ পর্যন্ত দুইজন সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডতে রইল কিন্তু পরব্রহ্ম ওই মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। ঈশ্বরী মায়ার নিজের ইচ্ছাতে অঙ্গীকার করেছিল এবং নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রী (যোনি) বানিয়েছিল। ঈশ্বরী দেবীর সহমতিতেই সন্তান উৎপন্ন করল। এইজন্য পরব্রহ্মের লোকে (সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডে) প্রাণীদেরকে তপ্ত শিলার কষ্ট সহ্য করতে হয় না। ওই স্থানের পশু পাখিরা, এই ব্রহ্মলোকের দেবতাদের থেকেও ভালো চরিত্রযুক্তের। আয়ুও অনেক বেশী কিন্তু জন্ম-মৃত্যু কর্মের আধারেই তাদের কর্মদণ্ড হয় এবং পরিশ্রম করেই পেট পূর্তি করতে হয়। স্বর্গ ও নরক একইপ্রকারে বানানো রয়েছে। পরব্রহ্মকে (অক্ষর পুরুষকে) এই সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছা রূপী ভক্তি ধ্যান অর্থাৎ সহজ সমাধি বিধি দ্বারা তার কামাইয়ের প্রতিফলেই প্রদান করা হয়েছে এবং সতলোক থেকে পৃথক স্থানে গোলাকার পরিধিতে আবদ্ধ করে, সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড সহিত অক্ষর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরী মায়াকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

পূর্ণ ব্রহ্মের (সতপুরুষ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যা সতলোকে অবস্থিত এবং ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড এই সকল ব্রহ্মান্ডের প্রভু অর্থাৎ মালিক হলেন পরমেশ্বর কবির্দেব, তিনি সমস্ত কুলের মালিক।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের কেবল চার ভুজা (হাত) এবং তারা ১৬ কলাযুক্ত। প্রকৃতি দেবীর (দুর্গার) আট ভুজা (হাত) ও ৬৪ কলাযুক্ত। ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) এক হাজার ভুজা (হাত) ও এক হাজার কলাযুক্ত এবং একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু (মালিক)। পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) দশ হাজার ভুজা ও দশ হাজার কলাযুক্ত এবং সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তবে পূর্ণব্রহ্মের (পরম অক্ষর পুরুষ/ সতপুরুষ) অসংখ্য ভুজা এবং অসংখ্য কলার প্রভু এবং তিনি হলেন কালের (ক্ষর ব্রহ্ম) ২১ ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড সহ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রভু। প্রত্যেক প্রভু নিজের সকল হাত গুটিয়ে, কেবল দুই হাতও রাখতে পারেন এবং যখন চাইবেন তখন সর্ব হাত প্রকটও করতে পারেন।

এই পূর্ণ পরমাত্মা, পরব্রহ্মের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেও আলাদা অন্য স্থান বানিয়ে, অন্য রূপে গুপ্ত থাকেন। এমন ভেবে নাও যেমন, এক ঘুরতে থাকা ক্যামেরা ঘরের বাইরে লাগিয়ে দেওয়া হয় আর ঘরের ভিতরে টি.ভি (টেলিভিশন) রাখা হলে, বাইরের সকল দৃশ্য টেলিভিশনে দেখা যাবে এবং অন্যভাবে টেলিভিশন বাইরে রাখা হলে এবং ভিতরে ক্যামেরা স্থির করা হলে, তাতে কেবল ভিতরে বসে থাকা প্রবন্ধক ব্যক্তির চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে, যার কারণে সমস্ত কর্মচারী সতর্ক থাকে।

এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মা নিজের সতলোকে বসে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সতগুরু কবির্দেব বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন সূর্য দূরে থাকা সত্ত্বেও তার প্রভাব অন্যান্য লোকেও বানিয়ে রাখে।

"পবিত্র অথর্ববেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪, অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ১ :-

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥১॥

ব্রহ্ম - জ - জ্ঞানম্ - প্রথমম্ - পুরস্তাত্ - বিসিমতঃ- সুরুচঃ - বেনঃ- আবঃ - সঃ
- বুধ্ন্যাঃ - উপমা - অস্য - বিষ্ঠাঃ- সতঃ - চ - যোনিম্ - অসতঃ - চ - বি- বঃ।

অনুবাদ :- (প্রথমম্) প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন (ব্রহ্ম) পরমাত্মা (জ) প্রকট হয়ে (জ্ঞানম্) নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা (পুরস্তাত্) শীর্ষে অর্থাৎ উপর সতলোক ইত্যাদি কে (সুরুচঃ) স্বেচ্ছাতে বড় রুচি দ্বারা স্বপ্রকাশিত (বিসিমস্তঃ) সীমা রহিত অর্থাৎ বিশাল সীমাতে অন্যান্য লোককে বা ধামগুলোকে বানিয়েছেন। ওই (বেনঃ) তাঁতী বা জুলাহ তিনি তানের মতো অর্থাৎ কাপড়ের মতো বুনে (আবঃ) সুরক্ষিত করে রেখেছেন (চ) এবং (সঃ) সেই পূর্ণ ব্রহ্মই সর্ব রচনা করেন (অস্য) এই জন্য ওই (বুধন্য) মূল মালিক তিনি (যোনিম্) মূলস্থান সত্যলোকের রচনা করেছেন (অস্থা) তাঁর (উপমা) সাদৃশ্য অর্থাৎ তার মতো কিছুটা (সতঃ) অক্ষর পুরুষের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোক কিছুটা স্থায়ী (চ) আর (অসতঃ) ক্ষর পুরুষের অস্থায়ী লোক গুলোর (বিঃ বঃ) নিবাস স্থান আলাদা (বিষ্ঠাঃ) স্থাপিত করেছেন।

ভাবার্থ :- পবিত্র বেদ বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছে যে, সনাতন পরমেশ্বর স্বয়ং অনাময় (অনামী) লোক থেকে সত্যলোকে প্রকট হয়ে, নিজেরজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বুঝে-সুঝে কাপড়ের মতো রচনা করে, উপরের সতলোক ইত্যাদিকে সীমা রহিত স্বপ্রকাশিত অজর-অমর অর্থাৎ অবিনাশী করে রেখেছেন এবং নীচে পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের ২১ (একুশ) ব্রহ্মাণ্ড ও তার মধ্যের ছোট ছোট রচনাগুলোও ওই পরমাত্মা অস্থায়ী রূপে করে রেখেছেন।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ২ :-

ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্রেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।

তস্মা এতাং সুরুচ্যং হারমহ্যং ধর্ম শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে॥২॥

ইয়ম্ - পিত্র্যা -রাষ্ট্রী- এতু অগ্রে- প্রথমায়-জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ - তস্মা - এতম্ - সুরুচম্ -হবারমহ্যম্-ধর্মম্-শ্রীণান্তু-প্রথমায়-ধাস্যবে।

অনুবাদ :- (ইয়ম্) এই (পিত্র্যা) জগৎপিতা পরমেশ্বর (এতু) এই (অগ্রে) সর্বোত্তম (প্রথমায়) সর্ব প্রথম মায়া পরানন্দনী (রাষ্ট্রি) রাজেশ্বরী শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি যাকে আকর্ষণ শক্তিও বলা হয়, তাকে (জনুষে) উৎপন্ন করে (ভুবনেষ্ঠঃ) ধাম স্থাপনা করলেন (তস্মা) ওই পরমেশ্বর (সরুচম্) বড় রুচি সহকারে স্বেচ্ছাতে (এতম্) এই (প্রথমায়) প্রথম উৎপত্তি করা শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তির দ্বারা (হবারমহ্যম্) একে অন্যের বিচ্ছেদকে আটকানোর অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তির (শ্রীণান্তু) মহাকর্ষীয় আকর্ষণকে পরমাত্মা আদেশ দিলেন যে, সর্বদা স্থির থেকো, সেই কখনো সমাপ্ত না হওয়া (ধর্মম্) স্বভাবকে (ধাস্যবে) ধারণ করে তানের মতো অর্থাৎ কাপড়ের মতো বুনে স্থির করে রেখে দিয়েছেন।

ভাবার্থ :- জগৎপিতা পরমেশ্বর নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে রাষ্ট্রী অর্থাৎ সর্ব প্রথম যে মায়া রাজেশ্বরীকে উৎপন্ন করেছেন এবং সেই পরাশক্তির দ্বারা একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে, যা কখনো সমাপ্ত না হওয়া গুণে যুক্ত, উপরোক্ত সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপিত করে।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৩ :-

প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নিচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ॥৩॥

প্র - যঃ - জজ্ঞে- বিদ্যানস্য - বন্ধুঃ - বিশ্বা - দেবানাম্ - জনিমা - বিবক্তি,

ব্রহ্মঃ - ব্রহ্মণঃ- উজ্জভার -মধ্যাত্ - নিচৈঃ- উচ্চৈঃ - স্বধা - অভিঃ - প্রতস্থৌ

অনুবাদ :- (প্র) সর্ব প্রথম (দেবানাম্) দেবতাগণ ও ব্রহ্মাণ্ডের (যজ্ঞ) উৎপত্তির জ্ঞানকে (বিজ্ঞানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্তের (যঃ) যে (বন্ধুঃ) বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মাই প্রিয় সেবককে (জনিমা) নিজের দ্বারা সৃষ্টিকে (বিবক্তি) স্বয়ংই সঠিকভাবে বিস্তার পূর্বক বলেন, (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাত্) নিজের মধ্যে থেকে অর্থাৎ শব্দ শক্তি দ্বারা (ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম-ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ কাল জ্যোতি নিরঞ্জনকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সমস্ত সংসারকে অর্থাৎ সর্ব ধামকে (উচ্চৈঃ) উপরের সত্যলোক ইত্যাদির (নিচৈঃ) নীচে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের সর্ব ব্রহ্মাণ্ড (স্বধা) নিজের ধারণ করা (অভিঃ) আকর্ষণ শক্তি দ্বারা (প্রতস্থৌ) উভয়কেই ভালোভাবে স্থির করেছেন।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান ও সর্ব আত্মাদের উৎপত্তির জ্ঞান, নিজের প্রিয় দাসকে স্বয়ংই সঠিকভাবে বলেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্যে থেকে অর্থাৎ নিজের শরীর থেকে নিজের শব্দশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের/কালের) উৎপত্তি করেছেন এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক ও অন্য সকল অর্থাৎ নীচে পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ড সহ সকলকে নিজের ধারণ করা আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে স্থির করে রেখেছেন। যেমন পূর্ণ পরমাত্মা কবীর (কবির্দেব) আপন নিজের সেবক অর্থাৎ সাথী শ্রী ধর্মদাসকে, আদরণীয় গরিবদাস ও আরও অন্যদেরকে নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেছেন। উপরোক্ত বেদ মন্ত্রও এই কথার সমর্থন করছে।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং ৪

সঃ হি দিবঃ সঃ পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমং রোদসী অস্কভায়ত্।

মহান মহী অস্কভায়দ বি জাতো দ্যাং সদ্ম পার্থবং চ রজঃ ॥৪॥

সঃ - হি - দিবঃ - সঃ - পৃথিব্যা - ঋতস্থা - মহী - ক্ষেমম্ - রোদসী - অকসভায়ত্

- মহান্ - মহী - অস্কভায়দ্ - বিজাতঃ - ধাম্ - সদম্ - পার্থিবম্ - চ - রজঃ

অনুবাদ :- (সঃ) ওই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা (হি) নিঃসন্দেহে (দিবঃ) উপরের চার দিব্য লোক অর্থাৎ লোক যেমন সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামী অর্থাৎ অকহ লোক অর্থাৎ দিব্য গুণ যুক্ত লোকগুলোকে (ঋতস্থা) সত্য স্থির অর্থাৎ অজর-অমর রূপে স্থির করেছেন (স) তারই মতো (পৃথিব্যা) নীচে পৃথিবীর সমস্ত লোক যেমন পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের/কালের একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব দ্বারা (ক্ষেমম) সুরক্ষার সাথে (অস্কভায়ত্) স্থির করে দিয়েছেন (রোদসি) আকাশ তত্ত্ব ও পৃথিবী তত্ত্ব এই উভয়ের দ্বারা উপর নীচের ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে {যেমন- আকাশ এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, আকাশের গুণ হল শব্দ, পূর্ণ পরমাত্মা উপরের লোক (ধামগুলো) শব্দ রূপে রচনা

করেন , যা তেজ পুঞ্জের বানিয়েছেন এবং নীচের পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) যে সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মের/ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে, পৃথিবী তত্ত্ব দ্বারা অস্থায়ী ভাবে রচনা করেছেন।} (মহান্) পূর্ণ পরমাত্মা (পার্থিবম্) পৃথিবী সহিত (বি) ভিন্ন-ভিন্ন (ধাম্) লোক (চ) আর (সদম্) আবাস স্থান (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব দ্বারা (রজঃ) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ছোট-ছোট ধামের বা লোকের (জাতঃ) রচনা করে (অস্কভায়ত্) স্থির করেছেন।

ভাবার্থ :- উপরের চার লোক যেমন সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক, এই সমস্ত লোক (ধাম) তো অজর অমর স্থায়ী অর্থাৎ অবিনশ্বর রচনা করেছেন এবং নীচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের লোকগুলোকে অস্থায়ী রচনা করে ও অন্য ছোট - ছোট লোকও ওই পরমেশ্বর রচনা করে স্থির করে দিয়েছেন।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৫

সঃ বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোঅভ্যগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা তস্য সম্রাট্।
অহর্যচ্ছুক্রং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥৫॥

সঃ-বুধ্ন্যাত্-আষ্ট্র-জনুষেঃ-অভি-অগ্রম্-বৃহস্পতিঃ-দেবতা-তস্য-সম্রাট-অহঃ-যত্-শুক্রম্-জ্যোতিষঃ-জনিষ্ট-অথ-দ্যুমন্তঃ-বি-বসন্তু - বিপ্রাঃ।

অনুবাদ :- (সঃ) ওই (বুধ্ন্যাত্) মূল মালিক দ্বারা (অভি-অগ্রম্) সর্ব প্রথম স্থানে (আষ্ট্র) অষ্টাঙ্গী মায়া-দুর্গা অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী (জনুষে) উৎপন্ন হয়েছে। কেননা নীচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোকের প্রথম স্থান হল সতলোক, এটিকে তৃতীয় ধামও বলা হয় (তস্য) এই দুর্গারও মালিক হলেন, ওই (সম্রাট) রাজাধিরাজ (বৃহস্পতিঃ) সব থেকে বড় স্বামী ও জগৎগুরু হলেন (দেবতা) পরমেশ্বর। (যত্) যাঁর থেকে (অহঃ) সকলের বিচ্ছেদ হয়েছে (অথ) এর পরে (জ্যোতিষঃ) জ্যোতি রূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ কালের (শুক্রম্) বীর্য অর্থাৎ বীজ শক্তি দ্বারা (অনিষ্ট) দুর্গার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়ে (বি) ভক্ত আত্মারা (বিপ্রঃ) আলাদা ভাবে (ধমন্তঃ) মনুষ্য লোক ও স্বর্গলোকে জ্যোতি নিরঞ্জনের আদেশে দুর্গা বললেন (বসন্ত) নিবাস করো অর্থাৎ তারা নিবাস করতে লাগল।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা উপরের চার লোকের নীচের দিক থেকে সর্বপ্রথম অর্থাৎ সত্যলোকে আষ্ট্রা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গীকে (প্রকৃতিদেবী/দুর্গাকে) উৎপত্তি করেছেন। এই রাজাধিরাজ, জগৎগুরু পূর্ণ পরমেশ্বর (সতপুরুষ) যাঁর থেকে সকলের বিচ্ছেদ হয়েছে। পরে সমস্ত প্রাণী জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) বীজ (বীর্য) থেকে দুর্গার (আষ্ট্রা) গর্ভ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে পৃথিবী লোক ও স্বর্গ লোকে নিবাস করতে লাগলেন।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৬

নূনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্বস্য ধাম।
এষ জজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিথ্যা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু ॥৬॥

নূনম্ - তত্ - অস্য - কাব্যঃ - মহঃ - দেবস্য - পূর্ব্যস্য - ধাম - হিনোতি - পূর্বে- বিষিতে - এষ – জজ্ঞে - বহুভিঃ - সাকম্ - ইত্থা - অর্ধে - সসন্ - নু।

অনুবাদ :- (নুনম্) নিঃসন্দেহে (তত্) ওই পূর্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ তত্ ব্রহ্মই (অস্য) এই (কাব্যঃ) ভক্ত আত্মা যারা পূর্ণ পরমেশ্বরের ভক্তি বিধিবৎ করে, তাদেরকে পুনরায় (মহঃ) সর্বশক্তিমান (দেবশ্য) পরমেশ্বরের (পূর্বাস্য) পূর্বের (ধাম) লোকে অর্থাৎ সত্যলোকে (হিনোতি) পাঠিয়ে দেন।

(পূর্বে) পূর্বের (বিষিতে) বিশেষভাবে প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখা (এষ) এই পরমেশ্বরকে ও (জজ্ঞে) সৃষ্টি উৎপত্তির জ্ঞানকে জেনে (বহুভিঃ) খুবই আনন্দের (সাম্) সাথে (অর্ধে) অর্ধ (সসন্) নিদ্রা অবস্থায় (ইত্থা) বিধিবত্ এই প্রকার (নু) সত্য হৃদয় দ্বারা স্তুতি করে।

ভাবার্থ :- ওই পূর্ণ পরমেশ্বর সত্য সাধনা করা সাধককে, পূর্বের ওই স্থানে (সত্যলোকে) নিয়ে যান, যে স্থান থেকে সকলে বিচ্ছেদ হয়ে এসেছিল। সে স্থানে ওই বাস্তবিক সুখদায়ী প্রভুকে প্রাপ্ত করে খুশিতে আত্মবিভোর হয়ে, আনন্দের সাথে স্তুতি করেন যে, হে পরমাত্মা! অসংখ্য জন্মের ভুলে যাওয়া পথের আসল ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। এরই প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬-তেও রয়েছে।

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়) নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

আদরণীয় গরীব দাসকে এইভাবে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং সত্যভক্তি প্রদান করিয়ে সত্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আদরণীয় গরীব দাস মহারাজ নিজের চোখে দেখে তাঁর নিজের অমৃত বাণীতে বলেছিলেন যে :-

গরীব, অজব নগর মেঁ লে গয়ে, হমকুঁ সতগুরু আন।
ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সুতে চাদর তান॥

অথর্ববেদ কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৭

য়োঅথর্বাণং পিত্তরং দেবন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাত্।
ত্বং বিশ্বেতাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ত্ স্বধাবান্॥৭॥

যঃ-অথর্বাণম্ - পিত্তরম্ - দেববন্ধুম্ - বৃহস্পতিম্ - নমসা - অব-চ-গচ্ছাত্ ত্বম্- বিশ্বেষাম্- - জনিতা - যথা - সঃ - কবির্দেবঃ - ন - দভায়ত্ - স্বধাবান্

অনুবাদ :- (যঃ) যে (অথর্বাণম্) অচল অর্থাৎ অমর বা অবিনাশী (পিত্তরম্) জগৎপিতা (দেব বন্ধুম্) ভক্তদের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ সর্ব আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগৎগুরু (চ) এবং (নমসা) বিনম্র ভক্তকে অর্থাৎ বিধিবত্ সাধককে সুরক্ষার সহিত (গচ্ছাত্) সতলোক গমনকারীদেরকে অর্থাৎ যাদের পূর্ণ মোক্ষ হয়ে গেছে কিংবা যারা সতলোকে চলে গেছে। তাদেরকে সতলোকে নিয়ে যাওয়া (বিশ্বেষাম) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (জনিতা) রচয়িতা জগদম্বা অর্থাৎ মায়ের গুণেও যুক্ত (ন দভায়ত্) ব্রহ্মের মতো না ঠকানো (স্বধাবান) স্বভাব অর্থাৎ গুণযুক্ত (যথা) তেমনই অর্থাৎ সেইরূপ (সঃ) স্বয়ং (ত্বম) তুমি (কবির্দেবঃ/কবির্ দেবঃ) কবির্দেব অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যে তাঁকে কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ওই পরমেশ্বরের নাম কবির্দেব অর্থাৎ তিনি হলেন কবীর পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত সৃষ্টির রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর চিরস্থায়ী অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী বা অমর (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তেও প্রমাণ রয়েছে) জগৎগুরু, আত্মাদের সহায়ক, যারা পূর্ণ মুক্ত হয়ে সত্যলোকে গিয়েছেন, তাদেরকে সতলোকে নিয়ে যান, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি রচনহার, কালের (ব্রহ্মের) মতো না ঠকানো, যেমন ঠিক তেমন, তিনি স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। এই পরমেশ্বরই সর্ব ব্রহ্মাণ্ড ও সকল প্রাণীদেরকে নিজের শব্দ শক্তি দিয়ে উৎপন্ন করার কারণে (জনিতা) তাকে মাতাও বলা হয় এবং (পিত্তরম্) পিতা ও (বন্ধু) সখা, ভাইও বাস্তবে তিনিই এবং (দেব) পরমেশ্বরও তিনিই। এই জন্য এই কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) স্তুতি করা হয়। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব। এই পরমেশ্বরের মহিমার প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ১ সুক্ত নং ২৪ -তে বিস্তারিত ভাবে বিবরণ রয়েছে।

"পবিত্র ঋগ্বেদে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্। স ভূমিং বিশ্বতোং বৃত্তাত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

সহস্রশির্ষা - পুরুষঃ - সহস্রাক্ষঃ - সহস্রপাত্

স- ভূমিম্ - বিশ্বতঃ - বৃত্বা - অত্যাতিষ্ঠত্ - দশংগুলম্।

অনুবাদ :- (পুরুষ) বিরাট রূপ কাল ভগবান অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সহস্রশির্ষা) হাজার মাথাযুক্ত (সহস্রাক্ষঃ) হাজার চোখযুক্ত (সহস্রপাত) হাজার পা-যুক্ত (স) ওই কাল (ভূমিম্) পৃথিবী সহিত একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে (বিশ্বতঃ) সর্বদিক থেকে (দশংগুলম্) দশ আঙ্গুল দ্বারা অর্থাৎ পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রণ করে (বৃত্বা) গোলাকার পরিধিতে ঘিরে (অত্যাতিষ্ঠত্) এর থেকে বড় স্থানে অর্থাৎ নিজের কাল লোকের সব থেকে আলাদা স্থান জুড়ে একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন অর্থাৎ থাকেন।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে বিরাট (কাল/ব্রহ্ম) পুরুষের বর্ণনা আছে। গীতা অধ্যায় ১০-১১ তেও এই কাল ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণন আছে। গীতা অধ্যায় ১১ মন্ত্র নং ৪৬ তে অর্জুন বলেছিলেন, হে সহস্রবাহু! অর্থাৎ হাজার ভুজা (হাত) যুক্ত, আপনি আপনার চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দেন।

যার হাজার হাত, হাজার পা, হাজার চোখ, হাজার কান ইত্যাদি রয়েছে, সেই বিরাট রূপ কাল প্রভু নিজের অধীনে সকল প্রাণীদেরকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রেখে অর্থাৎ ২০ ব্রহ্মাণ্ডকে গোলাকার পরিধিতে স্থির করে, স্বয়ং এর থেকে উপরে অন্য আলাদা একুশ নম্বর ব্রহ্মাণ্ডে বসে রয়েছেন।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ২

পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥

পুরুষ - এব - ইদম্ - সর্বম্ - যত্ - ভূতম্ - যত্ - চ - ভাব্যম্

উত - অমৃতত্বস্য - ঈশানঃ - যত্ - অন্নেন - অতিরোহতি।

অনুবাদ :- (এব) এই প্রকার কিছুটা ঠিক ঠাক (পুরুষ) ভগবান আছেন, তিনি অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম (চ) আর (ইদম্) এই (যত) যারা (ভুতম্) উৎপন্ন হয়েছে (যত্) যারা (ভাব্যম্) ভবিষ্যতে হবে (সর্বম্) সকলেই (যত্) প্রয়ন্ত করে অর্থাৎ পরিশ্রম করে (অন্নেন) অন্ন থেকে (অতিরোহতি) বিকশিত হয়। এই অক্ষর পুরুষও (উত) সন্দেহযুক্ত (অমৃতত্বস্য) মোক্ষের (ইশানঃ) স্বামী অর্থাৎ ভগবান অক্ষর পুরুষও কিছুটা সঠিক কিন্তু পূর্ণ মোক্ষদায়ক নয়।

ভাবার্থ :- এই মন্ত্রে পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) বিবরণ আছে। যিনি কিছুটা ভগবানের মতো লক্ষণযুক্ত কিন্তু এই ভগবানের ভক্তিতেও পূর্ণ মোক্ষ হয় না, এই জন্য এই প্রভুকে সন্দেহযুক্ত মুক্তিদাতা বলা হয়েছে। এনার মধ্যে কিছুটা প্রভুর গুণযুক্ত আছে, এইজন্য বলা হয়েছে যে, ইনি কালের মতো তপ্ত শিলার উপর প্রাণীদের ফেলে ভেজে (ফ্রাই করে) খান না কিন্তু এই পরব্রহ্মের লোকেও প্রাণীদের পরিশ্রম করে কর্ম আধারের উপরই ফল প্রাপ্ত হয় এবং অন্ন হতেই সর্ব প্রাণীর শরীর বিকশিত হয়। জন্ম ও মৃত্যুর সময় যদিও বা কালের (ক্ষর পুরুষ) থেকে অধিক হয়, তবুও উৎপত্তি, প্রলয় ও চুরাশি লাখ যোনির যন্ত্রণা অবশ্যই বজায় থাকে।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৩ :-

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ। পাদোঅস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩।

তাবান্ - অস্য - মহিমা - অতঃ - জ্যায়ান্- চ – পুরুষঃ

পাদঃ - অস্য - বিশ্বা - ভূতানি - ত্রি - পাদ্ - অস্য - অমৃতম্ - দিবি

অনুবাদ :- (অস্য) এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের তো (এতাবান্) এতটাই (মহিমা) প্রভুত্ব (চ) এবং (পুরুষঃ) ওই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর তো (অতঃ) এনার থেকেও (জ্যায়ান) বড়, (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ এবং এনাদের লোকে ও সত্যলোকে এবং এই লোকে যত প্রাণী আছে (অস্য) এই পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর পুরুষের (পাদঃ) এক পায়ের অংশ মাত্র। (অস্য) এই পরমেশ্বরের (ত্রি) তিন (দিবি) দিব্য লোক আছে, যেমন- সত্যলোক-অলখ লোক-অগম লোক (অমৃতম্) অবিনাশী (পাদ্) দ্বিতীয় পা আছে অর্থাৎ যা কিছু সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন আছে, তা সতপুরুষ পূর্ণ পরমাত্মারই অংশ বা অঙ্গ।

ভাবার্থ :- এই উপরের মন্ত্র ২-তে বর্ণিত অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম) তো এতটাই মহিমা আছে আর পূর্ণ পুরুষ কবীরদেব তো এনার থেকেও অনেক বড় অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অংশ মাত্রের উপর স্থিত। এই মন্ত্রে তিন লোকের বা ধামের বর্ণনা এইজন্য রয়েছে, কেননা চতুর্থ অনামী (অনাময়) লোক, অন্যান্য লোকের (ধামের) রচনার পূর্বেই ছিল। এই তিন প্রভুর (ক্ষর পুরুষ - অক্ষর পুরুষ ও এই উভয় প্রভুর থেকে অন্য পরম অক্ষর পুরুষের) বিবরণ শ্রীমদভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তেও আছে। {এর প্রমাণ আদরণীয় গরীবদাস সাহেব বলেছেন যে :-

গরীব, জাকে অর্ধ রূম পর সকল পসারা, এঈসা পূর্ণ ব্রহ্ম হমারা॥

গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার।

সত্গুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুল কে সৃজনহার॥

এরই প্রমাণ আদরণীয় দাদূ সাহেব বলছেন যে :-

জিন মোকুঁ নিজ নাম দিয়া, সোঈ সতগুরু হমার।

দাদূ দূসরা কোএ নহীঁ, কবীর সৃজনহার॥

এরই প্রমাণ আদরণীয় নানক সাহেবও দিয়েছেন যে :-

য়ক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কূন করতার।

হক্কা কবীর করীম তু, বেএব পরবরদিগার॥

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা নং ৭২১, মহলা ১, রাগ তিলংগ)

'কুন করতার' এর অর্থ হল সমস্ত কিছুর রচনহার বা সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ শব্দ শক্তি দ্বারা রচনাকারী শব্দ স্বরূপী প্রভু আর 'হক্কা কবীর' - এর অর্থ হল সত্ কবীর আর 'করীম'-এর অর্থ হল দয়ালু এবং 'পরবরদিগার'- এর অর্থ হল পরমাত্মা।}

ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৪

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈত্পুরুষ পাদোঅস্যেহাভবৎপুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥৪॥

ত্রি - পাদ - উর্দ্ধঃ - উদৈত্ - পুরুষঃ - পাদঃ – অস্য - ইহ - অভবত্ – পুনঃ

ততঃ- বিশ্বঙ্ -ব্যক্রামত্ - সঃ - অশনানশনে - অভি

অনুবাদ :- (পুরুষ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা (উর্ধ্বঃ) উপরের (ত্রি) তিন লোক যেমন সত্যলোক - অলখলোক - অগমলোক রূপ (পাদ) পা অর্থাৎ উপরের অংশে (উদৈত্) প্রকট অর্থাৎ বিরাজমান হন, (অস্য) এই পরমেশ্বর পূর্ণ ব্রহ্মের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ জগৎরূপ (পুনর্) আবার (ইহ) যেখানে (অভবত্) প্রকট হন (ততঃ) এইজন্য (সঃ) ওই অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা (অশনানশনে) ভক্ষন করা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও ভক্ষণ না করা পরব্রহ্ম অর্থাৎ এই অক্ষর পুরুষেরও (অভি) উপর (বিশ্বঙ্) সর্বত্র (ব্যক্রামত্) ব্যাপ্ত আছেন অর্থাৎ তাঁর প্রভুত্ব সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে ও সর্ব প্রভুদের উপরে, তিনি হলেন সর্ব কুলের মালিক। যিনি নিজের শক্তি সকলের উপর বিস্তারিত করে রেখেছেন।

ভাবার্থ :- এই সর্ব সৃষ্টির রচনহার প্রভু, নিজের রচনার উপরের অংশে তিন স্থানে (সতলোক, অলখলোক, অগম লোকে) স্বয়ং তিন রূপে প্রকট হন অর্থাৎ স্বয়ং বিরাজমান আছেন। এখানে অনামী লোকের বর্ণনা এইজন্য করা হয়নি, কেননা অনামী লোকে কোনো রচনা নেই এবং অকহ (অনাময়) লোক অন্যান্য লোকের রচনার পূর্ব থেকেই ছিল। আবার বলেছেন যে, ওই পরমাত্মার সতলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে, নীচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের লোক উৎপত্তি হয়েছে এবং ওই পূর্ণ পরমাত্মা তিনি ভক্ষণ করা ব্রহ্ম অর্থাৎ কাল (অভিশাপের কারণে এই কাল ব্রহ্ম এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীকে ভক্ষণ করে) আর ভক্ষণ না করা পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ থেকেও (পরব্রহ্ম প্রাণীদের ভক্ষণ করেন না কিন্তু জন্ম - মৃত্যুর কর্মদণ্ড এখানে যেমন ঠিক তেমনই ভোগ করতে হয়) উপরে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন অর্থাৎ এই পূর্ণ পরমাত্মার প্রভুত্ব সবার উপরেই রয়েছে। কবীর পরমেশ্বরই সমস্ত কুলের মালিক আছেন। যিনি নিজের শক্তি সকলের উপরে বিস্তার করে রেখেছেন। যেমন সূর্য নিজের প্রকাশকে সকলের উপরে বিস্তারিত করে প্রভাবিত করে, এইভাবে পূর্ণ পরমাত্মা নিজের শক্তি রূপী রেঞ্জকে (ক্ষমতাকে) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ছেড়ে রেখেছেন। যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার এক স্থানে থাকা সত্ত্বেও, নিজের শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জ (ক্ষমতা) চারিদিকে ছড়িয়ে রাখে। তেমনভাবে পূর্ণ প্রভু তাঁর নিজের নিরাকার শক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। যার কারণে পূর্ণ পরমাত্মা এক স্থানে বসে সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত রাখেন।

এরই প্রমাণ আদরণীয় গরীব দাস মহারাজ নিজের বাণীতে দিয়েছেন। (অমৃত বাণী রাগ কল্যাণ)

তীন চরণ চিন্তামণী সাহেব, শেষ বদন পর ছায়ে।
মাতা, পিতা, কুল ন বন্ধু, না কিহ্নে জননী জায়ে॥

ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৫

তস্মাদ্বিরাঅজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥

তস্মাত্ - বিরাট্ - অজায়ত - বিরাজঃ- অধি - পুরুষঃ

স- জাতঃ - অত্যরিচ্যত - পশ্চাত্ - ভূমিম্ - অথঃ- পুরঃ।

অনুবাদ :- (তস্মাত্) তারপরে ওই পরমেশ্বর সতপুরুষের শব্দ শক্তিতে (বিরাট) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম যাকে ক্ষর পুরুষ বা কাল বলা হয়, তিনি (অজায়েৎ) উৎপত্তি হয়েছে। (পশ্চাৎ) এরপরে (বিরাজঃ) বিরাট পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের থেকেও (অধি) বড় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর, (ভূমিম) কাল ব্রহ্মের পৃথিবী লোক ও পরবহ্মের লোককে (অত্যারচিত) ভাল ভাবে রচনা করেছেন (অথঃ) পরে (পুরঃ) অন্য ছোট ছোট লোককে (স) ওই পূর্ণ পরমেশ্বরই (জাতঃ) উৎপন্ন অর্থাৎ স্থাপিত করেছেন।

ভাবার্থ :- উপরোক্ত মন্ত্র ৪ -তে বর্ণিত তিন লোকের (অগমলোক, অলখলোক এবং সতলোক) রচনা করার পরে পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনকে (ব্রহ্ম) উৎপত্তি করেছেন অর্থাৎ ওই সর্বশক্তিমান পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর প্রভু) দ্বারাই বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মের (কালের) উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ মন্ত্র ১৫ -এ রয়েছে যে, পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী প্রভু থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রমাণ অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ সুক্ত ৩ - এ আছে যে, পূর্ণ ব্রহ্ম দ্বারাই ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়েছে। ওই পূর্ণ ব্রহ্মই (ভূমিম্) ভূমি ইত্যাদি ছোট বড় সমস্ত লোকের রচনা করেছেন। ওই পূর্ণ ব্রহ্ম এই বিরাট ভগবানের (কালব্রহ্মের) থেকেও বড় অর্থাৎ এনারও মালিক।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৫

সপ্তাস্যাসন্পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥

সপ্ত - অস্য - আসন্ - পরিধয়ঃ - ত্রিসপ্ত - সমিধঃ - কৃতাঃ

দেবা - যত্ - যজ্ঞম্ - তন্বানাঃ - অবধ্নন্ - পুরুষম্ - পশুম্।

অনুবাদ :- (সপ্ত) সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড তো পরব্রহ্মের এবং (ত্রিসপ্ত অর্থাৎ ৭×৩=২১) একুশ ব্রহ্মাণ্ড কাল ব্রহ্মের (সমিধঃ) কর্মদণ্ড দুঃখ রূপী আগুনে দুঃখী (কৃতাঃ) করা (পরিধিয়ঃ) গোলাকার ঘেরা রূপ সীমাতে (আসন) বিদ্যমান রয়েছে (যত) যারা (পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার (যজ্ঞম) বিধিবত্ ধার্মিক কর্ম অর্থাৎ পূজা করেন (পশুম্) বলির পশু রূপী কালের জালে, কর্ম বন্ধনে বাঁধা (দেবা) ভক্ত - আত্মাদেরকে (তন্বানাঃ) কালের দ্বারা রচিত অর্থাৎ ফেলানো বা বিস্তারিত পাপ কর্ম বন্ধনের জাল থেকে (অবধ্নন্) বন্ধন মুক্ত করেন অর্থাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত করা উনিই হচ্ছেন বন্দীছোড়।

ভাবার্থ :- সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড হল পরব্রহ্মের আর একুশ ব্রহ্মাণ্ড হল কাল ব্রহ্মের, যা গোলাকার সীমাতে বন্ধ রয়েছে। পাপ কর্মের আগুনে জ্বলতে থাকা প্রাণীদের যথার্থ পূজা বিধি প্রদান করে সঠিক উপাসনা (ভক্তি) করান, যার কারণে বলি দেওয়া পশুর মতো জন্ম-মৃত্যুর কালের ভক্ষণের জন্য, তপ্ত শীলাতে (গরম পাথরে) কষ্টে পীড়িত ভক্তাত্মাদের, কালের কর্ম বন্ধনে ছড়ানো জালকে ছিঁড়ে বন্ধন মুক্ত যিনি করান অর্থাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, তিনিই হলেন বন্দি ছোড়। এরই প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২ -তে রয়েছে যে, কবিরংঘারিসি (কবির্) কবির পরমেশ্বর (অংঘ) পাপের (অরি) শত্রু (আসি) আছেন অর্থাৎ পাপ বিনাশকারী হলেন কবীর (পরমাত্মা)। বন্ডারিসি (বন্ডারি) বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দিছোড় কবীর পরমেশ্বর (অসি) আছেন।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥

যজ্ঞেন্ - অযজ্ঞম্ - অ - যজন্ত - দেবাঃ - তানি - ধর্মাণি - প্রথমানি - আসন্ - তে - হ - নাকম্ - মহিমানঃ - সচন্ত - যত্র পূর্বে - সাধ্যাঃ - সন্তি - দেবাঃ।

অনুবাদ :- যারা (দেবাঃ) নির্বিকার দেব স্বরূপ ভক্তআত্মারা (অযজ্ঞম্) অসম্পূর্ণ ভুল ধার্মিক পূজার স্থানে, (যজ্ঞেন) সত্য ভক্তি ধার্মিক কর্মের আধারে (অযজন্ত) পূজা করে, (তানি) সে (ধর্মানি) ধার্মিক শক্তি সম্পন্ন (প্রথমানি) মুখ্য অর্থাৎ উত্তম (আসন্) আছে। (তে হ) তিনিই বাস্তবে (মহিমানঃ) মহান ভক্তি শক্তি যুক্ত হয়ে (সাধ্যাঃ) সফল ভক্তজন, (নাকম) পূর্ণ সুখদায়ক পরমেশ্বরকে (সচন্ত) ভক্তি নিমিত কারণ অর্থাৎ সতভক্তির উপার্জন দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তিনি সেখানে চলে যান। (যত্র) যেখানে (পূর্বে) প্রথম উৎপন্ন হওয়া সৃষ্টির (দেবাঃ) পাপমুক্ত দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (সন্তি) থাকেন।

ভাবার্থ :- যে নির্বিকার (যারা মাছ, মাংস, মদ, তামাক ইত্যাদি সেবন ত্যাগ করে দিয়েছে এবং সকল খারাপ কার্য রহিত আছে, সে) দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা, শাস্ত্র বিধি রহিত পূজাকে ত্যাগ করে শাস্ত্রানুকুল সাধনা করে। সে ভক্তির ধনে ধনী হয়ে কালের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের সত্য ভক্তির অর্জন করে ওই সর্ব সুখদায়ী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে অর্থাৎ সতলোক বা অমরধামে চলে যায়। যেখানে সর্ব প্রথম রচনা করা সৃষ্টির দেব স্বরূপ অর্থাৎ নিষ্পাপ হংস আত্মারা থাকেন।

যেমন, কিছু আত্মারা তো কালের (ব্রহ্মের) জালে ফেঁসে এখানে এসে গিয়েছে এবং কিছু পরব্রহ্মের সাথে সাত সংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে চলে গিয়েছে। এরপরও অন্য অসংখ্য আত্মারা রয়েছে, যাদের পূর্ণ পরমাত্মার প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল, যারা পতিব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত হয়নি তারা, সেখানেই রয়ে গিয়েছে, এইজন্য এখানে তারই বর্ণন পবিত্র বেদেও সত্য বলে দিয়েছে। এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮ থেকে ১০ -তে বর্ণিত রয়েছে, যে সাধক পূর্ণ পরমাত্মার সত্যাসাধনা শাস্ত্রবিধি অনুসার করে, সে ভক্তির কামাইয়ের শক্তিতে, ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁর কাছে চলে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিন প্রভু আছেন :- ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম। (১) ব্রহ্মকে বলা হয় ইশ, ক্ষর পুরুষ, ক্ষর ব্রহ্ম বা জ্যোতি নিরঞ্জন বলা হয়। (২) পরব্রহ্মকে বলা হয় অক্ষর পুরুষ / অক্ষর ব্রহ্ম / অক্ষর পুরুষ, ঈশ্বর। (৩) পূর্ণ ব্রহ্মকে - পরম অক্ষর ব্রহ্ম,পূর্ণ ব্রহ্ম, পরম অক্ষর পুরুষ, পরমেশ্বর, সত পুরুষ ইত্যাদি উপমাত্মক শব্দতে পরিচিত বা জানা যায়।

এই প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ পর্যন্ত স্পষ্ট ভাবে দেওয়া আছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) শিশুরূপ ধারণ করে প্রকট হন এবং নিজের নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (কবিগীর্ভিঃ) কবীর বাণীর দ্বারা নিজের ভক্তদেরকে মুখে উচ্চারণ করে বর্ণনা করে শোনান। ওই কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) ধাম, এই ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের) ও পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) ধামের থেকে আলাদা আছে, যেটি হল পূর্ণ ব্রহ্মের (পরম অক্ষর পুরুষ) তৃতীয় ঋতধাম (সতলোক)। সেখানে আকার বিরাজমান আছেন এবং সতলোক থেকে চতুর্থ অনামীলোক রয়েছে, সেখানেও এই কর্বিদেব (কবীর পরমেশ্বর/কবীর খুদা) অনামী পুরুষ রূপে মনুষ্য সদৃশ আকারে বিরাজমান রয়েছেন।

"পবিত্র শ্রীমদ্ দেবী মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা-পিতা"

(দূর্গা ও ব্রহ্মের সংযোগ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম)

"পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ১-৩ (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিমনলাল গোস্বামী, পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে উদ্ধৃত)

পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১১৮ পর্যন্ত বিবরণ আছে যে, অনেকে আচার্য ভবানীকে সম্পূর্ণ মনস্কামনা পূরণকারী বলে থাকেন। তাঁকে প্রকৃতি বলা হয় এবং ব্রহ্মের সাথে তাঁর অভেদ সম্বন্ধ আছে। {যেমন স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনীও বলা হয় অর্থাৎ দূর্গা ব্রহ্মের (কালের) স্ত্রী।} এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাজা শ্রী পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করার পর, শ্রীব্যাসদেব বলেছিলেন যে, আমি শ্রী নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হে দেবর্ষি! এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কিভাবে হয়েছে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নারদ বলেছিলেন যে, আমি আমার পিতা শ্রী ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হে পিতা! এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কি আপনি করেছেন? না শ্রী বিষ্ণু এর রচয়িতা, না শ্রী শিব রচনা করেছেন? সত্য-সত্য বলার কৃপা করুন। তখন আমার পূজ্য পিতা শ্রী ব্রহ্মা বললেন যে, পুত্র নারদ! আমি স্বয়ং নিজেকে পদ্ম ফুলের উপরে বসা অবস্থায় পেয়েছিলাম, আমার জ্ঞান নেই যে, এই অগাধ জলে আমি কোথা থেকে উৎপন্ন হয়ে গেলাম? এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অন্বেষণ করেছি, কোথাও জলের কূল-কিনারা পাইনি। তারপর আকাশবাণী হল যে, তপস্যা করো। এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তপস্যা করেছি। এরপরে সৃষ্টি করার জন্য আকাশবাণী হল। এরমধ্যে মধু ও কৈটভ নামের দুই রাক্ষস এল, তাদের ভয়ে আমি পদ্ম ফুলের ডগা ধরে নীচে নামলাম। সেখানে শ্রী বিষ্ণু শেষ নাগের শয্যাতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁর মধ্য হতে এক স্ত্রী (প্রেতের মতো প্রবিষ্ট হওয়া দূর্গা) বাহির হল। তাঁকে আকাশে অলংকার পড়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। তারপর ভগবান বিষ্ণুর জ্ঞান ফিরে এল। সেখানে আমি আর বিষ্ণু দুইজনই ছিলাম। এরমধ্যে ভগবান শংকরও এসে উপস্থিত হলেন। দেবী আমাদের বিমানে বসিয়ে ব্রহ্মলোকে নিয়ে গেলেন। সেখানে অন্য এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও এক অন্য শিবকেও দেখলাম, আবার অন্য এক দেবীকেও দেখেছি। তাঁকে দেখে শ্রী বিষ্ণু বিবেকপূর্বক নিম্নের বর্ণনা করলেন (ব্রহ্ম কাল, ভগবান বিষ্ণুকে চেতনা প্রদান করে দিলেন, যার কারণে শ্রী বিষ্ণুর নিজের বাল্যকালের স্মৃতি মনে পড়ে গেল, তখন তিনি বাল্যকালের কাহিনী শোনাতে লাগলেন)।

পৃষ্ঠা নং ১১৯ -১২০ তে লেখা রয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবকে বললেন যে, ইনি আমাদের তিনজনের মাতা, ইনিই জগৎজননী প্রকৃতি দেবী। আমি এই দেবীকে ওই সময় দেখেছিলাম, যখন আমি ছোট্ট বালক ছিলাম, ইনি আমাকে দোলনায় ঝুলাতেন।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১২০ -তে শ্রী বিষ্ণু, শ্রী দূর্গার স্তুতি করে বললেন - তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সমস্ত সংসার তোমা হতে উদ্ভাসিত হচ্ছে, আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শংকর আমরা সবাই তোমারই কৃপাতে বিদ্যামান। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে অর্থাৎ আমরা তিন দেবতা নাশবান (মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়)। কেবল মাত্র তুমিই নিত্য (অবিনাশী), জগৎজননী প্রকৃতি দেবী।

ভগবান শংকর বললেন, দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমা হতে প্রকট (উৎপন্ন) হয়েছে, তাহলে তারপর উৎপন্ন হওয়া ব্রহ্মাও তোমারই পুত্র (বালক) হল। তারপর আমি তমোগুণী লীলা করা শংকর কি তোমার পুত্র হলাম না অর্থাৎ আমাকেও তুমিই উৎপন্ন করেছো।

বিচার করুন :- উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হল যে, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব হলেন নাশবান (মৃত্যু হয়), মৃত্যুঞ্জয় (অজর-অমর) ও সর্বেশ্বর নয় এবং এই তিন দেব হলেন দূর্গার (প্রকৃতির) পুত্র এবং ব্রহ্ম (কাল-সদাশিব) হলেন এনাদের পিতা।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং ১২৫ তে শ্রী ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে মাতা! বেদে যে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, সে কি আপনি, না অন্য কোনো প্রভু? এর উত্তরে দূর্গা বললেন, আমি আর ব্রহ্ম একই। আবার এই স্কন্দ অধ্যায় ৬ পৃষ্ঠা নং ১২৯ - তে বলা হয়েছে যে, এখন আমার কার্য সিদ্ধ করার জন্য বিমানে বসে তোমরা শীঘ্র যাও। কোনো কঠিন কার্য উপস্থিত হলে আমাকে স্মরণ করবে, তখন আমি সামনে এসে যাব। দেবতাগণ! আমার (দূর্গার) ও ব্রহ্মের ধ্যান সর্বদা তোমাদের করা উচিৎ। আমাদের দুই জনের স্মরণ করতে থাকবে, তাহলে তোমাদের কার্য সিদ্ধ হতে ক্ষণিকও সন্দেহ থাকবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দূর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্মই (কালই) তিন দেবতার মাতা-পিতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাশবান ও পূর্ণ শক্তিযুক্ত প্রভু নয়।

তিন দেবতার (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রী শিবের) বিবাহও মাতা দুর্গা (প্রকৃতি দেবী) করিয়েছেন। পৃষ্ঠা ১২৮ - ১২৯ - তে তৃতীয় স্কন্দে।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ১২

যে, চ, এব, সাত্ত্বিকাঃ, ভাবাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, চ, যে,
মতঃ, এব, ইতি, তান্, বিদ্ধি, ন, তু, অহম্, তেষু, তে, ময়ি।

অনুবাদ :- (চ) আর (এব) ও (যে) যে (সাত্ত্বিকাঃ) সত্ত্বগুণ বিষ্ণু দ্বারা স্থিতি (ভাবাঃ) ভাব আছে আর (যে) যে (রাজসাঃ) রজোগুণ ব্রহ্মা হতে উৎপত্তি (চ) এবং (তামসাঃ) তমোগুণ শিব দ্বারা সংহার হয় (তান্) ওই সব কিছুকে তুই (মতঃএব) আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়মানুসারেই হয়ে থাকে (ইতি) একপ্রকার (বিদ্ধি) জানো (তু) পরন্তু বাস্তবে (তেষু) তাদের মধ্যে (অহম্) আমি আর (তে) তারা (ময়ি) আমার মধ্যে (ন) নেই।

"পবিত্র শিব মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

(কাল ব্রহ্ম ও দুর্গা থেকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি)

এরই প্রমাণ পবিত্র শ্রী শিব পুরাণ গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, এর অধ্যায় ৬ রুদ্র সংহিতা, পৃষ্ঠা নং ১০০ -তে বলা হয়েছে, যে মূর্তি রহিত পরব্রহ্ম আছেন, তাঁর মূর্তি ভগবান সদাশিব। তাঁরই শরীর থেকে এক শক্তি বের হয়েছে, ওই শক্তি অম্বিকা, প্রকৃতি (দুর্গা), ত্রিদেব জননী (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রী শিবকে উৎপন্ন করা মাতা) বলা হয়েছে। যাঁর ৮ ভুজা (হাত) আছে। ওই যে সদাশিব আছেন, তাকে শিব, শম্ভু ও মহেশ্বরও বলা হয়। (পৃষ্ঠা নং ১০১ তে) তিনি নিজের সমস্ত শরীরে ভস্ম মাখিয়ে রাখেন। সেই কাল রূপী ব্রহ্ম, শিবলোক নামে এক ক্ষেত্রের নির্মাণ করেছেন। পরে দুইজন স্বামী - স্ত্রীর ব্যবহার করেছেন, তাতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর নাম বিষ্ণু রাখলেন। (শিব পুরাণ পৃষ্ঠা নং ১০২)

আবার রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৭ পৃষ্ঠা নং ১০৩ - তে ব্রহ্মা বলেছেন যে, আমার উৎপত্তি শ্রী ভগবান সদাশিব (ব্রহ্ম/কাল) ও প্রকৃতির (দুর্গার) সংযোগে অর্থাৎ স্বামী - স্ত্রীর ব্যবহারের দ্বারা হয়েছে। পরে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছেন। তারপর রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৯ পৃষ্ঠা নং ১১০ তে বলা হয়েছে যে, এইপ্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতার গুণ আছে। কিন্তু শিবকে (কাল-ব্রহ্মকে) গুণাতীত মানা হয়েছে।

এই স্থানে চারজনের প্রমাণ সিদ্ধ হল যে, সদাশিব (কাল/ব্রহ্ম) ও প্রকৃতির (দুর্গা) থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়েছে। এই তিন ভগবানের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের) মাতা হলেন দুর্গা দেবী আর পিতা হলেন শ্রী জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল/ব্রহ্ম)। এই তিন প্রভুই হলেন তিন গুণযুক্ত, যেমন - রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব।

"পবিত্র শ্রীমদভগবত গীতায় সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

এর প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ পর্যন্ততে আছে। ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, প্রকৃতি (দুর্গা) হল আমার স্ত্রী, আমি ব্রহ্ম (কাল) হলাম তাঁর স্বামী। আমাদের দুই জনের সংযোগে সর্ব প্রাণী সহ তিন গুণের (রজোগুণ - ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ - বিষ্ণু, তমোগুণ - শিবের) উৎপত্তি হয়েছে। আমি (ব্রহ্ম) হলাম সকল প্রাণীর পিতা আর প্রকৃতি (দুর্গা) হল তাদের সকলের মাতা। আমি এই প্রকৃতি (দুর্গার) গর্ভে বীজ স্থাপনা করি, যার কারণে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন হওয়া এই তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু ও তমোগুণ-শিব) সমস্ত জীবকে কর্মের আধারে শরীরে বেঁধে রাখে। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৬, ১৭ তে আছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১

উর্ধ্বমূলম্, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্ , প্রাহুঃ অব্যয়ম্
ছন্দাসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ, তম্, বেদ, সঃ, বেদবিত্॥

অনুবাদ :- (উর্দ্ধমূলম্) উপরে পূর্ণ পরমাত্মা আদি পুরুষ পরমেশ্বর রূপী মূল, (অধঃশাখম্) নীচেতে তিন গুণ অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব রূপী শাখা (অব্যয়ম্) অবিনাশী (অশ্বত্থম্) বিস্তারিত অশ্বত্থের বৃক্ষ আছে (যস্য) যার (ছন্দাসি) যেমন বেদে ছন্দ বা ভাগ রয়েছে, এমন সংসার রূপী বৃক্ষেরও বিভাগ ছোট-ছোট অংশ ডাল ও (পর্ণানি) পাতা (প্রাহুঃ) বলা হয়েছে, (তম্) ওই সংসার রূপ বৃক্ষকে (যঃ) যিনি (বেদ) তাকে বিস্তারিত ভাবে জানেন (সঃ) তিনি (বেদবিত্) পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ২

অধঃ চ, উর্ধ্বম্ , প্রসৃতাঃ তস্য, শাখাঃ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ
বিষয়প্রবালাঃ, অধঃ চ মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্মানুবন্ধীনি, মনুষ্যলোকে॥

অনুবাদ :- (তস্য) ওই বৃক্ষের (অধঃ) নীচে (চ) আর (উর্ধ্বম্) উপরে (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) তিন গুণ ব্রহ্মা - রজোগুণ, বিষ্ণু - সত্ত্বগুণ, শিব - তমোগুণ রূপী (প্রসৃতাঃ) ছড়ানো (বিষয়প্রবালাঃ) বিকার - কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অহংকার রূপী অঙ্কুরিত হওয়া (শাখাঃ) শাখা রূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (কর্মানুবন্ধীনি) জীবদেরকে কর্মের বন্ধনে বেঁধে রাখার (মূলানি) মূল অর্থাৎ মূখ্য কারণ (চ) এবং (মনুষ্যলোকে) মনুষ্যলোক অর্থাৎ পৃথিবী লোকে (অধঃ) নীচে - নরক, চুরাশি লাখ যোনিতে (উর্ধ্বম্) উপর স্বর্গ লোক ইত্যাদি লোকে (অনুসন্ততানি) ব্যবস্থিত করা রয়েছে।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৩

ন, রূপম্ , অস্য, ইহ, তথা উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ ন, চ, আদিঃ, ন, চ,
সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম্ , এনম্ , সুবিরূঢ়মূলম্ , অসংগশস্ত্রেণ, দৃঢ়েন , ছিত্বা॥

অনুবাদ :- (অস্য) এই সৃষ্টি রচনার (ন) না (আদিঃ) শুরু (চ) এবং (ন) না (অন্ত) অন্ত আছে (ন) না (তথা) তেমন (রূপম্) স্বরূপ (উপলভ্যতে) পাওয়া যায় (চ) এবং (ইহ) এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানের, পূর্ণ পরিচয় আমারও (ন) জানা নেই (সম্প্রতিষ্ঠা) কেননা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনার বিষয়ে ভালো মতো স্থিতির জ্ঞান আমারও নেই। (এনম্) এই (সুবিরূঢ়মূলম্) ভালোভাবে স্থায়ী স্থিতিযুক্ত (অশ্বত্থম্) পরিপক্কতা স্বরূপযুক্ত সংসার রূপী বৃক্ষের জ্ঞানকে (অসংগশাস্ত্রেণ) পূর্ণ জ্ঞান রূপী (দৃঢ়েন্) দৃঢ় সূক্ষ্ম বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জেনে (ছিত্বা) ছেদন করে অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষণিক বা ক্ষণ ভঙ্গুর জেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম থেকেও আদি পূর্ণ ব্রহ্মের খোঁজ করা উচিত।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৪

ততঃ, পদম্, তত্, পরিমার্গিতব্যম্ , যস্মিন্ , গতাঃ ন, নিবর্তন্তি, ভূয়ঃ
তম্, এব, চ, আদ্যম্ , পুরুষম্ , প্রপদ্যে, যতঃ, প্রবৃতিঃ প্রসৃতা, পুরাণী॥

অনুবাদ :- যখন তত্ত্বদর্শী সন্তের সন্ধান পাওয়া যাবে (ততঃ) তারপর (তত্) ওই পরমাত্মার (পদম্) পরম পদ স্থানকে অর্থাৎ সতলোককে (পরিমার্জিত ব্যম্) ভালোভাবে খোঁজ করা দরকার (যস্মিন্) যেখানে (গতাঃ) যাওয়ার পর সাধক (ভূয়ঃ) পুনরায় (ন, নিবভ্রান্তি) ফিরে এই সংসারে আসে না (চ) আর (যতঃ) যে পরমাত্মা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম হতে (পুরাণী) আদি (প্রবৃতিঃ) রচনা- সৃষ্টি (প্রসৃতা) উৎপন্ন হয়েছে (তম্) অজ্ঞাত (অধ্যম্) আদি যম অর্থাৎ আমি কাল নিরঞ্জন (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (এব) ই (প্রপদ্যে) শরণে রয়েছি এবং তাঁরই পূজা করি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬

দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ, ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ, অক্ষরঃ, উচ্চতে॥

অনুবাদ :- (লোকে) এই সংসারে (দ্বৌ) দুই প্রকারের (পুরুষ) ভগবান আছে, এক (ক্ষরঃ) নাশবান (চ) আর এক (অক্ষরঃ) অবিনাশী (পুরুষঃ) ভগবান আছেন, (এব) এই প্রকার (ইমৌ) এই দুই প্রভুর লোকে (সর্বাণি) সম্পূর্ণ (ভূতানি) প্রাণীর শরীর তো (ক্ষরঃ) নাশবান (চ) আর (কূটস্থঃ) জীব আত্মাকে (অক্ষরঃ) অবিনাশী (উচ্চতে) বলা হয়।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৭

উত্তমঃ পুরুষঃ, তু, অন্যঃ পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ
যঃ লোকত্রয়ম্, আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥

অনুবাদ :- (উত্তমঃ) সর্বোত্তম (পুরুষঃ) প্রভু (তু) তো (অন্যঃ) উপরোক্ত দুই প্রভু " ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ" থেকেও অন্য (ইতি) যাকে প্রকৃতপক্ষে (পরমাত্ম) পরমাত্মা (উদাহৃতঃ) বলা হয়েছে (যঃ) যিনি (লোকত্রয়ম্) তিন লোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সকলের ধারণ পোষণ করেন এবং যিনি (অব্যয়ঃ) অবিনস্বর (ঈশ্বরঃ) ঈশ্বর (প্রভুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সামর্থ্যবান প্রভু) আছেন।

ভাবার্থ :- গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু কেবল এতটাই বলেছেন যে, এই সংসার উল্টো ঝুলন্ত বৃক্ষের তুল্য জানবে। উপরের শিকড় (মূল) তো হল পূর্ণ পরমাত্মা। নীচে ডাল-পালা ইত্যাদিকে অনান্য অংশ জানবে। এই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতিটি ভাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যে সন্ত জানেন, তিনিই হলেন তত্ত্বদর্শী সন্ত, যাঁর বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ - তে বলা

হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২-৩ তে কেবল এতটাই বলা হয়েছে যে, তিন গুণ রূপী শাখা আছে। এখানে বিচারকালে অর্থাৎ গীতাতে তোমাকে আমি (গীতা জ্ঞান দাতা) সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারবো না কেননা আমার এই সংসার সৃষ্টির রচনার আদি ও অন্তের জ্ঞান আমার জানা নেই। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং ৩৪ -তে বলে দিয়েছেন যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে ওই পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান জানো এছাড়া এই গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ তে ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, তিনি ওই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রত্যেক বিভাগের জ্ঞান যথার্থভাবে বুঝিয়ে দেবেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ৪ তে বলেছেন যে, ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়ার পর, ওই পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত অর্থাৎ ওই তত্ত্বদর্শী সন্তের কথা অনুসারে সাধনা করা উচিত, যার দ্বারা পূর্ণ মোক্ষ (অনাদি মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬ -১৭ তে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই সংসারে তিন প্রভু আছেন, এক ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম), দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম), তৃতীয় পরম অক্ষর পুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম)। এই ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ প্রকৃতপক্ষে অবিনশ্বর অর্থাৎ অমর নয়। ওই অবিনশ্বর পরমাত্মা তো এই দুইজন থেকে কেউ অন্য রয়েছেন। তিনিই তিনলোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ পোষণ করেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তে এবং ১৬-১৭ তে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, উল্টো ঝুলে থাকা অশত্থবৃক্ষের ন্যায় সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ শিকড় তো পরম অক্ষর ব্রহ্ম বা পূর্ণ ব্রহ্ম জানবে। যাঁর দ্বারা সমস্ত বৃক্ষের পালন হয় এবং বৃক্ষের যে অংশ পৃথিবীর কিছুটা বাইরে ভূমির সাথে দেখা যায়, যেটাকে কাণ্ড বলা হয়, তাঁকে অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম জানবে। আবার ওই কাণ্ড থেকে উপরে গিয়ে অন্য মোটা ডাল বের হয়, তার মধ্যে এক ডাল ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ জানবে এবং ওই মোটা ডাল থেকে অন্য তিন শাখা বের হয়, তাঁদেরকে ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব জানবে এবং ওই শাখাতে যত পাতা আছে, তাদেরকে সাংসারিক প্রাণী জানবে। উপরোক্ত গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ক্ষরপুরুষ (ব্রহ্ম) ও অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং এই দুই লোকে যত প্রাণী রয়েছে, তাদের স্থূল শরীর তো নাশবান এবং জীবাত্মা অবিনাশী অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রভু ও তাদের অন্তর্গত সর্ব প্রাণী নাশবান। যদিও বা অক্ষর পুরুষকে (পরব্রহ্ম) অবিনাশী বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা তো এই দুই ভগবান থেকে অন্য। যিনি এই তিন লোকে প্রবেশ করে, সকলের পালন-পোষণ করেন। উপরোক্ত বিবরণে তিন প্রভুর পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়া হল।

"পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরআন শরীফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

এর প্রমাণ পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কুরআন শরীফেও রয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফে বাইবেলেরও জ্ঞান রয়েছে, এইজন্য এই দুই পবিত্র সদগ্রন্থ একত্রে প্রমাণিত করেছে যে, কে এবং কেমন সেই সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর প্রকৃত নাম কি।

পবিত্র বাইবেলের উৎপত্তি গ্রন্থ (পৃষ্ঠা নং ২, অধ্যায় ১:২০ - ২:৫ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ দিন : প্রাণী আর মানুষ :-

অন্য প্রাণীদের রচনা করে ২৬. তারপর পরমেশ্বর বললেন, আমি আমার নিজের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে তৈরি করব, যেন তারা সর্ব প্রাণীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারে। ২৭. তখন পরমেশ্বর মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসার উৎপন্ন করলেন এবং নিজেরই স্বরূপ অনুসারে পরমেশ্বর নর ও নারী করে মানুষদেরকে সৃষ্টি করলেন।

২৯. প্রভু মানুষদের ভোজন করার জন্য যাবতীয় ছোট ছোট বীজযুক্ত উদ্ভিদ এবং যাবতীয় যত বৃক্ষ আছে যাতে বীজযুক্ত ফল হয়, তা ভোজনের জন্য প্রদান করলেন। (মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতে বলেননি)

সপ্তম দিন :- বিশ্রামের দিন।

পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে সর্ব সৃষ্টির উৎপত্তি করে, সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন।

অতএব পবিত্র বাইবেলে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা মানব সাদৃশ্য শরীরে রয়েছেন। যিনি ছয় দিনে সর্ব সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিন বিশ্রাম করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন শরিফ (সূরাহ ফুরকান ২৫, আয়ত নং ৫২, ৫৮, ৫৯)

আয়ত ৫২ :- ফলা তুতিঅল্, কাফিরন্ ব জহিদহুম বিহী জিহাদন্ কবীরা (কবীরন্)॥ ৫২॥

এর ভাবার্থ, হজরত মুহম্মদের খুদা (প্রভু) বলছেন যে, হে পয়গম্বর! তুমি কাফিরদের (যারা এক প্রভুর কাদির আল্লার) ভক্তি ত্যাগ করে অন্যান্য দেবী-দেবতা এবং মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে, তাদের) কথা মানবে না, কেননা তারা কবীরকে পূর্ণ পরমাত্মা অর্থাৎ কাদির আল্লাহ বলে মানেন না। তুমি আমার দ্বারা দেওয়া এই কুরআনের জ্ঞানের উপর দৃঢ় থাকবে, কেননা

কবীরই হলেন পূর্ণ প্রভু এবং কবীর আল্লার জন্য সংঘর্ষ করবে (লড়াই করবে না) অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানে অটল থাকবে।

আয়ত ৫৮ :- ব তবক্কল্ অলল্, - হরিল্লজী লা যমূতু ব সব্বিহ বিহমদিহী ব কফা বিহী বিজুনুবি ইবাদিহী খবীরা (কবীরা)॥৫৮॥

ভাবার্থ হল যে, হজরত মুহম্মদ যাকে নিজের প্রভু বলে মানেন, সেই আল্লাহ (প্রভু) অন্য কোনো পূর্ণ প্রভুর (আল্লার) দিকে সংকেত করে বলছেন, হে পয়গম্বর! ওই কবীর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখ, যিনি জিন্দা মহাত্মা রূপে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি কখনো মরেন না অর্থাৎ তিনি বাস্তবে অবিনশ্বর (অমর)। প্রশংসার সাথে তাঁর পাকীর (পবিত্র মহিমার) গুণগান করতে থাকবে, ওই কবীর আল্লাহ (কবির্দেব) কেবল ইবাদতের যোগ্য এবং তিনি নিজের বান্দার (ভক্তের) সর্ব পাপ বিনাশ করে থাকেন।

আয়ত ৫৯ :- অল্লজী খলকসসমাবাতি বল্অর্জ ব- মা বৈনহুমা ফী সিত্ততি অয়্যামিন্ সুম্মস্তবা অলল্অর্শি অররহ্-মানু ফস্অল্ বিহী খবীরন্ (কবীরন্) ॥৫৯॥

ভাবার্থ হল যে, হজরত মুহম্মদকে কুরআন শরিফ বলা প্রভু (আল্লাহ) বলছেন যে, ওই কবীর প্রভুই তিনি, যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত কিছুর রচনা ছয় দিনে করেছেন এবং সপ্তম দিনে নিজের সতলোকে সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়েছেন অর্থাৎ বসেছেন। তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের (বাখবরের) কাছে জিজ্ঞাসা করো। ওই পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কিভাবে হবে? তাঁর যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ে কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তকে (বাখবরকে) জিজ্ঞাসা করো, আমি জানি না।

উপরোক্ত দুই পবিত্র ধর্মের (খ্রীষ্টান ও মুসলমান) পবিত্র শাস্ত্রও একসাথে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সর্ব সৃষ্টির রচনহার, সর্ব পাপ বিনাশক, সর্ব শক্তিমান, অবিনাশী পরমেশ্বর মানব সদৃশ্ শরীর আকারে এবং তিনি সতলোকে থাকেন। তাঁর নাম কবীর, তাঁকে আল্লাহু আকবিরুও বলা হয়।

আদরণীয় ধর্মদাস জী, পূজ্য কবীর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে সর্বশক্তিমান! আজ পর্যন্ত এমন তত্ত্বজ্ঞান আমাকে কেউ বলেননি। বেদের বিদ্বান জ্ঞানীরাও কখনও বলেননি। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার পবিত্র বেদ এবং চার পবিত্র কতেব (কুরআন শরিফ ও অন্যান্য) মিথ্যা।

এই কথা শুনে পূর্ণ পরমাত্মা (কবীর আল্লাহ) বললেন যে :-

কবীর, বেদ কতেব ঝূঠে নহীঁ ভাঈ, ঝূঠে হৈঁ জো সমঝে নাহিঁ।

ভাবার্থ হল, চার পবিত্র বেদ (ঋগ্বেদ - অথর্ববেদ - যজুর্বেদ - সামবেদ) ও পবিত্র চার কতেব (কুরআন শরিফ-জবুর-তৌরাত-ইঞ্জিল) মিথ্যা নয়। কিন্তু যারা এই সব পবিত্র গ্রন্থকে বুঝতে পারেনি, তারা হল অবুঝ।

"পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবির্ দেবের) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

❑ **বিশেষ :-** নিম্ন অমৃতবাণী ১৪০৩ সাল থেকে (যখন পূজ্য কবির্দেবের অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বরের লীলাময় শরীরের বয়স পাঁচ বৎসর ছিল} ১৫১৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ {যখন কবীর পরমেশ্বর মগহর নামক স্থান থেকে স্বশরীরে সতলোকে গমন করেছিলেন} তার কমপক্ষে ৬০০ বৎসর পূর্বে, পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) দ্বারা, তাঁর নিজের প্রিয় শিষ্য (দাস/ভক্ত) আদরণীয় ধর্মদাস সাহেবকে তাঁর নিজের মহিমা, সৃষ্টি রচনা ও সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান শুনিয়েছিলেন এবং ধনী ধর্মদাস সাহেব সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ওই সময়ের পবিত্র হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু অবুঝ ও নকল ধর্ম গুরুরা (নিম-হাকিমরা) বলেছিলেন যে, এই ধাণক (তাঁতি/জুলাহা) কবীর হল মিথ্যাবাদী। কোনো সদগ্রন্থে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের মাতা-পিতার নাম নেই। এই তিন প্রভু অবিনাশী এবং তাদের জন্ম-মৃত্যু হয় না এবং না পবিত্র বেদে ও পবিত্র কুরআন শরিফ কিংবা অন্যান্য কোনো গ্রন্থতে কবীর পরমেশ্বরের প্রমাণ আছে। পরমাত্মার বিষয়ে তো নিরাকার লেখা রয়েছে, আমরা প্রতিদিন পড়ি। সরল-সোজা আত্মারা ওই বিচক্ষণদের (চতুর গুরুদের) উপর বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, এই কবীর তাঁতি (ধাণক/জুলাহ) সত্যই অশিক্ষিত আর আমাদের গুরু শিক্ষিত, নিশ্চয়ই সত্য বলছেন। আজ সেই সত্য প্রকাশ্যে এসেছে এবং নিজেদের সর্ব পবিত্র ধর্মের পবিত্র সদগ্রন্থেও সাক্ষী রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ পরমেশ্বর সর্ব সৃষ্টির রচনহার, সর্বকূলের মালিক এবং তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর)। যিনি কাশীর (বেনারস) লহরতালা নামক দীঘিতে কমল ফুলের (পদ্ম ফুলের) উপর প্রকট হয়ে ১২০ বৎসর পর্যন্ত, নিজের বাস্তবিক তেজময় শরীরের উপর হালকা তেজযুক্ত মানব সদৃশ শরীর ধারণ করে রয়েছেন এবং নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির জ্ঞান সঠিক ভাবে বর্ণনা করে সশরীরে সতলোকে চলে গিয়েছিলেন।

পাঠকগণ! কৃপা করে পড়ুন কবীর সাহেব দ্বারা উচ্চারিত অমৃত বাণী :-

ধর্মদাস য়হ জগ বৌরানা। কোঈ ন জানে পদ নিরবানা॥১॥
যহী কারণ মৈঁ কথা পসারা। জগসে কহিয়ো রাম নিয়ারা॥
যহী জ্ঞান জগ জীব সুনাও। সব জীবোঁ কা ভরম নশাও॥২।
ভরম গয়ে জগ বেদ পুরানা। আদি রাম কা ভেদ ন জানা॥৩॥
রাম রাম সব জগত বখানে। আদি রাম কোঈ বিরলা জানে॥৪॥
জ্ঞানী সুনে সো হিরদৈ লগাই। মূর্খ শুনে সো গম্য না পাঈ॥৫।
অব মৈঁ তুমসে কহুঁ চিতাঈ। ত্রিদেবন কী উৎপত্তি ভাঈ॥৬॥
কুছ সংক্ষেপ কহুঁ গোহরাঈ। সব সংশয় তুমহরে মিট জাঈ॥৭॥
মাঁ অষ্টঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুণ বংশন অঞ্জন॥৮॥
পহিলে কীনহ নিরঞ্জন রাঈ। পিছে সে মায়া উপজাঈ॥৯॥
মায়া রূপ দেখ অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা॥১০॥
কামদেব ধর্মরায় সত্তায়ে। দেবী কো তুরতহী ধর খায়ে॥১১॥
পেট সে দেবী করী পুকারা। সাহব মেরা করো উবারা॥১২॥
টের সুনী তব হম তহাঁ আয়ে। অষ্টঙ্গী কো বন্দ ছুড়ায়ে॥১৩॥
সতলোক মেঁ কীন্হা দুরাচারি, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারি॥১৪॥
মায়া সমেত দিয়া ভগাঈ, সোলহ সংখ কোস দূরী পর আঈ॥১৫॥
অষ্টঙ্গী ঔর কাল অব দোঈ, মন্দ কর্ম সে গয়ে বিগোঈ॥১৬॥
ধর্মরায় কো হিকমত কিন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লিন্হা॥১৭॥
ধর্মরায় কিন্হাঁ ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহী তব আসা॥১৮॥
তীন পুত্র অষ্টঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥১৯॥
তীন দেব বিস্তার চলায়ে। ইনমেঁ যহ জগ ধোখা খায়ে॥২০॥
পুরুষ গম্য কৈসে কো পাবৈ। কাল নিরঞ্জন জগ ভরমাবৈ॥২১॥
তীন লোক আপনে সুত দীন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লীন্হা॥২২॥
অলখ নিরঞ্জন সুন্ন ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা॥২৩॥
তীন দেব সো উনকো ধাবেঁ। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবেঁ॥২৪॥
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তীন লোক জিব কিন্হ অহারা॥২৫॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বচায়ে। সকল খায় পুন ধূর উড়ায়ে॥২৬॥
তিনকে সুত হৈঁ তিনোঁ দেবা। আন্ধর জীব করত হৈ সেবা॥২৭॥
অকাল পুরুষ কাহু নহীঁ চীন্হাঁ। কাল পায় সবহী গহ লীন্হাঁ॥২৮॥
ব্রহ্ম কাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্ম কো না পহিচানে॥২৯॥
তিনোঁ দেব ঔর ঔতারা। তাকো ভজে সকল সংসারা॥৩০॥
তিনোঁ গুণ কা যহ বিস্তারা। ধর্মদাস মৈঁ কহোঁ পুকারা॥৩১॥
গুণ তিনোঁ কি ভক্তি মেঁ, ভুল পরো সংসার॥৩২॥
কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উত্তরৈঁ পার॥৩৩॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে পরমেশ্বর কবীর সাহেব নিজের প্রিয় ভক্ত শ্রী ধর্মদাসকে বলেছিলেন যে, হে ধর্মদাস! এই সমস্ত সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত হয়ে রয়েছে। এখানে কারোরই পূর্ণ মোক্ষ মার্গের জ্ঞান এবং পূর্ণ সৃষ্টির রচনার জ্ঞান নেই। এইজন্য আমি তোমাকে আমার দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির কথা শোনাচ্ছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো খুবই শীঘ্র বুঝে যাবে কিন্তু যারা সর্ব প্রমাণ দেখেও মানবে না, তারা অবুঝ প্রাণী, কারণ তারা ব্রহ্মের (কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনের) প্রভাবে প্রভাবিত

হয়ে রয়েছে, তারা ভক্তির যোগ্যই নয়। এখন আমি তোমাকে বলছি, এই তিন দেবতাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? তাদের মাতা হল অষ্টাঙ্গী (দুর্গা) এবং পিতা হল জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম/কালপ্রভু)। প্রথমে ব্রহ্মের উৎপত্তি ডিমের থেকে হয়েছে। পরে দুর্গার উৎপত্তি হয়। দুর্গার রূপে আকৃষ্ট হয়ে, এই কাল (ব্রহ্ম) অভদ্র আচরণ করেছিল, তখন দুর্গা (প্রকৃতি), এই কালের পেটে সূক্ষ্ম রূপে শরণ নিয়েছিল।

আমি সেখানে গিয়েছিলাম, যেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল /ব্রহ্ম) ছিল। তখন আমি ভবানীকে (দুর্গাকে) ব্রহ্মের পেট থেকে বের করে, এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সহিত ষোলো (১৬) সংখ ক্রোস দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন (ধর্মরায়) প্রকৃতি দেবীর (দুর্গার) সাথে ভোগ বিলাস করে। এই দুই জনের সংযোগেই এই তিন গুণের (শ্রী ব্রহ্মা-রজোগুণ, শ্রী বিষ্ণু-সত্ত্বগুণ, শ্রী শিব-তমোগুণ) উৎপত্তি হয়েছে। এই তিন গুণের সাধনা করে সকল প্রাণী এই ব্রহ্মের জালেই ফেঁসে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক মন্ত্র প্রাপ্ত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মোক্ষ কিভাবে প্রাপ্ত হবে?

❑ **বিশেষ :-** পাঠকগণ! বিচার করুন, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের বিষয়ে অবিনাশী (অমর) বলা হয়েছিল। সর্ব হিন্দু সমাজ আজ পর্যন্ত তিন দেবতাকেই অজর-অমর ও জন্ম-মৃত্যু রহিত বলে মানছিলেন, যেহেতু এই তিনজনই নাশবান অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয়। তাদের পিতা হলেন কাল রূপী ব্রহ্ম এবং মাতা হলেন দুর্গা (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী), যাঁদের বিষয়ে আপনারা পূর্বে প্রমাণেতে পড়েছেন, এই জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রেও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমাজের কলিযুগী গুরু, ঋষি, সন্তদের জ্ঞান নেই। যে অধ্যাপক পাঠ্যক্রমের (সিলেবাসের) সাথে পরিচিত নেই, সেই অধ্যাপক ঠিক নয় অর্থাৎ তিনি বিদ্বান নন। তিনি হলেন বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যতের শত্রু। ঠিক এইপ্রকার, যে গুরুরা এখনও পর্যন্ত জানেন না যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মাতাপিতা কে? তাহলে সেই গুরু, ঋষি ও সন্তরা হলেন জ্ঞানহীন। যার কারণে সর্ব ভক্ত সমাজকে শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধ জ্ঞান (লোক বেদ অর্থাৎ রূপ কথা) শুনিয়ে অজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শাস্ত্রবিধি বিরুদ্ধ ভক্তি সাধনা করিয়ে, পরমাত্মার বাস্তবিক লাভ অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ থেকে বঞ্চিত রেখে, সকলের দুর্লভ মানব জন্মই নষ্ট করে দিয়েছে। কেননা শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ তে এই প্রমাণ রয়েছে যে, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পূজা (ইবাদত) করে, তাদের কোনো লাভ হয় না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব ৫ বৎসরের লীলাময় আয়ুতে ১৪০৩ সাল থেকেই সর্ব শাস্ত্র যুক্ত জ্ঞান, নিজের অমৃতবাণীতে (কবিরবাণীতে) বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই অজ্ঞানী গুরুরা এই শাস্ত্র অনুসার জ্ঞানকে ভক্ত সমাজ পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি। যে জ্ঞান বর্তমানে সকল সদগ্রন্থে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কবির্দেব (কবীর প্রভু) তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মাই এসেছিলেন।

"আদরণীয় গরীবদাস সাহেবের অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

আদি রমৈণী (সদ্ গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৬৯০ থেকে ৬৯২ পর্যন্ত)

আদি রমৈনী অদলী সারা। জা দিন হোতে ধূঁন্ধূঁকারা ॥ ১ ॥

সতপুরুষ কীন্হা প্রকাশা। হম হোতে তখত কবীর খবাসা ॥২॥

মন মোহিনী সৃজী মায়া। সতপুরুষ এক খ্যাল বনায়া ॥৩॥

ধর্মরায় সৃজে দরবানী। চৌঁসঠ যুগ তপ সেবা ঠানী ॥৪॥

পুরুষ পৃথ্বী জা কুঁ দীন্হী। রাজ করো দেবা রখ আধীনী ॥৫॥

ব্রহ্মণ্ড ইক্কীস রাজ তুম্হ দীন্হা। মন কী ইচ্ছা সব জগ লীন্হা ॥৬॥

মায়া মূল রূপ এক ছাজা। মোহি লিয়ে জিনহুঁ ধর্মরাজা ॥৭॥

ধর্ম কা মন চঞ্চল চিত ধার্-য়া। মন মায়া কা রূপ বিচারা ॥৮॥

চঞ্চল চেরী চপল চিরাগা। যা কে পরসে সর্বস জাগা ॥৯॥

ধর্মরায় কিয়া মন কা ভাগী। বিষয় বাসনা সংগ সে জাগী ॥১০॥

আদি পুরুষ অদলী অনুরাগী। ধর্মরায় দিয়া দিল সেঁ ত্যাগী ॥১১॥

পুরুষ লোক সে দীয়া ঢহাহী। সহজ দাস কে দ্বীপ চল আয়ে ভাঈ ॥১২॥

সহজ দাস জিস দ্বীপ রহন্তা। কারণ কৌন কৌন কুল পঁন্থা ॥১৩॥

ধর্মরায় বোলে দরবানী। সুনো সহজ দাস ব্রহ্মজ্ঞানী ॥১৪॥

চৌসঠ যুগ হম সেবা কিন্হী। পুরুষ পৃথ্বী হম কুঁ দীন্হী ॥১৫॥
চঞ্চল রূপ ভয়া মন মৌরা। মনমোহিনী ঠগিয়া ভঁবরা ॥১৬॥
সতপুরুষ কে না মন ভায়ে। পুরুষ লোক সে হম চল আয়ে ॥১৭॥
অগর দ্বীপ সুনত বড়ভাগী। সহজ দাস মেটো মন পাগী ॥১৮॥
বোলে সহজ দাস দিল দানী। হম তো চাকর সত সহদানী ॥১৯॥
সতপুরুষ সে অর্জ গুজারুঁ। জব তুম্হারা বিমান উতারুঁ ॥২০॥
সহজ দাস কো কীয়া পীয়ানা। সত্যলোক লীয়া প্রবানা ॥২১॥
সতপুরুষ সাহিব সরবংগী। অবিগত অদলী অচল অভংগী ॥২২॥
ধর্মরায় তুম্হরা দরবানী। অগর দ্বীপ চল গয়ে প্রাণী ॥২৩॥
কৌন হুক্ম করী অর্জ অবাজা। কহাঁ পঠাউঁ উস ধর্মরাজা ॥২৪॥
ভঈ অবাজ অদলি এক সাচা। বিষয় লোক জা তীন্যুঁ বাচা ॥২৫॥
সহজ বিমান চলে অধিকাঈ। ছিন মেঁ অপনে দ্বীপ চল আঈ ॥২৬॥
হম তো অর্জ করী অনুরাগী। তুম বিষয় লোক জাও বড়ভাগী ॥২৭॥
ধর্মরায় কে চলে বিমানা। মানসরোবর আয়ে প্রানা ॥২৮॥
মানসরোবর রহন ন পায়ে। জহাঁ কবীরা রূপ মেঁ থাঁনা লায়ে ॥২৯॥
বঙ্কনাল কী বিষমী বাটী। তহাঁ কবীরা রোকী ঘাটী ॥৩০॥
ইন পাঁচোঁ মিল জগত বন্ধানা। লখ চৌরাসী মেঁ জীব সতানা ॥৩১॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, মায়া। ধর্মরায় কা রাজ বৈঠায়া ॥৩২॥
য়ৌহ খোকা পুর ঝূঠী বাজী। ভিস্ত বৈকুণ্ঠ দগা সী সাজী ॥৩৩॥
কৃত্রিম জীব ভুলাঁনেঁ ভাঈ। নিজ ঘর কী তো খবর ন পাঈ ॥৩৪॥
সবা লাখ উপজেঁ নিত হংসা। এক লাখ বিনশেঁ নিত অংসা ॥৩৫॥
উত্পত্তি খপতি যাহ প্রলয় ফেরী। হর্ষ শোক জৌঁরা জম জেরী ॥৩৬॥
পাঁচোঁ তত্ত্ব হৈঁ প্রলয় মাঁহী। সত্ত্বগুণ রজগুণ তমগুণ ঝাঁঈ ॥৩৭॥
আঠোঁ অঙ্গ মিলি হে মায়া। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সকল ভরমায়া ॥৩৮॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কি ডোরী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড লগী হে খোরী ॥৩৯॥
শ্বাসা পারস মন গহ রাখো। খোলিহ কপাট অমীরস চাখো ॥৪০॥
সুনাউঁ হংস শব্দ সুন দাসা। অগম দ্বীপ হৈ অগ হৈ বাসা ॥৪১॥
ভবসাগর জম দণ্ড জমানা। ধর্মরায় কা হৈ তলবাঁনা ॥৪২॥
পাঁচোঁ উপর পদ কি নগরী। বাট বিহংগম বঁকী ডগরী ॥৪৩॥
হমরা ধর্মরায় সোঁ দাবা। ভবসাগর মেঁ জীব ভরমায়া ॥৪৪॥
হম তো কহৈঁ অগম কি বাণী। জহাঁ অবিগত অদলী আপ কবীর বিনানী ॥৪৫॥
বন্দী ছোড় হমারা নামম্। অজর অমর হে অস্থীর ঠামম্ ॥৪৬॥
জুগন জুগন হম কহতে আয়ে। জম জৌঁরা সে হংস ছুটায়ে ॥৪৭॥
জো কোঈ মানেঁ শব্দ হমারা। ভবসাগর নহীঁ ভরমেঁ ধারা ॥৪৮॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কা লেখা। তন অন্দর মন কিন দেখা ॥৪৯॥
দাস গরীব কবীর কী বাণী। খোজো হংসা শব্দ সহদানী ॥৫০॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল যে, আদরণীয় গরীব দাস সাহেবও এই কথা বলেছেন যে, এখানে প্রথমে কেবল অন্ধকার ছিল এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব সত্যলোকে তখ্তের (সিংহাসনে) উপর বিরাজমান ছিলেন। আমরা সবাই সেখানে সেবক (চাকর) ছিলাম। পরমাত্মাই জ্যোতি নিরঞ্জনকে উৎপন্ন করেছেন। পরে তার তপস্যার প্রতিফলে তাকে

একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করেছিলেন। তারপরে মায়াকে (প্রকৃতিকে/দুর্গাকে) উৎপত্তি করলেন। এরপরে যুবতী দুর্গার রূপে মোহিত হয়ে জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) দুর্গার সঙ্গে বলাৎকার করার চেষ্টা করলেন। এর ফলস্বরূপ ব্রহ্ম শাস্তি পেলেন। ব্রহ্মকে সত্যলোক থেকে বের করে দিয়ে অভিশাপ দিলেন যে, এক লাখ মানব শরীর ধারী প্রাণী প্রতিদিন ভক্ষণ করবে আর এক লাখ পঁচিশ হাজার প্রতিদিন উৎপন্ন করবে। এইজন্য এখানে সর্ব প্রাণী জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করছে। যদি কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক শব্দ (সত্যনাম জপ মন্ত্র) আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত করে, তাহলে তাকে আমি কালের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেব। আমার নাম বন্দি ছোড়। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী নিজের গুরু ও প্রভু কবীর পরমাত্মার আধারে বলছেন যে, সত্য মন্ত্র অর্থাৎ সত্যনাম ও সারশব্দকে প্রাপ্ত করলে, পূর্ণ মোক্ষ হয়ে যাবে। তা না হলে নকল নাম দেওয়া গুরু ও মহন্তের মিষ্টি মিষ্টি কথায় ফেঁসে শাস্ত্র বিধির বিরুদ্ধ সাধনা করে কালের জালেই থেকে যাবে আর তারপর কষ্টের উপর কষ্ট সইতে হবে। সন্ত গরীব দাস জী কৃত অমর গ্রন্থের অধ্যায় " হংস পরমহংস" এর কথার বাণী ৩৭ - ৪৩ তে বলা হয়েছে :-

মায়া আদি নিরঞ্জন ভাঈ, অপনে জায়ে আপৈ খাঈ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চেলা, ওম সোহম কা হৈ খেলা॥৩৭॥
শিখর সুন্ন মেঁ ধর্ম অন্যায়ী, জিন শক্তি ডায়ন মহল পঠাঈ। লাখ গ্রাসৈ নিত উঠ দূতী, মায়া আদি তখত্ কী কূতী॥৩৮॥
সবা লাখ ঘড়িয়ে নিত ভাণ্ডে, হংসা উৎপত্তি প্রলয় ডাণ্ডে। য়ে তীনোঁ চেলা বট পারী, সিরজে পুরুষা সিরজী নারী॥৩৯॥
খোখাপুর মেঁ জীব ভুলায়ে স্বপন নরক, বৈকুণ্ঠ বনায়ে। যৌহ হরহট কে কূবা লোঈ, যা গল বন্ধ্যা হৈ সব কোঈ॥৪০॥
কীড়ী কুঞ্জর ঔর অবতারা, হরহট ডোরি বন্ধে কঈ বারা। অরব অলিল ইন্দ্র হুএ ভাঈ, হরহট ডোরি বন্ধে সব আঈ॥৪১॥
শেষ মহেশ অরু গণেশ তাঁঈ, হরহট ডোরি বন্ধে সব আঁঈ। শুক্রাদিক ব্রহ্মাদিক দেবা, হরহট ডোরি বন্ধে সব খেবা।
কোটিক কর্তা ফিরতা দেখ্যা, হরহট ডোরি কহুঁ সুন লেখা॥৪২॥
য়ে চতুর্ভূজী ভগবান কহাবৈঁ, হরহট ডোরি বন্ধে সব আবৈঁ।
যৌহ হৈ খোখা পুর কা কূবা, যা মেঁ পড়য়া সো নিশ্চয় মুবা॥৪৩॥

জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল বলীর) অধীন হয়ে এই তিন দেবতা (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) নিজের মহিমা দেখিয়ে জীবকে (মানুষদের) স্বর্গ, নরক ও ভবসাগরে (চুরাশি লক্ষ যোনিতে) ভ্রমিত করতে থাকে। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের মায়া দ্বারা নাগিনীর মতো জীবগণকে উৎপন্ন করে আর পরে মেরে দেয়। যেভাবে নাগিনী নিজের লেজ দিয়ে ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী তৈরি করে, পরে ওই ডিমের উপর নিজের ফণা মারে, যাতে ডিম ফেটে যায় ও তার ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে যায় আর পরে তাদের সে খেয়ে নেয়। ফণা মারার সময় অনেক ডিম ফেটে যায়। কেননা নাগিনীর একসাথে অনেক ডিম হয়।

যে ডিম ফেটে যায় তার মধ্যে থেকে বাচ্চা বের হয়। যদি কোনো বাচ্চা কুণ্ডলী (সাপের কুণ্ডলী) থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়, সেই বাচ্চা তো বেঁচে যায়। না হলে কুণ্ডলীতে থাকা বাচ্চাকে নাগিনী ছাড়ে না। যত বাচ্চা ওই কুণ্ডলীর ভিতরে থাকে, সবাইকে খেয়ে ফেলে। ঠিক এই প্রকার, যে সাধক কাল ব্রহ্মের অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন, দেবী দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে, তারা কাল ব্রহ্ম রূপী নাগিনীর কুণ্ডলীর মধ্যে অর্থাৎ কালের লোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে রয়ে যায়, যাদেরকে পরে কাল জ্যোতি নিরঞ্জন ভক্ষণ করে ফেলে।

গরীব, মায়া কাল নাগিনী অপনে জায়ে খাত। কুণ্ডলী মেঁ ছোড়ৈ নহীঁ, সৌ বাতোঁ কী বাত॥

এই প্রকার এই কালবলীর জাল বানানো রয়েছে। কাল নিরঞ্জন অবধি ভক্তি পূর্ণ গুরুর থেকে মন্ত্র নিয়ে করলেও, এই নিরঞ্জনের কুণ্ডলী (একুশ ব্রহ্মাণ্ড) থেকে বাইরে বেরোতে পারবে না। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, আদিমায়া দুর্গাও নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে। তারা বেচারা অবতার ধারণ করে আসেন আর জন্ম-মৃত্যুর চক্কর কাটতে থাকেন। এই জন্য বিচার করুন, সোহং নামের জপ যা কিনা ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শুকদেব ঋষিও জপেছিলেন, তাঁরাও পার হতে পারেন নি। কেননা শ্রী বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশ অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯৩ পৃষ্ঠা ৫১ তে লেখা আছে যে, ধ্রুব কেবল এক কল্প অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত মুক্ত থাকবে। এইজন্য কাল লোকেই রয়েছে এবং "ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্র জপ করা ভক্তগণও কৃষ্ণ পর্যন্ত ভক্তি করছেন, তারাও চুরাশি লক্ষ যোনির চক্র কাটার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। তা পরম পূজ্য কবীর সাহেব ও শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব মহারাজের বাণী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছে।

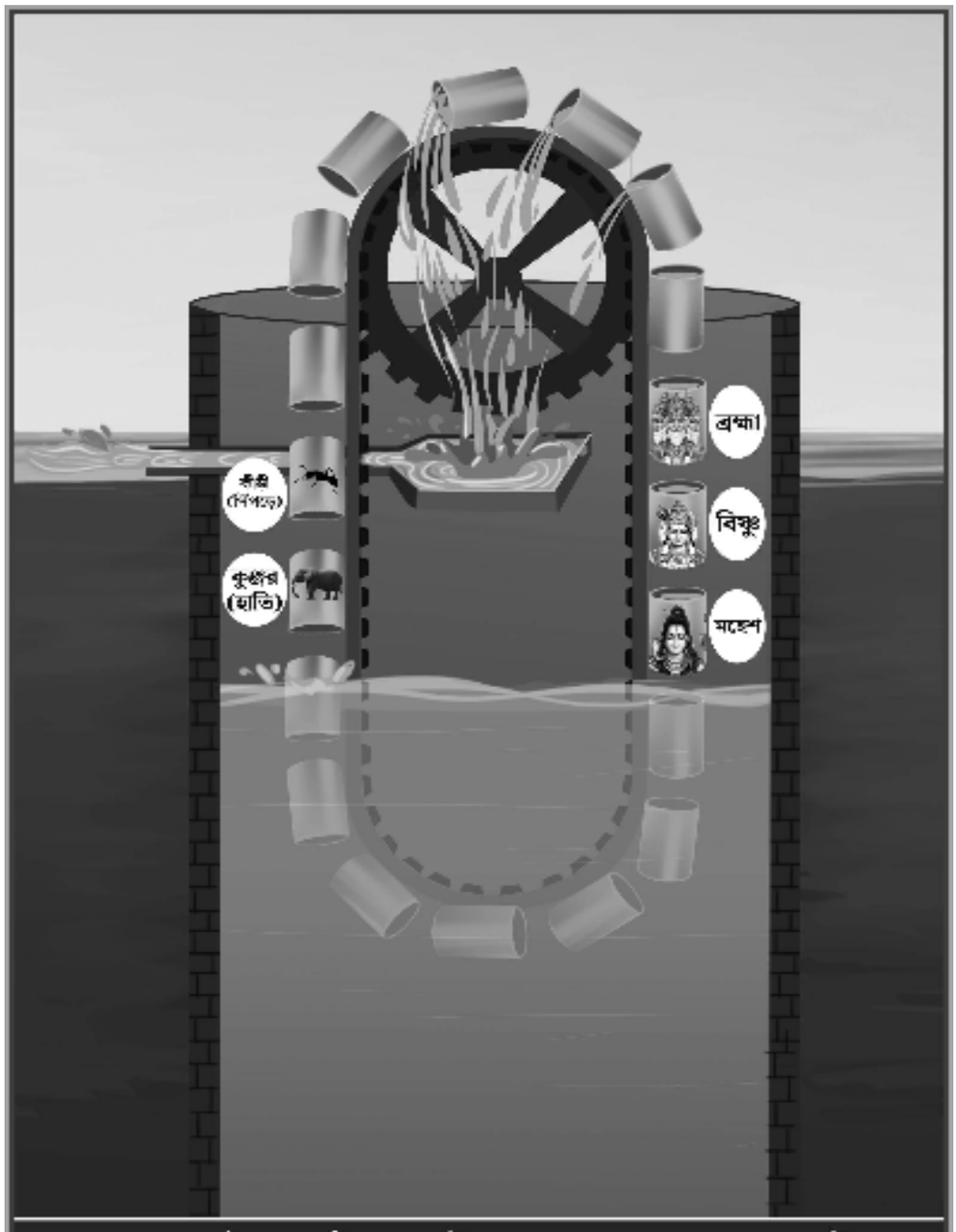

য়োহ হরহট কা কুঁয়া লোই, যা গল বন্ধা হে সব কই ।
কীড়ী কুঞ্জর ওর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কই বারা ।।

কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরহট)

গরীব"অনন্ত কোটি অবতার হৈঁ, মায়া কে গোবিন্দ। কর্তা হোয় হোয় উতরেঁ, বহুর পড়েঁ জগ ফন্দ"

সতপুরুষ কবীর সাহেবের ভক্তি দ্বারাই পূর্ণ মুক্তি হতে পারে। জীব যতক্ষণ সতলোকে ফিরে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কালের লোকে এইপ্রকার কর্ম করবে আর জপে আসা নাম ও দান ধর্ম করা পুন্য ফলে স্বর্গ রূপী হোটেলে গিয়ে খরচ করে, পুনরায় কর্মের আধারে এই চুরাশি লক্ষ প্রকারের প্রাণীদের শরীরে কষ্ট ভোগ করার জন্য কালের লোকে পুনরায় এসে চক্কর কাটতে থাকবে। মায়া (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়ে কোটি কোটি গোবিন্দ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) মৃত্যুকে বরণ করেছেন। ভগবানের অবতার হয়ে এসেছিলেন আর পরে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, কর্মকে ভোগ করে চুরাশি লাখ যোনিতে চলে গিয়েছেন। যেমন ভগবান বিষ্ণুর উপর দেবর্ষি নারদের অভিশাপ ছিল, সেইজন্য বিষ্ণুকে শ্রী রামচন্দ্র রূপ ধারণ করে অযোধ্যাতে আসতে হয়েছিল। শ্রীরাম রূপে এখানে এসে তিনি বালিকে বধ করেছিলেন। এই পাপের কর্মদণ্ড ভোগ করার জন্য আবার কৃষ্ণ রূপে জন্ম নিতে হয়েছিল। পরে সেই বালির আত্মা এক শিকারী হয়ে, নিজের প্রতিশোধ নিলেন। ওই বালির আত্মা রূপী শিকারী, শ্রী কৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর মেরে বধ করেছিলেন।

মহারাজ গরীব দাস জী তাঁর নিজের বাণীতে বলেছেন :-

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মায়া অউর ধর্মরায় কহিয়ে। ইন পাঁচোঁ মিল পরপঞ্চ বনায়া, বাণী হমরী লহিয়ে॥
ইন পাঁচোঁ মিল জীব অটকায়ে, জুগন-জুগন হম আন ছুটায়ে॥
বন্দী ছোড় হমারা নামম্, অজর অমর হে অস্থির ঠামম্॥
পীর পৈয়গম্বর কুতুব ঔলিয়া, সুর নর মুনিজন জ্ঞানী। যেতা কূঁ তো রাহ ন পায়া, জম কে বন্ধে প্রাণী॥
ধর্মরায় কী ধুমা-ধামী, জম পর জংগ চলাউঁ। জৌরা কূঁ তো জান ন দেয়োঙ্গা, বান্ধ অদলি ঘর ল্যাউঁ॥
কাল অকাল দোহূঁ কূঁ মোসূঁ, মহাকাল সির মুন্ডু॥ মৈঁ তো তখ্ত হুজুরী হুকমী, চোর খোজ কূঁ ঢুন্ডু॥
মূলা মায়া মগ মেঁ বৈঠী, হংসা চুন-চুন খাঈ। জ্যোতি স্বরূপী কহ নিরঞ্জন, মৈঁ হী কর্তা ভাঈ॥
সহংস অঠাশী দীপ মুলীশ্বর, বন্ধে মূলা ডোরী। এত্যাঁ মেঁ জম কা তলবানা, চলিয়ে পুরুষ কীশোরী॥
মূলা কা তো মাথা দাগুঁ, সতকি মৌহর করুঙ্গা। পুরুষ দীপ কূঁ হংস চলাউঁ, দরা ন রোকন দয়োঙ্গা।
হম তো বন্দী ছোড় কহাবাঁ ধর্মরায় হৈ চকবৈ। সতলোক কী সকল সুনাবাঁ, বাণী হমরী অখবৈ॥
নৌ লখ পট্টন উপর খেলূঁ, সাহদরে কূঁ রোকূঁ। দ্বাদশ কোটি কটক সব কাটূঁ, হংস পঠাউঁ মোখূঁ॥
চৌদহ ভুবন গমন হৈ মেরা, জল থল মেঁ সরবঙ্গী। খালিক খলক খলক মেঁ খালিক, অবিগত অচল অভঙ্গী॥
অগর অলীল চক্র হৈ মেরা, জিত সে হম চল আয়ে। পাঁচোঁ পর প্রবাণা মেরা, বন্ধি ছুটাবন ধায়ে॥
জহাঁ ঔমকার নিরঞ্জন নাহীঁ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বেদ নহীঁ জাহীঁ।
জহাঁ করতা নহীঁ জান ভগবানা, কায়া মায়া পিণ্ড ন প্রাণা॥
পাঁচ তত্ত্ব তীনোঁ গুণ নাহীঁ, জৌরা কাল দ্বীপ নহীঁ জাহীঁ।
অমর করূঁ সতলোক পঠাঁউ, তাতৈঁ বন্দী ছোড় কহাউঁ॥

কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেবের) মহিমার বিষয়ে আদরণীয় গরীব দাস সাহেব তাঁর বাণীতে বলছেন যে, আমার প্রভু হলেন কবির্ (কবির্দেব) বন্দী ছোড়। বন্দী ছোড়ের ভাবার্থ হল - কালের কারাগার থেকে যিনি মুক্ত করেন, কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে সর্বপ্রাণী পাপের কারণে কালের বন্দী হয়ে রয়েছে। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব (কবির্দেব/কবীর খুদা) পাপকে নষ্ট করে দেন। পাপের বিনাশ না তো ব্রহ্মা, না পরব্রহ্ম, না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না শিব করতে পারেন, এনারা কেবল যে যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমনই ফল দিতে পারেন। এইজন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২ তে লেখা আছে, 'কবিরংঘারিরসি'=(কবির্) কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) (অঙ্ঘ অরি) পাপের শত্রু, 'বন্ডারিরসি'=(বন্ডারিঃ) বন্ধনের (অরি) শত্রু অর্থাৎ বন্ধনের শত্রু বা যিনি হচ্ছেন বন্দীছোড়।

এই পাঁচ জনের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়া-ধর্মরায়) উপরে সতপুরুষ পরমাত্মা (কবীর্দেব) আছেন, যিনি সতলোকের মালিক। ইনি ছাড়া অন্য সব যেমন - পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আদি মায়া এনারা সব নাশবান (মৃত্যু প্রাপ্ত হন) ভগবান। মহাপ্রলয়ের সময় এই সকল প্রভু ও এনাদের সকল লোক (ধাম) সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাধারণ প্রাণীদের থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি আয়ু এনাদের হয় কিন্তু এনাদের যে সময় পর্যন্ত আয়ু নির্ধারিত হয়ে রয়েছে তা একদিন অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী মহারাজ বলেছেন :-

শিব ব্রহ্মা কা রাজ, ইন্দ্র গিনতী কহাঁ। চ্যার মুক্তি বৈকুণ্ঠ সমঝ, য়েতা লহ্যা॥
সংখ জুগন কী জুনী, উম্র বড় ধারিয়া। জা জননী কুর্বান, সু কাগজ পারিয়া॥
ঐতী উম্র বুলন্দ মরৈগা অন্ত রে। সত্গুরু লগে ন কান, ন ভেঁটে সন্ত রে॥

তাতে যদিও বা তাদের সংখ যুগের দীর্ঘ আয়ু হোক না কেন, একদিন সমাপ্ত অবশ্যই হবে। যদি সতপুরুষ

পরমাত্মার (কবির্দেবের) অর্থাৎ কবীর সাহেবের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত (পূর্ণ গুরু) যিনি তিন নামের মন্ত্র (ওম্+তত্+সত্ সাংকেতিক মন্ত্র) দেন এবং ওই পূর্ণ সন্তকে যদি পরমাত্মার দ্বারা নাম দান দেওয়ার আদেশ থাকে, তাহলে তাঁর থেকে নামদীক্ষা (উপদেশ) নিয়ে নামের কামাই করলে, তবেই আমরা সতলোকের অধিকারী হংস (পবিত্র আত্মা) হতে পারব। সত্য সাধনা না করতে পারলে, দীর্ঘ আয়ু কোনো কাজে আসবে না, কেননা জ্যোতি নিরঞ্জনের লোকে কেবল দুঃখ আর দুঃখই রয়েছে।

কবীর, জীবনা তো থোড়া হী ভলা, জৈ সত সুমরন হোয়।
লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখৈ ধরে না কোয়॥

❖ যদি সত্য সাধনা করা যায়, তাহলে অল্প আয়ুও ভাল। আর যদি সত্য সাধনা সতপুরুষের করা না হয় এবং কাল ব্রহ্মের ও দেবী-দেবতাদের পূজা করে ও প্রাণায়াম ইত্যাদি করে দীর্ঘ আয়ু জীবন প্রাপ্ত করা ব্যক্তিদের, কোনো চিহ্ন বা গণনা মোক্ষের মার্গে (Account) করা হবে না। এতো দীর্ঘ আয়ু (যতটা শঙ্করের আয়ু) প্রাপ্ত হলেও, একদিন মৃত্যু অবশ্যই হবে, ভুল ভক্তি করার কারণে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে। এত দীর্ঘ আয়ুর কি মূল্য?

কবীর সাহেব স্বয়ং নিজের (পূর্ণ ব্রহ্মের) পরিচয় নিজেই বলেন, এইসব প্রভুদের উপরে অসংখ্য ভূজার (হাত) পরমাত্মা সৎপুরুষ আছেন, যিনি সত্যলোকে (শাশ্বতধাম, সচ্চখন্ড) থাকেন এবং তাঁর অন্তর্গত সর্বলোক {ব্রহ্মের (কাল) ২১ ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির (দুর্গা) লোক এবং পরব্রহ্মের সাত সংখ ব্রহ্মাণ্ড ও অন্যান্য সর্ব ব্রহ্মাণ্ড} আসে এবং সেখানে সত্যনাম-সারনামের জপ দ্বারাই যাওয়া যায়, যা পূর্ণ গুরু থেকে প্রাপ্ত করতে হয়। যে আত্মারা সচ্চখণ্ডে (সতলোক) চলে যায়, তাদের পুনরায় আর পুনর্জন্ম হয় না। সতপুরুষ (পূর্ণব্রহ্ম) কবীর সাহেবই (কবির্দেব) অন্য অন্য লোকে (ধামে) স্বয়ং ভিন্ন-ভিন্ন নামে বিরাজমান হন। যেমন অলখ লোকে অলখ পুরুষ, অগম লোকে অগমপুরুষ এবং অকহ লোকে অনামী পুরুষ রূপে বিরাজমান আছেন। এ তো কেবল তাঁর উপামাত্মক নাম কিন্তু ওই পূর্ণ পুরুষের বাস্তবিক নাম হল কবির্দেব (ভাষা ভিন্ন হয়ে তাঁকে কবীর সাহেব বলা হয়)।

"আদরণীয় নানক সাহেবের বাণীতে সৃষ্টি রচনার সংকেত"

শ্রী নানক সাহেবের অমৃতবাণী, মহলা ১, রাগ বিলাবলু , অংশ ১ (গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৩৯)

আপে সচু কীআ কর জোড়ি। অংডজ ফোড়ি জোডি বিছোড়॥
ধরতী আকাশ কীয়ে বৈসণ কউ থাউ। রাতি দিনন্তু কীয়ে ভউ-ভাউ॥
জিন কিয়ে করি বেখণহারা। (৩)
ত্রিতীআ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশা। দেবী দেব উপায়ে বেসা॥ (৪)
পউণ পাণী অগনী বিসরাউ। তাহী নিরঞ্জন সাচো নাউ॥
তিসু মহি মনুআ রহিআ লিব লাঈ। প্রণবতি নানকু কালু ন খাঈ ॥ (10)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল যে, সত্য পরমাত্মা (সতপুরুষ) স্বয়ং নিজের হাতে সর্ব সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি ডিম বানিয়ে পরে ভেঙেছেন এবং তার মধ্য থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বেরিয়েছিলেন। ওই পূর্ণ পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীদের বসবাস করার জন্য পৃথিবী, আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল এই পাঁচ তত্ত্ব রচনা করেছেন। নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির তিনি নিজেই সাক্ষী। অন্য কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারবে না। ডিম থেকে ফেটে বের হওয়া জ্যোতি নিরঞ্জনের পরে তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু শ্রী শিব) এবং অন্য দেবী-দেবতারা ও অন্যান্য অগণিত জীবের উৎপত্তি হয়েছে। তারপর অন্য দেবী - দেবতাদের জীবন চরিত্র এবং অন্যান্য মুনি ঋষিদের অনুভবে ছয় শাস্ত্র ও আঠারো পুরাণ তৈরি হয়েছে। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনামের (সতনামের) সাধনা অনন্য মনে করলে এবং গুরু মর্যাদায় থাকা ব্যক্তিদেরকে (প্রণবতিদের), শ্রী নানকদেব বলছেন যে, কাল জ্যোতি নিরঞ্জন তাদেরকে খায় না।

রাগ মারু (অংশ) অমৃতবাণী মহলা ১ (গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ১০৩৭)

সুনহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেসু উপায়ে । সুনে বরতে যুগ সবায়ে ॥
ইসু পদ বিচারে সো জনু পুরা। তিস মিলিয়ে ভরমু চুকাইদা॥ (৩)
সাম বেদু, রূগু জুজরূ অথরবণু। ব্রহ্মোঁ মুখ মাইয়া হৈ ত্রৈগুণ॥
তা কী কীমত কহি ন সকৈ। কো তিউ বোলে জিউ বুলাঈদা॥ (৯)

উপরোক্ত অমৃতবাণীর সারাংশ হল, যে সন্ত সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচনা শোনাবেন এবং বলবেন যে, ডিম দুই ভাগ হওয়ার

পরে তার ভিতর থেকে কে বেরিয়েছিল, পরে যে ব্রহ্মলোকের শূন্যে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি করেছিলেন, ওই পরমাত্মা কে? যিনি ব্রহ্মের (কাল) মুখ দিয়ে চার বেদের (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদকে) উচ্চারণ করিয়েছিলেন, ওই পূর্ণ পরমাত্মা যখন যেমন চাইবেন, ঠিক তেমনই প্রাণীদের দিয়ে বলাতে পারেন। এই সর্ব জ্ঞানকে পূর্ণরূপে জানা সন্তের বা গুরুর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়ার পরে তাঁর কাছে যাও এবং যিনি সর্ব শঙ্কার সম্পূর্ণ রূপে নিবারণ করে দেবেন, তিনিই পূর্ণ গুরু অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ৯২৯, অমৃত বাণী শ্রী নানক সাহেবের "রাগ রামকলী মহলা" ১ দখণী ওঁকার :-

ওঅঙ্কারি ব্রহ্মা উৎপত্তি। ওঅঙ্কারু কীয়া জিনি চিত। ওঅঙ্কারি সৈল জুগ ভয়ে। ওঅঙ্কারি বেদ নিরময়।
ওঅঙ্কারি সবদি উধরে। ওঅঙ্কারি গুরুমুখি তরে। ওনম অখর সুনহু বীচারু। ওনম অখরু ত্রিভবণ সারু।

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, ওঙ্কার অর্থাৎ জোতি নিরঞ্জন (কাল) দ্বারা শ্রীব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। কয়েক যুগ পর্যন্ত আনন্দ-ফুর্তি করে ওঙ্কার (কাল/ব্রহ্ম) বেদগুলি উৎপত্তি করেছেন, যে বেদগুলি পরে ব্রহ্মা প্রাপ্ত করেছিলেন। তিন লোকের ভক্তি কেবল এক ওউম্ মন্ত্রই বাস্তবে জপ করার আছে। এই ওউম্ শব্দ পূর্ণ গুরুর নিকট হতে দীক্ষা নিয়ে অর্থাৎ গুরু ধারণ করে, জপ করলে উদ্ধার হয়।

বিশেষ :- শ্রী নানক সাহেব তিন মন্ত্রের (ওম্+তত্+সত্) বিষয়ে আলাদা-আলাদা স্থানে রহস্যময় ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তা কেবল পূর্ণ গুরুই (তত্ত্বদর্শী) বুঝতে পারেন এবং তিন মন্ত্রের জপের বিষয়ে কেবল দীক্ষা প্রাপ্ত ভক্তকেই বোঝানো হয়।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ১০৩৮)

উত্তম সতিগুরু পুরুষ নিরালে, সবদি রতে হরি রস মতবালে।
রিধি, বুধি, সিধি, গিয়ান গুরুতে পাইয়ে, পুরে ভাগ মিলাঈদা॥ ১৫।
সতিগুরু তে পাএ বীচারা, সুন সমাধি সচে ঘরবারা॥
নানক নিরমল নাদু সবদ ধুনি, সচু রামৈঁ নামি সমাইদা ॥(১৭)॥

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল যে, বাস্তবিক জ্ঞান দেওয়া সদগুরু তো দুর্লভই হন, তিনি কেবল নাম জপকে জপ করেন, অন্য হঠযোগ সাধনার কথা বলেন না। যদি আপনার ধন-দৌলত, পদ, বুদ্ধি বা ভক্তি শক্তিও প্রয়োজন হয়, তাহলে ওই ভক্তি মার্গের জ্ঞান, পূর্ণ গুরুই সম্পূর্ণ প্রদান করবেন, এমন পূর্ণ সন্ত (গুরু) তো বড় পুণ্য ও ভাগ্যের দ্বারাই পাওয়া যায়। ওই পূর্ণ সন্ত বিবরণ বলে দেবেন যে, উপরের শূন্যে (আকাশে) আমাদের বাস্তবিক ঘর (সতলোক) আছে, যা পরমেশ্বর বানিয়ে রেখেছেন।

সেখানে এক বাস্তবিক সার নামের ধুন (শব্দ) চলছে, ওই আনন্দতে অবিনাশী পরমেশ্বরের সার শব্দতে বিলীন হওয়া যায় অর্থাৎ ওই বাস্তবিক আনন্দময় সুখদায়ী স্থানে নিবাস হতে পারে, অন্য নামের (মন্ত্র) দ্বারা কিংবা অজ্ঞানী অসম্পূর্ণ গুরু দ্বারা সম্ভব হতে পারে না।

আংশিক অমৃতবাণী মহলা পহলা (শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা নং ৩৫৯-৩৬০)

সিব নগরী মহি আসণি বৈসউ কলপ ত্যাগী বাদং। (১)
সিনঙী সবদ সদা ধুনি সোহৈ অহিনিসি পূরৈ নাদং। (২)
হরি কীরতি রহ রাসি হমারী গুরু মুখ পন্থ অতীতং (৩)
সগলী জ্যোতি হমারী সঁমিআ নানা বরণ অনেকং।
কহ নানক সুণি ভরথরী জোগী পারব্রহ্ম লিব একং। (৪)

উপরোক্ত অমৃত বাণীর ভাবার্থ হল যে, শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, হে ভরথরী যোগীজি! আপনার সাধনা তো ভগবান শিব পর্যন্ত, সেই কারণে আপনি শিব নগরীতে (শিব লোকে) স্থান পেয়েছেন আর শরীরে যে সিঙ্গী শব্দ ইত্যাদি হচ্ছে, তা হলো শরীরের কমলের (চক্রের) এবং টেলিভিশনের মতো প্রত্যেক দেবতাদের লোক (ধাম) হতে শরীরে শুনতে পাওয়া যায়।

আমি তো এক পরমাত্মা পারব্রহ্ম অর্থাৎ সব থেকে উপরে যিনি পূর্ণ পরমাত্মা আছেন, অন্য কোনো এক পরমাত্মাতে লৌ (অন্যান্য মন দ্বারা ধ্যান) লাগাই।

আমি লোক দেখানো (ভস্ম মেখে, হাতে লাঠি রাখা) এসব করি না। আমি তো সকল প্রাণীকে এক পূর্ণ পরমাত্মার

(সত্পুরুষের) সন্তান মনে করি। সমস্ত কিছু ওঁনার শক্তি দ্বারাই চলছে। আমার মুদ্রা তো সত্য নামের জপ, যা সদগুরুর থেকে প্রাপ্ত করে জপতে হয় এবং ক্ষমা করাটা হলো আমার বাণা (বেশভূষা)। আমি তো পূর্ণ পরমাত্মার উপাসক, পূর্ণ সদগুরুর ভক্তি মার্গ এর থেকে ভিন্ন।

অমৃত বাণী রাগ আসা মহলা ১ (শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা ৪২০)

॥ আসা মহলা ১॥ জিনী নামু বিসারিআ দূজৈ ভরমি ভুলাঈ। মূলু ছোড়ি ডালী লগে কিআ পাবহি ছাঈ॥১॥ সাহিবু মেরা একু হৈ, অবরু নাহি ভাঈ। কিরপা তে সুখু পাইআ সাচে পরথাঈ॥৩॥ গুরু কী সেবা সো করে জিসু আপি করাএ। নানক সিরু দে ছুটিয়ে দরগহ পতি পাএ॥৮॥ ১৮॥

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ হল, শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, যারা পূর্ণ পরমাত্মার (কাদির আল্লার) বাস্তবিক নাম ভুলে অন্য ভগবানের (অন্য আল্লার) নামের জপে ভ্রমিত হয়ে রয়েছো, তারা তো এমন করছে যে, মূলকে (পূর্ণ পরমাত্মাকে বা পূর্ণ আল্লাকে) বাদ দিয়ে ডালগুলোতে (তিনগুণ রূপী রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব দেবতাকে) জল ঢালছে অর্থাৎ ইবাদত করছে। ওই সাধনায় কোনো সুখ হতে পারে না অর্থাৎ গাছ শুকিয়ে যাবে, তাহলে ছায়াতে বসতে পারবে না। ভাবার্থ হল যে, শাস্ত্র বিধির বিরুদ্ধ সাধনা করা মানে ব্যর্থই চেষ্টা, এটিতে লাভ হয় না। এর প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ তেও আছে। ওই পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করার জন্য মনমতো (নিজের ইচ্ছানুসার করা) সাধনা ত্যাগ করে, পূর্ণ গুরুদেবকে সমর্পণ করলে আর সত্য নামের জপ দ্বারাই পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব, তা না হলে মৃত্যুর পরে নরকে যেতে হবে।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৪৩-৮৪৪)

॥ বিলাবলু মহলা ১॥ মৈঁ মন চাহু ঘণা সাচি বিগাসী রাম। মোহী প্রেম পিরে প্রভু অবিনাসী রাম। অবিগতো হরি নাথু নাথহ তিসৈ ভাবৈ সো থীঐ। কিরপালু সদা দইআলু দাতা জীআ অন্দরি তুঁ জিঐ। মৈঁ আধারু তেরা তু খসমু মেরা মৈ তাণু তকীআ তেরও। সাচি সূচা সদা নানক গুরসবদি ঝগরু নিবেরও॥৪॥২॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা, নাথেরও নাথ অর্থাৎ তিনি দেবতাদেরও (সর্ব প্রভু যেমন শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব এবং ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এনাদেরও উপরের যিনি নাথ অর্থাৎ স্বামী) দেব, আমি তো সত্য নামকে হৃদয়ে ধারণ করে রেখে দিয়েছি। হে পরমাত্মা! আপনিই সমস্ত প্রাণীর জীবনের আধার। আমি আপনার আশ্রয়ে রয়েছি, আপনি আমার মালিক। আপনিই গুরু রূপে এসে সত্যভক্তির নির্ণায়ক জ্ঞান প্রদান করে, সমস্ত ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সর্ব শঙ্কার সমাধান করে দিয়েছেন।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১, রাগ তিলক মহলা ১)

য়ক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কূন করতার। হক্কা কবীর করীম তূ বেঅব পরবরদিগার।
নানক বুগোয়দ জন তুরা তেরে চাকরাং পাখাক॥

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হে সত্কবীর (কুন করতার/হক্কা কবীর) আপনি শব্দ শক্তি দিয়ে রচনা করা শব্দ স্বরূপী প্রভু অর্থাৎ সর্ব সৃষ্টির রচনহার। আপনিই বেএব নির্বিকার (পরবরদিগার) সর্বের পালন কর্তা দয়ালু প্রভু, আমি আপনার দাসেরও দাস।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪, রাগ সীরী মহলা ১)

তেরা এক নাম তারে সংসার, মৈঁ ঐহা আস ঐহো আধার।
নানক নীচ কহৈ বিচার, ধাণক রূপ রহা করতার॥

উপরোক্ত অমৃত বাণী প্রমাণ করে যে, কাশীতে যে ধাণক (জুলাহা/তাঁতি) আছেন, তিনিই কূলের সৃজনহার (করতার/মালিক)। অতি অধীন হয়ে শ্রী নানক সাহেব বলছেন যে, আমি সত্য বলছি, এই ধাণক অর্থাৎ কবীর তাঁতিই হলেন পূর্ণব্রহ্ম (সতপুরুষ)।

বিশেষ :- উপরোক্ত প্রমাণের সাংকেতিক জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হল সৃষ্টির রচনা কিভাবে হয়েছে? অতএব পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করা উচিত, যা পূর্ণ সন্তের অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর নিকট থেকে নামদীক্ষা (উপদেশ) নিলেই সম্ভব হয়।

"অন্যান্য সাধু-সন্তদের দ্বারা সৃষ্টি রচনার রূপকথা"

অন্য গুরুদের দ্বারা যে সৃষ্টি রচনার জ্ঞান বলা হয়েছে, তা কেমন? কৃপা করে নিম্নে পড়ুন :- **সৃষ্টির রচনার বিষয়ে রাধা স্বামী পন্থের সন্ত এবং ধন ধন সতগুরু পন্থের সন্তের বিচার :-**

পবিত্র পুস্তক **"জীবন চরিত্র পরম সন্ত বাবা জয়মল সিংহ মহারাজ" পৃষ্ঠা নং ১০২- ১০৩ থেকে "সৃষ্টির রচনা"** (সাবন কৃপাল পাবলিকেশন, দিল্লী)

"প্রথমে সতপুরুষ নিরাকার ছিলেন, পরে আকারে (ইজহারে) আসেন, তখন উপরের তিন নির্মল মন্ডল (সতলোক, অলখলোক, অগমলোক) তৈরি হয়ে গেল এবং প্রকাশ ও মণ্ডলের নাদ (ধুনি) সৃষ্টি হয়ে গেল।"

পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর), প্রকাশক :- রাধাস্বামী সৎসঙ্গ সভা, দয়ালবাগ আগরা, "সৃষ্টি রচনা" পৃষ্ঠা-নং ৮ :-

"প্রথমে অন্ধকারময় ছিল। তাতে পুরুষ অসাড় অবস্থায় ছিল। যখন কিছুরই রচনা হয়নি। পরে যখন মৌজ হল তখন শব্দ প্রকট হল আর তার থেকে সমস্ত কিছুর রচনা হয়েছে, প্রথমে সতলোক আর তারপর সতপুরুষের কলা থেকে তিনলোক এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর বিস্তার হয়েছে।"

এই জ্ঞান এমন যেমন- এক সময় একটা ছেলে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়, তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি মহাভারত পড়েছেন? ছেলেটি উত্তর দিল, নামতার মতো মহাভারত আমার আঙ্গুলে মুখস্থ করে রেখেছি। অফিসার প্রশ্ন করল, পাঁচ পাণ্ডবের নাম বলো। ছেলেটি উত্তর দিল যে, এক ভীম ছিল, এক তার বড় ভাই ছিল, একজন তার ছোট ছিল, একজন আরও ছিল আর এক জনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। উপরোক্ত সৃষ্টি রচনার জ্ঞানও ঠিক এমনই।

সতপুরুষ ও সতলোকের মহিমা বলা ব্যক্তি ও পাঁচ নাম (ওঙ্কার-জ্যোতি নিরঞ্জন-ররঙ্কার-সোহং- সত্যনাম) দেওয়া ব্যক্তি এবং তিন মন্ত্রের (অকাল মূর্তি-সতপুরুষ-শব্দ স্বরূপী রাম) নাম দেওয়া গুরুদের দ্বারা রচনা করা পুস্তক হতে কিছু নিষ্কর্ষ :-

সন্তমত প্রকাশ ভাগ ৩ পৃষ্ঠা ৭৬ -তে লেখা আছে যে, "সচ্চখণ্ড বা সতনাম চতুর্থ লোক (ধাম),-কে, এখানে 'সতনাম' স্থান বলছেন। আবার এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নম্বর ৭৯ তে লেখা আছে যে , "এক রাম দশরথের পুত্র, দ্বিতীয় রাম 'মন', তৃতীয় রাম 'ব্রহ্ম' চতুর্থ রাম 'সতনাম' এই আসল রাম।" আবার পবিত্র পুস্তক "সন্তমত প্রকাশ" প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা নং ১৭ তে লেখা আছে যে, "ওটাই সতলোক, ওটিকেই সতনাম বলা হয়।" পবিত্র পুস্তক "সার বচন অর্থাৎ বার্তিক" পৃষ্ঠা নং ৩ তে লেখা আছে যে, এখন বোঝা উচিৎ যে, রাধা স্বামী পদ সব থেকে উচ্চ মোকাম (স্থান), যাকে সন্তগণ সতলোক, সচ্চখন্ড, সার শব্দ, সত শব্দ, সতনাম ও সতপুরুষ বলে ব্যক্ত করেছেন।" পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) আগ্রা থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা নং ৪ - তেও উপরোক্ত যথারীতি তেমনই বর্ণনা করা রয়েছে। পবিত্র পুস্তক "সচ্চখন্ডের সড়ক" পৃষ্ঠা নং ২২৬ "সন্তদের দেশ সচ্চখণ্ড বা সতলোক, তাকেই সতনাম, সতশব্দ, সারশব্দ বলা হয়েছে।"

বিশেষ :- উপরোক্ত ব্যাখ্যা এমন লাগছে, যেমন কোনো এক ব্যক্তি জীবনে না তো শহর দেখেছেন, না গাড়ি দেখেছেন, না পেট্রোল দেখেছেন, না ড্রাইভারের জ্ঞান আছে যে, ড্রাইভার কাকে বলে? আর সেই ব্যক্তি অন্য সাথীদের বলেছিলেন যে, আমি শহরে যাই, গাড়িতে বসে আনন্দ উপভোগ করি। তারপর সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন যে, গাড়ি কেমন হয়, পেট্রোল কেমন হয়, ড্রাইভার কেমন হয় ও শহর কেমন হয়? ওই গুরু উত্তর দিলেন যে, শহর বলো বা গাড়ি বলো একই কথা। শহরও গাড়ীই, পেট্রোলও গাড়িকেই বলে, ড্রাইভারও গাড়িকেই বলে এবং সড়কও গাড়ীকেই বলে। **আসুন বিচার করি :-** সতপুরুষ তো পূর্ণ পরমাত্মা আর সতনাম ওই দুই মন্ত্রের নাম, যার মধ্যে এক ওঁম্ + তত্ সাংকেতিক আছে এবং এরপরে সারনাম সাধককে (শিষ্যকে) পূর্ণ গুরুর দ্বারাই দেওয়া হয়। সতনাম ও সারনাম এই দুই নামই কেবল স্মরণ করতে হয়। সতলোক ওই স্থান আছে, যেখানে সতপুরুষ থাকেন। পুন্যাত্মাগণ! স্বয়ং নির্ণয় করুন, সত্য ও অসত্যের।

❑❑❑

“পবিত্র কুরআন থেকে পুস্তকে প্রমাণিত আয়তের ফটোকপি”

সূরাঃ অম্বিয়া - ২১ থেকে আয়ত নং ৩০- ৩২, ৯২, ১০৪ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ অম্বিয়া - ২১ আয়ত নং ৩০

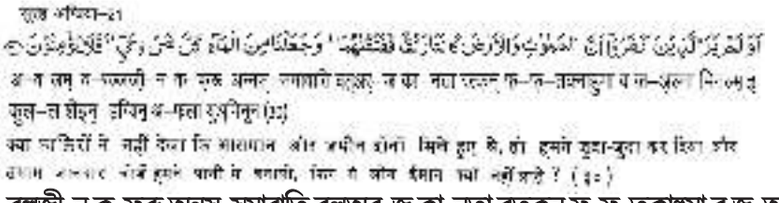

অ-ব লম্ য়-রল্লজী-ন ক-ফরূ অন্নস্-সমাবাতি বল্অর্-জ কা-নতা রত্কন্ ফ-ফ-তক্বাহুমা ব জ-অল্না মিনল্মাই কুল্-ল শৈইন্ হয়্য়িন্ অ-ফলা য়ুত্মিনূন। (৩০)

কাফিররা কি দেখেনি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী উভয় ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক-পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু আমি জল দ্বারা বানিয়েছি, তবুও তারা কেন বিশ্বাস আনতে পারছে না? (৩০)

সূরাহ অম্বিয়া - ২১ আয়ত নং ৩১

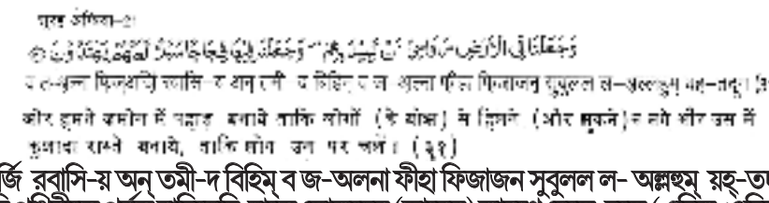

ব জ-অল্না ফিল্অর্জি রবাসি-য় অন্ তমী-দ বিহিম্ ব জ-অলনা ফীহা ফিজাজন সুবুলল ল- অল্লহুম্ য়হ্-তদূন। (৩১)

আর আমি পৃথিবীতে পর্বত বানিয়েছি, যাতে লোকদের (ভারের) কারণে হেলে-দুলে (এদিক-ওদিক) না যায় এবং তাতে প্রশস্ত রাস্তা বানিয়েছি, যাতে লোকেরা তার উপর চলতে পারে। (৩১)

সূরাহ অম্বিয়া - ২১ আয়ত নং ৩২

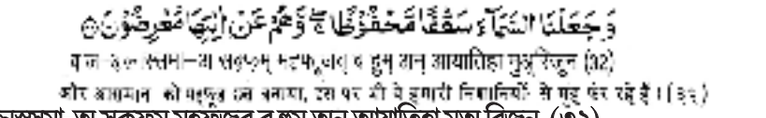

ব জ-অল্নস্সমা-অ সকফম্ মহফুজব্ ব হুম অন আয়াতিহা মুঅ্রিজুন (৩২)

আর আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি কিন্তু এরপরেও তারা আমার আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়েবা রয়েছে। (৩২)

সূরাহ অম্বিয়া- ২১ আয়ত নং ৯২

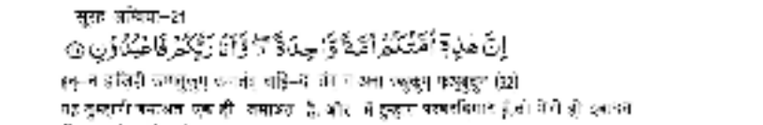

ইন্-ন হাজিহী উম্মতুকুম্ উম্মতব্ বাহি-দ-তব্ ব অনা রব্বুকুম্ ফঅ্'বুদূন্। (৯২)

এই তোমাদের জাতি, একটাই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমারই ইবাদত করো। (৯২)

সূরাহ অম্বিয়া- ২১ আয়ত নং ১০৪

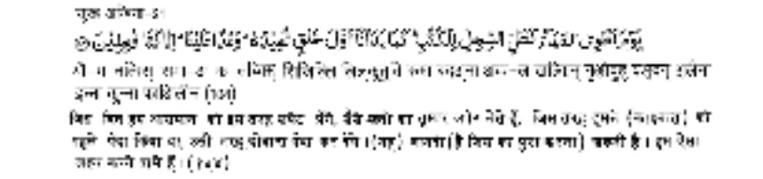

য়ৌ-ম নত্বিস্ সমা-অ ক-তয়্যিস্ সিজিল্লি লিল্কুতুবি কমা বদঅ্না অব্ব-ল খল্কিন নুঈদুহূ বঅ্দন অলৈনা ইন্না কুন্না ফায়িলীন। (১০৪)

যেদিন আমি আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব, যেভাবে নথিপত্রের বান্ডিল মুড়ে ফেলা হয়, যেভাবে আমি সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তি করেছিলাম, সেইভাবেই আমি পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা প্রতিশ্রুতি (রইল, যা পূর্ণ করা) আবশ্যক। আমি এটা অবশ্যই করবো। (১০৪)

সূরাঃ অনআম - ৬ থেকে আয়ত নং ১০৮ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ অনআম - ৬ আয়ত নং ১০৮

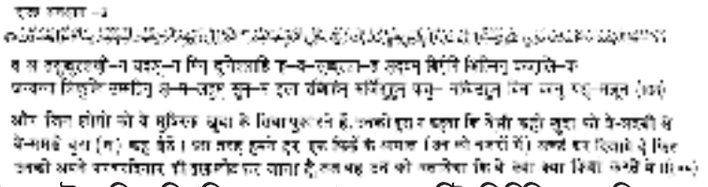

ব লা তসুব্বুল্লজী-ন য়দ্উ-ন মিন্ দূনিল্লাহি ফ-য়-সুব্বুল্লা-হ অদ্বম্ বিগৈরি য়িল্মিন কজালি-ক জয়্যন্না লিকুল্লি উম্মতিন অ-ম লহুম সুম্-ম ইলা-রব্বিহিম্ মর্জিউহুম্ ফয়ু-নব্বিউহুম্ বিমা-কানূ য়অ্-মলূন (১০৮)

আর এই মুশরিকরা (অবিশ্বাসীগণ) খুদাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, তাদের সম্পর্কে খারাপ বলবে না, পরে তারা সীমালঙ্ঘন করে খারাপ মনে করে, খুদাকে অপ শব্দ না বলে বসে। এইভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কার্যকলাপকে (তাদের দৃষ্টিতে) সুশোভন করে দেখিয়েছি, পরে পুনরায় তাদেরকে নিজের পরবরদিগারের নিকটে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তাদেরকে অবহিত করাবেন যে, তারা কি কি করতো। (১০৮)

সূরাঃ বাকারা - ২ থেকে আয়ত ২৫, ২৮, ২৯, ৩৫ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৫

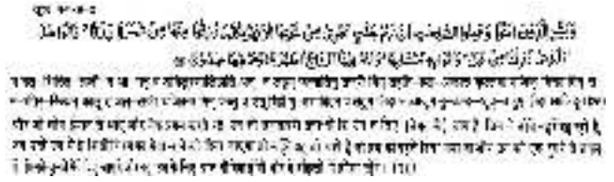

ব বশ্-শিরিল্-লজী-ন আ-মনূ ব অমিলুস্সালিহাতি অন্-ন লহুম্ জন্নাতিন্ তজ্ রী মিন্ তহ্তি-হল্-অন্হারু কুল্লমা-রুজিকূ মিনহা মিন্ স-ম-রতির্ -রিজক্বন কালূ হাজল্-লজী রুজিকনা- মিন্ ক্বব্লু ব উতূ বিহী মু-তশাবিহন্ ব লহুম্ ফীহা অজ্বাজুম্ মু-তহ্হ - রন্তুব্ -ব হুম্ ফীহা খালিদূন। (২৫)

এবং যারা ইমান নিয়ে এসেছে এবং সৎকর্ম চালিয়ে গেছে, তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য (অমূল্য) বাগান রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। যখন তাদের সেখান থেকে কোনো প্রকারের শুকনো ফল-ফলাদি খেতে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে এ তো তাই, যা আমাদেরকে পূর্বে দেওয়া হয়েছিল আর তাদেরকে একে অন্যের অনুরূপ শুকনো ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রীগণ থাকবে এবং তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে। (২৫)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৮

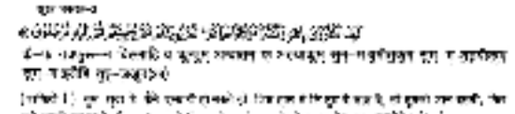

কৈ -ফ তকফুরু-ন বিল্লাহি ব কুন্তুম্ অম্বাতন্ ফ অহয়াকুম্ সুম্-ম য়ুমীতুকুম্ সুম্-ম য়ুহয়ীকুম্ সুম্-ম ইলৈহি তুর্- জয়ূন (২৮)

(কাফিরগণ!) তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো? যে অবস্থায় তোমরা যখন প্রাণহীন ছিলে, তখন তোমাদের জীবন দান করেছেন, পরে তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন, পরে তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (২৮)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৯

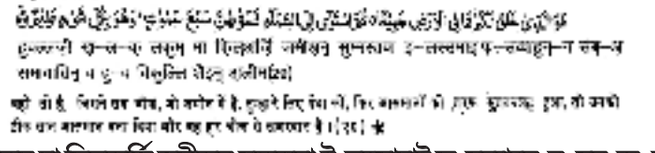

হুবলল্লজী খ-ল-ক্ব লকুম্ মা ফিল্অর্জি জমীঅন সুম্মস্তবা ই-লস্সামাই ফ-সব্বাহুন্-ন সব্-অ সমাবাতিন্ ব হু-ব বিকুল্লি

শৈইন্ অলীম (২৯)

তিনিই সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা পৃথিবীতে আছে, তারপরে আকাশের প্রতি মনোসংযোগ হলেন আর সেটাকে সাত আকাশে সুবিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ব বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। (২৯)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ৩৫

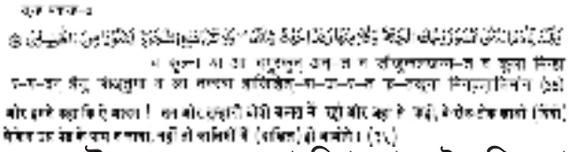

ব কুল্না য়া আ-দমুস্কুন্ অন্-ত ব জৌজুকলজন্ন -ত ব কুলা- মিন্হা র-গ-দন হৈসু শিঅতুমা ব লা তাক্বরবা-হাজিহিশ্-শ-জ-র-ত ফ-তকূনা মিনজ্জালিমীন (৩৫)

এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো আর যেখান থেকে যা ইচ্ছা, তা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো কিন্তু ওই বৃক্ষের নিকটে যাবে না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (৩৫)

সূরাঃ বাকারা - ২ থেকে আয়ত নং ৩৬, ৩৭, ৩৮, ১৮৮, ২১৯ - এর ফটোকপি :-

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ৩৬

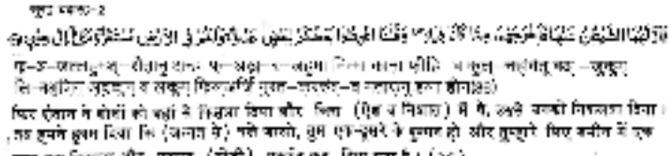

ফ-অ-জল্লহুমশ্ শৈতানু অন্হা ফ-অখ্-র-জহুমা মিম্মা কানা ফীহি ব কুল্-নহবিতু বঅ্-জুকুম্ লি-বঅজিন্ অদুব্বুন্ ব লকুম্ ফিল্অর্জি মুস্ত-কর্‌রুংব্-ব মতাউন্ ইলা-হীন। (৩৬)

তারপর শয়তান উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলন ঘটালো এবং যে (ঐশ ও নিশাত) স্থানে ছিল, সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। তখন আমি আদেশ দিলাম যে, (জান্নাত থেকে) চলে যাও এবং তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে যাও এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীর মাটিতে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বসবাসের স্থান ও মআশ (জীবিকা নির্বাহ) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। (৩৬)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ৩৭

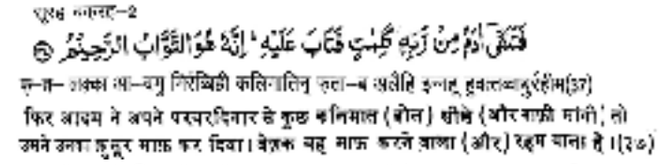

ফ-ত-লক্কা আ-দমু মিররব্বিহী কলিমাতিন্ ফতা-ব অলৈহি ইন্নহূ হুবত্তব্বাবুররহীম। (৩৭)

এরপরে আদম তাঁর নিজের রবের নিকট হতে কিছু কলিমাত (বাণী) শিখলেন (আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন) তারপর তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম দয়ালু। (৩৭)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ৩৮

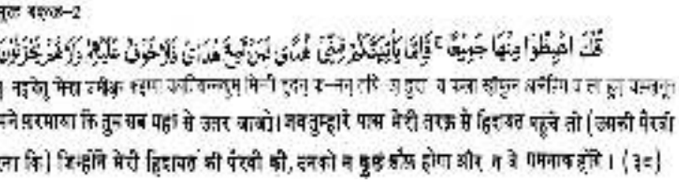

কুল্-নহবিতূ মিন্হা জমীঅন্, ফইম্মা য়অতিয়ন্নকুম্ মিন্নী হুদন্ ফ-মন্ তবি-অ হুদা-য় ফলা খৌফুন্ অলৈহিম ব-লা-হুম য়হ্‌জনূন। (৩৮)

আমি বললাম, তোমরা এই স্থান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও, যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোনো হেদায়েত পৌঁছবে, (তার অনুসরণ করবে), যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, তার না কোনো ভয় হবে আর না সে দুঃখী হবে। (৩৮)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ১৮৮

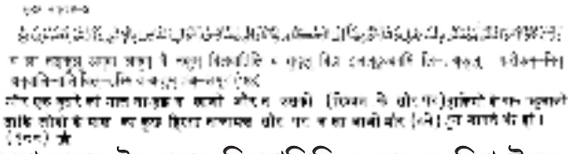

ব লা-তঅকুলূ অমবা-লকুম্ বৈ-নকুম্ বিলবাতিলি ব তুদ্ লু বিহা ইলল্ হুক্কামি লি-তঅকুলূ ফরীকম্-মিন্ অমবালিন্নাসি বিল্ ইস্মি ব অন্'তুম তঅ-লমূন্। (১৮৮)

আর একে অন্যের সম্পত্তির না দাবি করবে, না গ্রাস করবে আর না তার জন্য (ঘুষ হিসাবে) বিচারকের নিকট পৌঁছাবে, যাতে লোকের সম্পত্তির কিছু অংশ অন্যায়ভাবে না গ্রাস করে নাও আর (এটাও) তুমি জানো। (১৮৮)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২১৯

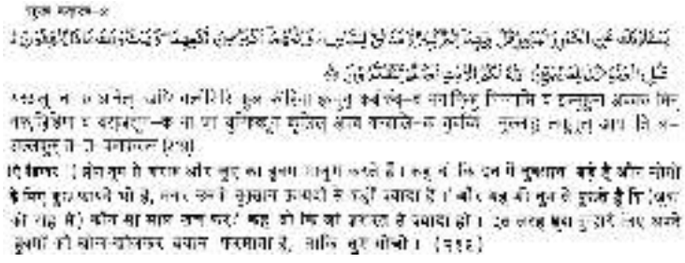

য়সঅলূ-ন-ক অনিল্-খম্রি বল্মৈসিরি কুল ফীহিমা ইস্মুন্ কবীরুব্-ব মনাফিউ লিন্নাসি ব ইস্মুহুমা অকবরু মিন্ নফ ইঅইহিমা ব য়স্অলূন-ক মা জা য়ুন্ফিকূন; কূলিল্ অফ্ব-কজালি-ক য়ুবয়্যি-নুল্লাহু লকুমুল্ আয়া তি ল-অল্লকুম্ ত-ত-ফ্ক্করূন। (২১৯)

(হে পয়গম্বর) লোকেরা তোমার নিকট হতে মদ জুয়ার বিষয়ে হুকুম জানতে চায়, বলে দাও যে, এগুলিতে ক্ষতি অধিক হয় আর লোকদের জন্য কিছুটা লাভও রয়েছে কিন্তু লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক এবং একথাও তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, (আল্লাহর মার্গে) কি পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করবে? বলে দাও যে, যেটা প্রয়োজনের থেকে অধিক আছে। এইভাবে খুদা তোমাদের জন্য নিজের নির্দেশগুলিকে খুলে-খুলে ব্যক্ত করছেন, যাতে তোমরা বিচার করতে পারো। (২১৯)

সূরাঃ বাকারা - ২ থেকে ২৪৩, ২৫৫, ২৬১ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৪৩

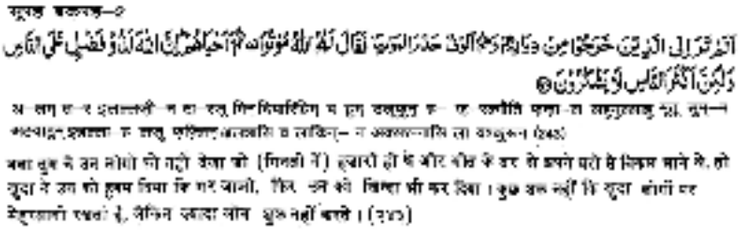

অ- লম্ ত-র ইলল্লজী-ন খ্-রজু মিন্ দিয়ারিহিম্ ব হুম উলূফুন্ হ-জ- রলমৌতি ফকা-ল লুহুমুল্লাহু মূতূ সুম্-ম অহ্যাহুম্ ইন্নল্লা-হ লজূ ফজলিন্ অল্লনাসি ব লাকিন্-ন অক্সরন্নাসি লা-য়শ্কুরূন্। (২৪৩)

তবে তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখনি, যারা (সংখ্যায়) হাজারে হাজারে ছিল আর মৃত্যুভয়ে তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ আদেশ দিলেন যে, মরে যাও, পরে তাদেরকে জীবিতও করে দিলেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (২৪৩)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৫৫

অল্লাহু লা-ইলা-হ ইল্লা-হু-ব অল্হয়্যুল্ কয়্যুমু লা তঅখুজুহূ সি-নতুব্ ব লা-নৌমুন্ লহূ মা-ফিস্সমাবাতি ব মা-ফিল্অর্জি মন্ জল্লজী য়াশ্ফউ ইন্দহূ ইল্লা বি -ইজনিহী য়অ-লম মা বৈ-ন অইদীহিম্ ব মা খলফহুম্ ব লা য়ুহীতূ-ন বিশৈইম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা-বিমা শা -অ বসি-অ কুরসিয়্যু হুস্-সমাবাতি বল্অর্জ ব লা য়উদুহূ হিফজুহুমা ব হুবল্ অলিয়্যুল্-অজীম। (২৫৫)

খুদা (তিনিই সত্য মাবুদ) তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি চিরজীবন্ত, তাঁর না তন্দ্রা আসে আর না নিদ্রা আসে। যা কিছু আকাশমন্ডলে ও যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে, সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট (অন্যের জন্য) সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু লোকদের সামনে ঘটছে এবং যা কিছু তাঁর অগোচরে ঘটে গিয়েছে, তিনি সর্ব বিষয় জানেন আর তাঁর জানা জ্ঞান থেকে কেউ কোনো কিছুর উপর আয়ত্ত (অর্জন) করতে পারে না, হ্যাঁ! তিনি যেমনটি চান (তিনি তেমনটি জানিয়ে দেন)। তাঁর সার্বভৌমত্ব (আর জ্ঞান) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার হয়ে রয়েছে এবং ঐ সমস্ত কিছুর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহিমান্বিত। (২৫৫)

সূরাহ বাকারা - ২ আয়ত নং ২৬১

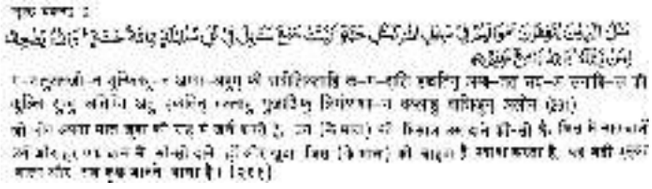

ম-সলুল্লজী-ন য়ুন্ফিকূ-ন অম্বা-লহুম্ ফী সবীলিল্লাহি ক-ম-সলি হব্বতিন অম্ব-তত্ সব্-অ সনাবি-ল ফী কুল্লি সুম্বু-লতিম্মি-অতু হব্বতিন্ বল্লাহু য়ুজাঅইফু লিময়্যশা-উ বল্লাহু বাসিউন্ অলীম। (২৬১)

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর মার্গে ব্যয় করেন, তাদের (ধন-সম্পদের) দৃষ্টান্ত হল একটি শস্য বীজের মতো, যার একটি দানা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেকটি শীষ থেকে শত-শত শস্য দানা যেমন উৎপন্ন হয় এবং আল্লাহ যার (ধন-সম্পদকে) চান, সেটিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, তিনি মহা প্রাচুর্যের অধিকারী ও সর্বজ্ঞ। (২৬১)

সূরাঃ বাকারা - ২ আয়ত নং ২৬২, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৬, ২৭৮ - এর ফটোকপি :-

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৬২

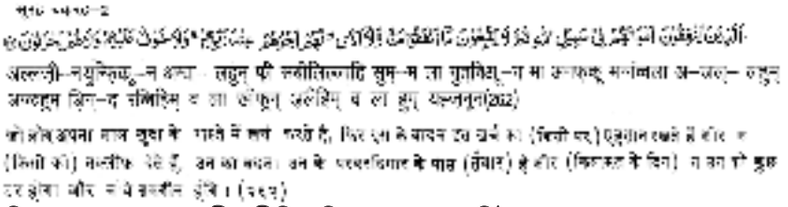

অল্লজী-ন য়ুন্ফিকূ-ন অম্বা- লহুম্ ফী সবীলিল্লাহি সুম্-ম লা য়ুতবিউ-ন মা অন্ফকূ মন্নব্বলা অ-জল্-লহুম অজরুহুম্ ইন্-দ রব্বিহিম্ ব লা-খৌফুন অলৈহিম্ ব লা হুম্ য়হজনুন। (২৬২)

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, ব্যয় করার পরে, না তার বদলে (কোনো কিছুর) প্রতিদান চায় আর না কাউকে কষ্ট দেয়, তার প্রতিফল তাদের পরবরদিগারের নিকট (পুরস্কার হিসাবে প্রস্তুত) রয়েছে আর (কিয়ামতের দিন) না তাদের কোনো ভয় হবে আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে। (২৬২)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৬৮

[illegible]

অশ্শৈতানু য়অইদুকুমুল্ ফক্-র ব য়অ্মুরুকুম্ বিল্ফ্হশা-ই বল্লাহু য়অইদুকুম্ মগ্ফি - র - তম্মিহু ব ফজলন্ বল্লাহু বাসিউন্ অলীম। (২৬৮)

(আর দেখো) শয়তান (এর কথা মানবে না, এ) তোমাদের অভাবগ্রস্তের ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীল কর্ম করতে বলে এবং খুদা তোমাদের কাছে নিজ পুরুস্কার ও দয়ার প্রতিশ্রুতি করেন। তিনি বড় দয়ালু (ও) সর্ব কিছু জানেন। (২৬৮)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৬৯

[illegible]

য়ুঅ্তিল্হিক্ম-ত মনয়য়শা-উ ব ময়য়ুঅ্তল্-হিক্ম-ত ফ-ক্বদ্ উতি-য় খৈরন্ কসীরন্ ব মা য়জ্-জক্করু ইল্লা উলুল্- অল্বাব। (২৬৯)

তিনি যাকে চান, তাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন আর যে সেই হিকমত পেয়েছে, সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ প্রাপ্ত করেছে আর উপদেশকে সেই ব্যক্তিরা স্বীকার করে, যারা বুদ্ধিমান। (২৬৯)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৭৬

[illegible]

য়ম্হকুল্লাহুর্রিবা ব য়ুর্বিস্স-দক্বাতি বল্লাহু লা-য়ুহিব্বু কুল্-ল কফ্ফারিন্ অসীম। (২৭৬)

আল্লাহ সুদখোরীকে ধ্বংস (অর্থাৎ খুব দুঃখিত) করেন আর দানীকে (আশীর্বাদ দ্বারা) বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে সাথী হিসাবে রাখেন না। (২৭৬)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৭৮

[illegible]

য়া অয়্যুহল্লজী-ন য়া-মনুত্তকুল্লা-হ ব-জরূ মা-বক্কি-য় মিনর্রিবা ইন্ কুন্তুম মুঅ্মিনীন। (২৭৮)

হে মুমিনগণ! খুদাকে ভয় করো আর যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা বর্জন করো। (২৭৮)

সূরাঃ বাকারা - ২ থেকে আয়ত নং ২৭৯, ২৮০ এর জেরক্সকপি :-

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৭৯

[illegible]

ফ-ইল্লম তফ্-অলূ ফঅ্- জনূ বি-হবিম্- মিনল্লাহি ব রসূলিহী ব ইন তুবতুম ফ-লকুম রূউসু অম্বালিকুম লা তজ্লিমূ-ন ব লাতুজ্-লমূন (২৭৯)

যদি এমনটি না করো, তাহলে সাবধান হয়ে যাও (যে তোমরা) আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ (সুনিশ্চিত জানো) আর যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে নাও (আর সুদ ছেড়ে দাও), তাহলে তোমাদের নিজের প্রকৃত মূলধন প্রাপ্তি করার অধিকার থাকবে, যাতে

না অন্যের ক্ষতি হবে আর না তোমাদের ক্ষতি হবে। (২৭৯)

সূরাহ বাকারাহ - ২ আয়ত নং ২৮০

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

[illegible]

ব ইন কা-ন জূ অস্রতিন ফ-নজি রতন ইলা মৈ-স -রতিন ব অন ত-সদদক খৈরুল লকুম ইন কুন্তুম তঅ্- লমূন (২৮০)

আর যদি ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে (তার) সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে সময় (দাও) আর যদি (ঋণের পরিমাণ) মাফ করে দাও, তাহলে তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। (২৮০)

সূরাঃ ফাতিহা - ১ আয়াত নং থেকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ - এর ফটোকপি :-

সূরাহ ফাতিমা - ১ আয়াত নং ১

[illegible]

অল্'হম্দু লিল্লাহি রব্বিল-আ-লমীন (১)

সকল প্রকারের প্রশংসা আল্লারই জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। (১)

সূরাহ ফাতিহা - ১ আয়ত নং ২

সূরহ ফাতিহা–1 الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ অর্রহ্মানির্রহীম (2) বড়া মেহরবান, নিহায়ত রহম বালা, (২)	সূরহ ফাতিহা–1 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ ইহ্দিনস্ সিরাত্বল মুস্ত–তকীম (5) হুম কো সীধে রাস্তে পর চলা, (৫)
সূরহ ফাতিহা–1 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ মালিকি য়াঁমিদ্দীন (3) ইন্সাফ কে দিন কা হাকিম, (৩)	সূরহ ফাতিহা–1 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ সিরাতলজী– ন অন্‌অম্–ত অলৈহিম্ (6) [illegible] (৬)
সূরহ ফাতিহা–1 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ ইয়্যা– ক নঅ্‌বুদু ব ইয়্যা–ক নস্তাঈন (4) [illegible] (৪)	সূরহ ফাতিহা–1 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ গৈরিল–মগ্‌জুবি অলৈহিম্ ব লাজ্‌জাল্লীন (7) [illegible] (৭)

সূরাঃ ফুরকান - ২৫ থেকে আয়ত নং ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫২

سورة الفرقان 25

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

ফলা তুতিহিল্ কাফিরী ন ব জাহিদ্‌হুম্ বিহী জিহাদন্ কবীরা (52)

[illegible] (৫২)

ফলা-তুতিহিল্ কাফিরী-ন ব জাহিদ্'হুম্ বিহী জিহাদন্ কবীরা। (৫২)

সুতরাং তুমি কাফিরদের কথা মানবে না এবং তাদের সঙ্গে এই কুরআনের নির্দেশ অনুসারে প্রবলভাবে সংগ্রাম (প্রতিবাদ) করবে। (৫২)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৩

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

ব হুবল্লজী ম-র জল বহ্‌'রৈনি হাজা-অজ্বুন ফুরাতুব্ ব হাজা মিলহুন উজাজুন ব জ-অ-ল বৈ-নহুমা বর্‌'জখব্ ব হিজরম্ মহ্‌জুরা (৫৩)
আর তিনিই দুই নদীকে (একত্রে) মিলিয়ে দিয়েছেন, একটির জল মিষ্টি, পিপাসা মেটায় এবং অপরটি লবনাক্ত, বুক জ্বলে যায় এবং উভয়ের মধ্যে এক অবরোধ ও শক্তিশালী ব্যবধান বানিয়ে দিয়েছেন। (৫৩)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৪

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

ব হুবল্লজী খ-ল-ক মিনলমাই- ব-শরন্ ফ-জ-অ-লহূ ন-স-বব্ ব সিহ্‌'রন্ ব কা-ন রব্বু-ক কদীরা (৫৪)
আর তিনিই পানী থেকে মানুষকে উৎপন্ন করেছেন, তারপর তাদেরকে বংশ সম্পর্কীয় ও (বৈবাহিক অনুসারে) জামাই সম্বন্ধ বানিয়েছেন আর তোমার প্রতিপালক (সকল প্রকারে) প্রকৃতিকে রক্ষা করেন। (৫৪)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৫

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

ব য়অবুদূ-ন মিন্ দুনিল্লাহি মা লা য়নফউহুম ব লা য়জুররুহুম ব কানল্কাফিরু অলা রব্বিহী জহীরা (৫৫)
আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর পূজা করে, যা না তাদের লাভ দিতে পারে আর না তাদের ক্ষতি আর কাফির তো তাঁর পরবরদিগারের বিরোধিতা জোর দিয়ে করে। (৫৫)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৬

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

ব মা অর্‌'সল্না-ক ইল্লা-মুবাশিশরংব্ ব নজীরা (৫৬)
আর (হে মুহম্মদ!) আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদ ও শাস্তির বার্তা শোনানোর জন্য পাঠিয়েছি। (৫৬)

সূরাঃ ফুরকান - ২৫ থেকে আয়ত নং ৫৭, ৫৮, ৫৯ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৭

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

কুল্ মা অসঅলুকুম্ অলৈহি মিন্ অজরিন্ ইল্লা-মন্'শা -অয়্যত্তখি-জইলা রব্বিহী সবীলা (৫৭)
বলে দাও, আমি তোমাদের থেকে এ (কর্মের) জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি চায় (সে) তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করতে পারে। (৫৭)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৮

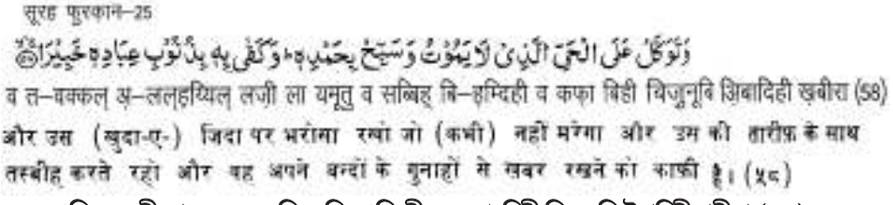

ব ত-বক্কল্ অ-লল্হ'য়্যিল্ লজী লা য়মূতু ব সব্বিহ্ বি-হ'ম্দিহী ব কফা-বিহী বিজুনুবি ইবাদিহী খবীরা (৫৮)
আর ঐ (খুদা-এ) জিন্দার উপর ভরসা রাখো, যিনি (কখনই) মরেন না আর তাঁর মহিমা প্রশংসার সহিত ঘোষণা করতে থাকো এবং তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। (৫৮)

সূরাহ ফুরকান - ২৫ আয়ত নং ৫৯

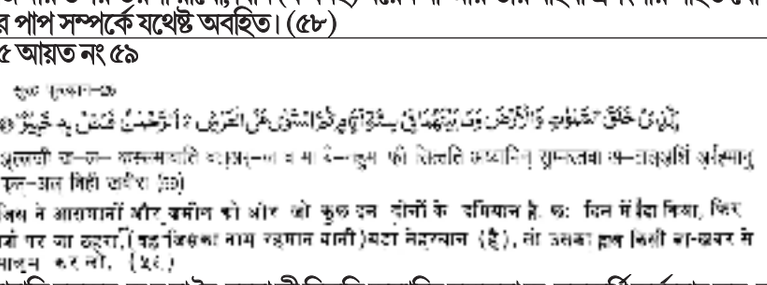

অল্লজী খ-ল- ক্বসমাবাতি বল্অর্-জ ব মা বৈ-নহুমা ফী সিত্তুতি অয়্যামিন্ সুম্মস্তবা অ-ললঅর্শি অর্রহমানু ফস্-অল্ বিহী খবীরা (৫৯)
যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী আর যা কিছু এ দু'য়ের মধ্যবর্তী রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের (সিংহাসনের) উপর বিরাজমান হয়েছেন (যাঁর নাম রহমান অর্থাৎ) পরম দয়ালু (আছেন), তাঁর বিষয়ে কোনো বা-খবরের নিকটে জিজ্ঞাসা করো। (৫৯)

সূরাঃ হাদীদ ৫৭ থেকে আয়ত নং ২৬ -এর ফটোকপি :-
সূরাহ হাদীদ ৫৭ আয়ত নং ২৬

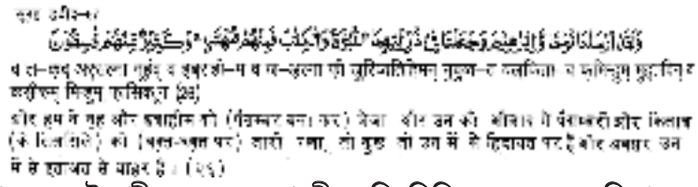

ব ল-কদ্ অর সর্লনা নূহব ব ইবরাহী-ম ব জ-অল্না-ফী জুররিয়্যতিহিমন নুবুব্ব-ত বলকিতা-ব ফমিন্হুম মুহতদিন ব কসীরুম মিন্হুম ফাসিকূন। (২৬)
আর আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে (পয়গম্বর বানিয়ে) পাঠিয়েছি আর তাদের বংশধরগণের মধ্যে পয়গম্বরী ও কিতাবের (ধারাবাহিকতা)-কে (সময়-সময় অনুসার) চালু রেখেছি, তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো সৎপথে ছিল এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ আনুগত্যের বাইরে ছিল। (২৬)

সূরাঃ হাদীদ - ৫৭ আয়ত নং ২৭

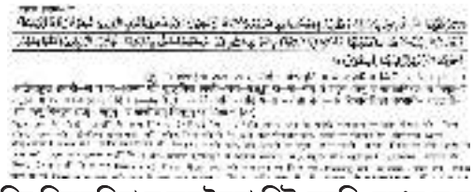

সুম্-ম কফফৈনা অলা আসারিহিম্ বিরুসুলিনা ব কফফৈনা বিঈ-সবনি মর'য়-ম ব আতৈনাহুল্ ইঞ্জি-ল্ ব জ-অল্না-ফী কুলুবিল লজী-নত- বউহু রা-ফ-তব্ ব রহ্'ম-তন ব রহবানিয়্য-ত নিব্ত-দ উহা মা ক-তব্নাহা অলৈহিম ইল্লব্তিগা-অ রিজ্বানিল্লাহি ফমা রওহা হক্-ক রিআয়তিহা-ফআতৈ-নল্লজী-ন আ-মনূ মিন্হুম্ অজ্-রহুম্ ব কসীরুম্ মিন্হুম্ ফাসিকূন (২৭)

অতঃপর তাঁদের পিছনে তাঁদেরই পদচিহ্ন অনুসারে (আরও) রসূলদের পাঠিয়েছি আর তাঁদের পরে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে (যীশুকে) পাঠিয়েছি এবং তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল, তাদের হৃদয়ে সহানুভূতি ও দয়া ভরে দিয়েছি আর (যখন) লজ্জা থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছিল, তখন তারা নিজেরাই এক নতুন পন্থা (সন্ন্যাস বাদ) উদ্ভাবন করে নেয়। আমি তাদেরকে এমনটি করার নির্দেশ দিইনি কিন্তু (তারা নিজের ইচ্ছানুসারে) আল্লাহর লাভ প্রাপ্তির জন্য (নিজেরাই এমনটি

করেছিল), তবে যেমনটি করা উচিৎ ছিল, সেইরূপ কার্য যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেনি। তবে তাদের মধ্যে থেকে যারা ইমান (বিশ্বাস) এনেছে, তাদের আমি তার প্রতিদান দিয়েছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবিশ্বাসী। (২৭)

সূরাঃ হজ্জ ২২ থেকে আয়ত নং ৬১ -এর ফটোকপি :-

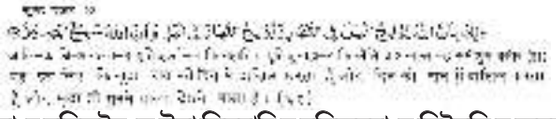

জালি-ক বি-অন্নল্লা-হ য়লিজল্লৈ-ল ইলা ফিন্নহারি ব য়ুলিজুন্নহা-র ফিল্লৈলি ব অন্নল্লা-হ সমীউম বসীর। (৬১)

এটা এইজন্য যে, আল্লাহ রাত্রীকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান এবং আল্লাহ তো শ্রবণকারী ও পরিদর্শককারী। (৬১)

সূরাঃ কহফ- ১৮ থেকে আয়ত নং ৪৭, ৪৮ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ কহফ্ - ১৮ আয়ত নং ৪৭

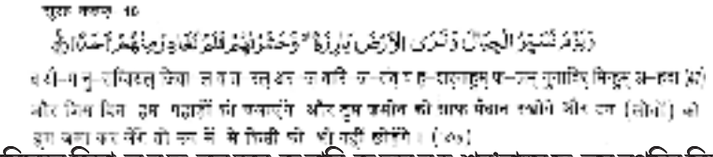

ব য়ৌ-ম নু-সয়্যিরুল্ জিবা-ল ব ত-রল্ অর্-জ বারি-জ তব্ ব হ-শর্'নাহুম ফ্-লম্ নুগাদির মিন্হুম্ অ- হদা (৪৭)

আর যেদিন আমি পর্বতসমূহকে স্থানান্তরিত করব এবং তোমরা পৃথিবীকে শূন্য ময়দান রাখবে এবং সেই (ব্যক্তিদেরকে) আমি একত্রিত করে নেব, তখন তাদের মধ্যে কাউকেও ছাড়ব না। (৪৭)

সূরাহ কহফ্ - ১৮ আয়ত নং ৪৮

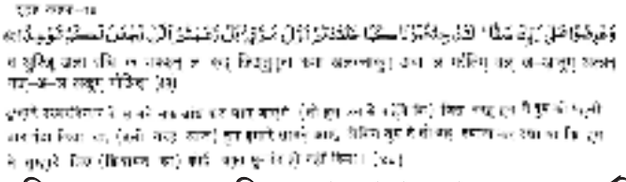

ব উরিজু অলা-রব্বি-ক সফ্ফন ল-কদ্ জিঅ্তুমূনা কমা-খলকনাকুম অব্ব-ল মর্রতিম্ বল্ জ-অম্তুম অল্লন্ নজ্-অ-ল লকুম্ মৌঅইদা (৪৮)

তোমাদেরকে পরবরদিগারের সামনে সারিবদ্ধভাবে বেঁধে নিয়ে আসা হবে, (তখন আমি তাদেরকে বলব যে,) যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার উৎপন্ন করেছিলাম, (সেইভাবে আজ) তোমরা আমার সামনে এসেছ কিন্তু তোমরা তো এটা মনে ভেবে নিয়েছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য (কিয়ামতের) কোনো সময় নির্ধারিতই করিনি। (৪৮)

সূরাঃ লুকমান ৩১ আয়ত নং ১২, ১৩, ১৪, ১৫ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১২

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

ব ল-কদ্ আতৈনা লুক্মানল্ হিক্ম-ত অনিশ্কুর্ লিল্লাহি ব ময়্য়শ্কুর্ ফ-ইন্নমা য়শ্কুরু লিনফ্সিহী ব মন্ ক-ফ-র ফ-ইন্নল্লা-হ গনিয়্যুন্ হমীদ (১২)

और हमने लुक़्मान को हिकमत बख़्शी कि ख़ुदा का शुक्र करो और जो शख़्स शुक्र करता है, तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है और जो ना-शुक्री करता है, तो ख़ुदा भी बे-परवाह (और) हम्द (व तारीफ़) के लायक़ है। (१२)

ব ল-কদ্ আতৈনা লুক্মানল্ হিক্ম-ত অনিশকুর্ লিল্লাহি ব ময়্য়শ্কুর্ ফ্-ইন্নমা য়শ্কুরু লিনফ্সিহী ব মন্ ক-ফ্-র ফ্-ইন্নল্লা-হ গনিয়্যুন হমীদ (১২)

আর আমি লুকমানকে হিকমত (জ্ঞান) প্রদান করেছি যে, আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা নিজের লাভের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাহলে আল্লাহও (তাকে) নিঃসন্দেহে অবহেলনা করেন (ও তিনি) প্রশংসার যোগ্য। (১২)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৩

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

ব ইজ্ কা-ল লুক্মানু লিব্নিহী ব হু-ব য়অ'ইজুহূ য়াবুনয়্-য় লা-তুশরিক্ বিল্লাহি ইন্নশির্-ক ল-জুল্মুন্ অজীম (13)

और (उस वक़्त को याद करो,) जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा ख़ुदा के साथ शिर्क न करना शिर्क तो बड़ा (भारी) ज़ुल्म है। (१३)

ব ইজ্ কা-ল লুক্মানু লিব্নিহী ব হু-ব য়অ'ইজুহূ য়াবুনয়্-য় লা-তুশরিক্, বিল্লাহি ইন্নশির্-ক ল-জুল্মন অজীম। (১৩)
আর (ওই সময়ের কথা স্মরণ করো,) যখন লুকমান নিজের পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল যে, পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, শরীক করা তো মহা অপরাধ। (১৩)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৪

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

ব বস্সৈনল্ ইন্সা-ন বিবালিদৈহি হ-ম-লতহু উম্মুহূ বহনন্ অলা বহনিব্ ব ফিসালুহূ ফী আমৈনি অনিশ্কুর্'লি ব লিবালিদৈ-ক ইলয়্যল্ মসীর (১৪)

और हम ने इंसान को, जिसे उस की माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सह कर पेट में उठाए रखती है (फिर उस को दूध पिलाती है) और (आख़िरकार में) दो साल में उस का दूध छुड़ाना होता है,(अपने, साथ ही) उसके मा-बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रह और अपने मा-बाप का भी (कि तुम को) मेरी ही तरफ़ लौट कर आना है●(१४)

ব বস্সৈনল্ ইন্সা-ন বিবালিদৈহি হ-ম-লতহু উম্মুহূ বহনন্ অলা বহনিব্ ব ফিসালুহূ ফী আমৈনি অনিশ্কুর্'লি ব লিবালিদৈ-ক ইলয়্যল্ মসীর (১৪)

আর আমি মানুষকে, যাকে তার জননী কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে (তারপর তাকে দুগ্ধ পান করায়) আর (অবশেষে) দুই বৎসরে মধ্যে তাকে দুগ্ধ ছাড়িয়ে দিতে হয়, (তার সাথেই) তার মাতা-পিতার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমাকেও কৃতজ্ঞতা জানাও এবং নিজের মাতা-পিতাকেও (কেননা তোমাদেরকে) আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৪)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৫

وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

ব ইন্ জা-হদা-ক অলা অন্ তুশ্রি-ক বী মা লৈ-স ল-ক বিহী ইল্মুন ফ্লা-তুতিঅ্হুমা ব সাহিব্'হুমা ফিদ্দুন্যা মঅরূফব্ বত্তবিঅ্ সবী-ল মন্ অনা-ব ইলয়্-য় সুম্-ম ইলয়্-য় মর্জিউকুম্ ফ্উনব্বিউকুম্ বিমা কুন্তুম্ তঅ্-মলূন (১৫)

और वे तेरे पीछे पड़े हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे, जिस का तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उन का कहना न मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उन का इज़्ज़त साथ देना और जो शख़्स मेरी तरफ़ झुका हो, उस के रास्ते पर चलना, फिर तुम को मेरी तरफ़ लौट कर आना है। तो जो काम तुम करते रहे, मैं उन से तुम को आगाह करूँगा। (१५)

ব ইন্ জা-হদা-ক অলা অন্ তুশ্রি-ক বী মা লৈ-স ল-ক বিহী ইল্মুন ফ্লা-তুতিঅ্হুমা ব সাহিব্'হুমা ফিদ্দুন্যা মঅরূফব্ বত্তবিঅ্ সবী-ল মন্ অনা-ব ইলয়্-য় সুম্-ম ইলয়্-য় মর্জিউকুম্ ফ্উনব্বিউকুম্ বিমা কুন্তুম্ তঅ্-মলূন (১৫)

যদি তোমার পিতামাতা আমার তুলনা অন্যের সঙ্গে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না। হ্যাঁ! জগতের কাজকর্মে সদভাবে তাদের সহযোগ করবে এবং যে ব্যক্তি আমার দিক অভিমুখী হয়েছে, তার মার্গ অবলম্বন করবে, অতঃপর তোমাকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে কর্ম তুমি করতে, সেই বিষয়ে আমি তোমাকে অবগত করব। (১৫)

সূরা লুকমান ৩১ থেকে আয়ত নং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৬

يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

या बुनय्-य इन्नहा इन् तकु मिस्क़ा-ल हब्बतिम् मिन् ख़र्दलिन् फ़-तकुन् फ़ी सख़्-रतिन् औ फ़िस्समावाति औ फ़िल्अर्ज़ि य़अ्ति बिहिल्लाहु इन्नल्ला-ह लतीफ़ुन् ख़बीर (16)

(लुक़मान ने यह भी कहा कि) बेटा! अगर कोई अमल (राई के दाने के बराबर भी (छोटा) हो और हो भी किसी पत्थर के अन्दर या आसमानों में (छिपा हुआ हो) या ज़मीन में, ख़ुदा उस को क़ियामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि ख़ुदा बारीक (और) ख़बरदार है। (१६)

या-बुनय्-य इन्नहा इन् तकु मिस्का-ल हब्बतिम् मिन् ख़र्दलिन् फ-तकुन् फ़ी सख्-रतिन् औ फ़िस्समावाति औ फ़िल्अर्ज़ि य़अ्ति बिहिल्लाहु इन्नल्ला-ह लत्वीफ़ुन् ख़बीर। (১৬)

(লুকমান একথাও বলেছিল যে,) পুত্র ! কোনো অমল (মেনে নাও) তা যদি সরিষার দানার সমানও (ছোটো) হয় আর তাহা যদি কোনো পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচেও (লুকিয়ে থাকে), আল্লাহ সেটাকে কিয়ামতের দিন হাজির করবেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। (১৬)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৭

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

য়া বুনয়্-য় অকিমিস্সলা-ত বঅ্মুর্ বিল্মঅ্'রুফি বন্-হ অনিল্মুনকরি বসবির্ অলা মা অসা-ব-ক ইন্-ন জালি-ক মিন্ অজমিল্ উমূর (১৭)

হে পুত্র! নামাজের নিয়মিততা বজায় রাখবে আর (মানুষকে) সৎকর্ম করার জন্য নির্দেশ দাও আর খারাপ কর্ম করতে নিষেধ করতে থাকবে এবং যেসব বাধা বিপত্তি তোমার উপর আসবে, তখন ধৈর্য রাখবে। যদিও বা এটা বড় সাহসের কার্য। (১৭)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৮

وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨

ব লা-তুসঅইর্ খদ্-ক লিন্নাসি ব লা-তাম্শি ফিল্অর্জি ম-র-হন্ ইন্নল্লা-হ লা য়ুহিব্বু কুল্-ল মুখ্তালিন ফখূর (১৮)

আর (অহংকারে বশীভূত হয়ে) মানুষের প্রতি গাল ফুলিয়ে থাকবে না এবং ভূমির উপর দম্ভভরে চলবে না, কারণ আল্লাহ এমন কাউকে পছন্দ করেন না, যে নিজেকে নিয়ে অহংকার করে। (১৮)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ১৯

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

বকসিদ্ ফী মশয়ি-ক বগ্জুজ্ মিন্ সৌতি-ক্ ইন্-ন অন্করল্ অস্বাতি লসৌতুল্ হমীর (19)

আর নিজের কর্মে একটি মধ্যপন্থা বজায় রাখবে এবং (বলার সময়) কণ্ঠস্বরটি নীচু রাখবে, কেননা (উচ্চ কণ্ঠস্বর গাধারই আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে,) সবচেয়ে নিকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হল গাধার। (১৯)

সূরাহ লুকমান - ৩১ আয়ত নং ২১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۗ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١

ব ইজা কী-ল লহুমুত্তবিউ মা অন্জ-লল্ল তত্তাবিউ মা ব-জদনা অলৈহি আবা-অনা অ-ব লৌ কানশশৈতানু য়দ'উহুম ইলা-অজাবিস সঈর (২১)

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, যে (কিতাব) আল্লাহ নাজিল করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন বলে যে, আমরা তো সেইটাই অনুসরণ করব, যেটা আমাদের পিতৃপুরুষরা পেয়েছে। এমনকি শয়তান যদি তাদেরকে দোজখের জ্বলন্ত আগুনের দিকেও আহ্বান করে (তবুও?) (২১)

সূরাঃ মায়দা ৫ থেকে আয়ত নং ১ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ মায়দা - ৫ আয়ত নং ১

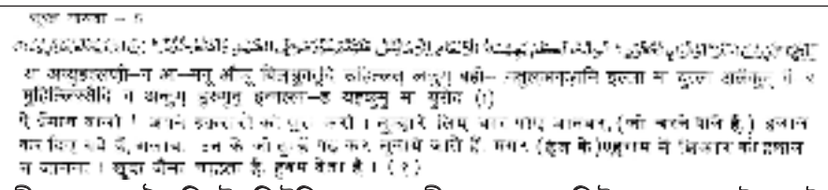

য়া-অয়্যুহুল্লজী-ন আ-মনু ঔফু বিলউকূদি উহিল্লত্ লকুম্ বহী- মতুল্অন্আমি ইল্লা- মা-য়ুল্লা অলৈকুম গৈ-র মুহিল্লিসৈদি ব অন্তুম্ হুরুমুন্ ইন্নল্লা-হ য়হ্কুমু মা-য়ুরীদ (১)

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু (যা চড়ে বেড়ায়) হালাল করা হয়েছে, তা ব্যতীত, যা তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হয়, তবে (হজের) ইহ্রাম অবস্থায় শিকারকে বৈধ্য মনে করবে না। খুদা যা চান, তাই আদেশ করেন। (১)

সূরাঃ মুদ্দসসির - ৭৪ থেকে আয়াত নং ২৬, ২৭ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ মুদ্দসসির ৭৪ আয়াত নং ২৬

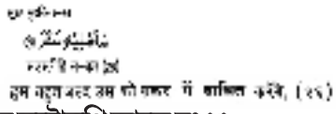

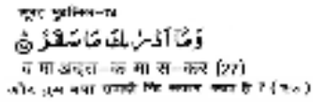

আরবি ভাষার ফটোকপি আয়ত নং ২৬

সউস্লী'হি স্-কর (২৬)

আমরা খুব শীঘ্রই তাকে যাত্রায় অংশভুক্ত করব। (২৬)

ব মা অদ্'রা-ক মা স-কর (২৭)

আর তুমি কি জানো, কেমন ওই জাহান্নাম? (২৭)

সূরাঃ মুল্ক - ৬৭ থেকে আয়ত নং ২, ৯ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ মুল্ক - ৬৭ আয়ত নং ২

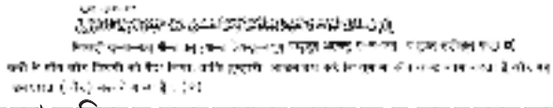

নিল্লজী খ-ল-কল্ মৌ-ত বল্ হয়া-ত লিয়ব্ লু-য়কুম্ অয়্যুকুম্ অহ্সনু অ-ম-লন্ ব হুবল্ অজীজুল্ গফূর (২)

তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কর্ম করছে এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীলদাতা। (২)

সূরাহ মুল্ক - ৬৭ আয়ত নং ৯

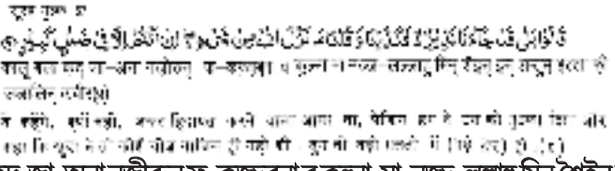

কা-লূ বলা-ক্বদ্ জা-অনা নজীরুন্ ফ-কজ্জব্না ব কুল্না-মা-নজ্জ-লল্লাহু মিন্ শৈইন্ ইন্ অন্তুম্ ইল্লা-ফী জলালিন্ কবীর (৯)

তারা বলবে, কেন নয়, নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শক এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম আর বলেছিলাম যে, খুদা তো কোনো কিছুই নাজিল করেন নি। তুমি তো মহা বিভ্রান্তের মধ্যে (পড়ে) রয়েছো। (৯)

সূরাঃ মুঅ্মিনুন - ২৩ থেকে আয়ত নং ১২, ৪৯, ৫০, ৭৯ এর ফটোকপি :-

সূরাহ মুঅ্মিন - ৪০ আয়ত নং ১২

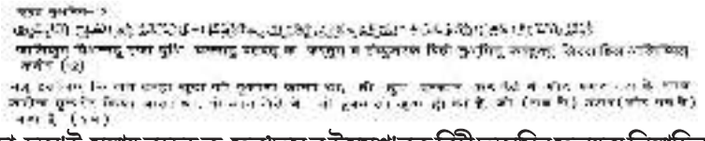

জালিকুম্ বিঅন্নহূ ইজা-দুআ'ই-য়ল্লাহু বহ্দহূ ক-ফর্'তুম্ ব ইন্ইয়ুশ্'রক্ বিহী তুঅ্মিনূ ফলহুক্মু লিল্লাহিল্ অলিয়্যিল্ কবীর। (১২)

এ (শাস্তি) এইজন্য যে, যখন একমাত্র আল্লাহকে আহবান করা হতো, তখন তোমরা অস্বীকার করে দিতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক নিযুক্ত করা হতো, তখন মেনে নিতে, অতএব আদেশ তো আল্লাহরই ছিল, যিনি (সব থেকে) উপরে (এবং সবার থেকে) বড়। (১২)

সূরাহ মুঅ্‌মিনুন - ২৩ আয়ত নং ৪৯

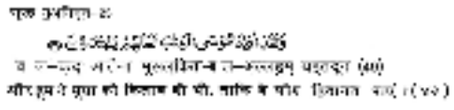

ব ল- কদ্ আতৈনা-মূসল্‌’কিতা-ব ল-অল্লহুম্ য়হ্‌তদূন্। (৪৯)
আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা উপদেশ পায়। (৪৯)

সূরাহ মুঅ্‌মিনুন - ২৩ আয়ত নং ৫০

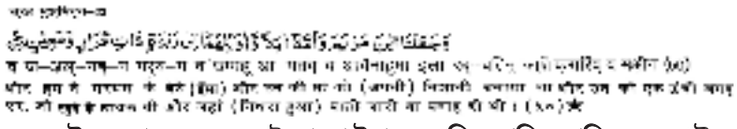

ব জ-অল্-নব্-ন মর্‌’য়-ম ব উম্মহূ আ-য়তনব্ ব আবৈনাহুমা ইলা রব্-বতিন্ জাতি ক্বরারিংব্ ব মঅ্‌’ঈন্ (৫০)
এবং আমি মরিয়মের পুত্র (ঈসা) ও তাঁর জননীকে (আমার) নিদর্শন বানিয়েছি এবং তাদেরকে এক উচ্চ স্থানে আশ্রয় দিয়েছি, যা বসবাস যোগ্য আর যেখানে (স্থির) স্বচ্ছ জল প্রবাহিত ছিল। (৫০)

সূরাহ মুঅ্‌মিন - ৪০ আয়ত নং ৭৯

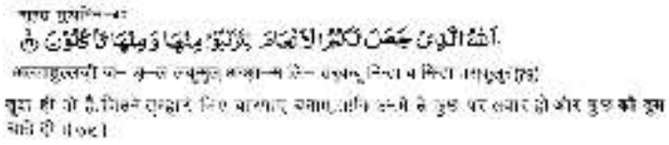

অল্লাহুল্লজী জ-অ-ল লকুমুল্ অন্‌আ-ম লি- তর্‌’কবূ মিন্হা ব মিন্হা তঅকুলূন (৭৯)
আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ (চার পায়ের প্রাণী) সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারমধ্যে কিছু সংখ্যকের উপরে চড়তে পারো আর কিছু সংখ্যককে তোমরা ভোজন করতে পারো। (৭৯)

সূরাঃ নিসা ৪ আয়ত নং ৯, ১০, ৩৬ -এর ফটোকপি :-
সূরাহ নিসা - ৪ আয়ত নং ৭

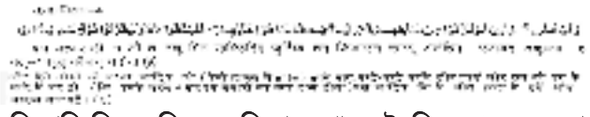

বল য়খ্‌শল্‌জী-ন লৌ ত-রকূ মিন্ খল্‌ফিহিম্ জুররিয়্য-তন জিআফন্ খাফূ অলৈহিম্ ফল্‌য়ত্-তকূল্লা-হ বল্-যকূলূ কৌলন্ সদীদা (৯)
আর এমন ব্যক্তিদের ভয় পাওয়া উচিত, যারা (এমন অবস্থায় রয়েছে যে,) নিজেদের (গত হয়ে যাওয়ার) পরে, ছোট ছোট অসহায় সন্তানদেরকে ছেড়ে যায় এবং তাদের বিষয়ে তার ভয় থাকে (যে, তিনি মারা যাবার পরে, এই অসহায়দের কি দুর্দশা হবে) সুতরাং লোকেদের উচিৎ, যেন আল্লাহকে ভয় পায় এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলে। (৯)

সূরাহ নিসা- ৪ আয়ত নং ১০

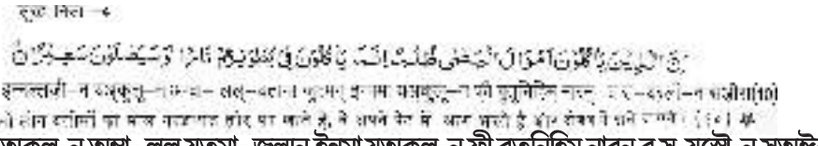

ইন্নল্লজী - ন য়অ্‌কুলূ-ন অম্বা- লল্ য়তমা- জুল্মন্ ইন্নমা য়অ্‌কুলূ-ন ফী বুতূনিহিম্ নারন্ ব স-য়স্লৌ-ন সঅঈরা (১০)
যারা অনাথদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের নিজেদের পেটে আগুন ভরে এবং তাদেরকে দোজখে

ফেলে দেওয়া হবে। (১০)

সূরাহ নিসা- ৪ আয়ত নং ৩৬

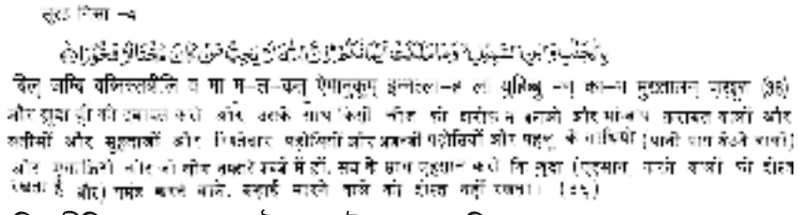

বিল্ জম্বি বব্‌নিস্সবীলি ব মা ম-ল -কত্ ঐমানুকুম্ ইন্নল্লা-হ্ লা য়ুহিব্বু, মন্ কা-না মুখ্‌তালন্ ফখূরা (৩৬)

আর (তোমরা) আল্লাহরই ইবাদত (উপাসনা) করো এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনদের, অনাথদের, অভাবগ্রস্থদের, নিকটতম-প্রতিবেশী, অজানা-প্রতিবেশীদের, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী-সাথীদের (অর্থাৎ যারা সর্বদা কাছে থাকে), পথিকদের এবং যে সকল ব্যক্তিরা তোমার অধীনে রয়েছে (দাস-দাসী কর্মচারী) সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করো, আল্লাহ (সদ্ব্যবহার করা ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা রাখেন আর) অহংকার করা দাম্ভিকদের সঙ্গে মিত্রতা রাখেন না। (৩৬)

সূরাঃ রহমান ৫৫ থেকে আয়ত নং ৭, ৯ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ রহমান - ৫৫ আয়ত নং ৭

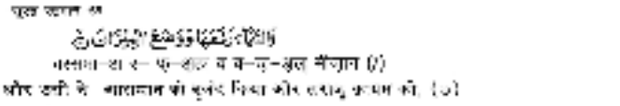

বস্সমা-অ র-ফ্-অহা ব ব-জ-অল্ মীজান (৭)

আর তিনিই আকাশকে উন্নীত করেছেন এবং মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। (৭)

সূরাহ রহমান - ৫৫ আয়ত নং ৯

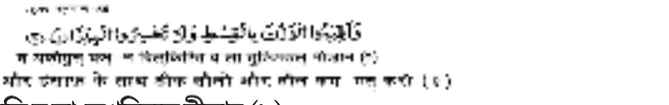

ব অকীমুল্ বজ্-ন বিল্'কিস্তি ব লা তুখ্‌সিরুল্ মীজান (৯)

এবং সততার সহিত সঠিক ওজন করবে এবং ওজনে কমতি করবে না। (৯)

সূরাঃ রুম - ৩০ থেকে আয়ত নং ১১ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ রুম – ৩০ আয়ত নং ১১

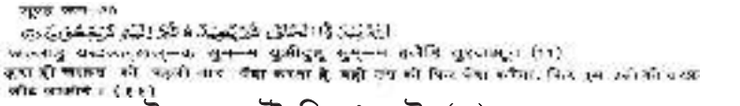

অল্লাহু যব্দউল্'খল্-ক সুম্ -ম য়ুঅঈদুহু সুম্-ম ইলৈহি তুর্'জঅউন (১১)

আল্লাহই সর্বপ্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তিনিই পুনরায় এর সৃষ্টি করবেন, তারপর তাঁর কাছেই তোমদের ফিরে যেতে হবে। (১১)

সূরাঃ সবা ৩৪ থেকে আয়ত নং ২৩ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ সবা - ৩৪ আয়ত নং ২৩

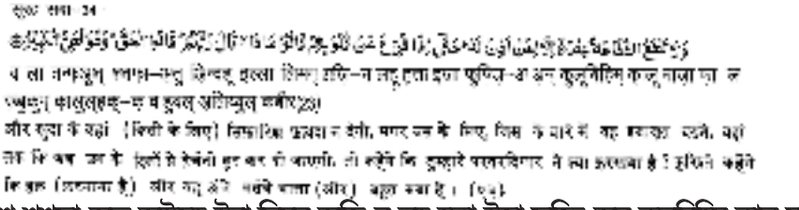

ব লা-তন্ফউশ্ শশফা-অতু অইন্দহূ ইল্লা লিমন্ অজি-ন লহূ হত্তা ইজা ফুজ্জি-অন্ কুলূবিহিম্ কালু মাজা কা-ল রব্বুকুম

কালুল্‌হক্ - ক ব হুবল্ অলিয়্যুল্ কবীর (২৩)

আর আল্লাহর দরবারে (কারোর জন্য) সুপারিশ ফলপ্রসূ দেবে না কিন্তু তার জন্য যার বিষয়ে তিনি অনুমতির কৃপা করবেন, এমন কি, যখন তাদের হৃদয় হতে অস্থিরতা দূর করে দেওয়া হবে, তখন বলবে যে, আপনার পরবরদিগার কী নির্দেশ দিয়েছেন? ফেরেশতা বলবেন, যা সত্য (তার নির্দেশ দিয়েছেন) আর তিনি অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার অধিকারী (এবং) অতি মহান। (২৩)

সূরাঃ সজদহ ৩২ থেকে আয়ত নং ৪ -এর ফটোকপি :-

সূরাহ সজদহ - ৩২ আয়ত নং ৪

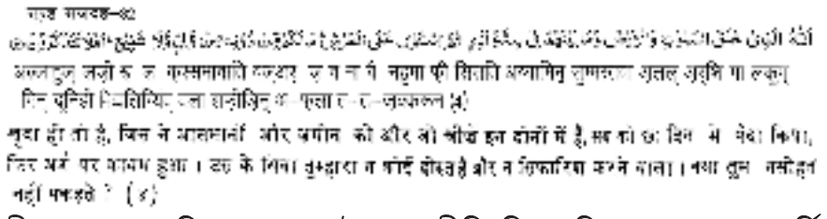

অল্লাহুল্ লজী খ-ল-কস্সামাবাতি বল্‌অর্ জ ব মা বৈ- নহুমা ফী সিত্তাতি অয়্যামিন্ সুম্মস্তবা অলল্ অর্'র্শি মা লকুম্ মিন্ দূনিহী- মিব্বলিয়িঁব্ বলা- শফীইন্ অ-ফলা ত-ত -জক্করূন (৪)

আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং যা কিছু এই দুইয়ের মধ্যবর্তী রয়েছে, সমস্ত কি ছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশের (সিংহাসনের) উপর বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের না কোনো সাথী আছেন আর না কোনো সুপারিশকারী আছে। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৪)

সূরাঃ শূরা - ৪২ থেকে আয়ত নং ১, ২ - এর ফটোকপি :-

সূরাহ শূরা - ৪২ আয়ত নং ১

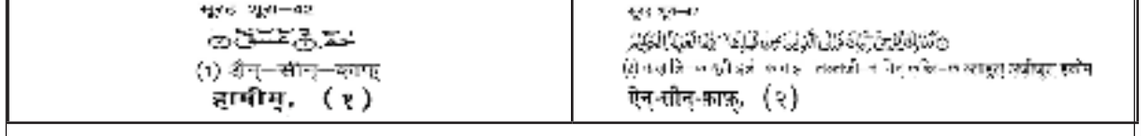

হা মীম্ (১)

সূরাহ শূরা - ৪২ আয়ত নং ২

আরবি ভাষার ফটোকপি আয়ত নং ২

ঔন্ - সীন্ - কাফ্। (২)

সূরাঃ যুনুস - ১০ থেকে আয়ত নং ৯৯ - এর ফটোকপি :-

সূরাহ যুনুস - ১০ আয়ত নং ৯৯

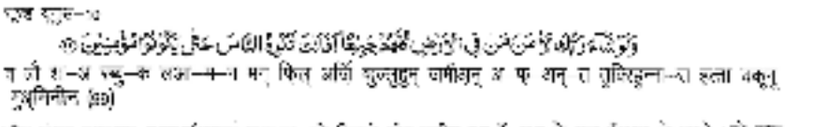

আরবি ভাষার ফটোকপি আয়ত নং ৯৯

ব লৌ শা-অ রব্বু-ক লআ-ম-ন মন্ ফিল্ অর্জি কুল্লুহুম্ জমীঅন্ অ-ফ্ব-অন্-ত তুক্রিহুন্না-স হত্তা যকূনূ মুঅ্‌মিনীন্। (৯৯)

আর যদি তোমার পরবরদিগার চাইতেন, তাহলে যত মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে, সকলেই ইমান আনতে পারত। তাহলে কি তুমি লোকেদের উপর জবরদস্তি করতে চাইছ, যাতে তারা মোমিন হয়ে যায়। (৯৯)

❑❑❑